

বিমল করের জীবনদৃষ্টি : প্রসঙ্গ তাঁর ছোটগল্প

পি. এইচ.ডি (আর্টস) ডিগ্রীর জন্য প্রস্তুত অভিসন্দর্ভ
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়
২০০৭

গবেষক : পঞ্চানন মন্ডল
তত্ত্বাবধায়ক : ড. সুজিত কুমার পাল

Ref
92.8
ଅକ୍ଷା/ବିନ୍ଦୁ

202078

20 MAR 2003
20 MAR 2003

STOCK TAKING-2011



Govt. of West Bengal
Acharya B. N. Seal College
(Affiliated to University of North Bengal)
Department of Bengali
Cooch Behar- 736101
West Bengal, India.

From

Dr. Sujit Kumar Pal

Lecturer in Bengali

Vill : Bajitpur, Po : Laxminathpur,

Dist : Murshidabad , W. B., India .

Mobile : 09434228453

E-mail : skpal_1987@yahoo.co.in

TO WHOM IT MAY CONCERN

I am pleased to certify that Sri Panchanan Mandal, Lecturer in Bengali, A. B. N. Seal College, Cooch Behar has successfully completed his Ph. D research work under my Guidance , as a research scholar of University of North Bengal, his research topic being "BIMAL KARER JIBAN DRISHTI : PRASANGA TNAR CHHOTO GALPO". I also certify that the work of Sri Mandal is a fundamental one and no part of it has been published in any newspaper, journal, magazine, book or any such electronic media.

I, hereby, approve the thesis of Sri Mandal and allow him to submit it to University of North Bengal.

I wish him betterment in life.

Date : 25/06/07
Place : Cooch Behar , (W.B)

Sujit Kumar Pal
.....
(DR. SUJIT KUMAR PAL)
Lecturer in Bengali
(W.B.E.S)
A.B.N. Seal College (Govt.)
Cooch Behar

সূচিপত্র

--ঃ বিষয় :--

--ঃ পৃষ্ঠা সংখ্যা :--

মুখবন্ধ

১-৫

প্রথম অধ্যায় :

দেশ কালের পরিপ্রেক্ষিতে বিমল কর

৬-৩২

দ্বিতীয় অধ্যায় :

বিমল করের ছোটগল্পে জীবনদৃষ্টির বৈচিত্র্য

৩৩-১৮৬

তৃতীয় অধ্যায় :

বিমল করের উপন্যাসে জীবনদৃষ্টির বৈচিত্র্য

১৮৭-২২৮

চতুর্থ অধ্যায় :

সমকালীন গল্পকারদের সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনা ও

বিমল করের স্বকীয়তা

২২৯-২৬১

পঞ্চম অধ্যায় :

উপসংহার

২৬২-২৭৮

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

২৭৯-২৮৬

মুখবন্ধ

বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে ছোটগল্প অর্বাচীন হলেও তার বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। উনিশ শতকের শেষার্ধ্বে প্রকৃতপক্ষে এর জন্ম হলেও বলিষ্ঠ সাহিত্য-মাধ্যম হিসেবে এই ছোটগল্প শতাধিক বর্ষের মধ্য দিয়ে নানা পরিবর্তনেও মানুষের মনে স্থায়ী আসন লাভ করেছে। আধুনিক ব্যঙ্গজীবনে এর গ্রহণযোগ্যতা অত্যন্ত বেশি -- একথা বলা যায়। রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে একুশ শতকের প্রথম দশকেও মানবজীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত হয়ে এবং জীবনচিত্র প্রতিফলনের মাধ্যমে ছোটগল্প হয়ে উঠেছে প্রকৃতপক্ষে জীবনেরই দর্পণ। বিন্দুতে সিঁদু-দর্শন ছোটগল্পের অন্যতম বৈশিষ্ট্য বলে প্রচলিত আছে, সেই কারণে ছোটগল্প পাঠককে যথার্থভাবে ভাবিত করতে পারে। তার ইঙ্গিতময়তা পাঠকের মনে দীর্ঘব্যাপ্ত ভাবনার রেশ রেখে দেয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন চল্লিশের দশকে সাহিত্যক্ষেত্রে ছোটগল্পের হাত ধরে আবির্ভূত হন কথাসাহিত্যিক বিমল কর। রবীন্দ্রনাথের হাতে সৃষ্ট হয়ে বহু লেখকের হাত ধরে এগোতে এগোতে ছোটগল্প তখন পরিপূর্ণ। মানব জীবনের অনুভববেদ্য জগতের চিত্র রূপায়ণে আধুনিক লেখকেরা তখন কবিতা ও উপন্যাসের পাশাপাশি ছোটগল্পকে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছেন। মানুষের ব্যক্তিজীবন সমাজজীবন তথা তার আর্থিক, রাজনৈতিক অবস্থান, দেশীয়, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সব কিছু প্রকাশের মধ্য দিয়ে তখন ছোটগল্প পরিপূর্ণভাবে জীবন-আলেখ্য রূপে পরিগণিত। বিমল কর এই সময় সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশ করেন ব্যক্তি মানুষের প্রকৃত পরিচয় দানের মধ্য দিয়ে। তিনি মানুষের জীবনকে দেখেছেন খুব কাছ থেকে, অনুভব করেছেন তাদের চিন্তার শরিক হয়ে। অকারণ কল্পনাবিলাসের পথ ছেড়ে দিয়ে বাস্তবসম্মতভাবে মানবের অন্তরজগতে প্রবেশ করে খুঁজে এনেছেন নানা অনুভববেদ্য ধারণা। সমালোচনা করে নয়, উপেক্ষা করে নয়। তিনি সহানুভূতির মাধ্যমে মানুষের জীবনকে দেখার চেষ্টা করেছেন। তাঁর জীবনদৃষ্টির মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে আধুনিক পরিস্থিতিতে মানব জীবনের সর্বাত্মক রূপ। সেখানে হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখ, আনন্দ-যন্ত্রণা, প্রত্যাশা-অসহায়তা, সাফল্য-ব্যর্থতার ছবি ফুটে উঠেছে। মৃত্যু ও নিরতি ভাঙিত জীবনে অশেষ যন্ত্রণা ভোগের পরও মানুষ যে আশাবাদী হয়ে উঠতে পারে তা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। জীবন ভোগের মধ্য দিয়ে জীবন বরণের প্রত্যাশায় তাঁর চরিত্রগুলি উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছে।

আমার গবেষণার প্রথমেই বিশ শতকের দেশ-কালের পরিপ্রেক্ষিত, সমাজচিত্র আলোচনা করেছি। দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক ঝঞ্ঝাটের পরিস্থিতির প্রভাব মানুষের জীবন ও সাহিত্যের মধ্যে কেমন ভাবে প্রকাশ পেয়েছে তা তুলে ধরেছি। বিমল করের আবির্ভাব, তাঁর পারিবারিক ঐতিহ্য, তাঁর ব্যক্তিজীবন ও সাহিত্যজীবন, এবং সর্বোপরি তাঁর জীবন চেতনার বিবর্তন ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছি। এই আলোচনার মাধ্যমে তাঁর জীবনচর্যা ও জীবনবীক্ষাই যে তাঁর সাহিত্যে জীবনদর্শন প্রকাশের মাপকাঠি তা ব্যক্ত হয়েছে। চোখে দেখা এবং অনুভব করা জগৎই তাঁর বাস্তববাদী ভাবনার নিরিখে তাঁর সাহিত্যে রূপ পেয়েছে।

তাঁর জীবনদৃষ্টির মধ্য দিয়ে ছোটগল্পে সমাজবদ্ধ মানুষের সামগ্রিক জীবনের রূপ ফুটে উঠেছে। পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার ঝাড়খণ্ডের মানুষের জীবনচিত্র তাঁর ব্যক্তিজীবনের অভিজ্ঞতার নিরিখে রূপায়িত হয়েছে। তাঁর ছোটগল্পে সমকালীন পরিস্থিতির পাশাপাশি মানবের অন্তরঙ্গজগতের কথা, তার মনোবিশ্লেষণের স্বরূপসন্ধান করেছেন লেখক। জীবনের মূল্যবোধ কেমন ভাবে সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে বিবর্তিত হয়, জীবনের অর্থময়তার সাথে তার কেমন ভাবে সম্পর্ক স্থাপিত হয় তা লেখক তাঁর আত্মানুসন্ধানের মাধ্যমে অঙ্কন করেছেন। বহির্জগতের ঘটমানতার থেকেও অন্তরঙ্গজগতের ঢেউ ও প্রবাহ যে সর্বাধিক তা মানুষের সাথে মেলামেশার মাধ্যমে এবং জীবননিষ্ঠ প্রত্যয়ের মাধ্যমে তিনি উপলব্ধি করেছেন। অর্ধশতাব্দীর বেশি সময় ধরে তাঁর গল্পগুলি রচিত হলেও সংখ্যার দিক দিয়ে তা খুব বেশি নয়। প্রায় দেড় শতাধিক গল্পের মধ্যে প্রতিনিধি স্থানীয় কিছু গল্প নিয়ে তাঁর গল্পকার জীবনের বিভিন্ন সময়কাল ও ভাবনার বৈচিত্র্যকে অনুসন্ধান করার চেষ্টা করেছি। এই আলোচনায় যেমন বিমল করের জীবনদৃষ্টির বৈচিত্র্য খোঁজার প্রয়াস রয়েছে তাঁর মানব জীবনের স্বরূপ সন্ধানের মধ্য দিয়ে, তেমনি গল্পপ্রেমী, গল্প আন্দোলনের এক পুরোহিতের জীবন-অনুসন্ধিৎসা ও তাঁর দৃঢ় প্রত্যয়ী মানসিকতা এখানে প্রতিভাত হয়েছে। এই আলোচনায় আরও দেখানোর চেষ্টা করেছি লেখকের দৃষ্টিভঙ্গির স্বকীয়তায় তাঁর সমাজদর্শন, প্রেমচেতনা, মানবিক সম্পর্ক, আধ্যাত্মিকতার বৈশিষ্ট্য, ব্রাত্যজীবনচেতনা, দাম্পত্য সমস্যা, নর-নারীর জীবনবোধ, মরমিয়াবাদ, চেতনা প্রবাহ রীতি, লিরিকধর্মিতা, ইঙ্গিতময়তা, প্রতীকধর্মিতা, সংলাপ ব্যবহারের কারুকার্য কেমন ভাবে তাঁর ছোটগল্পে অর্থবহ হয়ে উঠেছে। সর্বোপরি বলা যায় জীবনকে ভালবেসে জীবন অনুসন্ধানের মধ্য দিয়েই তাঁর গল্পে জীবনদৃষ্টির বৈচিত্র্য প্রকাশ পেয়েছে।

বিমল করের ছোটগল্পের আলোচনা করতে গিয়ে উপলব্ধি করি তাঁর বিচিত্র জীবন-অভিজ্ঞতা তাঁর সাহিত্যের নানা ক্ষেত্রে রূপ পেয়েছে। জীবনে বিভিন্ন সময়ের নানা ভাবনা ও উপলব্ধির প্রকাশ ছোটগল্পের পাশাপাশি উপন্যাস গুলিতেও তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন। কেননা তাঁর জীবনদৃষ্টিকে আরও ব্যাপক ভাবে প্রকাশের জন্য উপন্যাসের আলোচনার প্রয়োজন আছে বলে মনে করেছি। তাই তাঁর কয়েকটি প্রতিনিধি স্থানীয় উপন্যাসের আলোচনায় তাঁর জীবনদৃষ্টির বৈচিত্র্যকে তুলে ধরেছি। লেখকের ভাবনার সূত্রে উপন্যাস ও ছোটগল্প বহুক্ষেত্রে সমন্বীত হলেও জীবন উপলব্ধির বৈচিত্র্যময় দিক উপন্যাসেও প্রতিভাত হয়েছে। ‘দেওয়াল’, ‘অসময়’, ‘পূর্ণ অপূর্ণ’, ‘যদুবংশ’ প্রভৃতি উপন্যাসে সমকালীন পরিস্থিতি ও মানবের প্রকৃত অন্তরসত্তার স্বরূপ যেমন অসাধারণ কৃতিত্বে প্রকাশিত হয়েছে, তেমনি ‘খড়কুটো’, ‘নিমফুলের গন্ধ’, ‘খোয়াই’, ‘বেদনাপর্ব’, ‘ভুবনেশ্বরী’ প্রভৃতি উপন্যাসে মানব মনের রহস্যময়তাকে রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছেন লেখক। মনোবিশ্লেষণের প্রয়াস, সমাজদর্শন, উপেক্ষিত মানুষের স্বরূপ সন্ধান, চেতনাপ্রবাহ রীতি, আধুনিক জীবনের অবক্ষয়, মূল্যবোধের বিপর্যয়, মানুষের জীবনবোধের সদর্থক ভাবনায় প্রত্যাবর্তনের রূপ তাঁর উপন্যাসের বিষয় হয়ে উঠেছে।

এরপর সমকালীন গল্পকারদের সঙ্গে বিমল করের তুলনামূলক আলোচনায় তাঁর স্বকীয় জীবনদৃষ্টির মূল্যায়ন করার চেষ্টা করেছি। সমকালীন গল্পকারদের মধ্যে তাঁরা যদিও বয়সের দিক থেকে অগ্রজ, সমসাময়িক কিংবা অনুজ, তবুও সমকালীন পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে তাঁরা গল্প রচনা করে তাঁদের জীবনদৃষ্টিকে প্রকাশ করেছিলেন। এই তালিকায় জগদীশ গুপ্ত, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সুবোধ ঘোষ, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সন্তোষকুমার ঘোষ, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের কয়েকটি করে গল্পের নিরিখে বিমল করের স্বকীয়তা উপলব্ধি করার প্রচেষ্টা করেছি। এর মাধ্যমে বিমল করের জীবনবাদী প্রত্যয় প্রকাশ পেয়েছে এবং তাঁর গল্পে জীবনদৃষ্টির বৈচিত্র্যের স্বরূপ সন্ধান করার সুযোগ ঘটেছে।

উপসংহারে বিমল করের ছোটগল্প ও উপন্যাসে জীবনদৃষ্টির বৈচিত্র্যময় দিক সম্পর্কে আমার স্বকীয় মূল্যায়ন প্রকাশ করেছি। ঘটনাবহুল জীবনে নানা মানুষ ও পরিস্থিতির সংস্পর্শে এসে মানব জীবন সম্পর্কে তাঁর যে প্রত্যয় জন্মেছিল তা যে রূপ আঙ্গিক ও ভাবনায় তাঁর গল্পে ও উপন্যাসে রূপায়িত হয়েছে তা ব্যক্ত করেছি। তিনি চরিত্রের মনোলোকে অনুসন্ধানী আলো ফেলে জীবনের অনালোকিত দিকগুলিকে বিশেষ রূপ দিয়েছেন, ব্যক্ত করেছেন জীবনের মূল্যবোধের যথার্থ স্বরূপ।

আধুনিক যন্ত্রসভ্যতার যুগে মূল্যবোধের অবক্ষয়ের মধ্যেও মানব মনের ইতিবাচক প্রত্যয়, জীবনতৃষ্ণা, মানবিকতার অবশেষ-টুকুকেও তিনি যথার্থভাবে সঞ্জীবিত করার চেষ্টা করেছেন, এবং এখানেই তাঁর জীবনদৃষ্টির স্বকীয়তা প্রতিপাদিত হয়েছে।

ছাত্রাবস্থায় বিমল করের কয়েকটি গল্প পাঠ করে যে মুগ্ধতা আসে তারই ফলশ্রুতিতে আমার বিমল করের ছোটগল্প নিয়ে গবেষণার অবতারণা। এই বিষয় নিয়ে গবেষণা করতে এসে প্রথমে যে ভীষণ অসুবিধার সম্মুখীন হই, তা হল তাঁর প্রাপ্ত গল্পের অপ্রতুলতা। বিমল করের সমস্ত গল্পের সন্ধান করে ওঠা আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি। লেখকের সল্টলেকের বাড়িতে গিয়েও তাঁর সমস্ত গল্প পাওয়া যায় নি। নিজের রচনার প্রতি উদাসীন লেখক বিমল কর তাঁর সমস্ত গল্প সংরক্ষণ করেন নি। পাণ্ডুলিপিও পাওয়া যায়নি। বহু গ্রন্থাগার ও ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে কিছু গল্প উদ্ধার করতে পেরেছি। তবে এর মধ্যে বেশ কিছু গল্প পৃষ্ঠা ছেঁড়া থাকায় আমি নিজেও তার রচনাকাল সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারি নি। এত আধুনিক কালের লেখক হওয়া সত্ত্বেও তাঁর সমস্ত গল্প সংরক্ষণ করা হয় নি। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডে প্রকাশিত বিমল করের ‘পঞ্চাশটি গল্প’, ‘উপাখ্যান মালা’ এবং মডল বুক হাউস প্রকাশিত ‘বিমল করের বাছাই গল্প’ সংকলনগুলি আমার গবেষণার কাজে অত্যন্ত সহায়তা করেছে। এছাড়াও লেখকের ‘নির্বাচিত গল্প’, ‘শেষ বেলার গল্প’, ‘ময়ূরী’, ‘সুধাময়’, ‘বরফসাহেবের মেয়ে’, ‘জোনাকি’ গল্প সংকলনগুলি আমার কাছে এসেছে। আমি আমার সাধ্য অনুযায়ী বিমল করের ছোটগল্পগুলিকে যত বেশি পারি সংগ্রহ করে গবেষণার কাজে ব্যবহার করেছি। বানান বিধির ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি ও সংসদের বানান অভিধানকে অনুসরণ করেছি। উদ্ধৃতির বানান মূলানুগ রাখার জন্য সব জায়গায় বানান-সমতা বজায় থাকেনি। তবুও লেখকের ব্যবহৃত বানান অপরিবর্তিত রাখার চেষ্টা করেছি।

আমার গবেষণার কাজে অক্লান্ত পরিশ্রম, উৎসাহ এবং প্রেরণা দিয়েছেন আমার তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক ডঃ সুজিত কুমার পালা। তাঁর সক্রিয় পরামর্শ, সাহায্য ও নির্দেশনা আমার গবেষণার পাথেয়। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক-অধ্যাপিকাবৃন্দ ডঃ অক্ষুশ ভট্ট, ডঃ নিখিলেশ রায়, ডঃ মঞ্জুলা বেরা, ডঃ রেজাউল করিম, ডঃ সুবোধ যশ আমাকে নানাভাবে সাহায্য করেছেন এবং সুপারামর্শ দিয়েছেন, তাঁদের কাছে আমি ঋণী। আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল কলেজের বাংলা বিভাগের সহকর্মীরা আমাকে নানাভাবে সাহায্য করেছেন। নবীন সাহিত্যিক উল্লাস মল্লিকের

সংগৃহীত বিমল করের কয়েকটি পুরোনো গল্প সংকলন ব্যবহার করতে পেরে আমি তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ। লেখক (বিমল কর) পত্নী শ্রীমতী গীতা কর, শ্রীমতী শুভা চৌধুরী (বিমল করের মধ্যমা কন্যা), অনুভা কর চক্রবর্তী (বিমল করের কনিষ্ঠা কন্যা) আমার গবেষণার কাজে বহু তথ্য জ্ঞাপন করে আমাকে সমৃদ্ধ করেছেন। ডঃ নিতাই বসু, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ লায়েক আলি খান, ‘দেশ’ পত্রিকার সম্পাদক হর্ষ দত্ত, সাহিত্যিক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, সুব্রত রুদ্র, সমীর চট্টোপাধ্যায়, ঐদের কাছে আমি প্রেরণা ও পরামর্শ লাভ করেছি। এছাড়া জাতীয় গ্রন্থাগার (কলকাতা), রামমোহন লাইব্রেরী, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, গোলপার্ক রামকৃষ্ণ মিশন লাইব্রেরী, লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরী ও গবেষণা কেন্দ্র (সন্দীপ দত্ত, কলকাতা), আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল কলেজ গ্রন্থাগার ও বাংলা বিভাগীয় গ্রন্থাগার, খড়্গপুর কলেজ গ্রন্থাগার, ঝাড়গ্রাম রাজ কলেজ গ্রন্থাগার, মেদিনীপুর কলেজ গ্রন্থাগার, পূর্বরাগ সংঘ পাঠাগার (রামনগর, পূর্ব মেদিনীপুর), উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগার (কোচবিহার), সাহিত্য সভা গ্রন্থাগার (কোচবিহার), সাদী রাজেন্দ্র নারায়ণ হাইস্কুল গ্রন্থাগার (রামনগর, পূর্ব মেদিনীপুর), ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র গ্রন্থাগার (নৈহাটি), জে. পি. ডি. স্যারের ব্যক্তিগত সংগ্রহশালা (কোচবিহার) থেকে প্রয়োজনীয় অধিকাংশ গ্রন্থ সংগ্রহ করে আমি উপকৃত হয়েছি। আমার বাবা, মা, ভাই এবং স্ত্রীর উৎসাহে গবেষণার কাজে ব্রতী হয়েছিলাম। একাজে সফল হলে তাঁরা অত্যন্ত খুশি হবেন। সর্বোপরি বলতে দ্বিধা নেই গবেষণা কাজের স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ আমার কাজের ক্লান্তি ও তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে সমস্ত ভৌগোলিক দূরত্বের বাধা অপসারিত করেছে।

সংকলন

তাং ২৬/৬/০৭

শ্রী পঞ্চানন মন্ডল

বাংলা বিভাগ

আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল (সরকারি) কলেজ,

কোচবিহার

দেশ কালের পরিপ্রেক্ষিতে বিমল কর

সাহিত্য জীবন নির্ভর। জীবন ও জগতের নানা বিষয়কে সাহিত্যের মাধ্যমে প্রকাশ করেন সচেতন সাহিত্যিক। সেই সাহিত্য ধর্ম-নির্ভর হোক বা রাজনৈতিক, সামাজিক, কাল্পনিক যাই হোক না কেন সাহিত্যিকের চতুর্পার্শ্বের জগৎ ও নিজের জীবনভাবনার প্রতিফলন সাহিত্যকে দেয় পৃথক পৃথক বৈশিষ্ট্যের অধিকার এবং এভাবেই ঘটে সম্পূর্ণতা। সাহিত্যিক তাঁর বক্তব্য বিষয়কে বা মনের অনুভূতিকে নানা পরিস্থিতির মাধ্যমে অর্থাৎ নানা কাহিনীর মাধ্যমে প্রকাশ করতে চান। এই ভাবে কাহিনী বা গল্প বা ঘটনার উত্থাপন লক্ষ্য করা গেছে সমস্ত সাহিত্যে। বেদ উপনিষদ, ব্রাহ্মণের মধ্যেও ছিল কাহিনী। এই কাহিনী বর্ণনার মাধ্যমে লেখক তাঁর উদ্দিষ্ট বিষয়কে বলিষ্ঠভাবে প্রকাশ করার চেষ্টা করেন। এই প্রচেষ্টার মাধ্যমে ফুটে ওঠে লেখকের স্বকীয় জীবনদৃষ্টির প্রতিফলন। তাঁর ব্যক্তিজীবন, জগৎ ও সমাজ সম্পর্কিত ভাবনা, নিজস্ব জীবনদর্শন, অনুভূতির মানচিত্র মিলিত হয় তাঁর জীবনদৃষ্টির সাথে। তাই সাহিত্য যে প্রকারের হোক না কেন সেখানে লেখকের উল্লেখযোগ্যতা থাকে তাঁর স্বকীয় জীবনদৃষ্টির প্রাবল্যে।

বেদ, ব্রাহ্মণ, উপনিষদের ঋষিরা সাহিত্যের মাধ্যমে যে ধর্মভিত্তিক আলোচনা করেছেন, সেখানে কাহিনীর অবতারণা ছিল। এই কাহিনী লক্ষ্যকেন্দ্রিক এবং এগুলি অধিকাংশই গল্পের দাবিতে অসম্পূর্ণ। তবুও এই কাহিনীগুলি আমাদের নজর কাড়ে। রামায়ণ, মহাভারতের মধ্যে রয়েছে প্রচুর খণ্ড খণ্ড কাহিনী, যেগুলি আধুনিক যুগেও বহু রচনার বীজ-মন্ত্র। প্রাচীন সংস্কৃত ও প্রাকৃত অপভ্রংশ সাহিত্যেও কাহিনীর অবতারণা ছিল। বাংলা সাহিত্যের আদি যুগের একমাত্র সাহিত্য হিসেবে পরিচিত ‘চর্যাপদ’-এ পদকর্তারা বৌদ্ধ সহজিয়া সাধনার আচরণীয় ও অনাচরণীয় বিষয়গুলিকে প্রকাশ করেছিলেন যে পদের মাধ্যমে, সেখানে ধর্মের পাশাপাশি প্রকাশিত হয়েছে মানুষের জীবনের বাস্তব সমস্যা ও যন্ত্রণার দিকগুলি, প্রকাশিত হয়েছে সামাজিক জীবনের নানা ঘাত-প্রতিঘাত, শাসন ও দৌরাভ্যের দিনলিপি। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’ কাব্যে টুকরো টুকরো কাহিনীর পাশাপাশি একটি সমগ্র কাহিনীর দ্যোতনা রয়েছে যা কৃষ্ণ ও রাধার প্রেম-সম্পর্কের সাথে জড়িত। শ্রীকৃষ্ণের দুরন্ত রাখাল বালকের মতো মানসিকতা, আদি রসাত্মক অনুভূতির আকাঙ্ক্ষার পাশাপাশি দেবত-সুলভ আচরণ এবং রাধার দেহমগ্ননের মাধ্যমে হৃদয়-

মস্তনজাত অনুরাগ ও বিরহের হাহাকার, বড়াইর অপূর্ব দৌত্যক্রিয়া কাব্যের মাধ্যমে গল্পরসকে জমাট করে তুলেছে। ‘শ্রীকৃষ্ণবিজয়’ কাব্যেও উল্লিখিত হয়েছে শ্রীকৃষ্ণের দেবতাসুলভ কাহিনী। মঙ্গলকাব্যগুলি কাহিনীর ভান্ডার— মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল, শিবায়ন সর্বত্রই এক বা একাধিক খণ্ডিত ও পূর্ণাঙ্গ কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। জীবনী সাহিত্যের মাধ্যমে কবিরা তাঁদের গল্প প্রকাশের সাধকে নানা ভাবে সঞ্জীবিত করেছেন। প্রকৃত কাহিনীর পাশাপাশি অতিরঞ্জন দোষ কাহিনী রচনার গুণকেই সমৃদ্ধ করেছে। এই কাহিনীর অবতারণার সাথে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণভাবে যুক্ত হয়ে আছে মুসলমান কবিগোষ্ঠীর রোমান্টিক মানবজীবননির্ভর কাহিনী রচনার প্রচেষ্টা। দৌলত কাজির ‘সতী ময়না’, আলাওলের ‘পদ্যাবতী’ প্রভৃতি কাব্যেও সুফী ধর্মের থেকেও বড় হয়ে উঠেছে মানব জীবনের গল্পকথা। এই গল্পের সাথ পূর্ণ করে গীতিকা বা গাথা সাহিত্যগুলি। মধ্যযুগের এই কাহিনী নির্ভরতার ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায় কোথাও বা পূর্ণাঙ্গ কাহিনীর মাধ্যমে মূল বিষয়কে উপস্থাপিত করা হয়েছে, কোন কোন ক্ষেত্রে রয়েছে কাহিনীর খণ্ডিত রূপ বা ইঙ্গিত। বৈষ্ণব পদাবলী, শাক্ত পদাবলী কিংবা নাথ যোগীদের কাহিনী, বাউল গান, কবিগান, লালন ফকিরের গানে কাহিনীর পাশাপাশি রয়েছে ইঙ্গিতময়তা ও গভীর জীবনদর্শন যা বহু কাহিনীর কোরক। মধ্যযুগের সাহিত্য সবই পদ্যাকারে রচিত হলেও কিংবা ধর্মই অধিকাংশের মূল সারাৎসার হলেও কাহিনীর নীচে ফল্গুধারার মতো প্রবাহিত হয়েছে সমকালীন মানুষের ইচ্ছা-অনিচ্ছা, চাওয়া-পাওয়ার আর্তি এবং জীবনযন্ত্রণার পুঞ্জীভূত দীর্ঘশ্বাস, যা লেখকের রচনার অনবদ্য সঙ্গী হয়ে রয়েছে। কোন রচনাই আকস্মিক ও অহেতুক হতে পারে না, লেখকের জীবনদর্শন ও জীবনদৃষ্টির আলোকসম্পাত সমস্ত রচনারই প্রাণভোমরা।

আধুনিক যুগের কথাসাহিত্যে এই জীবন-ঘনিষ্ঠতা ও বাস্তবতা অনেক বেশি। কারণ আধুনিক যুগে সাহিত্য প্রকাশমাধ্যমের বৈচিত্র্যে বহু রূপ লাভ করে। মধ্যযুগের ছন্দময় পদ্য রচনার ধারা এখানে পুরোপুরি গৃহীত হয়নি। প্রকাশিত হয়েছে গদ্য ও কবিতার দুটি ধারা। গদ্য ধারায় প্রবন্ধের পাশাপাশি জন্ম নিয়েছে উপন্যাস ও ছোটগল্প। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠা ও শিক্ষাক্ষেত্রে নতুনত্বের সূচনা, বিদেশী শাসকের ভাষা ও শিক্ষাপ্রণালী অপেক্ষাকৃত বেশিসংখ্যক মানুষকে শিক্ষিত হওয়ার সুযোগ এনে দেয়। এর সাথে প্রকাশিত হতে থাকে কিছু পত্রিকা। এই পত্রিকাগুলি বিভিন্ন ধর্ম ও প্রতিষ্ঠানের মুখপত্র হিসেবে প্রথম দিকে প্রচলিত হওয়ার পর সংবাদ ও সাহিত্যনির্ভর পত্রিকাও প্রকাশিত হতে থাকে, এবং এর ফলেই বাঙালির মানসমুক্তি ঘটতে থাকে ক্রমশ।

“পত্রিকাগুলি ত্বরান্বিত করল বাংলা গদ্যের বিকাশ। জীবনের এই নানা ব্যবহারিক কাজে অভিদ্রুত গদ্য হয়ে উঠল ভাবপ্রকাশের বাহন, তর্ক-যুক্তির প্রধান অস্ত্র, প্রাত্যহিকতার দূতা”^১ এই পত্রিকাগুলিতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাহিনী প্রকাশিত হয়েছিল যেগুলিকে সমালোচকেরা আখ্যানক, নক্সা, চূর্ণক নামে অভিহিত করেছেন। ‘বিবিধার্থ সংগ্রহ’, ‘উপদেশক’, ‘বঙ্গমিহির’, ‘রহস্য সন্দর্ভ’, ‘পঞ্চানন্দ’ প্রভৃতি পত্রিকাতে এই কাহিনীগুলি যেমন প্রকাশিত হয়েছিল, তারও আগে মনে রাখার মতো বিষয় এই যে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পাঠ্যক্রম ও শ্রীরামপুর মিশন প্রেসের তত্ত্বাবধানে কিছু প্রকাশিত গ্রন্থ বাঙালির কাহিনী পঠনের মাত্রাকে বাড়িয়ে তুলেছিল।

আখ্যানক বা নক্সাজাতীয় রচনার পাশাপাশি তৎকালীন সময়ের আরও একটি অসাধারণ সৃষ্টি ‘নভেলা’ বা ছোট উপন্যাস, যা উপন্যাস রচনার গতিকে ত্বরান্বিত করেছিল। ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের ‘অঙ্গুরীয় বিনিময়’ এই জাতীয় রচনা। উপন্যাসের মাধ্যমে মানব জীবনের বাস্তব-ঘনিষ্ঠ বিস্তৃত রূপকে ঝুঞ্জে পাওয়া গেল। প্যারীচাঁদ মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখের উপন্যাস মানব জীবন তথা মানব সমাজকে স্বচ্ছভাবে প্রকাশ করেছে। তাঁদের শক্তিশালী লেখনীর মাধ্যমে তাঁরা বাংলা সাহিত্যকে বহুদূর এগিয়ে নিয়ে গেছেন এক লহমায়। প্যারীচাঁদ মিত্রের ‘আলালের ঘরে দুলাল’ উপন্যাসে কাহিনী, চরিত্র, জীবনদর্শন সর্বক্ষেত্রেই সমকালীনতাকে প্রকাশ করেছে। এ কারণে এটি একটি উল্লেখযোগ্য রচনা। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নিজেও উল্লেখ করেছেন, “‘আলালের ঘরে দুলাল’ বাঙ্গালা ভাষায় চিরস্থায়ী ও চিরস্মরণীয় হইবে। উহার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট গ্রন্থ তৎপরে কেহ প্রণীত করিয়া থাকিতে পারেন অথবা ভবিষ্যতে কেহ করিতে পারেন, কিন্তু ‘আলালের ঘরে দুলাল’র দ্বারা বাঙ্গালা সাহিত্যের যে উপকার হইয়াছে, আর কোন বাঙ্গালা গ্রন্থের দ্বারা সে রূপ হয় নাই এবং ভবিষ্যতে হইবে কিনা সন্দেহ।”^২ প্যারীচাঁদ মিত্রের পর বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা উপন্যাসকে মজবুত ভিতের উপর দাঁড় করালেন। ‘বিষবৃক্ষ’ ও ‘কৃষ্ণকান্তের উইল’ উপন্যাসে নর-নারীর অবৈধ সম্পর্কের ও প্রেমের চিত্র অঙ্কনের পাশাপাশি যে মনস্তাত্ত্বিক ঘাত-প্রতিঘাতের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন তার ফলেই পরবর্তী বাংলা উপন্যাস ও ছোটগল্পে মনস্তাত্ত্বিকতা একটি মূল বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের পর বাংলা কথাসাহিত্যের প্রাণপুরুষ হয়ে উঠেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ‘রাজর্ষি’ ও ‘বউঠাকুরানীর হাট’ উপন্যাস রচনার পর তাঁর তৃতীয় উপন্যাস রচনার মধ্যে প্রায় ষোল বছরের ব্যবধান ঘটে গিয়েছিল এবং সেই সময়ে তিনি রচনা করেছিলেন বেশকিছু ছোটগল্প, যা বাংলা

সাহিত্যে মনিমুক্তোর সাথে তুলনীয়। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দ বা ১২৮৪ বঙ্গাব্দে ‘ভারতী’ পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের সর্বপ্রথম ছোটগল্প ‘ভিখারিনী’ প্রকাশিত হয়। এটি রবীন্দ্রনাথের কিশোর বয়সে লেখা সাহিত্য, যেখানে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব প্রতিফলিত এবং রচনাশৈলীর দিক থেকেও তেমন নিটোল নয়। তবুও ছোটগল্পের ইতিহাসে এটির মর্যাদা আছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরই বিশেষ অর্থে ‘ছোটগল্প’ শব্দটির প্রবর্তন করেছিলেন। “বাংলা উপন্যাসের প্রথম শিল্পী বঙ্কিমচন্দ্র; মহাকাব্য, সনেট আর নাটকের স্রষ্টা মধুসূদন; আধুনিক গীতিকবিতার জনক বিহারীলাল। কিন্তু ছোটগল্পের প্রবর্তক ও প্রথম শিল্পী রবীন্দ্রনাথ। এক্ষেত্রে তাঁর কোন পূর্বসূরী নেই।”^৩ রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পগুলি তিল তিল করে সঞ্চিত আবেগ অনুভূতি জীবনদর্শনের নিটোল মুক্তোর মতো। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দ এর মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ গল্প লিখিত হয় যার বিষয় ছিল মানুষ ও প্রকৃতি। এই বিষয় নির্বাচনে কাল্পনিকতা ও অহেতুক রোমান্টিকতা প্রকাশ পায়নি। পারিবারিক জমিদারি দেখাশোনার দায়িত্ব নিয়ে পদ্মাতীরবর্তী শিলাইদহ, পতিসর, কালীগাম, সাজাদপুর প্রভৃতি অঞ্চলে বসবাসকালীন প্রকৃতির অনাবিল সৌন্দর্যের হাতছানি যেমন অনুভব করেছেন, তেমনি সাধারণ মানুষের সঙ্গে মেশার দুর্লভ সুযোগ ও ইচ্ছাকে অর্জন করেছেন, যে মানব সমাজ তাঁর ছোটগল্পের বিষয়। সাধারণ চাষা-ভূষা, শ্রমিক, চাকুরিজীবী, সাধারণ মানুষ, নারী ও শিশু চরিত্রের পাশাপাশি তাদের গহন অনুরাগ, মনস্তাত্ত্বিকতা তাঁর গল্পে পৃথক মর্যাদায় প্রতিফলিত হয়েছে। এই সময়কার কবিতা বা ছিন্নপত্রের পাতায়ও এই বিষয়গুলির প্রমাণ মেলে। “সে সঙ্গে স্বীকার্য রবীন্দ্রনাথ কেবল পদ্মালালিত ভূখণ্ডের মানব সন্তানগুলিকে রোমান্টিক দৃষ্টিতে দেখেন নি, তাদের জীবনে ও নাগরিক জীবনে প্রবৃত্তির ঝড় উঠতে দেখেছেন, ভালোবাসার অপমান ও অবসান দেখেছেন, প্রণয়ের রোমান্টিক বেদনা ও অভিসম্পাত দেখেছেন। এক কথায় জীবনকে সমগ্রভাবে দেখেছেন।”^৪ তাই জীবনের ছোট ছোট দুঃখ-কথা নানা অনুভূতি সঞ্চারে নির্মাণ করেছে তাঁর ছোটগল্প।

‘পোস্টমাস্টার’ গল্পে রয়েছে হারানোর বেদনা। তবুও হত মানব মনটিকে ফিরে পাওয়ার জন্য কর্মকুশলতা দেখাতে পারেনি শহরের ছেলে, পোস্টমাস্টার। মানুষ প্রাত্যহিক জীবনে এগিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয়ে বহু স্মৃতিকেই জীবন নদীর স্রোতে ভাসিয়ে দেয়, যার পিছনে তার পূর্বপরিকল্পনা কিছুই থাকেনা—এই সত্য এই গল্পটির প্রাণ। ‘শাস্তি’ গল্পে নারীর অভিমানক্ষুব্ধ হৃদয়-বেদনা প্রকাশ পেয়েছে। এই বেদনার পিছনে রয়েছে প্রেমাস্পদের সামান্য ভুল ও

অপরিণামদর্শী মিথ্যাভাষণের বিষময় ফল। ‘দেনাপাওনা’ গল্পে প্রকাশিত হয়েছে পণ-প্রথার যুগকাষ্ঠে একটি নারীর নিস্তরঙ্গ মৃত্যুর অতলে হারিয়ে যাওয়ার বেদনা। আবার ‘নিশীথে’, ‘মনিহারা’ প্রভৃতি গল্পে অতিপ্রাকৃত ঘটনার পাশাপাশি মনস্তাত্ত্বিক আলোড়ন রবীন্দ্র-গল্পকে অসাধারণ উচ্চতায় প্রতিষ্ঠিত করেছে। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ গল্পেই মানব-মনের যে অতল বিস্ময় নানাভাবে মনস্তাত্ত্বিক আলোড়ন নিয়ে উপস্থিত তা পরবর্তীকালে ছোটগল্পকার দের মধ্যে গ্রহীত হয়েছে।

রবীন্দ্র সমকালে যে গল্পকার রবীন্দ্রানুসরণের পথ থেকে সরে এসে, এমন কি প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পূর্ববর্তী ও তৎপরবর্তী সময়কালের নতুন জীবনদৃষ্টির অনুসারী না হয়ে ব্যক্তিগত স্বকীয়তার প্রাবল্যে সামন্ততান্ত্রিক ও শ্রেণীবিভক্ত সমাজের ষাঁতাকলে পতিত মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত মানুষের জীবনের প্রেম, প্রীতি, আশা-আকাঙ্ক্ষা, সাধ-ঐশ্বর্য, স্নেহ-বাৎসল্যের ছবিকে অন্তরের অনাবিল সহানুভূতির প্রখরতায় উজ্জ্বলীকৃত করে তুললেন তিনি হলেন অপরাধের কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তিনি পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর নিজস্ব ভাগ্যান্বেষণের অধিকার অর্জনের যে জোরালো দাবিকে তিনি পেশ করেছেন তা বিংশ শতকের নারী জাগরণের একটি সোপান। “তিনি লিখেছেন পাড়া গাঁয়ের গরিব মানুষের ও গৃহস্থের মনোবেদনার কাহিনী। সে মনোবেদনার সঙ্গে তাঁর আবাল্য পরিচয় ছিল। এই সব কাহিনীতে কিঞ্চিৎ অতিশয়োক্তি আছে। সেইটুকু আছে নিজস্ব মশলার মতো। তা না থাকলে গল্পগুলি অমন জমত না”।^৬ তাঁর লেখা কয়েকটি গল্পের মধ্যে ‘পথনির্দেশ’ পৃথক মর্যাদায় অভিষিক্ত। নারী মনস্তত্ত্বের উদাহরণ গল্পটি। হিন্দু নারীর সংস্কার, সমাজের সমালোচনার ভয় একদিকে, অপরদিকে মানসিক চাঞ্চল্য, প্রমাদকে অপমান, আবার কাছে আসার প্রবল ইচ্ছা, সংযম ও স্থলন সবকিছু মানসিক স্ববিরোধিতার পরিস্থিতি গল্পটিকে মর্যাস্তিক পরিণতি এনে দিয়েছে। ‘অভাগীর স্বর্গ’ গল্পে সামাজিক জাতিভেদ প্রথা, সামাজিক অনুশাসনের ফলে অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষের বাসনার কদর্যতম অপূর্ণাঙ্গতার চিত্র অঙ্কন করে লেখক সমাজ শাসকদের অত্যাচারী মানসিকতার পরিচয় ও অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষের অসহায়তার পরিচয় দিয়েছেন। এই গল্পগুলির মধ্যে কথাশিল্পীর সহানুভূতির পরিচয় প্রতিটি ছত্রে ছত্রে বর্ণিত।

১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়, যেখানে ভারতের সক্রিয় অংশগ্রহণ না থাকলেও ক্রমশ দেশীয় ও বিশ্ব রাজনীতিতে স্বেচ্ছায় ও অনিচ্ছায় অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকে বাংলা কথাসাহিত্যে প্রাবল্য নেমে আসে। সেই সময়কার নানা চিত্র সাহিত্যের মাধ্যমেই

মানুষের কাছে তাৎপর্যমণ্ডিত হওয়ার চেষ্টা করে। ব্যর্থতা, নৈরাশ্য, সংকট, বেকারত্ব, পলায়নবাদী মানসিকতা, আত্মবঞ্চনা, আত্মহত্যা, অবৈধপ্রেম, যৌনতা এই সময়ে কল্লোল গোষ্ঠীর কথাসাহিত্যের বিষয় হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে সাহিত্যে প্রভাব ফেলেছে একাকিত্ব ও মননসর্বস্বতা। বিশ্বযুদ্ধের পর বাঙালির মূল্যবোধের বিরাট পরিবর্তন দেখা দেয়। যদিও এই পরিবর্তন অন্যভাবে বেশ কিছু বছর আগেই ঘটেছিল। উনিশ শতকের নবজাগরণে আপামর বাঙালি-জীবনে তেমন প্রভাব পড়েনি। বরং উনিশ শতকীয় শিক্ষিত বাঙালি কিছুটা ইংরেজের ধ্যানে মগ্ন ছিল। একদিকে ব্রিটিশ উপনিবেশ তার শিকড় মাটির গভীরে প্রোথিত করে চলেছিল, অপরদিকে পাশ্চাত্য অনুকরণের মাধ্যমে মুনাফা লোভী ভারতীয়রা ইংরেজের কাছে ক্ষণিক সম্মান লাভের আশায় ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যকে বিসর্জন দিচ্ছিল। স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা তেমন করে জাতির মনে সার্বিকভাবে প্রকাশিত হয়নি। ইংরেজের কাছে এই নিজস্বতা হারানোর বিষময় ফলের কথা মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রকাশ করেছিলেন। নিজেদের অপারিসীম রত্নরাজ্যকে উপেক্ষা করে নিজভূমে পরবাসী হয়ে ভিখারী দশা গ্রহণের যে অপরিণামদর্শী আবেগ-সর্বস্বতা, তার যে বিষময় ফল অপেক্ষা করে আছে, তার ইঙ্গিত দিয়েছেন। তবু মানুষ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে গর্জে উঠতে পারেনি। “উনিশ শতকের অন্যতম যুগলক্ষণ মানব প্রত্যয় হলেও, সে মানবতার মূল চেতনা মূলত ছিল সমাজ কেন্দ্রিক। এই সমাজ মুখীনতার অতিরিক্ত অনেক স্তলেই ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য চেতনাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল তখনও পর্যন্ত।”^{১৬} সাধারণ মানুষের ব্যক্তিগত ইচ্ছা অনিচ্ছার থেকেও বঙ্কিমচন্দ্র ও তৎপরবর্তী সাহিত্যে সমাজ কল্যাণের আদর্শকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এবং তার পিছনে রয়েছে লেখকের নিজস্ব ভাবানুভূতি।

বিমল কর বিশ শতকের চারের দশকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন সময়ে বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে আবির্ভূত হন। রবীন্দ্র-মত বিরোধিতা প্রকট ভাবে তাঁর সাহিত্যে লক্ষ্য করা না গেলেও তৎকালীন যুগলক্ষণ তাঁর সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়েছিল। এই যুগলক্ষণের সাথে আধুনিক সাহিত্যের নিবিড় যোগ লক্ষ্য করা যায়। তাই বিশ শতকের দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি এবং সাহিত্যের নানা পালাবদল, বিশেষত সাহিত্যের ভাবগত বৈশিষ্ট্য আলোচনা করা প্রয়োজন। এই আলোচনার মাধ্যমে বিমল করের সমকালীন পরিপ্রেক্ষিত ও তাঁর সাহিত্যের সম্বন্ধসূত্র খুঁজে পাওয়া যেতে পারে।

বিশ শতকের শুরু থেকে ভারতীয়দের জীবনে নেমে আসে নানা বিপর্যয়। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-১৯১৮), মন্টেগু চেমসফোর্ড সংস্কার পরিকল্পনা (১৯১৯),

জালিয়ান ওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড, রাউলাট আইনের মাধ্যমে ব্রিটিশ সরকারের অমানবিক দমন-পীড়ন নীতি মানুষকে দাঁড় করিয়ে দেয় চরম বিপর্যয় ও অনিশ্চয়তার মধ্যে; এর প্রতিবাদে শুরু হয়ে যায় অসহযোগ আন্দোলন (১৯২০)। সাহিত্য এই জায়গায় থেমে থাকেনি, থেমে থাকতে পারে না। রবীন্দ্রনাথ থেকেই এই আধুনিকতার প্রবর্তন বিশেষভাবে লক্ষ্য করা গেছে। তাঁর প্রবন্ধে ও কথাসাহিত্যে প্রকাশিত হয়েছে ইংরেজ শাসন ও তাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা, সমাজ ব্যবস্থা বাঙালি মনে কেমন ভাবে অপ্রাপ্তির বেদনা সঞ্চারিত করেছে তার চিত্র। ‘চোখের বালি’-তে মানুষের মনের গোপন বাসনা ও প্রবৃত্তি প্রকাশ পেয়েছে চরিত্রের বিদ্রোহী মানসিকতার মাধ্যমে এবং তার সাথে লক্ষ্য করা গেছে সমাজের অচলায়তন ভাঙার প্রয়াস।

বিশেষ করে ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত ‘সবুজ পত্র’ পত্রিকা এই আধুনিকতা ও তার নব রূপায়ণে বিশেষভাবে অর্থবহ হয়ে উঠেছে। “...শীর্ষ আধুনিকতার এই পর্বে কিন্তু প্রতীচ্য-কেন্দ্রিকতার আতিশয্যই ব্যতিক্রমহীন সত্য নয়, ঔপনিবেশিক আকল্পের প্রতি অতিমান্যতাকে অস্বীকার করে নির্জন্ম অবস্থান ও উচ্চারণকে প্রকাশ করার জোরালো চেষ্টাও হয়েছে। আর এই চেষ্টার সূত্রধার ‘সবুজ পত্র’ সম্পাদক প্রমথ চৌধুরী।”^{১১} রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যে প্রমথ চৌধুরী ‘সবুজ পত্র’কে যৌবনের দীপ্তিতে উদ্দীপ্ত করে তুলেছিলেন। তার সঙ্গে প্রকাশ করেছিলেন যুগধর্মের বৈশিষ্ট্যকে। ‘সবুজ পত্রে’ প্রাধান্য পেয়েছে আধুনিক মানুষের স্বতন্ত্র বিচারবুদ্ধি ও পুরোনোকে ভেঙে নতুনকে গ্রহণ করার সংস্কারহীনতা। কিন্তু এটাও উল্লেখ্য বিষয়, যৌবনের উচ্ছ্বাস থাকলেও তা বেপরোয়া মানসিকতা ও হঠকারী ভাবনাকে অবলম্বন করে গড়ে ওঠেনি। নব্যআধুনিকতার মধ্যে স্বকীয়তাকে বলি দেয়নি কিংবা বহির্বিশ্বের ভাবকে আপ্যায়ন করলেও বাঙালিয়ানাকে বিসর্জন দেয়নি এই সাহিত্য গোষ্ঠী। “বস্তুত সে যুগের ভাব সঙ্কটের দিনে প্রাচ্য ও পশ্চাত্য জীবনবোধের প্রবল দ্বন্দ্ব যখন ভিতরে ভিতরে ‘অধিকাংশ লোকের মন ঘুলিয়ে’ দিয়েছে -- সেই দিন বদলের কালে ‘সবুজ পত্র’ তার মননধর্মী পক্ষপাতহীন বিচার বোধের দ্বারা প্রবল প্রাণবন্ত্যাকে সংহত করে নির্দিষ্ট ‘বাস্তব’ পথে সঞ্চারিত করার গুরু দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল, সন্দেহ নেই।”^{১২} এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েছিল ‘ভারতী’ গোষ্ঠীও। তারাও সাহিত্যে নতুনত্বকে গ্রহণ করার জন্য পক্ষপাতহীন হয়ে উঠেছিল। প্রাচীন কুসংস্কার ও অবক্ষয়কে দূর করে নতুনত্বকে পাথেয় করে যৌবন-দীপ্ত স্বরে যে প্রকাশ মহিমা ‘সবুজ পত্র’ দেখিয়েছিল তা ক্রমশ পরবর্তী কালে আরো জোরালো হয়েছে।

হয়তো তার রূপ বদল ঘটেছে বাহ্যিক ও আত্মিক ভাবে, তবুও সমাজের খোল-নলচে পাল্টে ফেলার প্রচেষ্টা এই সময়কালে তাৎপর্য মণ্ডিতভাবে স্পষ্ট হয়েছে।

কল্লোল পত্রিকা প্রকাশিত হয় ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে, এবং এর প্রচারের সাথে সাথে বাংলা সাহিত্যের আরও একটি দিক বদল ঘটে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে চরম মন্দার সৃষ্টি হয়। বেকারত্ব, শ্রমিক অসন্তোষ, শ্রমিকদের ধর্মঘট এর মাধ্যমে সাধারণ মানুষ সংগঠিত হবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু অভাব, দারিদ্র্য ক্রমশ মানুষকে করে তুলেছে আত্মকেন্দ্রিক ও স্বার্থপর। এর পাশাপাশি একের পর এক রাজনৈতিক আন্দোলনের ফলে উদ্ভূত সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যা মানুষের নৈতিক বিপর্যয়কে সূচিত করে। গ্রামের মানুষ চাষাবাস ছেড়ে শহরে চলে আসতে চেয়েছে চাকরির সন্ধানে, কিন্তু তা অপ্রতুল হওয়ায় তারা আরও গভীর সমস্যায় পতিত হয়েছে। একালমবর্তী পরিবারের ভাঙন ও তার পাশাপাশি মানুষের একাকিত্ব, মানুষকে অসহায় করে তুলেছে। পরিবারে মেয়েরাও কাজের খোঁজে এসে লোভী মানুষের চক্রান্তের শিকার হয়ে অথবা নিজের বার্থ জীবনের গ্লানি সহ্য করতে না পেরে বাধ্য হয়েছে পতিতাবৃত্তি গ্রহণ করতে। পারিবারিক শৃঙ্খল ভেঙে যাওয়ার সাথে সাথে মানুষের মনেও সন্দেহ, লোভ, জিঘাংসা ক্রমশ কলুষিত করে দিয়েছে তাদের হৃদয়কে। এই রকম দুর্বিষহ সময়ে প্রকাশিত হয়েছে ‘কল্লোল’ (১৯২৩), কালিকলম (১৯২৬), প্রগতি (১৯২৭) পত্রিকাগুলি। কল্লোল পত্রিকাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে কল্লোল গোষ্ঠী। এদের রচনায় সাধারণ মানুষের তৎকালীন পরিস্থিতি ও মানসিকতা প্রকাশিত হয়েছে। একদিকে জীবনের নানা বিপর্যয়, নেতিবাদিতা, অপরদিকে রোমান্টিক স্বপ্নচারিতার আবেশধন মুহূর্ত তাদের সাহিত্যকে সমকালীন পরিস্থিতির সাথে একাত্ম করে তুলেছে। অর্থাৎ এই কবি-সাহিত্যিকরা খোঁজার চেষ্টা করছিলেন একটা নতুন জীবনপ্রত্যয় এবং পৃথক একটি সাহিত্যধারা ও প্রকাশভঙ্গি যা তাদের প্রতিষ্ঠা দেবে এই অবক্ষয়িত, যন্ত্রণাদগ্ধ সমাজের প্রকৃত রূপকার রূপে, দীপ্ত সূর্যের মতো ভাস্বর রবীন্দ্রনাথকে তাই এড়িয়ে গিয়ে পৃথক ভাবনায় নিজেদের নির্মিত করতে চেয়েছেন তৎকালীন লেখকেরা। তাঁরা রবীন্দ্রনাথের প্রদর্শিত পথ থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করছিলেন। “যাকে কল্লোলযুগ বলা হয় তার লক্ষণই বিদ্রোহ, আর সে বিদ্রোহের প্রধান লক্ষ্যই রবীন্দ্রনাথ।”^{১০} সত্য-শিব-সুন্দরের পূজারী রবীন্দ্রনাথের মধ্যে এই লেখকেরা কঠিন বাস্তবের প্রতিরূপ দেখতে পাননি, তাঁদের মনে হয়েছে — “তাঁর কাব্যে বাস্তবের ঘনিষ্ঠতা নেই, সংরাগের তীব্রতা নেই, নেই জীবনের জ্বালা-যন্ত্রণার চিহ্ন, মনে হলো তাঁর জীবনদর্শনে মানুষের

অনতিক্রম্য শরীরটাকে তিনি অন্যায়ভাবে উপেক্ষা করে গেছেন।”^{১০} যদিও রবীন্দ্রনাথের ‘চোখের বালি’, ‘নষ্টনীড়’, ‘চতুরঙ্গ’, ‘ঘরে বাইরে’ ততদিনে জনসমাজে আলোড়ন ফেলেছে নিষিদ্ধ প্রেমের স্বরূপ অঙ্কনে। কিংবা ‘শান্তি’, ‘দেনাপাওনা’র মতো ছোটগল্পে সমাজের অন্যায় প্রথা ও দারিদ্র্যের ছবি রবীন্দ্রনাথের সহানুভূতিপূর্ণ হৃদয়ে ধ্বনিত হয়ে জনসমাজে প্রকাশিত হয়েছে। একাধিক কবিতায় মর্ত্যের মানুষের বিদ্রোহ ও জাগরণকে সম্মান জানিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ (যেমন ‘এবার ফিরাও মোরে’, ‘দুই বিঘা জমি’ প্রভৃতি কবিতায়)। তবুও এই রবীন্দ্র-মত বিরোধিতা তখনকার কবি ও সাহিত্যিকদের মাধ্যমে ফুটে উঠেছে তাঁদের জন-সমাজে প্রকাশ লাভের ও খ্যাতি লাভের অনমনীয় পরাক্রমশালী ইচ্ছার সূত্র ধরে। তাই তো রবীন্দ্র-বিরোধিতার পাশাপাশি রবীন্দ্র-বরণের সুচিন্তিত আকাক্ষ্যা তাঁদের মনে অবচেতনে প্রকাশ লাভ করে। “.....এই আন্দোলনে অগ্রণী ছিলেন সেই সব তরুণ লেখক, যারা সবচেয়ে বেশী রবীন্দ্রনাথে আপুত, অন্তত, একজন যুবকের কথা আমি জানি, যে রাত্রে বিছানায় শুয়ে পাগলের মতো ‘পূর্ববী’ আওড়াতো, আর দিনের বেলায় মস্তব্য লিখতো রবীন্দ্রনাথকে আক্রমণ করে।.... ‘নিজের কথাটা নিজের মতো করে বলবো’— এই ইচ্ছেটা প্রবল হয়ে উঠেছিল সেদিন, আর তার জন্যই তখনকার মতো রবীন্দ্রনাথ কে দূরে রাখতে হ’লো।”^{১১} তৎকালীন তরুণ লেখকেরা কথা সাহিত্যের ধারাকে নতুন পথে পরিচালিত করার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁদের গল্পে অবহেলিত, নিপীড়িত ব্রাহ্মমানুষেরা যারা এতদিন দূরে দাঁড়িয়ে স্ভ্যমানুষদের নির্বাকভাবে দেখতো, তারাই গল্পে-উপন্যাসে নায়কত্বে ভূষিত হয়েছে। শ্রমিক, মুচি, মেথর, বেশ্যা, পকেটমার, ফুটপাথের ভিখিরি এরা সকলেই প্রকাশ করলো তারা আগে মানুষ তার পর তাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিচয়। যারা এই গোষ্ঠীর নন তাঁরাও তৎকালীন সময় চেতনা থেকে দূরে থাকতে পারেন নি। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ‘মহেশ’ গল্পে চটকলের শ্রমিক গফুরের কাছে নিজের মেয়ের আব্রুতা রক্ষার সংগ্রাম সাধারণ মানুষের অস্তিত্ব ও অস্তিত্বের সংকট প্রকাশ করেছে।

দাম্পত্য জীবনের শিথিলতা, ভালোবাসার ওপর অবিশ্বাসের সর্পিলালিঙ্গ, মানসিক অসুস্থতা প্রকাশ পেয়েছে প্রেমেন্দ্র মিত্রের ‘হয়তো’, ‘পোনাঘাট পেরিয়ে’ প্রভৃতি গল্পে শৈলজ্ঞানন্দ মুখোপাধ্যায়, জগদীশ গুপ্ত, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, মনীশ ঘটক, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ লেখকদের রচনায় সামন্ততন্ত্রের ক্ষয়িষ্ণুতা ও আধুনিক ধনতান্ত্রিক জীবনের বিপর্যয় বিশেষ মাত্রা পেয়েছে। যা রবীন্দ্রনাথের শুভবোধ ও মানুষের প্রতি বিশ্বাস না হারানোর

অঙ্গীকারের সাথে বেমানান। অর্থাৎ কব্জলের লেখকেরা মুখ থেকে লাগের খোলস খুলে ফেলে তীব্র তীক্ষ্ণভাবে জীবন ও জগতের চিত্রকে প্রকাশ করেছেন। তাঁদের সেই রচনায় তৎকালীন সময়চেতনার পাশাপাশি ফুটে উঠেছে মানুষের মনের গহন অন্ধকারের রূপ। মনন-সর্বস্বতার পাশাপাশি মনোবিকলন, প্রেমের পাশাপাশি যৌনতা ও অবৈধ সম্পর্ক, হতাশার অন্ধকারে নিমজ্জিত হওয়ার পাশাপাশি রোমান্টিক স্বপ্নচরিতা বাংলা সাহিত্যকে নতুন পথে, বিশেষত রবীন্দ্র-প্রভাব মুক্ত পথে পরিচালিত করেছিল। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের ‘আবিষ্কার’ কবিতাটিতে এই প্রতিজ্ঞা প্রকাশিত হয়েছিল—

“পশ্চাতে শত্রুরা শর অগণন হানুক ধারালো,
সম্মুখে থাকুন বসে পথ রুধি রবীন্দ্র ঠাকুর,
আপন চক্ষের থেকে জ্বালিব যে তীব্র তীক্ষ্ণ আলো
যুগ-সূর্য স্নান তার কাছে।”^{২২}

‘কব্জলে’র সময়ে যে পরিবর্তন সাহিত্য ও সমাজে ঘটে যায় তার প্রভাব লক্ষ্য করা গেছে বহুদিন ধরে। বিশেষত পরধীন ভারতবর্ষে ব্রিটিশদের কাছে মানুষের ক্রম পরাজয় ঘটেছে ও তার ফলে তারা ক্রমশ শক্তিহীন হয়ে পড়েছে। এর পাশাপাশি দেশীয় ও বিশ্ব রাজনীতির মাধ্যমে একটা আলোড়ন দেখা দেয়। রাশিয়ার বলশেভিক আন্দোলন, স্পেনের গৃহযুদ্ধ, চীন-জাপানের যুদ্ধ, হিটলারের রণনীতি এগুলি যেমন বিশ শতকের প্রথম অর্ধে বিশেষ তাৎপর্য পেয়েছিল; এর পাশাপাশি বিজ্ঞান, রাজনীতি, সমাজনীতির নব নব আবিষ্কার ও তার ফল বা প্রভাব মানুষের চিন্তা ভাবনার মাত্রাকেও পরিবর্তিত করে তুলেছিল। তা যেমন উনিশ শতকের তেমনি বিশ শতকের চিন্তা-ভাবনাকে আলোড়িত করেছিল। (১)ডারউইনের বিবর্তনবাদ, (২)আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতা-বাদ (Relativity Theory), (৩)ফ্রয়েডের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণবাদ, (৪)মার্কসের দ্বন্দ্বিক বস্তুবাদ ও তার থেকে জন্ম নেওয়া সমাজতত্ত্ববাদ আধুনিক মানুষের চিন্তাধারায় পরিবর্তনের হাওয়া নিয়ে এসেছিল। “সমস্ত যুগদৃষ্টি, দর্শন, সাহিত্য, সমাজচিন্তা, রাষ্ট্রীয় চেতনাকে উক্ত মতবাদের ভাবপ্রভাব কোন রূপেই এড়াতে পারেনি শুধু নয়, সম্পূর্ণ রূপেই তাকে আত্মস্থ করেছে।”^{২৩} ডারউইনের বিবর্তনবাদে প্রকাশিত হয়েছে জীবজগতের ক্রমবিবর্তনের রূপ। এই চলমান বিবর্তনে জীবের তথা মানুষের অবস্থানের কোন স্থিরতা নেই। জীব এখানে একটি সংখ্যা (Digit) বা এককের মতো, সময়ের প্রবাহের সাথে সাথে তা রূপান্তরিত হতে পারে। জীবনের এই অর্থহীনতা, পরিণামহীনতা

মানুষকে অসহায় করে তুলেছিল। আপেক্ষিকতা-বাদে (Relativity Theory) প্রকাশিত হয়েছে—
বিশ্বে সবকিছুই বুদবুদ বা ফেনার মতো, তা প্রসারণশীল ও সংকোচনশীল, স্থান (Space) বা
কালের (Time) নিরিখে বস্তুর প্রকৃতির পরিবর্তন হয় এই মহাবিশ্বে। মানুষের জীবনে এখানে শুধু
একঘেয়েমি বা ঘড়ির পেডুলামের মত বিবর্তনহীন আসা যাওয়া। এর ফলে মানুষের অস্তিত্ব ও
ভূমিকার প্রতি ক্রমশ সংশয় দেখা দিয়েছিল এবং তা থেকে জন্ম নিয়েছিল জীবন সম্পর্কে হতাশা
ও নৈরাশ্য। মানুষের ব্যক্তিগত সাফল্য-ব্যর্থতা বা ভালো-মন্দের উপর একক মানুষের গুরুত্ব
থাকলো না পরিবেশ, পরিস্থিতি, দেশকাল এবং পূর্বপুরুষের জিনগত বৈশিষ্ট্য ও মনের অবচেতন
স্তরের উপর গুরুত্ব প্রকাশ পেয়েছিল মনোবিজ্ঞানী ফ্রয়েডের (১৮৫৬-১৯৩৭) মতবাদে। তাঁর
গবেষণাপত্র The Interpretation of Dreams, এবং The psychopathology of Everyday
life, Wit and its relations to the Unconscious, Three Essays on the Theory of Sex
প্রভৃতি গ্রন্থ প্রকাশ পাওয়ার সাথে সাথে মানুষের অবস্থান, আচরণ, চিন্তাভাবনা, তার প্রয়োজনীয়তা
সবকিছুর উপরই কিছু প্রশ্নচিহ্ন উঠে গেল। মানুষের মনের তিনটি স্তর Ego, Id এবং Super
Ego -র বর্ণনার মাধ্যমে তিনি প্রকাশ করেছিলেন অবচেতন মনই আমাদের নিয়ামক, এবং
লিবিডোই হল একমাত্র প্রাণশক্তি ও সমস্ত ঘটনার কারণ। ‘Sex is the main spring of our
unconscious life’ এই মতবাদ প্রকাশের ফলে প্রেমের ক্ষেত্রে দেহচেতনা ও যৌনতার শর্ত
স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হল। তাঁর সহকারী অ্যাডলার, ইয়ুং এই ধারণাকে আরও গভীরভাবে প্রকাশে
উদ্যোগ নিয়েছিলেন। এই চিন্তাভাবনার মধ্যে যে নতুনত্ব ও আকস্মিকতা ছিল তার মধ্যে সব
কিছুই একেবারে নৈরাশ্যজনক নয়। নতুন উপলব্ধি, নতুন দর্শনের মাধ্যমে জীবনকে নতুন ভাবে
দেখার প্রচেষ্টা মানুষের মধ্যে দেখা দিয়েছে। সচেতন প্রত্যাশাকামী মানুষের কাছে সেই সময় এসে
পৌঁচেছে মার্কস, এঙ্গেলসের মতবাদ, যার থেকে জন্ম নিয়েছে ‘সমাজতত্ত্ব’। যেখানে প্রতিটি
মানুষকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে সমাজের সার্বিক ঐক্য বা জোটকে মূল্য দেওয়ার মধ্য দিয়ে।
তাঁদের এই মতবাদ উনিশ শতকে প্রকাশ পেলেও তার সামাজিক প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধ হল
১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মাধ্যমে। পৃথিবীর বিবর্তনের কথা মেনে নিয়েই
সমাজের বিবর্তনকে এখানে অর্থাৎ মার্কস-এঙ্গেলসের মতবাদকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। মার্কসের
দ্বন্দ্বিক বস্তুবাদ (Dialectic Materialism) এবং Das Capital (১৮৬৭) মানুষকে নৈরাশ্য থেকে
তুলে এনে কল্যাণকর সামাজিক মিলনের মাধ্যমে ইতিবাচক ভাবনার বশবর্তী হবার পথ দেখিয়েছে।

ক্ষুদ্র ব্যক্তির সীমাবদ্ধতা থেকে সরে এসে বিপুল সমাজ শক্তির মাধ্যমে ব্যক্তি তথা সমাজের উন্নতির কাঠামোকে শক্তিশালী করেছে এই মতবাদ --যা পৃথিবীর শুভকামী মানুষের কাছে আশাবাদ পোষণ করেছে। তাই লেনিনের নেতৃত্বে রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে (১৯১৭-১৯২২) বলশেভিকদের দ্বারা পুরোনো রাষ্ট্রব্যবস্থার অপসারণ করে নতুন সমাজতন্ত্র প্রকাশ পেয়েছে। বিশ্বে বহুদেশে এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে আন্দোলনের মাধ্যমে রাষ্ট্র ও সমাজের পরিবর্তনের স্পৃহা জাগে মানুষের মধ্যে।

এই পরিবর্তন আনার জন্য মানুষের উদ্যোগ লক্ষ্য করা গেলেও পৃথিবীর সর্বত্র তা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে নি। ক্ষমতাসীল পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের কাছে মানুষের দাবি ও জীবন ক্ষয় পেতে শুরু করে। নানা অত্যাচার, অবিচারের মাধ্যমে মানুষের মুখ বন্ধ করার চেষ্টা করে ফ্যাসিবাদ। গনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ও মানুষের ব্যক্তি-স্বাধীনতার উপর আগ্রাসী থাকা বিস্তার করে তাদের নিঃশেষ করার ব্রতে ব্রতী হয় ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা, অসহায়তার শেষ সীমায় এসে দাঁড়ায় মানুষ। একদিকে শুরু হয়ে যায় ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির ক্ষমতা দখলের লড়াই, জার্মান-ইংরেজ যুদ্ধের মাধ্যমে বিশ্বের অন্যান্য দেশের অংশগ্রহণে সৃষ্টি হয়েছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের (১৯১৪)। প্যারিসের শান্তিচুক্তি (১৯১৯) সংঘটিত হলেও পুঁজিবাদের আগ্রাসী নীতি সহসা বন্ধ হয় নি। মিত্রশক্তি জার্মানীকে শোষণের চেষ্টা করে তাকে অবক্ষয়ের শেষ সীমায় নামানোর আগেই হিটলারের রণনীতি তার বিরুদ্ধে গর্জে ওঠে, এবং তার ফলশ্রুতিতে শুরু হয়ে যায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। ইতিমধ্যে বিশ্ব রাজনীতিতে যে ঘটনাগুলি মানুষের জীবনে আরও ভয়াবহতা নিয়ে আসে তা হল স্পেনের গৃহযুদ্ধ (১৯৩১), ইটালীর আবিসিনিয়া (ইথিওপিয়া) গ্রাস (১৯৩৬), জাপানের চীন আক্রমণ।

ভারতীয় রাজনীতিতে গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলন তেমন সাফল্য লাভ করতে পারেনি। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ স্বরাজ্য দল প্রতিষ্ঠা করে (১৯২৩) মানুষের মনে খানিক আশা সঞ্চারিত করলেও তার অকাল প্রয়াণে (১৯২৫) তা নষ্ট হয়ে যায়। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে কংগ্রেসের সাথে মতানৈক্য শুরু হয় ও তা বিরোধের আকার নেয়। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে লবন আইন অমান্য আন্দোলনে গান্ধীজি ডাঙি অভিযান করেন। এর পর শুরু হয় দেশ ব্যাপী রাজনৈতিক আন্দোলন ও তার পাশাপাশি গান্ধী-আরউইন চুক্তি, সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব প্রভৃতি। এছাড়াও ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে স্যোসালিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠা পায়, এবং ঐ বছরই কমিউনিস্ট পার্টিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। ভারত শাসনবিধি (১৯৩৫) প্রচলন ও তার পাশাপাশি প্রগতি লেখক সঙ্ঘ

প্রতিষ্ঠিত হলে (১৯৩৬) রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব থেকে বুদ্ধিজীবী, মধ্যবিত্ত থেকে দরিদ্র-সাধারণ সর্বস্তরের মধ্যেই তৎকালীন পরিস্থিতি ও মানসিকতা সম্পর্কে জোরালো প্রস্তুতি শুরু হয়। ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে গণনাট্য সংঘের প্রতিষ্ঠা হলে সমাজ সাহিত্য সর্বক্ষেত্রে প্রতিটি সাধারণ মানুষের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়। পিছিয়ে পড়া নির্যাতিত মানুষেরা একটি প্লাটফর্মে এসে দাঁড়িয়ে তৎকালীন ক্ষয়িষ্ণু পরিস্থিতির মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত হয়। খুব কাছ থেকে সাহিত্যের মাধ্যমে নিজের জীবনের পরিস্থিতিকে উপলব্ধির সুযোগ পেয়ে আগামী কর্ম নির্ধারণ করতে শুরু করে জনগণ।

যুদ্ধ-হত্যা-জীবনের ক্ষয় যখন বাইরের পৃথিবীতে সংঘটিত হয়ে চলে তখন লেখকেরাও সামাজিক দায়বদ্ধতার স্বার্থে তার প্রভাব সাহিত্যের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলেন। লেখক ও পাঠকের মধ্যে তৈরি হয় সমভাবনার সেতু। সমালোচকের কথায় যথার্থভাবেই তার প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়-- “...the quality which most clearly distinguishes literary material from mere experience is the value the writer has been able to give to it within a dramatic or narrative framework. In much the sameway a reader will respond to the meaning of the novel and find it dramatic to the extent that he is able to realize it in terms of his own values. Ideally the writer and the reader should share the same values, so that the material which the writer select as valuable enough to write about will automatically be valuable to the reader.” (After the lost generation: A critical Study of the writers of two wars, Alridge Joseph, Page-74)

ছোটগল্প যে পরিবেশ পরিস্থিতির সাথে একাত্ম হয়ে সময়ানুযায়ী মানুষের জীবনের ও মনের পরিবর্তন ও দৃষ্টিভঙ্গির বৈচিত্র্যের সাথে সাযুজ্য রেখে বাস্তবধর্মী হয়ে উঠতে পারে তা এই সময়ের ছোটগল্পে প্রকাশিত হয়েছে। লেখকদের মনে যেমন আশাবাদ প্রকাশ পেয়েছে তেমনি সমকালীন অবক্ষয় ও নৈরাশ্যবোধকে নগ্নভাবে প্রকাশ করার স্বাধীনতা লেখকেরা দেখিয়েছেন। এই সময়কালকে অবলম্বন করে বেড়ে উঠছিলেন বিমল কল। তবুও বলতে হয় তাঁর ছোটগল্পে একটি পৃথক সুর ও ঐতিহ্য বার বার অবিচল, প্রশান্ত অথচ শক্তিশালীভাবে প্রকাশিত হয়েছে। প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে লেখা গল্পগুলির মাধ্যমে যেন একটি ঘরানা ও প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয়েছিল। প্রত্যেক লেখকের রচনায় যে স্বভাবসিদ্ধ পৃথক সুর ও ভাবনা প্রকাশিত হয় তা লেখকের জীবনদৃষ্টির পার্থক্যের জন্যই ঘটে। সমকালীন দেশ-কালের ঘটনা প্রবাহ, পারিবারিক ঐতিহ্য,

সমকালের ঘটনা ও মানসিকতার সাথে পারিবারিক সম্পর্ক, প্রভাবশালী কিছু ব্যক্তিত্বের সাথে লেখকের সম্পর্ক সমস্ত দিক থেকেই আকর্ষণ ও বিকর্ষণের মাধ্যমেই লেখকের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠে। এই দৃষ্টিভঙ্গিই তাঁর জীবনদৃষ্টির মৌলিকত্বকে প্রকাশ করে।

লেখক বিমল করের জন্ম ২৪ পরগনার শাঁকচূড়া গ্রামে হলেও পারিবারিক কারণে তাঁকে থাকতে হয়েছে ও বড় হতে হয়েছে বাংলার বাইরে। পিতা, জ্যাঠামশাই, সেজো কাকা ছিলেন রেলের কর্মরত। সেই সূত্রে হাজারিবাগে তাঁর শৈশব অতিবাহিত হয়েছে। পরবর্তীকালে ছোট কাকা ইন্জিনিয়ার হলেও তিনি বাংলার বাইরে অবস্থান করেন। তাই প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার সময় বিমল করকে থাকতে হয় বিভিন্ন সময়ে হাজারিবাগ, জামাডোবা, কালীপাহাড়ী, বার্নাপুর, কুলটি, আসানসোল, বরাকর প্রভৃতি স্থানে। ব্যক্তিত্বময়ী ঠাকুমা শরৎকুমারীর ইচ্ছানুসারে একান্নবর্তী পরিবার ও মানসিকতার মধ্যদিয়ে বিমল করের প্রথম জীবনের কিছু অংশ কাটে। আর্থিক দিক দিয়ে স্বচ্ছলতা তাদের না থাকলেও মানসিক উদারতা, সম্পর্কের গভীরতা, ভালবাসার বিস্তৃতি, সহানুভূতির ব্যাপকতা এই পরিবারে কোন দিন ঘাটতি পড়েনি। এই ভালোবাসার প্রতি তৃষ্ণা বিমল করের জীবনের শেষ পর্যায় পর্যন্ত বজায় ছিল। পারিবারিক ঘনিষ্ঠতা ও বিস্তৃতির মধ্যেই তিনি চিরদিন আবদ্ধ থাকতে চেয়েছেন। “মানুষের স্বভাব হল জলের মতন, নিচের দিকে গড়ায়। স্নেহ, ভালোবাসা, সহানুভূতি যেখানে জোটে সেখানে সে ছোটে।”^{১৪} বিমল করের পারিবারিক ঐতিহ্যের মধ্যে যে বিষয়টি তাঁকে বেশি আকৃষ্ট করেছিল তা হল সরলতা। ব্যক্তি-স্বার্থ ভুলে গিয়ে সকলেই পারিবারিক স্বার্থকে বেশি মূল্য দিতে চেয়েছেন। পিতার উদাসীনতা, নির্লোভ মানসিকতা তাঁকে অনেক ক্ষেত্রেই অবাক করেছিল। এর পাশাপাশি সেজো কাকার ব্যক্তিত্বের প্রতিও তাঁর আকর্ষণ ছিল। বাংলার বাইরে দীর্ঘদিন থাকতে হলেও ছোট পিসিমা, মেজো কাকা ও কাকিমার সাহিত্যবোধ ও সাময়িক পত্রিকা পাঠের প্রতি আকর্ষণ লেখকের অন্তর জগতে সাহিত্য-রস পিপাসাকে জন্ম দেয় একথা লেখক নিজেও স্বীকার করেছেন। “কাকা কাকিমার পড়াশোনার চর্চা ছিল। বিশেষ করে সেজো কাকিমার। তখনকার কিছু মাসিক পত্রিকা কাকার বাড়িতে আসতো।”^{১৫} ‘প্রবাসী’, ‘বিচিত্রা’, ‘ভারতবর্ষ’, ‘মাসিক বসুমতী’, ‘নবশক্তি’, ‘প্রবর্তক’, ‘দেশ’ পত্রিকা প্রভৃতি পত্রিকার সাথে বিমল করের যোগাযোগ ঘটেছিল কৈশোরেই। কৈশোরে ছাত্রাবস্থাতেই তিনি পড়ে ফেলেছিলেন বসুমতী সাহিত্য মন্দির থেকে প্রকাশিত বিভিন্ন গ্রন্থাবলী, বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস, বিশেষ করে ‘কম্পালকুণ্ডলা’, রবীন্দ্রনাথের ‘রাজঘী’, শরৎচন্দ্র, প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের কিছু উপন্যাস। চারু

বন্দোপাধ্যায়ের ‘রচনা’, মনীন্দ্রলাল বসুর ‘রমলা’, বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায়ের ‘পথের পাঁচালি’ প্রভৃতি রচনা। এরও আগে শৈশবে উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী, সুকুমার রায়ের কিছু শিশুসাহিত্য, দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের ‘ঠাকুমার ঝুলি’, ‘ঠাকুরদার ঝুলি’, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের ‘চলিয়াত চন্দর’, হেমেন্দ্রকুমার রায়ের ‘যথের ধন’, এছাড়া রামায়ণ, মহাভারতের গল্প পড়া হয়েছিল। অর্থাৎ পারিবারিক দিক দিয়ে সাহিত্যপাঠের একটা সুস্থ সংস্কৃতি তাঁকে আকর্ষণ করেছিল। বিশেষ করে সেজো কাকিমা বিভিন্ন পত্রিকা ও গ্রন্থ পাঠ করার সুযোগ দিয়ে পরে তা আলোচনার ব্যবস্থা করতেন। এই পদ্ধতিতে মনোযোগ দিয়ে সাহিত্য পাঠের পাশাপাশি সাহিত্য সমালোচনার বিশেষ কৌশল ও তার প্রতি অনুরাগ রপ্ত করে ফেলেছিলেন বিমল কর। সেজো কাকিমার পড়তেন অনুরূপা, নিরুপমা দেবী, থেকে সীতা দেবী, শান্তা দেবী, প্রভাবতী দেবী পর্যন্ত, কবিতায় মানকুমারী দেবী, প্রিয়স্বদা দেবী থেকে রবীন্দ্রনাথের ‘মানসী’, ‘সোনারতরী’ পর্যন্ত। বিমল কর এই সময় গিরিবালা দেবী, পূর্ণশশী দেবীর সাহিত্যও পাঠ করেছেন বিভিন্ন পত্রিকার হাত ধরে। ‘শৈলজানন্দরাও ততদিনে বাংলা সাহিত্যে পাকা আসন করে নিয়েছেন। নতুন হাওয়া লেগেছে বাংলা সাহিত্যে। তার দমকা বাতাস মফস্বলেও গিয়ে পড়ত।’^{১৬} সাময়িক পত্রিকার হাত ধরে আধুনিক সাহিত্যের সাথে তাঁর এভাবেই যোগাযোগ। বিনম্র-চিন্তে তাই তিনি সেজো কাকিমার প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেছেন। এছাড়াও তাঁর কৈশোর জীবনে সাহিত্যবোধ জাগিয়ে তোলার জন্য যাদের কথা তিনি উল্লেখ করেছেন তাঁরা হলেন আসানসোল রেল স্কুলের আশুতোষ ভট্টাচার্য, যিনি পরবর্তীকালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতনামা অধ্যাপক ছিলেন, সুপারিন্টেন্ডেন্ট প্রমোদ বাবু কুলটি ম্যাকমিলান ইনস্টিটিউশানের হেড মাস্টারমশাই শৌরিপদ চট্টোপাধ্যায় এবং বউবাজারের খুড়তুতো দাদা— দেবীপ্রসাদ কর (দাদামণি)। এই দাদামণির কাছ থেকেই বিমল কর আধুনিক সাহিত্য সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা-গুণো শেখবার চেষ্টা করেছিলেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকাল থেকেই গ্রামীণ দারিদ্র্যের যন্ত্রণা থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় হিসেবে কিছু মানুষের মধ্যে নগর-মুখীনতা লক্ষ্য করা যাচ্ছিল। এই নগর-মুখী মানুষেরা শহরের গোলক ধাঁধায় পড়ে তাদের জীবনের যে পরিবর্তন ঘটালো তা সাহিত্যের বিষয় করে তুলেছেন সাহিত্যিকেরা। এছাড়াও নাগরিক জীবনে বিলাসিতা ও দারিদ্র্য, স্বার্থপরতার ক্লেদ ও বিশ্বাসের সারল্য, সেবা পরায়ণতা ও নিষ্ঠুরতা বা হিংস্রতা — এই বৈপরীত্যের ছবি পাশাপাশি ঐক্য অসুন্দরের প্রকাশ মহিমার মাধ্যমে বরণ করা হলো নতুনত্বের। অর্থাৎ সাহিত্যের ক্ষেত্রে তা

কবিতা, ছোটগল্প, উপন্যাস সব দিকেই প্রচলিত ধারণার বিরোধিতা করে নতুন ভাবনা নতুন করে ভাববার অবকাশ এনেছিলেন সাহিত্যিকেরা। বিশেষত যুগধর্মের নিহিত তৎকালীন জীবনসমস্যা ও জীবনযন্ত্রণা প্রকাশের প্রতি দায়বদ্ধ ছিলেন তৎকালীন কল্লোল গোষ্ঠী ও গোষ্ঠী বহির্ভূত কিছু সাহিত্যিক। সকলেরই কেন্দ্রীয় সুর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়েছে কল্লোল গোষ্ঠীর ভাবনার সাথে। “যাকে বলে ‘ম্যালাডি অফ দি এজ’ বা যুগের যন্ত্রণা তা কল্লোলের মুখে স্পষ্ট রেখায় উৎকীর্ণ।”^{১৭} রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ‘চোখের বালি’র ভূমিকা অংশে ‘ঘটনা পরস্পরের বিবরণ’ না দিয়ে ‘তাদের আঁতের কথা বের করে দেখানো’র শুভ সূচনা করেছিলেন; যেখানে মনস্তত্ত্বই কথাসাহিত্যে প্রাধান্য পেয়েছিল কাহিনীর অতিরঞ্জন-ধর্মিতা থেকে। এই বৈশিষ্ট্য কল্লোল সমসাময়িক কাল থেকে বিশেষভাবে কথাসাহিত্যে — বিশেষ করে ছোটগল্পে প্রকাশিত হতে থাকে। কল্লোল পরবর্তীকালে বা কিছুমাত্রায় সমকালে নাগরিক চেতনার পাশাপাশি পল্লীজীবনের জীবনকথাকে কিছু সাহিত্যিক ফুটিয়ে তুললেও রোমান্টিক ভাব বিলাসে রূঢ় বাস্তবকে চাপা দেওয়ার অভিপ্রায় তাঁদের দেখা যায়নি, বরং পরিবর্তিত সময়ের পদচারণার সাথে সাথে গ্রামীণ জীবনের কাহিনী ও মানসিকতার বাস্তব তথ্যকেও সঠিকভাবে সাহিত্যে রূপদান করলেন। শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখের রচনায় তার স্বীকৃতি মেলে।

বিমল কর সেই সময়কার সাহিত্যের পাঠক হিসেবে সাহিত্যের ধারাটিকে বোঝার চেষ্টা করছিলেন। রবীন্দ্রনাথ পড়ার পাশাপাশি অন্যান্য লেখকদের রচনাও তিনি গুরুত্ব সহকারে উপলব্ধি করার প্রেরণা পেয়েছিলেন। শৈশব ও কৈশোরের দিনগুলি পশ্চিমবঙ্গের বাইরে কাটলেও যৌবনের প্রথম লগ্নে বিমল কর উচ্চতর শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে কলকাতায় এসে পৌঁছান। কল্লোলিনী তিলোত্তমার জনকল্লোলে নিজে থেকে ভাসিয়ে দিয়ে শিক্ষা ক্ষেত্রে কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজের আইএসসি পাঠক্রম, কিংবা শ্রীরামপুর টেক্সটাইল কলেজের ইঞ্জিনিয়ারিং পড়াশোনা বা বিদ্যাসাগর কলেজের স্নাতক পাঠক্রমে খুব বেশি কৃতিত্ব না দেখাতে পারলেও বিমল কর এই মুহূর্তে তৎকালীন সাহিত্যের অনুরাগী হয়ে পড়েন। প্রেমেন্দ্র মিত্র, জগদীশ গুপ্ত, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব বসু, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, সুরেশ চক্রবর্তী, জীবনানন্দ দাশের সাহিত্যের প্রতি কৌতূহলী হয়ে পড়েন।

রবীন্দ্র-মত বিরোধিতা বা প্রচলিত ধ্যান ধারণার বিরোধিতার জন্য তৎকালীন লেখক গোষ্ঠীর মধ্যে যে তৎপরতা দেখা গেছিল, সে বিষয়ে তাঁরা অনেক বেশি শক্তি, সাহস ও দৃষ্টির বৈচিত্র্য

খুঁজে পেয়েছিলেন বিদেশী সাহিত্য পাঠের মধ্য দিয়ে। বিদেশী সাহিত্যপাঠের প্রবণতার বিষয়টি যদি আলোচনা করতে হয় তাহলে অবশ্যই মনে পড়বে উনবিংশ শতাব্দীতে সাহিত্যিকদের মধ্যেও এই বিষয়টি পরিলক্ষিত। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, রাজনারায়ণ বসু থেকে আরম্ভ করে মধুসূদন, রঙ্গলাল, বঙ্কিমচন্দ্র — এঁরা সকলেই বিদেশী সাহিত্য পাঠ করেছেন। এঁদের মধ্যে যেমন বিদেশী সাহিত্য অনুবাদের প্রচেষ্টা দেখা যায়, তেমনি তাঁদের স্বকীয় রচনায় কিছু কিছু ক্ষেত্রে অন্য সাহিত্যের প্রভাবও পড়েছে। কল্লোল যুগের লেখকরা বিদেশী সাহিত্য পাঠ ও তার অনুসরণের কথা দৃপ্ত-কণ্ঠ ঘোষণা করেছেন। প্রেমেন্দ্র মিত্র যেমন ভাবে হ্যামসুন, গোর্কির সাহিত্য পাঠ করে জীবনকে দেখবার সুযোগের কথা ব্যক্ত করেছেন। তেমনি কল্লোল গোষ্ঠীর বাইরে থেকেও এই প্রবণতার কথা স্বীকার করেছেন সজ্জনীকান্ত দাস। “...আমিও কন্টিনেন্ট সাহিত্যে পাঠ লইতেছি। ইবসেন, মের্টোলিস্ক, বোয়ার, ফ্লুট, হ্যামসুন -- বঙ্গবাসীর নিরামিষ অঙ্গনে তাজা রক্তের ছাপ পড়িতেছে। সে কি উত্তেজনা, কি উন্মাদনা। সেই ট্রেডই চলিল ‘কল্লোল’, ‘কালিকলম’, ‘প্রগতি’, ‘উত্তরা’ পর্যন্ত।”^{১০} এই বিদেশী সাহিত্যের ক্ষেত্রে যেমন ইংরেজি সাহিত্য ছিল, তেমনি অন্যান্য বহু কন্টিনেন্টাল সাহিত্যের ইংরেজি অনুবাদ ছিল, যার মাধ্যমে লেখকদের ভাবনার একাত্মতা ঘটেছিল ও তা বাংলা সাহিত্যে নতুনত্বের বিকাশে সম্ভব হয়েছিল। এঁরা ডস্টয়েভস্কি, টলস্টয়, টুগেনিভ, চেকভ, গোর্কি, ফ্লবের, জোলা’র রচনাকে আত্মস্থ করেছিলেন। রোম্যা রোলঁর দৃষ্টিভঙ্গিতে যেমন স্বাধিকার খুঁজে পেয়েছেন, তেমনি ডি. এইচ. লরেনস, হান্সলির দর্শনে খুঁজে পেয়েছেন প্রেম ও যৌবন-চৈতন্যের নতুন ঠিকানা। অর্থাৎ সমস্ত কিছুর দিক থেকেই নতুন প্রাণোন্মাদনা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রত্যয়-নিষ্ঠতা এই সময়ের সাহিত্যিকদের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

বিমল কর কলকাতায় থাকাকালীন বাংলা সাহিত্যের যে পরিবর্তন ঘটেছিল তা বুঝতে পেরেছিলেন এবং সেই পরিবর্তনের ক্ষেত্রে বিদেশী সাহিত্যের অবদানকেও উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি নিজেও বিদেশী সাহিত্য পাঠ করে বাংলা সাহিত্যের সাথে তার সম্পর্ক বোঝার চেষ্টা করেছিলেন। বিদেশী সাহিত্য পাঠের মধ্য দিয়ে যেমন তাঁর একটি পরিচ্ছন্ন সাহিত্যবোধ গড়ে উঠেছিল, তেমনি তা ভবিষ্যতে তাঁর সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রেও বিশেষ সহযোগী হয়েছিল। আগষ্ট আন্দোলন ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিতে কলকাতা ছেড়ে বিমল কর যখন জামাডোবায় অবস্থান করেন তখন ভাগা ব্রেল লাইব্রেরীর শরণাপন্ন হয়ে বিদেশী সাহিত্যের প্রতি পরিচিত হয়ে

ওঠেন। হামসুন, বয়ার, ইবসেন, টুগেনিভ, বুনিন, টলস্টয়ের রচনা পাঠ করে তিনি নিজের অন্তরসত্তাকে ক্রমশ জাগিয়ে তোলেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমকালে নানা রাজনৈতিক ও সামাজিক টালমাটাল পরিস্থিতি বিমল করকেও ভাবিত করে তুলেছিল। কংগ্রেসের ভারতছাড়ো আন্দোলন, জাপানের বোমার আক্রমণ, মানুষের কলকাতা শহর ছেড়ে পালিয়ে যাওয়া, আবার কয়েকদিন পর ফিরে আসা, এর পর '৪২-এর মর্মান্তিক ঘূর্ণিঝড়, সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস, দুর্ভিক্ষ, এর পাশাপাশি ঘটে চলেছিল একাধিক কৃষক ও শ্রমিক বিদ্রোহ। রুশ বিপ্লবের (১৯১৭) মাধ্যমে কৃষক শ্রমিকেরা খুঁজে পেয়েছিল তাদের বিপ্লবী শক্তির প্রাচুর্য। তাই গান্ধীজির অহিংস সত্যগ্রহ আন্দোলন চলাকালীন সাধারণ মানুষের জাগরণে শুরু হয়েছিল কৃষক বিদ্রোহ। বিভিন্ন ক্ষেত্রে ধর্মঘট, গণশোভাযাত্রা, সুতাকল-চটকল শ্রমিকদের আন্দোলন প্রভৃতির মাধ্যমে এবং তা সফল করার ক্ষেত্রে সহায়তা করল বিভিন্ন কমিউনিস্ট মনোভাবাপন্ন বামপন্থী দল গুলো। অসহযোগ আন্দোলন ও আগষ্ট আন্দোলনের পর উল্লেখযোগ্য হয়ে উঠল তেভাগা আন্দোলন (১৯৪৫-৪৬)। জমির স্থায়ী প্রজাসত্ত্বের অধিকার, এবং উৎপন্ন ফসলের দুই তৃতীয়াংশ লাভের হকদার হওয়ার জন্য কৃষক সাধারণ এই আন্দোলনকে সংগঠিত করার চেষ্টা করে। বিহার, উত্তরপ্রদেশ, কাশ্মীর, তেলঙ্গানাতেও কৃষক বিদ্রোহ একই সময় মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। ১৯৪৩-৪৪ খ্রীষ্টাব্দের মনসুর বাংলার কৃষককুলকে চরমতম আঘাতের সন্মুখীন করেছিল। একদিকে বহু কৃষকের অসহায় মৃত্যু যেমন ভাবে দুঃখ, যন্ত্রণা হতাশার জন্ম দিচ্ছিল, তেমনি পাশাপাশি ঘটছিল ধনী জোতদারদের ক্রমশ কৃষকদের বঞ্চিত করে অর্থলোলুপ হয়ে ওঠা ও অর্থগর্বে স্ফীত হয়ে ওঠার মতো ঘটনা। —এই অব্যবস্থার বিরুদ্ধে কুঠারাবাত করার জন্য কৃষককুল সম্মিলিতভাবে শপথ গ্রহণে প্রেরণা পেয়েছিল। মজুতদার ও কালোবাজারী ব্যবসায়ীদের অন্যায় ভাবে মজুতকৃত ফসল উদ্ধারের জন্য ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে শুরু হয়েছিল গণ উদ্যোগ।

স্বাধীনতা আন্দোলনের এই সময়কালে বিক্ষিপ্তভাবে কিছুদিন বিমল কর কলকাতায় অবস্থান করছিলেন। উত্তাল সেই দিনগুলি তাঁর স্মৃতি পটেও অম্লান ছিল। স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে তিনি লিখেছেন, “কলকাতায় তখন কী ভয়ঙ্কর অবস্থা। কেমন এক অস্থিরতা, ক্ষিপ্ততা, বেপরোয়া ভাব। হরতাল, টিয়ার গ্যাস, পুলিশের গুলি; সৈন্যদের টহল চলেছে একদিকে অন্যদিকে মাথার ওপর জাপান বোমার আতঙ্ক। দিন কয়েক কোনো খবরের কাগজই বেরুলো না, একমাত্র ‘স্টেটসম্যান’ ছাড়া।”^{১৯}

এই সময়কালকে বিমল কর তাঁর সাহিত্যের মাধ্যমে প্রকাশ করার চেষ্টা করছেন। দুর্ভিক্ষের পটভূমিতে তিনি লেখেন তাঁর ‘মানবপুত্র’ গল্পটি। কলকাতা শহরে ভিড় করা ছিন্নমূল মানুষের অস্তিত্বের সংকট এই গল্পে বিশেষভাবে রূপ পেয়েছে। একদিকে অসহায় মানুষের ভিড়, অপরদিকে হঠাৎ আর্থিক দিক দিয়ে স্ফীত হয়ে ওঠা মানুষদের প্রবৃত্তি অসাধারণ মুন্সিয়ানায় লেখক ফুটিয়ে তুলেছেন। ‘দেওয়াল’ উপন্যাসেও এই সময়কালের নিখুঁত ছবি পরিবেশিত হয়েছে। ‘দেওয়াল’ উপন্যাসটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমকালীন ১৯৪১-এর মাঝামাঝি থেকে ১৯৪৫-এর প্রায় শেষ পর্যন্ত সময়ের বিশ্বাসযোগ্য দলিল। স্বাধীনতা আন্দোলন, কংগ্রেস ও কমিউনিস্ট দলগুলির ভূমিকা, মন্বন্তরের চিত্র, সমকালীন মানুষের অবস্থা সবকিছুই এই উপন্যাসে লেখক বর্ণনা করেছেন।

এর অব্যবহিত পরে ১৯৪৬ সালের দাঙ্গাও মানুষের জীবনে গভীর প্রভাব ফেলে যায়। স্বাধীনতা আন্দোলন, মন্বন্তর, তেভাগা আন্দোলনে বিপর্যস্ত চল্লিশের দশকে কলকাতা-কেন্দ্রিক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সেই অশান্ত পরিবেশকে আরও ঘনীভূত করে তুলেছিল। মানুষে মানুষে বিশ্বাস-বোধ ক্রমশ ক্ষয়িষ্ণু হয়ে আসছিল। রাজনৈতিক ক্ষমতা লোভের কারণে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিও ক্রমশ নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল। “আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতি-আক্রমণের একটা যুক্তি আছে। কিন্তু যেটা দেখা গেল সেটা হল মুসলমান-প্রধান এলাকায় হিন্দু-নিধন, আর হিন্দু-প্রধান এলাকায় মুসলমান-নিধন। এবং এই নিধন অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে। যেখানে আমাদের ভয়ের কোন কারণ নেই সেখানে যাদের শত্রু মনে করি তাদের খুন করব, এটা নিষ্ঠুরতা ত বটেই -এটা একটা নির্লজ্জ কাপুরুষতাও। এই নিষ্ঠুরতা ও কাপুরুষতা তখন অত্যাচারীদের গৌরব বহন করে আনত। কলকাতার ১৯৪৬ এর দাঙ্গাতে অনেকে শিখল-- মানুষের প্রাণের কোন দাম নেই, শিখল-- অনেকে মিলে অল্প কয়েকজনের ওপরে অত্যাচার করার মধ্যে কোন অন্যায় নেই। এই দাঙ্গাতে পাড়ায় আধিপত্য পেল তারা, যাদের আমরা আগে বলতাম গুডা, দাঙ্গার সময় বলতাম দাদা-ভাই আর পরে বলতাম মস্তানা।”^{২০}

আধুনিক ভারতবর্ষের এই দাঙ্গা ভারতবাসীদের কাছে লজ্জার সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। ধর্মের অঙ্গ যেহেতু সাম্প্রদায়িকতা নয়, সেহেতু ধর্মের নামে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা যে বীভৎস নারকীয়তার সৃষ্টি করতে পারে তা এই দাঙ্গার মাধ্যমে প্রকাশিত। বাংলার সাহিত্যিকরা মানুষকে সচেতন করতে চেয়েছেন এই দাঙ্গার পেছনে ক্ষমতালোভী, মুনাফাখোর কতিপয় মানুষের প্রবৃত্তির স্বরূপ উদ্ঘাটনের মাধ্যমে। মানিক বন্দোপাধ্যায়ের ‘খতিয়ান’ গল্পে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার মাধ্যমে

শোষণ ও বঞ্চনার ছবি অঙ্কিত। রমেশচন্দ্র দত্তের ‘সাদাঘোড়া’ গল্পে মানুষের দাস্কার শিকার হয়েছে অসহায় পালিত পশু, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘উস্তাদ মেহের খাঁ’ গল্পে কিংবদন্তি গায়ক যিনি সর্ব ধর্মের প্রতিভূ, অর্থাৎ গায়ক-শিল্পীর কোন সম্প্রদায় বা জাত নেই, তাকে খুন হতে হয় ধর্মের নামে পালিত যুদ্ধে। সমরেশ বসুর ‘আদাব’ গল্পে দুই ধর্মের মানুষই একই প্রবৃত্তিগত কারণে বাঁচতে চায়, অথচ যাদের সাথে এতদিন সুসম্পর্ক ছিল তারাই যখন শত্রু হয়েছে তখন সম্মেলনের চোখে দেখাই স্বাভাবিক। তবু ডান্টবিনের পাশে লুকিয়ে তারা দুজনেই একসাথে বিড়ি চেয়ে খেয়ে জীবনের হারানো সম্পর্কের উষ্ণতাকে ফিরে পাবার চেষ্টা করে। সোমেন চন্দ্রের লেখা ‘দাস্কা’, বনফুলের ‘দাস্কার সময়’ গল্পগুলি পরিস্থিতির উজ্জ্বল প্রমাণ।

বিমল কর এই সময়কালে রচনা করেন তাঁর ‘অন্তরে’ গল্পটি। দাস্কার পরিস্থিতিতে দুটি অসহায় নারী-পুরুষ কে নিয়ে লেখা গল্পটিতে তারা দুজনেই দাস্কার বিরুদ্ধে, কিন্তু অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে পড়ে তারা নিরাপত্তার সন্ধান করেছে এবং মানুষের আস্থা ও বিশ্বাসবোধকেই মূল্য দিতে চেয়েছে। কিন্তু দাস্কার সময় এই গল্পটি পশ্চিমবঙ্গের কোন পত্রিকায় ছাপা হয়নি। সাধারণ মানুষের পাশাপাশি পত্রিকার সম্পাদকও হয়তো এই দাস্কা নিয়ে ভাবিত ছিলেন। বিমল কর নিজেই জানিয়েছেন, “পরাগ পত্রিকার জন্য ঠিক নয়, স্বরাজের (বন্ধু) কথায় একটি গল্প লিখেছিলাম দাস্কা নিয়ে। কেউ সেটা ছাপেনি। যে গল্পে একটি হিন্দু মেয়ে আর একটি মুসলমান ছেলের বিপন্নতার কথা আছে তা কেন ছাপা হয়না —আমি জানি না। গল্পে ছিল, এই দুটি ছেলেমেয়ে ঘটনাচক্রে বিপদের মধ্যে, কেউ কাউকে না জেনে —(এমনকি পরস্পরের উপস্থিতির কথা না জেনেও) একটি বাড়ির মধ্যে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিল আত্মরক্ষার জন্যে—। এই গল্পটি না ছাপার কোন কারণ ছিল না। কিন্তু ছাপা হয়নি। কাশীর ‘উস্তরা’ পত্রিকার সম্পাদক সুরেশ চক্রবর্তী তাঁর কাগজের জন্যে নিয়ে গিয়ে ছাপেনা।”^{২১}

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কালে সমস্ত দিক থেকেই একটা পরিবর্তনের স্রোত দেখা গেছে। তা যেমন রাজনৈতিক তেমনই অর্থনৈতিক, যেমন সামাজিক তেমনই নৈতিক। তিরিশের দশক থেকেই এই পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল যা অনেক প্রকট রূপ ধারণ করে চল্লিশের দশকে, তা হল প্রেম ভাবনায় নতুনত্ব। উনিশ শতকের রচনাতে যে সমাজ বিগর্হিত বা নিষিদ্ধ প্রেমের স্বরূপ অঙ্কিত হয়েছিল এখানে তার সাথে মনোবিকলনের তত্ত্বও প্রযুক্ত হল। ফ্রয়েডের তত্ত্ব রবীন্দ্রোত্তর আধুনিক সাহিত্যে প্রেমের ক্ষেত্রে সূচনা করেছিল দেহকামনা ও যৌনচেতনার। যুগধর্মের দিকে যদি দৃষ্টি দেওয়া যায়

তাহলে দেখা যাবে বিদেশী শোষণ ও দাসত্বের ফলে রাজনৈতিক জটিলতা বৃদ্ধির পাশাপাশি সমাজ জীবনে লক্ষিত হয়েছে মানসিক অসন্তোষ। বেকারত্ব, মূল্যহ্রাস, কৃষিক্ষেত্রে মন্দা, অর্থনৈতিক অবক্ষয় সমাজ জীবনে মানুষের মনে এনে দিয়েছিল তীব্র অসন্তোষ। অনিশ্চিত জীবনকে কিছুটা সুরক্ষিত করার লক্ষ্যে একদিকে ভেঙে যাচ্ছিল যৌথ পরিবারতন্ত্র, অপরদিকে ঈপ্সিত লক্ষ্যে না পৌঁছানোর ফলে তীব্র মানসিক জ্বালায় অসং উপায়ে অর্থসৃষ্টির প্রবণতা মানুষের কাছে গৃহীত হচ্ছিল। এর প্রভাব পড়ে প্রেমের ক্ষেত্রেও। আর্থিক সুনিশ্চয়তা না থাকায় প্রেমের সাফল্যও থেকে যাচ্ছিল অধরা, কিন্তু মানসিক পিপাসা চরিতার্থ করার বাসনায় ভোগসর্বস্ব যৌনচেতনা হয়ে উঠছিল অবলম্বন। “বাস্তবিক অর্থেই যুদ্ধ সমকালে প্রেম ক্রমশ দেহভাঙ ধরে বিকৃতিতে এসে পৌঁছায়। সেই বিকৃতি মেয়েদের ঠেলে দেয় গণিকাবৃত্তিতে, পুরুষেরা হয় লোভী, লম্পট, সুবিধাভোগী, আর গোটা সমাজ হয় দুষ্ট ক্ষতে বিব্রত, বিষাক্ত, তার অবক্ষয় তখন অবধারিত। সমকালের কথাসিঁপীরা তারই রূপকার।”^{২২} ফ্রেড মনোবিকলন তত্ত্ব ও মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা বেশ কিছু গল্পের বিষয় হয়ে উঠেছে যার মাধ্যমে তৎকালীন মানুষের কিছুটা স্বরূপ চিনে নেওয়া সম্ভব হতে পারে। এছাড়াও এই সময়ের কিছু গল্পের বিষয় হল মানুষের প্রতি বিশ্বাসভঙ্গের বেদনা এবং তার প্রতি মানুষের অসহায় আত্মসমর্পণ। জগদীশ গুপ্ত, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, অন্নদাশঙ্কর রায়, মনীষ ঘটক, মনোজ বসু, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র, শরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সুবোধ ঘোষ, সমরেশ বসু প্রমুখ গল্পকারেরা মানুষের জীবনের অন্ধকারময় প্রদেশে ফেলেছেন তীক্ষ্ণ আলো। যতটা দেখা গেছে তার থেকে যা দেখা যায়নি তার প্রতি আমাদের সচেতন করার প্রয়াস নিয়েছেন।

বিমল কর আধুনিক সাহিত্যের মনোবিশ্লেষণের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপের চেষ্টা করেছেন। চরিত্রের আন্তর-জগতের অতলে ডুব দিয়ে সংগ্রহ করেছেন তার বৈচিত্র্যময় মানস-বৈশিষ্ট্য। তাঁর জীবনদৃষ্টির চেতনা প্রতিফলিত হয়েছে গল্পের কিংবা উপন্যাসের চরিত্রগুলির মানবিকতার স্পর্শে। “...বার বার তিনি খুঁজতে চেয়েছেন ব্যক্তির স্বাভিমানের রহস্য। তাকে খুঁজে পাওয়ার জন্য কোন বৃহৎ কর্মকাণ্ড তাঁর দরকার হয় না। ব্যক্তির আভ্যন্তর সত্তার উন্মোচন ঘটে আনমনে, তখনই তার ভাবনার চেহারা আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়। বিমল কর ব্যক্তির সেই আভ্যন্তর সত্তার লেখক।”^{২৩} বিমল করের এই বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে তাঁর গল্পে এসেছে মনস্তত্ত্ব, যৌনচেতনা, মানুষের

মনের অসহায়তা, বিষাদময়তা, মানবিক মূল্যবোধ, আর্থসামাজিক চিত্র এবং সর্বোপরি বেঁচে থাকার অদম্য উৎসাহ।

স্বাধীনতা পরবর্তীকালে ভারতবর্ষ ও পশ্চিমবঙ্গের মানুষের কাছে নানা সমস্যা ঘুরে ফিরে আসতে থাকে। রাজনৈতিক পরিস্থিতির অস্থিরতা, শাসনতন্ত্রের পরিবর্তনশীল মানসিকতা, সামাজিক জীবনের টালমাটাল পরিস্থিতি মানুষের কাছে সুস্থিরতা নিয়ে আসতে পারছিল না। ঘন ঘন দেশীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির পালাবদল এত দ্রুতহারে ঘটে চলেছিল যে, সাধারণ মানুষ তার সাথে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে পারেনি। এই কারণেই স্বাধীনতা পরবর্তীকালে লক্ষ্য করা গিয়েছিল মানুষদের মধ্যে চাঞ্চল্য, অস্থিরতা, আত্মগোপনের মানসিকতা। স্বাধীনতা প্রাপ্তির আগে মানুষ যে স্বপ্ন দেখেছিল, জীবনের যে উদার প্রেক্ষাপট কল্পনা করেছিল, নতুন শাসক গোষ্ঠীর হাতে শাসনভার প্রদত্ত হওয়ার পর তাদের মধ্যে অনেকেরই মোহমুক্তি ঘটতে থাকে। এছাড়া বঙ্গ বিচ্ছেদের মধ্য দিয়ে যে স্বাধীনতা মানুষ লাভ করেছিল তাও তাদের কাছে ঈপ্সিত ছিল না। তবুও দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক অশান্তি থেকে মুক্তিলাভের ইচ্ছা মানুষের মনে জাগ্রত হয়েছিল। বিমল কর এই সব মানুষদের প্রতিনিধি হয়ে তৎকালীন পরিস্থিতিকে ব্যক্ত করার চেষ্টা করেছেন স্মৃতি-চারণায় ও সাহিত্যের মাধ্যমে। “জুন মাসের মাঝামাঝি থেকেই আমরা মোটামুটিভাবে ধরে নিলাম বাংলাদেশ ভাগ হচ্ছে। এই সময় বাংলাদেশের ভাগ্য নিয়ে শেষ চালটুকু চালা হয়ে গেল। আজ আমরা যা কিছু ভাবিনা কেন—তখন—দাঙ্গা হাঙ্গামায় রক্তপাতে নরহত্যায় লুণ্ঠনে আর নানারকম অশান্তির মধ্যে মানুষের মন তিক্ত বিরক্ত হয়ে গেছে। পাকিস্তান হচ্ছে—এটাও যেমন সত্য হয়ে দাঁড়াল, বাংলাদেশ ভাগ হয়ে যাচ্ছে—এটাও তেমন ঘটনা হয়ে দাঁড়াল।”^{২৪} এক দল কমিউনিস্টরা মনে করতে শুরু করে ব্রিটিশ সরকার তাদের শাসনভার তাদের ভারতীয় সমর্থকদের হাতে তুলে দিয়ে গেছে। যাদের আদর্শবাদী রাষ্ট্রনায়ক মনে করা হয়েছিল সাধারণ মানুষ তাদের মধ্যে পরিবর্তন লক্ষ্য করেন। “ক্ষমতার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা প্রমাণ করে, ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তি এবং ক্ষমতা—এই দুইয়ের সম্পর্ক মাকড়সা এবং মাকড়সার জালের মতই জটিল ও সম্পৃক্ত।”^{২৫} এর ফলে ১৯৪৭-এর পর থেকে দেখা যায় রাজনৈতিক অবক্ষয়, যা তৎকালীন মানুষদের ভাবিত করে তুলেছিল। গান্ধীজির মৃত্যু সেই অবক্ষয়ের সাথে যুক্ত। বিমল কর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে না দেখলেও মানবিক ভাবনায় সমৃদ্ধ হয়ে এর বিরোধিতা করেছিলেন। “...কি করেছিলাম আমরা? নিরীহ, নিরপরাধ, নিঃশঙ্ক একটি মহৎ জীবনকে হত্যা করেছিলাম নৃশংসভাবে, উন্মাদনার বশবর্তী

হয়ে। আর যথার্থ অর্থে না হলেও অন্য অর্থে এই মানুষটির সারাজীবনের সাধনাকে এবং জীবনকে বুঝি পশুর মতন ক্ষতবিক্ষত করেছিলাম। অহিংসচিন্তা একটি মানুষ হয়েছিল পাশব হিংসার ভক্ষ্য। মৃত্যুর পর নয় তার আগেই।”^{২৬} এর পাশাপাশি কমিউনিস্টরা ক্রমশ সংঘবদ্ধ হয়ে ওঠে, তারা শ্লোগান তোলে ‘এ আজাদী বুটা হ্যায়’। তৎকালীন বড়লাট লর্ড ওয়াভেলের অপসারণ দাবি করে তারা। সরকারী বাস-ট্রাম জ্বালানোর পাশাপাশি লক্ষ্য করা যায় ছাত্র আন্দোলন।

বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে শুরু হয়ে যায় নানা সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তন। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা নেওয়া হয় ১৯৫১ সালে। এই সময় থেকেই নগরায়ন ও শিল্পায়নের প্রতি সরকার বিশেষ উৎসুক হয়ে ওঠে। কলকাতা ভিত্তিক এই নগরায়নের ফলে কলকাতায় যেমন মানুষের ভিড় বাড়তে থাকে তেমনি গ্রামীণ মানুষের সাথে কলকাতার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পার্থক্য সূচিত হতে থাকে। গ্রাম থেকে মানুষের ঢল কলকাতার আর্থিক জীবনের সাথে যুক্ত হওয়ার অভিলাষে কলকাতায় এসে জমা হয়। এর পাশাপাশি পূর্ববঙ্গ থেকেও মানুষ নিরাপত্তার তাগিদে কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ভিড় বাড়তে থাকে। ১৯৫২ সালে সাধারণ নির্বাচন মানুষের মনে পরিবর্তনের প্রত্যাশাকে গভীরভাবে প্রদর্শন করে না। কিন্তু ১৯৫৩ সাল থেকে গ্রামের ভূমিস্বত্ব সংক্রান্ত ভাবনা গ্রামীণ মানুষের কাছে নতুন আশা সঞ্চার করে।

১৯৫৪ সালে জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ হয় এবং মানুষ প্রকৃতভাবে সাম্যবাদী জীবনের সাথে পরিচিত হয়ে ওঠার প্রত্যাশা করে। ১৯৪৯-এ গণতান্ত্রিক চীনের জন্ম হওয়ার পর চীন এবং ভারতের সুসম্পর্ক নিয়ে বেশ কিছু মানুষ আশাবাদী হয়ে উঠেছিলেন। ১৯৫৪-তে প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুর ‘পঞ্চশীল’ নীতির ভিত্তিতে চীন তীব্রত ভারতের বাণিজ্যিক সম্পর্ক দৃঢ় হওয়ার আশা থাকে, কিন্তু তা বাস্তবে সম্ভব হয়নি। ১৯৫৪ সালের জুন মাসে চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাই ভারত সফরে নেহেরুর সাথে দীর্ঘ বৈঠকের পর আশাবাদ পোষণ করলেও ১৯৫৯-এর পর থেকে সম্পর্ক ক্রমশ খারাপ হতে থাকে। এক সময় ‘হিন্দী চীনি ভাই ভাই’ শ্লোগান ব্যক্ত হলেও ১৯৬২-তে চীন ভারত সংঘর্ষে সেই ভ্রাতৃত্ব বিলুপ্ত হয়। “কেউ কেউ বলেন দালাই লামাকে ভারতে রাজনৈতিক আশ্রয় দেওয়াই কাল হয়েছিল। চীন একেবারেই প্রসন্ন হয়নি। ...আবার কারও কারও ধারণা ভারত বা পণ্ডিত নেহেরু যতই ‘পঞ্চশীল’ করুন না কেন, আদতে ভারতের কোনো সুপরিষ্কৃত বৈদেশিক-নীতি ছিল না। স্বাধীনতা পাবার পর থেকেই সে শুধু প্রতিবেশীদের সঙ্গে একটা সম্ভাব্য সম্পর্ক বজায় রাখার চেষ্টাই করেছে— তার বেশি কিছু নয়।

ফলে এক সময় প্রতিবেশীরাও আর ভারতকে গুরুত্ব দিত না। পাকিস্তান, নেপাল, চীন--কার সঙ্গেই বা সম্পর্ক ভাল থাকল।”^{২৭}

চীন-ভারত সংঘর্ষের পর আর এক প্রতিবেশী রাষ্ট্র পাকিস্তানের সাথে ১৯৬৫-তে ঘটে গেল আর এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম। ১৯৪৭-এর ১৫-ই আগস্ট ভারত এবং পাকিস্তান স্বাধীন হওয়ার সময় পূর্ববঙ্গ ‘পূর্বপাকিস্তান’ নামে পাকিস্তানের অধীনে ছিল। কিন্তু কাশ্মীর নিয়ে সমস্যা ক্রমশ ঘনীভূত হতে থাকে। ভারত পাকিস্তান স্বাধীন হওয়ার সময় কাশ্মীর ছিল হিন্দু রাজা হরি সিং শাসিত একটি স্বাধীন রাজ্য ছিল। এর পর পাকিস্তানি জঙ্গিদের আক্রমণে পর্যুদস্ত কাশ্মীর ভারতের মধ্যস্থতায় রক্ষা পায়। এরপর দীর্ঘ রাজনৈতিক চাপান উত্বোধন ১৯৬৫-র সেপ্টেম্বরে পাক-ভারত যুদ্ধ শুরু হয়। রাশিয়ার মধ্যস্থতায় তাসখন্দ চুক্তির মাধ্যমে ভারত-পাক সমস্যা মেটানোর চেষ্টা করেন দুই দেশের রাষ্ট্র নায়করা। এই চুক্তি সাক্ষরিত হওয়ার কয়েক ঘণ্টা পর ভারতের প্রধানমন্ত্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রীর মৃত্যু ঘটলে ভারতবর্ষের রাজনীতির পালা বদল শুরু হয় ইন্দিরা গান্ধীর মাধ্যমে। তাঁর আমলে আবার কাশ্মীর সমস্যা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। ১৯৭০ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে ভারতবর্ষের প্রতিবেশী রাষ্ট্র পাকিস্তান ও বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংঘর্ষ তীব্র হয়ে ওঠে। পশ্চিম পাকিস্তানে জুলফিকার আলি ভুট্টোর নেতৃত্বাধীন পাকিস্তান পিপলস পার্টি বিজয়ী হলেও পূর্ব পাকিস্তানে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লিগ। মুজিবুর রহমান এরপর স্বায়ত্বশাসন দাবি করলে পশ্চিম পাকিস্তানের সাথে যুদ্ধ শুরু হয়। ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দে ২৫-শে মার্চ স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর ‘বাংলাদেশ’ নামে পরিচিত হয়। কিন্তু এই যুদ্ধে এবং পরবর্তীকালের রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে ছিন্নমূল বহু বাংলাদেশী শরণার্থী পশ্চিমবঙ্গের আশ্রয় লাভের জন্য ভিড় করতে শুরু করে।

কমিউনিস্ট দলগুলি বার বার সংঘটিত করে তোলার চেষ্টা করেছে কৃষক ও শ্রমিকদের আন্দোলন। তেভাগা আন্দোলনের মত তেলেঙ্গানা আন্দোলনেও তার প্রকাশ ঘটে। হায়দ্রাবাদে তেলেঙ্গানা আন্দোলন ঘটলেও পশ্চিমবাংলায় তার প্রভাব পড়েছিল। ১৯৬৭ খ্রীষ্টাব্দে উত্তরবঙ্গের নকশালবাড়িতে এই ভাবে শুরু হয় কৃষক বিদ্রোহ। কিন্তু লক্ষ্য করার মত বিষয় স্বাধীনোত্তর কালে পশ্চিমবঙ্গের নানা রাজনৈতিক সংকট, খাদ্য আন্দোলন, ভূমি আন্দোলন দেখা দিলেও সাধারণ মানুষের অভাব বা দারিদ্র্য ঘোচেনি। কমিউনিস্ট দল মানুষে মনে আশা জাগিয়েও তা সার্বিক ভাবে পূরণ করতে পারেনি। কমিউনিস্ট দল সি. পি. আই, সি. পি. (আই) এম এবং আরো

অনেক উপদলে বিভক্ত হয়ে গেছে। সমস্ত দিক দিয়ে ষাটের দশক পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে অত্যন্ত উত্তাল একটি দশক হিসেবে পরিচিত হয়েছে। কংগ্রেসের পতন, যুক্ত-ফ্রন্টের দায়িত্ব গ্রহণ আবার পদচ্যুতি এইভাবে রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা পশ্চিমবঙ্গকে ঘিরে ছিল। হেমন্ত বসুর খুন হওয়া, নকশালবাদী আন্দোলনের মাধ্যমে খুনোখুনি, সরকারি সম্পত্তি ধ্বংস করা, পুলিশি নির্যাতন, ইন্দিরা গান্ধীর জরুরি অবস্থা ঘোষণা, কংগ্রেস সরকারের পতন, বামপন্থী দলের শাসন ভার গ্রহণ সবদিক থেকে সত্তরের দশকও ঘটনা বহুল ছিল।

বিমল কর তাঁর দীর্ঘ সাহিত্যজীবনে সমকালীন পরিস্থিতিকে সময়ানুগভাবে ধরার চেষ্টা করেছিলেন। জরুরিঅবস্থা চলাকালীন সেই সময়কার যুবসম্প্রদায়ের মানসিক ভাবনা যেমনভাবে প্রকাশিত হয়েছিল, ‘শমীক’ উপন্যাসে তেমনি ‘যদুবংশ’, ‘অসময়’ প্রভৃতি উপন্যাসের মাধ্যমে তিনি সমকালীন জীবনের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ ভাবনাকে রূপায়িত করার চেষ্টা করেছেন। তবুও এই সমস্ত গল্প কিংবা উপন্যাসে তৎকালীন পরিস্থিতির পাশাপাশি ফুটে উঠেছে মানুষের অন্তর্জগতের রহস্যলীলা। নকশাল আমলে লেখা ‘সে’, ‘ওরা’, কিংবা তার পরবর্তীকালে ‘নিগ্রহ’ গল্পে অথবা ‘যদুবংশ’ প্রভৃতি উপন্যাসে মনোবিশ্লেষণ উপেক্ষিত হয়নি। রাজনৈতিক ভাবনা বিমল করকে উৎসাহিত করেনি। সুভাষচন্দ্র বোসের অন্তর্ধান, হিটলারের কর্মকাণ্ড, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বিশ্বের রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং মানুষের চাহিদা অবস্থা ও পরিণতি তাঁর মনে নতুন জীবনদর্শন জাগ্রত করে। র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিস্টদের দলে সংযুক্ত হয়ে বিভিন্ন গ্রামে ঘুরে নিজেদের ভাবনাকে প্রকাশ করার চেষ্টা করেন। যদিও তা খুবই কম সময়ের জন্য, তবুও এই পথেই রাজনীতি সম্পর্কে কিছুটা হলেও মোহভঙ্গ ঘটেছিল। তাই কিছুটা দূর থেকে সমকালীন পরিস্থিতিকে জানার ও বোঝার চেষ্টা করেছেন। কমিউনিস্ট পার্টির মতাদর্শ, জনযুদ্ধের বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া, কংগ্রেস সোসালিস্টদের ভাবনাগুলি তাঁকে মুহূর্ত্ত বিপর্যস্ত করে দিচ্ছিল। ৪৬’র দাঙ্গার সময় অকারণে পুলিশের স্বেচ্ছাচরিতার মাশুল দিতে তাঁকে কয়েকদিনের হাজত ও জেলবাস করতে হয়।

নিজের জীবনের সাফল্যের প্রতি(গুরুজনদের প্রদর্শিত পথে) উদাসীনতা দেখানোয় পারিবারিক দিক থেকে তিনি কিছুটা উপেক্ষিত হয়েছিলেন। এই রকম পরিস্থিতিতে অর্থ উপার্জনের লক্ষ্যে তাঁকে এগিয়ে আসতে হয়। এই পথেই তিনি অর্জন করেন বহু অভিজ্ঞতা, যা তাঁর সাহিত্য জীবনেও ছাপ রেখে গেছে। এ.আর.পি.তে চাকরি করা, আসানসোল ও বেনারসে রেলের চাকরি বিমল করের জীবনের একটি অধ্যায়। আসানসোল এবং বিশেষত বেনারসে চাকরি করতে গিয়ে

তাঁর মন বার বার চেনা জগতের প্রতি আকাঙ্ক্ষিত হয়ে উঠত। কলকাতার জীবন, বন্ধুবান্ধবদের সাহচর্য থেকে দূরে থাকতে এই মুহূর্তে তাঁর কষ্টবোধ হচ্ছিল, তাই কাজে তিনি মন বসাতে পারেন নি।

এক একটি মানুষ আমাদের জগতে প্রচলিত ভাবনার থেকে দূরবর্তী জগতে বাস করেন। বিমল কর সম্পর্কে একথা বলা যায়। পারিবারিক দিক দিয়ে লেখকের পিতা, জ্যাঠামশাই এবং সেজো কাকা এই রেলের চাকরিতে যেখানে সারাজীবন আপাত নিশ্চিন্তভাবে কাটিয়ে দিয়েছিলেন, সেই জীবন বিমল করের কাছে হয়ে উঠেছিল যন্ত্রণাদায়ক। সত্যতা, নিজস্ব রুচিবোধ এবং পরিচিত মানুষ ও বন্ধুদের সাহচর্য, বিশেষ করে সাহিত্যবোধ ও সাহিত্য রচনা তাঁকে পৃথক একটি পথে সঞ্চরণের আহ্বান জানিয়েছিল, তাই সরকারি চাকরির নিশ্চিন্ত জীবনকে পিছনে ফেলে তিনি অনির্দেশ্যের প্রতি শুরু করেছিলেন তাঁর দৃষ্ট পদচারণা। তাঁর অর্থ উপার্জন ও জীবন অতিবাহিত করার দ্বিতীয় অধ্যায় শুরু হয়েছিল কলকাতাকে ঘিরে।

অসম সাহসী, ধৈর্যশীল আর্থিক সাফল্যের প্রতি কিছুটা উদাসীন বিমল কর সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা ও সাংবাদিকতার জীবনে বার বার কর্মক্ষেত্রে থেকে বিচ্যুত হয়েছেন, আবার নতুন উদ্যমে শুরু করেছেন। ‘পরাগ’, ‘পশ্চিমবঙ্গ’, ‘সত্যযুগ’ পত্রিকায় নানা বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে কাজ করার পর ‘দেশ’ পত্রিকায় চাকরি নেন এবং দীর্ঘদিন ধরে এর সাথে সংযুক্ত থাকেন। অবসরের পর কিছুদিন ধরে ‘শিলাদিত্য’ পত্রিকায় সম্পাদক রূপে কাজ করেন। বর্ণময় এই জীবনে সাংসারিক ঘাত প্রতিঘাত তাঁর সংকল্পকে বিপর্যস্ত করতে পারেনি। সাহিত্য রচনার পাশাপাশি বার বার পত্রিকা প্রকাশের প্রতি তাঁর দুর্বলতা লক্ষ্য করা গেছে। ছাত্রাবস্থায় কলকাতায় পা দেবার পর ‘দাদামণি’র সাথে ‘পূর্বমেঘ’ পত্রিকা প্রকাশের মাধ্যমে যার সূচনা হয়, পরবর্তীকালে ‘ছোটগল্প : নতুন রীতি’, ‘গল্প বিচিত্রা’ ‘গল্পপত্র’ প্রভৃতি পত্রিকা প্রকাশের মাধ্যমে বাংলা ছোটগল্পের পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন বিমল কর। এই পত্রিকাগুলির মাধ্যমে যেমন নতুন ধারার গল্প প্রকাশ করার নানান পরীক্ষা নিরীক্ষা করার চেষ্টা করেছেন তেমনি বহু নতুন সাহিত্যিকের জন্ম দেওয়ার চেষ্টা করেছেন; যারা পরবর্তীকালে খ্যাতিমান সাহিত্যিক হয়ে উঠতে পেরেছেন। সাহিত্যের প্রতি এই ভালোবাসা এবং কর্তব্যবোধ বিমল করকে নতুনভাবে সাহিত্যের অঙ্গনে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। এই কর্তব্যবোধ ও দৃষ্টান্তের ফল সুদূর প্রসারী; পরবর্তীকালের বহু সাহিত্যিকের কাছে গ্রহণীয় মর্যাদায় অভিষিক্ত।

উৎস পরিচয়

১. 'বাংলা ছোটগল্প' -- শিশির কুমার দাশ, দে'জ পাবলিশিং, ফেব্রুয়ারী-২০০২, পৃষ্ঠা-১৯
২. 'আলালের ঘরে দুলাল', ভূমিকা-- 'বাংলা সাহিত্যে প্যারীচাঁদ মিত্রের স্থান', বসুমতী
কর্পোরেশন লিমিটেড, দ্বিতীয় সংস্করণ।
৩. 'কালের পুত্তলিকা'-- অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, দে'জ পাবলিশিং, নভেম্বর-১৯৯৯, পৃষ্ঠা-২৩
৪. তদেব, পৃষ্ঠা-৩১
৫. 'শরৎচন্দ্রিকা', শরৎ সাহিত্য সমগ্র, সম্পাদিত : সুকুমার সেন, আনন্দ পাব. প্রাঃ লিঃ, ভাদ্র-১৩৯৩
৬. 'দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথাসাহিত্য', গোপিকানাথ রায়চৌধুরী, দে'জ পাব. ১৯৮৬, পৃষ্ঠা-১৮
৭. 'আধুনিকতা : পর্ব থেকে পর্বান্তর'-- তপোধীর ভট্টাচার্য, পুস্তক বিপণি, জুলাই-১৯৯৫, পৃষ্ঠা-৩১
৮. 'দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথাসাহিত্য', তদেব, পৃষ্ঠা-১৬
৯. 'রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরসাহক', প্রবন্ধ সংকলন -- বুদ্ধদেব বসু, দে'জ পাব. নভেম্বর-২০০১, পৃষ্ঠা-৭৩
১০. তদেব, পৃষ্ঠা-৭৩
১১. তদেব, পৃষ্ঠা-৭৩
১২. 'আবিষ্কার'-- অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত শতবার্ষিকী সংকলন মিত্র ও ঘোষ পাব. মাঘ-১৪১০, পৃষ্ঠা-১৫২
১৩. 'কবিতা, আধুনিকতা ও আধুনিক কবিতা' --বীরেন্দ্র বসু, রত্নাবলী, এপ্রিল-১৯৮৭, পৃষ্ঠা-৫৪
১৪. উড়োখই (১ম পর্ব)--বিমল কর, আনন্দ পাব. সেপ্টেম্বর-২০০১, পৃষ্ঠা-১৫
১৫. তদেব, পৃষ্ঠা-৪৮
১৬. তদেব, পৃষ্ঠা-৯৭
১৭. 'কল্লোল যুগ'-- 'অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত শতবার্ষিকী সংকলন' মিত্র ও ঘোষ পাব. মাঘ-১৪১০, পৃষ্ঠা-২৩৬
১৮. 'আত্মস্মৃতি'(২য় খণ্ড)--সজ্জনীকান্ত দাস, নাথ পাবলিকেশন, ফেব্রুয়ারী-১৯৯৬, পৃষ্ঠা-২০০
১৯. উড়োখই (১ম পর্ব)--বিমল কর, আনন্দ পাব. সেপ্টেম্বর-২০০১, পৃষ্ঠা-১৮৪
২০. 'আট দশক'--ভবতোষ দত্ত, প্রতিষ্ঠান পাব. প্রাঃ লিঃ, নভেম্বর-১৯৯৫, পৃষ্ঠা-১১৮
২১. উড়োখই (১ম পর্ব)--বিমল কর, আনন্দ পাব. সেপ্টেম্বর-২০০১, পৃষ্ঠা-২৫৮
২২. 'দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমকালীন বাংলা কথাসাহিত্য'--ড. মীরা ঘোষ, মডার্ন বুক এজেন্সী, ১৯৮৪, পৃষ্ঠা-২৪৩
২৩. 'আলাপ : সংলাপ : সম্ভাষ'--সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, দে'জ পাব. ১৯৯৮, পৃষ্ঠা-১৭৯
২৪. উড়োখই (১ম পর্ব)--বিমল কর, আনন্দ পাব. সেপ্টেম্বর-২০০১, পৃষ্ঠা-২৭১
২৫. বাংলা কথাসাহিত্যের একাল--বীরেন্দ্র দত্ত, পুস্তক বিপণি, ডিসেম্বর-১৯৯৮, পৃষ্ঠা-৫৪
২৬. উড়োখই (১ম পর্ব)--বিমল কর, আনন্দ পাব. সেপ্টেম্বর-২০০১, পৃষ্ঠা-২৮২
২৭. উড়োখই(২)--বিমল কর, আনন্দ পাব. প্রাঃ লিঃ, জুলাই-১৯৯৭, পৃষ্ঠা-১০৬

বিমল করের ছোটগল্পে জীবনদৃষ্টির বৈচিত্র্য

সাহিত্যই হল সাহিত্যিকের মানসদর্পণ। সাহিত্যিকের জীবনদৃষ্টির নানা বৈচিত্র্যময় দিক তাঁর রচনার মাধ্যমেই প্রকৃতপক্ষে উদ্ভাসিত হয়। বিমল করের নিজস্ব উপলব্ধি ও চোখে দেখা জগৎ তাঁর কাছে ছোটগল্প রচনার প্রেরণা হয়েছে। বাবা, জ্যাঠা, কাকাদের বাংলাদেশের বাইরে রেলের চাকরি ও ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের কাজের ফলে বিমল করের জীবনের শৈশব ও কৈশোর কেটেছে বিভিন্ন স্থানে অস্থায়ী ভাবে। ব্যক্তিজীবনেও কিছুটা বোহেমিয়ানিজমের প্রভাব ও আচরণ তাঁকে কিছুটা সংস্কারমুক্ত করেছে। আবার অন্যদিকে মানসিক চাঞ্চল্য ও উদাসীনতা তাঁর মধ্যে দেখা গেছে। রেলের চাকরি ছেড়ে পত্রিকা অফিসের অনিশ্চিত চাকুরি-জীবন বেছে নিয়ে তিনি বার বার নিজের ইচ্ছাশক্তি ও নিজস্বতাকে প্রশ্ন দিয়েছেন। সাহিত্য সেবার মধ্য দিয়ে নিজের আনন্দময় অনুভূতিকে নিজের জীবনে বিশেষ ভাবে সংযুক্ত করতে চেয়েছেন। তাঁর চোখে দেখা জগতের ছবি যেমন তাঁর সাহিত্যের উপাদান হয়ে এসেছে, তেমনি নিজের কল্পনাপ্রবণ সত্তাকে তিনি বলিষ্ঠভাবে ব্যবহার করেছেন এ কাজে। তাই তাঁর গল্পে বাস্তব ও কল্পনার অপূর্ব সম্মিলন চোখে পড়ে। বাল্যকাল থেকেই নানা অসুখে ভোগার ফলে প্রচুর গল্পের বই পাঠের পাশাপাশি একটা কল্পনার জগৎ তাঁর সামনে উন্মুক্ত হয়ে যেত। তিনি নিজেও বলেছেন--“সারাদিন নানা রকম সম্ভব অসম্ভব কল্পনা করতুম, দিবাসপ্ন দেখতুম; আর এই আকাশকুসুম কল্পনাই আমার কাছে চরম সুখের বিষয় হয়ে উঠত। সত্য মিথ্যার যে দ্বন্দ্ব বাস্তব, যার বোধ আমার থাকা উচিত ছিল। সে বোধ তখন থেকেই লুপ্ত হয়ে যায়। যে কোন কারণেই হোক, এই কল্পনা এই অসত্য আমার মধ্যে একটি নিজস্ব জগৎ সৃষ্টি করেছে। আজও আমি তার মোহে মুগ্ধ।”^১ কিন্তু উল্লেখনীয় বিষয় হল যে কল্পনা তাঁর গল্পে কাহিনী গ্রন্থনে সহায়তা করলেও তাঁর জীবনদৃষ্টির বাস্তবতাবোধ এবং মানুষ ও তার মন সম্পর্কে সীমাহীন অভিজ্ঞতা মানুষের জীবনধারা ও সমকালীন পরিস্থিতির সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে সংযুক্ত হয়েছে।

বিমল কর নিজেও বলেছেন লেখক হবার বাসনা নিয়ে তিনি গল্প লেখার সূত্রপাত ঘটাননি। প্রচুর সাহিত্য পাঠের মাধ্যমে সাহিত্য রচনার ইচ্ছা তার মধ্যে যেমন জেগে উঠেছিল, তেমনি বন্ধু-বান্ধবদের বিভিন্ন পত্রিকার অনুরোধেও প্রাথমিক ভাবে গল্প লেখার চেষ্টা করেন। এর পর থেকে

যখন পাকাপাকি ভাবে গল্প রচনা শুরু করেন তখন গল্পের কাহিনী-গ্রন্থন বা বর্ণনাকৌশল ও রচনাকৌশলের ক্ষেত্রে খুব বেশি পূর্ব প্রস্তুতি থাকতো না। বাস্তব জগতের কোন খণ্ডিত ঘটনা অনেক সময় তাঁর ছোটগল্পের বিষয় হয়ে উঠেছে, যদিও তা প্রথম দিকের গল্প রচনার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, কিন্তু পরবর্তী কালে তিনি কোন তত্ত্বকে প্রথমে ভেবে নিয়ে গল্প লেখা শুরু করেছেন। তাই তাঁর গল্পে তত্ত্ব ও প্রতীকের এত ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। নিজের গল্প রচনা সম্পর্কে তিনি কয়েকটি পর্বে তাঁর গল্পগুলিকে সাজানোর পক্ষপাতী ছিলেন। যেমন প্রস্তাবনা পর্ব--(শুরু থেকে ‘মানব পুত্র’ পর্যন্ত), দ্বিতীয় পর্ব (‘মানব পুত্র’ থেকে ‘সুধাময়’ এর আগে পর্যন্ত), তৃতীয় পর্ব (‘সুধাময়’ থেকে ‘সুখ’ গল্পের আগে পর্যন্ত), চতুর্থ পর্ব (‘সুখ’ থেকে ‘তুচ্ছ’ পর্যন্ত)। তবুও বলা যায় পর্বের বিভাগ করে তাঁর গল্পগুলির যথার্থ বিভাজন ও ভাব বিশ্লেষণ করা যায় না। কেননা লেখকের চিন্তাধারার কিছু মৌলিক দর্শন বার বার জীবনের বিভিন্ন সময়ে ফিরে আসে। তবুও লেখকের ভাবনার সূত্র ধরে বলা যায় সময় পরিবর্তনের পাশাপাশি দেশ কালের পরিস্থিতি মানুষের চিন্তাধারা, সমাজের চলমানতার কিছু কিছু পরিবর্তন ঘটে যায়। লেখক যেহেতু সামাজিক জীব, সমকালীনতার প্রভাব থেকে তিনিও বাদ পড়েন না, তারও ভাবনার পরিবর্তন ঘটে, প্রকাশিত হয় জীবনদৃষ্টির নানা বৈচিত্র্য।

বিমল করের জীবনের নানা অভিজ্ঞতার সাথে একাত্ম হয়ে গেছে তাঁর ছোটগল্পগুলি। তাঁর জীবনদৃষ্টির সাথে তাই এর শিল্প প্রকরণের ঘটেছে সমরূপতা। ছোটগল্প সম্পর্কে সমালোচক বলেছেন, “. . . the story is presented to us from one of many available point of view; and it may be written in the mode of fantasy, realism, or naturalism.” (M. H. Abrams, 'A glossary of Literary Terms', Harcourt Brace College Publishers, Seventh Edition, Page-286) বিমল করের গল্পগুলিও ‘realism’ -এর ভিত্তিতে লেখা, এই কারণে লেখকের নিজস্ব জীবনদৃষ্টির স্বাক্ষর হয়ে রয়েছে তাঁর গল্পগুলি।

রবীন্দ্রোত্তর ছোটগল্পকারদের মধ্যে বিমল কর তাঁর নিজস্ব ভাবনা ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে ছোটগল্পে যে জীবনদৃষ্টির বৈচিত্র্যকে প্রকাশ করেছেন তাই এখন আলোচনার বিষয়। একারণেই সময়ের সূত্র ধরে ছোটগল্পের নানামুখী বিশ্লেষণে তাঁর অন্তর স্বরূপকে খুঁজে নেওয়ার প্রচেষ্টা করবো। তাঁর ছোটগল্পে একাধারে যেমন সমকালীনতার প্রভাব পড়েছে, তেমনি চরিত্রের মনোবিশ্লেষণের প্রচেষ্টাও লেখক অত্যন্ত সুসূক্ষ্মভাবে করেছেন। বিমল করের রচনায় মনস্তাত্ত্বিকতা

একটি বিশেষ গুণ। মনোবিশ্লেষণ যা আধুনিক সাহিত্যের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য, তা অধিকাংশ গল্পের মাধ্যমেই প্রকাশ করেছেন বিমল কর। এরই সূত্র ধরে এসেছে প্রতীকধর্মিতা, অবচেতন মনের খুঁটি-নাটি বর্ণনা, নরনারীর সম্পর্কের বৈচিত্র্য, অচরিতার্থ প্রেমতৃষ্ণা প্রভৃতি। এছাড়াও তাঁর গল্পের কয়েকটি দিক হল দার্শনিকতা, প্রেমচেতনা, প্রকৃতিচেতনা, মৃত্যুভাবনা, মধ্যবিস্তৃত জীবনের বিভিন্ন ছবি, ব্রাত্যচেতনা, ধর্মভাবনার বিশেষ বৈশিষ্ট্য। তাঁর ছোটগল্পের শিল্প-সার্থকতার আরও একটি বিশেষ দিক হল ভাষা ও শব্দের সচেতন ব্যবহার। সমস্ত কিছুর ভিতর দিয়েই লেখকের যথার্থ জীবনদৃষ্টির বৈচিত্র্যকে অনুধাবন করা যায়।

‘সৈনিক’(১৯৪৩) গল্পটি বিমল করের প্রথম দিকের রচিত গল্প। গল্পটির প্রেক্ষাপট দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমকালীন রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতি। উত্তম পুরুষে লেখা গল্পটিতে বক্তা বলেছে, সে টেলারিং এর কাজের জন্য একটা সিঙ্গার মেশিন ইনস্টলমেন্টে শোধ করার চুক্তিতে কিনেছিল কিন্তু এককালীন পরিশোধযোগ্য পঁচাত্তর টাকাও সে সংগ্রহ করতে পারছে না। পূর্ব পরিকল্পিত আনুমানিক রোজগারের থেকে তার বর্তমান আর্থিক উপার্জন অতি নগণ্য—মাসে দশ থেকে বারো টাকা। হঠাৎই উপার্জন কমে যাওয়া এবং ঋণের ভারে পর্যুদস্ত বক্তার ভাগ্যকে দোষারোপ করা ছাড়া আর উপায় নেই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বাঙালি তথা ভারতীয়দের আর্থিক পরিস্থিতির একটি ছবি এই গল্পের মাধ্যমে প্রতিভাত হয়েছে। ইউরোপে যে যুদ্ধের সূত্রপাত হয়েছিল ১৯৯৩ খ্রীঃ, তার প্রভাব খুব তাড়াতাড়ি ছড়িয়ে পড়ল সারা বিশ্বে। ফ্যাসিবাদের প্রচণ্ড তাণ্ডবে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল হিংসার বীজ। জাপানের অন্তর্ভুক্তি এই হিংসাকে আরও বাড়িয়ে দিল। ব্রিটিশ সরকারের পরিস্থিতি তখন খুব কোণঠাসা; বিরোধী পক্ষের মুহূর্মুহ আক্রমণে ও তাদের প্রতিবাদে জেরবার। ভারতবর্ষের অবস্থা এই সময় অত্যন্ত সমস্যা সম্বুল হয়ে পড়ে। একদিকে ইংরেজ সরকারের কাছে পরাধীনতার কারণে নানা অত্যাচার ও অবিচারের যন্ত্রণা, অপর পক্ষে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অনিচ্ছাকৃত প্রত্যক্ষ সংযোগ—এই দ্বিমুখী বিপর্যয়ে দিশেহারা হয়ে পড়ে ভারতের পরিস্থিতি। পশ্চিমবঙ্গ, বিশেষত কলকাতার অবস্থা আরও ঘোরতর। “কলকাতার তখন কী ভয়ঙ্কর অবস্থা। কেমন এক অস্থিরতা, ক্ষিপ্ততা, বেপরোয়া ভাব। হরতাল, টিয়ার গ্যাস, পুলিশের গুলি; সৈন্যদের টহল চলেছে একদিকে, অন্যদিকে মাথার ওপর জাপান বোমার আতঙ্ক।”^২ এরই জেরে ব্ল্যাক আউট, বিশেষত কলকাতা শহর থেকে নিরাপদ আশ্রয়ের উদ্দেশ্যে প্রচুর মানুষের অন্যত্র চলে যাওয়া, ব্যবসা বাণিজ্যের ওপর কুঠারাঘাত, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি

মানুষের জীবনকে খুবই কোণঠাসা করে দিয়েছিল। ‘সৈনিক’ গল্পটিতে বক্তা তৎকালীন পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে সেই ছবি চিত্রিত করেছেন।

গল্পটিতে বক্তা কিরীটি বাবুর দেওয়া কাপড়ে রক্তের দাগ লক্ষ্য করে শিহরিত হয়ে উঠেছে, এবং তার বাস্তববুদ্ধি অনুসারে কিরীটি বাবু সম্পর্কে সে বেশ কয়েকটি আশঙ্কা প্রকাশ করেছে-- তার মনে হয়েছে, কোন নিরপরাধ ব্যক্তিকে খুন করে সেই কাপড় কিরীটি বাবু কেড়ে নিয়েছেন; নতুবা উপহার দেওয়ার জন্য কেউ পথ দিয়ে সেই কাপড়টি নিয়ে যাচ্ছিল, তার উপর আক্রমণ করে বেয়নেটের খোঁচায় তাকে মেরে ফেলে তিনি সেই কাপড় সংগ্রহ করেছেন। কিরীটি বাবু সম্পর্কে এই ভাবনার কারণ, প্রথমত কিরীটি বাবু তাঁর স্ত্রীকে ফেলে নিজে সৈনিক হয়ে নিরুদ্দেশ হয়ে যান, তাঁর মধ্যে মানবিকতার স্থান কম। দ্বিতীয়ত, একজন সৈনিকের চরিত্র সম্পর্কে এবং তার অত্যাচারী কর্মকাণ্ড সম্পর্কে কিছুটা জ্ঞান তৎকালীন মানুষদের হয়েছিল ইংরেজ ও বিদেশী সৈনিকদের ব্যবহার ও কর্মকাণ্ড পর্যালোচনা করে। এর মাধ্যমে লেখক তৎকালীন পরিস্থিতির পাশাপাশি মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিকেও যথার্থ ভাবে মূল্যায়ন করেছেন।

গল্পটির মধ্যে আকর্ষণীয় অংশ এবং টার্নিং পয়েন্ট গল্পটির শেষাংশে। যখন ব্যথাতুর হৃদয়ে কিরীটি বাবু তাঁর নিজের অভিজ্ঞতালব্ধ বর্বরতার দৃশ্য ও মানবিকতার প্রসঙ্গটি ব্যক্ত করলেন। বর্মায় অবস্থান কালে মগ দস্যুদের হাত থেকে একজন মুমূর্ষু বার্মিজ সুন্দরী-তরুণীকে উদ্ধার করার পর তার হাত থেকে অতিকষ্টে রক্ষিত ভালোবাসার উপহার নিজে গ্রহণ করে নিয়েছিলেন কিরীটি বাবু। মৃতপ্রায় তরুণী তার উদ্ধারকর্তার স্ত্রীর জন্য নিজের ভালোবাসার উপহার অর্পণ করেছে। শত যন্ত্রণা, অত্যাচার, নৃশংসতার পরও মানুষের চিরন্তন ভালোবাসার অনুভূতিগুলো যে অক্ষত থাকে তা এই গল্পে খুব মর্মস্পর্শী ভাবে লেখক ফুটিয়ে তুলেছেন। ফ্ল্যাসব্যাকে দেখানো এই ঘটনাটির সাথে যেমন তৎকালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে, তেমনি রয়েছে মানুষের কর্তব্যবোধ, ভালোবাসা ও মানবিকতার মতো সুকুমার মনোবৃত্তির ছবি।

‘অম্বিকানাথের মুক্তি’ (১৯৪৩) গল্পটি বিমল করের প্রথম জীবনের একটি উল্লেখযোগ্য গল্প। লেখক নিজেও বলেছেন--“পরবর্তীকালে আমি যে ধরনের লেখা লিখতে চাই, তার একটা নিউক্লিয়াস ছিল। গল্পটির নাম ছিল ‘অম্বিকানাথের মৃত্যু’ বা মুক্তি--”।^{১০} বিমল করের বেশ কিছু গল্পে মৃত্যুচেতনা সম্পর্কিত যে ভাবনা আছে ‘অম্বিকানাথের মুক্তি’ গল্পে তার সূচনা বলা যেতে পারে। ‘চেতনা প্রবাহ রীতি’র বৈশিষ্ট্য এই গল্পে লক্ষণীয়। অম্বিকানাথ মৃত্যুশয্যায় শুয়ে প্রথম ও

শেষ বারের মতো কঁদেছেন। দার্শনিক মনের এই ব্যক্তি তার নিরাসক্ত দৃষ্টির মাধ্যমে জীবনের বহু দুঃখ, যন্ত্রণা ও সুখের অনুভূতিতে অবিচলিত থেকেছিলেন, অপরের হতাশায় ও মৃত্যুশোকে পাশে দাঁড়িয়ে ঋষিসুলভ যুক্তিপূর্ণ ও দার্শনিক মতবাদে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু নিজের মৃত্যুর আগে হঠাৎই নিজেকে স্থির রাখতে পারলেন না। অনবরত প্রবহমান অশ্রুধারার পিছনে কোন যুক্তি তিনি খুঁজে পেলেন না, বরং জীবনের ফেলে আসা স্মৃতি ও তার সাথে সংযুক্ত ব্যক্তিদের মনের এক অদ্ভুত অবচেতন সত্তার মাধ্যমে ও কিছুটা বিকার গ্রস্ত অবস্থায় চোখের সামনে অনুভব করতে পারলেন এই জগতের প্রকৃত রূপ। এটা তাঁর কাছে ভ্রম হলেও মনোগহনের সুপ্ত অন্তরাল থেকে চিস্তার স্রোত ধরে অতীতের ঘটনাকে তিনি সেই মুহূর্তে ভাবতে শুরু করলেন, এবং তার সাথে চলেছে আত্মবিশ্লেষণ। অতীতের যে সমস্ত সুখ ও দুঃখের ঘটনায় তিনি হর্ষ ও বেদনাকে প্রকাশ করেন নি, মৃত্যুর আগে তারই পুনর্বিবেচনায় আজ তার মধ্যে পরিলক্ষিত হল চিত্তচাঞ্চল্য, যার সাথে সাধারণ মানুষের কোন পার্থক্য নেই।

এখন প্রশ্ন হল অম্বিকানাথের হঠাৎ এই পরিবর্তনের কারণ কি? অম্বিকানাথ দার্শনিক সুলভ বক্তব্যে একদিন বলেছিলেন--“মৃত্যু তো সহজ-স্বাভাবিক। এ তো খিদে পাওয়া, ঘুম পাওয়ার মতোই সহজ, স্বাভাবিক, এর জন্য কীদা?...”^৪ কিন্তু সেই বক্তব্যের সাথে অম্বিকানাথের আজকের নিজস্ব উপলব্ধিজাত বেদনার অনুভূতিগত পার্থক্য আছে। এই সুন্দর প্রকৃতির স্নেহসুখা থেকে, পৃথিবীর অনন্ত মায়ার বন্ধন থেকে অজানা, অচেনা রহস্যঘন জগতে যেতে অম্বিকানাথের মন চায়নি। কিন্তু নিজের ভিতর এই দ্বিচারিতার কারণেই পূর্ব-স্মৃতির সামনে তাঁকে দাঁড়াতে হয়েছে, তাই আজ তিনি বিবেকের কাছে শুদ্ধবাক, হৃদয়ের সুকুমার প্রবৃত্তির কাছে অপরাধী।

অম্বিকানাথ চিরন্তন মানবাত্মার প্রতীক। পূর্ণতার অভিলাষী এই মানুষের ক্ষুদ্র পরিসরের আয়ুতে সীমাবদ্ধ জীবনে পরিতৃপ্তি আসে না। তাই পরবর্তীকালের গল্প ‘সুখাময়’-এ দেখি মৃত্যুকে দেখে ভয় পেতে, কিংবা ‘নদীর জলে ধরা ছোঁয়ার খেলা’ গল্পে নন্দকিশোরকে মৃত্যুর হাত থেকে নিজেকে বাঁচানোর সুযোগ সন্ধান করতে। তবুও ‘অম্বিকানাথের মুক্তি’ গল্পটিতে পরিশেষে অম্বিকানাথের মৃত্যুর মাধ্যমে মৃত্যু অবধারিত এই সূত্রের বৈপরীত্য ঘটানো হয়নি। অম্বিকানাথও অবধারিত মৃত্যুর কাছে তাঁর পূর্ব প্রচারিত দার্শনিক মতানুযায়ী আত্মসমর্পণ করলেন। “নিম্পাণ অম্বিকানাথের সারা মুখময় ছাড়িয়ে গেল এক বর্ণনাভীত হাসি! এ হাসিতে জ্যোতি ছাড়িয়ে আছে... তৃপ্তি ছড়িয়ে আছে। অম্বিকানাথ মুক্তি পেলেন।”^৫

“অম্বিকানাথ মুক্তি পেলেন”— কোথা থেকে? এই সুন্দর, মোহময় প্রকৃতির মায়া থেকে অম্বিকানাথ মুক্তি চান নি। তবুও মুক্তির প্রসঙ্গ কেন। প্রকৃতি কখনোই পুরোনো হয় না, তার প্রতি মানুষের মোহও চিরন্তন; তবুও আধুনিক পৃথিবী—বস্তুর পৃথিবী, এখানে মানবিক গুণাবলির ক্রমশ পতন ঘটে যাচ্ছে। ১৯৪৩ খ্রীঃ লেখা গল্পে তৎকালীন রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক পরিস্থিতির সাথে নিরন্তর যুদ্ধ করে চলা মানুষ তার জীবনযন্ত্রণা থেকে মুক্তি চাইছিল। তার জ্ঞানের জগৎ এবং নিজস্ব অনুভূতির জগতের সাথে অসাম্য হেতু একটা স্থিতাবস্থা বা স্থিতপ্রসঙ্গ মনোভাব আশা করছিল। কিন্তু বোধের ভিতরে ঘটতে থাকা অবিচ্ছিন্ন ক্ষয় তাকে বিবেকের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিচ্ছিল, যেখানে কোন অজুহাত কিংবা স্বত্তিবাচন চলে না, তাই প্রয়োজন হয় আকাঙ্ক্ষিত মুক্তির। যার মাধ্যমে তার উত্তরণ ঘটবে মায়ার জগৎ থেকে প্রকৃত জ্ঞানের জগতে।

বিমল করের সাহিত্যে বার বার এই মৃত্যুর প্রসঙ্গ এসেছে। ব্যক্তিজীবনে পরিচিত কিছু মানুষের মৃত্যু দেখার পর মৃত্যুর রহস্যময়তা তাঁর মনে বিশেষ ভাবনার উদ্রেক করে। খুব ছোটবেলায় নিজের সহদরা বোনের হঠাৎ ঘটে যাওয়া মৃত্যু খুব কাছ থেকে দেখার অভিজ্ঞতা তিনি ভুলতে পারেন নি। অম্বিকানাথের মনের ভাবনার সাথে নিজের দর্শনকে তিনি একাত্ম করে তুলেছেন যেখানে মৃত্যুর স্বাভাবিকত্বের সাথে তার রহস্যময়তার বহুমুখী বৈশিষ্ট্য প্রতিভাত; মানুষের মনের দোলাচলতাও এই কারণে এত বেশি প্রকট রূপে ধরা পড়ে। লেখকের জীবনদৃষ্টিতে তাই লক্ষণীয় ভাবে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে সেই মানুষদের ছবি যারা বিস্মিত হয়ে ভাবে --“মৃত্যু স্বাভাবিক; মৃত্যু দিনের মতো উজ্জ্বল, রাতের মতো অন্ধকার! জীবন রহস্য জন্ম রহস্য —মৃত্যু রহস্য! রহস্যের এক অদ্ভুত রোমাঞ্চ—এক অনন্ত সুর পৃথিবীর সর্বত্র জীবন বীণায় বেজে চলেছে! এর রূপ নেই--রহস্য আছে; রক্ত নেই, রোমাঞ্চ আছে।”^৬ লেখকের এই দর্শন তাঁর পরবর্তীকালে গল্পগুলিতেও নানা বৈচিত্র্যের মাধ্যমে ফিরে এসেছে।

‘অন্তরে’(১৯৪৭) গল্পটির প্রেক্ষাপট আগস্ট, ১৯৪৬ এর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। ১৬ই আগস্ট ক্ষমতায় আসীন মুসলিম লিগ ‘ডিরেক্ট অ্যাকশান ডে’ হিসেবে দিনটিকে বেছে নেয়। কলকাতার প্রায় সর্বত্র, বিশেষ করে বিডন স্ট্রীট, গোয়াবাগান, মানিক তলা, সুকিয়া স্ট্রীট, গড়পা, গৌরীবেড়, এন্টালি, ট্যাংরা প্রভৃতি অঞ্চলে হিংসার আগুন জ্বলে ওঠে। স্টেটসম্যান কাগজে প্রকাশিত খবর অনুযায়ী ‘গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং’ এই নামধারী দাঙ্গায় তিনদিনের মধ্যে প্রায় ২৭০ জন মানুষ মারা যায়, চোট জখমের সংখ্যা প্রায় ১৬০০ এর বেশি, প্রায় ৯০০টি বাড়িতে আগুন লাগানো হয়,

লুটপাটের কোন হিসেব নেই। খুব সামনে থেকে দেখা এই দাঙ্গা লেখক বিমল করের মনে জাগিয়ে দিয়েছিল প্রতিরোধের আগুন। পুলিশের গণ-গ্রেপ্তারে পুলিশি ফাঁদে পড়ে অভাবনীয় ভাবে তিনিও গ্রেপ্তার হন এবং কয়েকদিনের জেলবাসও তাঁর কপালে জোটে। শান্ত, নিরুপদ্রব ও মানুষের শুভাকাঙ্ক্ষী মনের অধিকারী হিসেবে তিনি প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন ‘অন্তরে’ গল্পের মাধ্যমে দুই ভিন্ন ধর্মের পুরুষ ও মহিলার মধ্যে বিশ্বাসবোধ ও শান্তিকামী আদর্শ ফুটিয়ে তুলে।

‘অন্তরে’ গল্পটির শুরু ভয়াবহ দাঙ্গার দ্বিতীয় দিন অর্থাৎ ১৭ই আগস্টের রাতের পটভূমি দিয়ে। কলাবাগানের কোণে একটা স্তূপীকৃত জঞ্জালের স্তূপে আশ্রয় নেওয়া একটি মানুষ যে আঠাশ ঘণ্টা ধরে ক্ষুধা তৃষ্ণায় সারা অথচ খাদ্য-পানীয়ের স্বাদ পায়নি তার জীবনযুদ্ধের ছবি লেখক ঐকেছেন। অস্বকার, সাপ বা ভয়ঙ্কর প্রাণী, জঞ্জাল সর কিছুর থেকে মূল্যবান পাণটিকে কোনরকমে বাঁচানোর লক্ষ্যে ইতস্তত ঘুরে বেড়াতে থাকে নিশ্চিত আশ্রয়ে খোঁজে সেই মানুষটি। একটি নির্ণয়মান বাড়ির মধ্যে ভয় পেয়ে আশ্রয় নিতে গিয়ে ভয়ঙ্করতার মধ্য দিয়ে আলাপ হয় আরও একজন মানুষের সাথে যে নিজেই আশ্রয়প্রার্থী এবং মহিলা। কিন্তু জীবনের এই বিপর্যয়ে পুরুষ ও মহিলার কোন পার্থক্য নেই, হিন্দু ও মুসলিমের মধ্যে কোন বিভেদ নেই। এই বিপর্যয়ে প্রাথমিক ভাবে একে অপরকে শত্রু ভাবলেও, বিশ্বাসভাজন মানুষের নিশ্চিহ্নতায় একে অপরের কাছে হয়ে ওঠে বন্ধু। ছেলেটি আত্মরক্ষার তাগিদে জীবনের কঠিনতম সার সত্যটি বলে—“কে কাকে বাঁচায়! আমিও তোমার কাছে ও কথা বলতে পারি।”^৭ ক্ষুধা তৃষ্ণায় সারা দুজনে অনিশ্চিত আশ্রয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে থাকে ‘কি করা যায়—?’ এবং তার উত্তরে সহমর্মিতা প্রকাশ করে ছেলেটি প্রস্তাব দেয় আত্মহত্যা। লেখক বিমল কর সুন্দর ভাবে তৎকালীন মানুষের পরিস্থিতিকে বিচার ও বিশ্লেষণ করেছেন। যে সময় মানুষের হিংসার উদ্যত খড়্গ তাকে পালিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছিল, ডাস্টবিন, নোংরার স্তূপে মুখ গুঁজে সে আত্মরক্ষার চেষ্টা করছিল। তখন আত্মহত্যার অনেক সুযোগ থাকলেও, আত্মহত্যার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের সময় ছিলনা। জৈবিক কারণেই মানুষ আত্মরক্ষা করতে চায়, বোধ বুদ্ধির পরোয়া না করে নিজেকে বাঁচাতে চায়, কিন্তু যখন ভাবার সময় থাকে, বোধের অতলে তলিয়ে নিজের পরিস্থিতি বিচারের উৎসাহ থাকে, তখনই জীবনের অসারত্ব উপলব্ধির মাধ্যমে আত্মহত্যার প্রস্তাব মনে আসে। মেয়েটি এই অবস্থায়ও বাঁচার আশা ছাড়ে না, মৃত্যুর কথা ভাবে না, বরং ছেলেটির অনুপস্থিতি তার ভয়ের কারণ হতে পারে বলে মনে করে, চিড়ে জল খেয়ে প্রাণ বাঁচানোর তাগিদ অনুভব করে।

খাওয়া দাওয়ার পর নিরাপদ আশ্রয় লাভ করে, উভয়ের বিশ্বাস অর্জন করার মাধ্যমে দুই পুরুষ-নারী যেন আলাপের অবসর লাভ করেছে। বিমল কর এখানেও মানুষের সহজাত প্রবৃত্তির কথাকেই প্রকাশ করেছেন। চরম ভয়ের মুহূর্তে দুটি মানুষ আলাপ পরিচয়হীন অবস্থায় উভয়ের বিশ্বাসভাজন হয়ে উঠেছে, কিন্তু যখন ওরা উভয়ের নাম জেনেছে, তখন ছেলেটিকে প্রতিশ্রুতি দিতে হয়—“ভয় পাবারই কথা। আমি একে মুসলমান, তায় পুরুষ। আপনি হিন্দু মেয়ে মানুষ’।... ‘আমায় বিশ্বাস করুন। খোদার নামে শপথ করছি। আপনার কোন ক্ষতি করবো না। শুধু আপনার কোনো কারুরই সামান্য ক্ষতি করতেও ইচ্ছে নেই।...”^৮ মাধবীর ভয় পাওয়া, কবীরের আস্থা জানানোর ভিতর দিয়ে মনে হয়, এই দাঙ্গা কাদের? কাদের স্বার্থ সিদ্ধির প্রয়োজনে? কাদের নিরাপত্তার আকাঙ্ক্ষায়? হিংসা মদমস্ত নেতৃত্ব এবং কিছু মানুষের জিয়াংসা কত মানুষের নিরাপত্তা কেড়ে নেয়, জীবনে নিয়ে আসে ধ্বংসের আগুন। গভীর আস্থাসঞ্চারী ঘুমের ভিতর থেকে জেগে উঠে কবীর ও মাধবী লক্ষ্য করে আকাশের বৃষ্টিখারাও হিংসার আগুন নেভাতে পারেনি।

“আগুন কিন্তু ভীষণ ভাবে ধরেছে দেখছো?”

‘বৃষ্টি আসছে-নিভবে না?’

‘মাথা খারাপ, ওই আগুন কি বৃষ্টিতে নেভে? হাতে জ্বালানো আগুন, হাত ছাড়া নেভে না।’^৯

এখানেই লেখক ফুটিয়ে তুললেন সেই তত্ত্ব, মানুষের হিংসার আগুন মানুষের দ্বারাই নেভানো সম্ভব। কবীর ও মাধবী দুই পুরুষ-নারী ঘুমের মধ্য দিয়েও সেই নিরুপদ্রব, নিশ্চিন্ত জগতের কামনা করে। যেখানে মানুষের প্রতি বিশ্বাস আছে, মানুষের কাছেই নিরাপত্তা আছে, যা সূর্যের আলোর মত উজ্জ্বল ও চিরন্তন।

‘পিয়ারীলাল বার্জ’ (১৯৪৮) গল্পটি বিমল কর বেনারসে রেলের এ্যাকাউন্টস্ ডিভিসনে চাকরি করার সময় বন্ধু অরুণ ভট্টাচার্যর তাগাদায় লিখেছেন। গল্পটিতে একজন পুরুষের প্রেম ও তারই সুবাদে দায়িত্ব গ্রহণের মহান আন্তরিকতার ছবি রয়েছে। খ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বী পিয়ারীলাল বার্জ তার উদার অনাবিল হৃদয়ের রোমান্টিকতার আবেশে সকলকে মুগ্ধ করেছিল। ফুটবল খেলার মাঠে, নাটকের অভিনয়ে, মাউথঅর্গানের মধুর সুরে সকলের প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেছিল। কাজের একঘেয়েমির মধ্যে তার বিরাম নেওয়ার জন্য মাউথঅর্গান যেমন তার কাছে অত্যন্ত প্রিয় ছিল, তেমনি তার সরল উদার মানসিকতায় ধরা পড়েছিল প্রকৃত প্রেমের দিশা। কয়লার খনি অঞ্চলে কাজ করতে এসে তিন নম্বর পিটের কাছে হারু সিংয়ের ডেরায় থাকা কৌশল্যার সাথে ঘটে তার হৃদয়

বিনিময়। প্রাথমিক ভাবে কৌশল্যা সামান্য এড়িয়ে যেতে চেয়েছিল, পিয়ারীলালের উপহার ফিরিয়ে দিয়েছিল; কিন্তু পিয়ারীলালের উচ্ছল প্রেমের বাধভাঙা উচ্ছ্বাস তাকে নিবৃত্ত করতে পারেনি। পিয়ারীলাল খ্রীষ্টান; কৌশল্যা হিন্দু ঘরের মেয়ে হওয়ার কারণে স্বাভাবিক ধর্মবিশ্বাসে তফাতে থাকতে চাইলেও, একদিন পিয়ারীলালের উচ্ছ্বাসকে স্বাগত জানিয়েছিল। অসুস্থ কৌশল্যার জন্য সপ্তমী পূজোর প্রসাদ নিয়ে এসেছিল পিয়ারীলাল। ধর্মভীরু কৌশল্যা এই আন্তরিকতা দেখে নিজের সর্বস্ব তুলে দিতে চেয়েছিল পিয়ারীলালের হাতে— “তুমার হাতে প্রসাদ খেলে আমার জাত যাবে, সাহেব। জাত লিতে চাও? লাও। তুমি যে ইন্দু, বাজসাহেব। ডাকাত। অহল্যার সব লিবে। লাও।”^{১০}

ধর্মবাবার পরিচয় নিয়ে হারু সিং বিশ্বা কৌশল্যাকে আশ্রয় দিয়েছিল, কিন্তু একদিন তার মুখোশ খুলে যায়। অষ্টমীর রাতে নাটকের অভিনয়ের সময় পঞ্চু সাহানা পিয়ারীলালের কাছে খবর নিয়ে গেলে এক লহমায় পিয়ারীলাল আত্মবিস্মৃত হয়ে ছুটে আসে কৌশল্যার কাছে হাসপাতালে। হারু সিং, তার চালা কেঁষ্ট মাইতি, ডাক্তার, পুলিশ ইন্সপেক্টর সকলের চেয়ে গুরুত্ব দিতে চায় কৌশল্যাকে। কৌশল্যার ইচ্ছানুসারে তার সাথে শুধু দেখা করা নয়, দৃপ্তভঙ্গিতে পুলিশ ইন্সপেক্টরের কাছে নিজের প্রেমের সত্যতাকে স্বীকার করে নেয়। আশ্চর্যের বিষয় এটাই, কৌশল্যার ছেলোটো তার নিজের না হলেও তার দায়িত্ব নিতে সে পরোয়া করে না। কৌশল্যা আজ তার কাছে ভালোবাসার স্বার্থে—‘কুশল্যা’; কুশল্যা থেকে --‘কুশল’ হয়ে উঠেছে। আন্তরিকতার তীব্রতায় অতীত ও বর্তমান, কিংবা ভবিষ্যৎও অতিসামান্য রূপে বিবেচিত হয় তার কাছে। প্রেমাকাজক্ষী একটি যুবক নিজের ভালোবাসার স্বার্থে এবং প্রেমের মূল্যকে চিরন্তন করে তোলার অভিপ্রায়ে অপরের দায়ভার নিজের হাতে তুলে নেয় হাসিমুখে। ডাক্তার যখন শিশুটির জন্য রহস্য জানতে চেয়েছে, “এক মুহূর্ত কী যেন ভাবলো বার্জ — পিয়ারীলাল বার্জ। তারপর বললে, ‘মাই সান। হ্যামকো বিবি।’”^{১১} অপরের ছেলে, অপরের ভোগ্যা বিশ্বা নারী, আজ পিয়ারীলালের কাছে নিজের। ভালোবাসার চরম মুহূর্ত আজ তার কাছে ধরা দিয়েছে, যেখানে কোন ধর্মের বিভেদ, সম্পর্কের বিভেদ তাদের ভালোবাসার সামনে দাঁড়াতে পারে না। তাই অকুতোভয় পিয়ারীলাল বার্জ দুষ্ট লোকের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে সারা রাত তিন নম্বর পিটের কাছে রক্তাক্ত হয়ে পড়ে থাকার পর জ্ঞান ফিরলে হারু সিংয়ের পালানোর খবরে স্বাভাবিকত্ব দেখায়। খুব স্বাভাবিক গলায় মধুবন ছেড়ে যাবার কথা বলে

এবং আশ্চর্য সুন্দর ভাবে বলে--“নাউ উউ আর থ্রি--তিন আদমী। হাম--হামকো কুশল, আউর হামকা ল্যাড্কা!”^{১২}

লেখক বিমল কর পিয়ারীলাল চরিত্রের মধ্যে সহজ সরল, অনাবিল, ভাবুকতার বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করেছেন। এর পাশাপাশি আছে নিজের ভালোবাসার জন্য কর্তব্য সাধনের অভীপ্সা ও অকুতোভয় মানসিকতা। প্রথম দিকের লেখা প্রেমচেতনা নির্ভর এই গল্প থেকে বিমল করের জীবনদৃষ্টির আদর্শের একটি রূপরেখা খুঁজে পাওয়া যায়। নর নারীর ভালোবাসার ক্ষেত্রে দেহবাদী ভাবনার চেয়ে মানসিক মিলনকেই এ গল্পে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। এছাড়া নিজের স্বার্থান্বেষণের থেকেও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে ভালোবাসার মানুষটির হতাশার সময়ে পাশে দাঁড়ানোর মহান ব্রত, নিজের নিরাপত্তার চেয়েও অন্যের জীবনের স্বীকৃতি প্রদানের সমস্যাসম্মূল পরিস্থিতিকে বরণ করে নেওয়ার উদারতা। ধর্মের চেয়েও মানুষ ও তার বিশ্বাসের মাধুর্য অনেক বেশি আশাপ্রদ এই ভাবনাও ‘পিয়ারীলাল বার্জ’ গল্পের মূল সুরকে ধরে রেখেছে বলে মনে করা যেতে পারে।

‘ভয়’ (১৯৪৯) গল্পটির মাধ্যমে বিমল করের ছোটগল্পের একটা বিশেষ দিক শুরু হয়েছে মনে করতে পারি। মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব মূলক গল্প হিসেবে ‘ভয়’ গল্পটিকে চিহ্নিত করা যায়, এর সাথে আছে মানসিক বিকার-গ্রস্ত একটি নারীর চিত্ত চাঞ্চল্য। অশোক এবং শোভার সংসারে আসছে তাদের সন্তান, এজন্য অশোক শোভার স্বাস্থ্য ও গর্ভের সন্তানের জন্য উদ্বিগ্ন। কিন্তু শারীরিক অসুস্থতাকে আমল দিতে চায় না শোভা, অথচ মাঝে মাঝেই অস্বাভাবিক ও অস্বস্তিদায়ক ব্যবহার প্রদর্শন করে অশোকের প্রতি। “মনের বীজগণিত অশোকের জানা ছিল না। শোভার এই মনোগতির রূপটাও প্রকট হয় নি এতদিনা”^{১৩} অশোক কী করে বুঝবে জানালার অপর পাশে নার্সিংহোমের বিজ্ঞাপনটা কেন শোভার চিত্ত বিকারের কারণ। যে বিজ্ঞাপনে পাশাপাশি দুটি ছবি প্রদর্শিত, একটি ছবিতে বিকৃত-দর্শন একটি শিশু ও তার মায়ের ছবি, অপরটি সুন্দরী মায়ের কোলে সুন্দর একটি শিশু। অসুস্থসত্তা শোভার মন অকারণে উৎকণ্ঠায় ভরে যায় গর্ভের শিশুর অজানা রূপের চিন্তায়। পর্দা ঝুলিয়ে সে চোখের দৃষ্টিকে আটকাতে চেষ্টা করে কিন্তু মনের দৃষ্টি এড়াতে পারে না। সেই জন্য বিজ্ঞাপনের বিসদৃশ শিশুর ছবিটি মনে গেঁথে যায়। এর পাশাপাশি অতীতের নানা হতাশাময় স্মৃতি তার মনের মণিকোঠায় নতুন ভাবে উজ্জীবিত হয়ে ওঠে। যেখানে একদিকে রয়েছে হারানোর বেদনা অপরদিকে রয়েছে হাজার প্রতিকূলতা সত্ত্বেও নতুন উদ্যমে বঁচার চেষ্টা। পিতৃহারা অবস্থায় সংসারের উপার্জনে চাকরী নেওয়া, অফিসের সহকর্মী

সুরঞ্জনের সাথে বিবাহপূর্ব প্রেম, শারীরিক মিলন, গর্ভের সন্তানের জন্ম দেওয়ার আগেই গর্ভপাত ঘটানো, সুরঞ্জনের এড়িয়ে যাওয়ার ঘটনা যেমন শোভার বিশ্বাসের জগৎকে ভেঙে দিয়েছে। তেমনি অশোকের সাথে আলাপ এবং তার সূত্র ধরে বিবাহের মাধ্যমে ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যাওয়ার ঘটনা তার জীবন তৃষ্ণাকেই প্রকাশ করেছে। “সে তো জানে, কি তীব্র এই পিপাসা জীবন ভরে বেঁচে থাকার, পৃথিবীতে চোখ মেলার।”^{১৪} এতটা মানসিক শক্তির অধিকারী হয়েও সে জানালার পাশে লাগানো নার্সিং হোমের বিজ্ঞাপন থেকে দূরে থাকার জন্যই অশোককে বাড়ি বদলের প্রস্তাব দেয়। অতীতের ঘটনাজাত অপরাধ বোধ এবং নার্সিংহোমের বিজ্ঞাপনের বিকৃত শিশুর ছবি—শোভার মনে বিকৃত ভাবনার জন্ম দেয়। জীবনে বেঁচে থাকার উদ্দীপনা সত্ত্বেও তার অবচেতন থেকে উদ্দীপ্ত হয় জীবন দর্শন— “আমাদের সারা জীবনটাই যেন খেলা। খেলতে আমরা ভালোবাসি। খেলা করতেই চাই।”^{১৫} —যে খেলা সুরঞ্জন খেলে গেছে, যে খেলা শোভা এতদিন অশোককে নিয়ে করে এসেছে, জীবনের সেই আলোছায়া, প্রকাশ ও গোপনীয়তা, সত্যতা ও মিথ্যা অভিনয়ের খেলাই শোভার হৃদয়ের রসায়নের সাথে যুক্ত হয়ে গেছে। নার্সিংহোমের বিছানায় শুয়ে বিবেকের মুখোমুখি হয়ে, বোধের অতলে চিন্তাসূত্রকে প্রোথিত করে শোভা অনুভব করে “—আমরা সকলেই খেলনা। যারা বাঁচতে চায়, ভালোবাসতে চায়, নীড় গড়তে চায়—তারা।”^{১৬} অপর পক্ষে খেলোয়াড় হল তারাই, যারা ঠকাতে জানে, কাঁদাতে জানে, বঞ্চনা করতে জানে। এই কারণেই শোভা একদিকে যেমন খেলনা, তেমনি অপর দিকে খেলোয়াড়ও। তাই সন্তান জন্মানোর পর অশোকের ইতিবাচক কথাও তার কাছে অবিশ্বাস্য লাগে, ভাবে অশোকও বোধকরি তার সাথে খেলা করতে চায়। বিজ্ঞাপনের বিকৃত শিশুর ছবি দেখে মানসিক ভয় হেতু নিজের সন্তানের রূপকেও তার মনে হয় অস্বাভাবিক। তাই চোখ খুলতে চাইলেও মানসিক বিকার হেতু সে কিছুই দেখতে পায় না।

বিমল কর এই গল্পটিতে মানুষের মনের ভেতর ঘটে থাকা দ্বন্দ্ব ও তার দ্বারা ক্ষত বিক্ষত মানুষের মনের বিকারগ্রস্ত রূপটিকে প্রকাশ করেছেন। মনের অবচেতনে লুকিয়ে থাকা পাপবোধ, অশোককে ঠকানোর জন্য গ্লানিবোধ একাকার হয়ে নিজের সন্তানের অস্বাভাবিকত্ব শোভার কাছে যেন স্বাভাবিক মাত্রা নিয়ে হাজির হয়। মনের উপর যুক্তি বা বিজ্ঞানের কোন প্রভাবই কার্যকরী হয়ে ওঠে না। তাই এতদিন ধরে মনের গভীরে জন্ম নেওয়া ভ্রান্ত ভয় তার উন্মুক্ত দৃষ্টির সামনে তুলে দেয় অদৃশ্য প্রাচীর।

গল্পটিতে বিমল কর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও সেই সময়কালে ঘটে যাওয়া মর্মান্তিক দুর্ভিক্ষের পটভূমি ঝুঁকিয়েছেন। নারী মনস্তত্ত্বের প্রাধান্য সূচক গল্পটিতে শোভার জীবন যুদ্ধের ছবি এই পটভূমিতে প্রতিষ্ঠিত। দুর্ভিক্ষের সময় দ্রব্যমূল্যের আকাশ ছোঁয়া দাম, পথে পথে পুলিশ ও সৈনিকের টহল, সব কিছুর মধ্য দিয়ে বিদেশী অফিসে চাকরি পেয়ে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার ও মনের স্বপ্নকে উজ্জীবিত করে তোলার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায় শোভার মধ্যে। এর পাশাপাশি প্রেমাস্পদের বঞ্চনা, নতুন করে বিবাহ, সন্তান সন্তাননা প্রভৃতি ঘটনার মাধ্যমে শোভার জীবনের সমগ্র রূপ ফুটে উঠেছে। লেখক এই গল্পে আধুনিক মনস্তত্ত্বের মানবিক মূল্যবোধহীনতার ছবিকে ছোঁয়ার চেষ্টা করেছেন। --যে আধুনিকতা স্বপ্ন দেখতে ভালোবাসে, আবার স্বার্থের কারণে অন্যকে ব্যবহার করার সুযোগ খোঁজে এবং তাকে বঞ্চনা করতে দ্বিধা করে না। কখনো সততার মুখোশ পরে অপরের হৃদয়ে সঞ্চারিত করে অকারণ পাপবোধের মারণ-বিষ। শোভার মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বের সাথে সাযুজ্য রেখে লেখক তাঁর এই বক্তব্যকে কাহিনীর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

বিমল করের অধিকাংশ ছোটগল্পেই নারী মনস্তত্ত্বের দিকটি যেমন গুরুত্ব পেয়েছে, তেমনি নারী চরিত্রের কার্যকারিতাও অধিক মাত্রায় প্রদর্শিত হয়েছে। ‘ভয়’ গল্পে শোভা চরিত্রের মাধ্যমে সেই বিশেষত্ব প্রকাশ পেয়েছে। জীবনের প্রতি, বিশেষত বেঁচে থাকার প্রতি অসীম অনুরাগ তাকে সকল পরাজয়, বঞ্চনা, দুর্দশা থেকেও নতুন ভাবে এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা দিয়েছে। জীবনে স্বীকৃতি, প্রেম, সুখী দাম্পত্য জীবনের মাধ্যমে পরিপূর্ণতা লাভের অভিপ্সায় অশোকের প্রস্তাব সে সাগ্রহে গ্রহণ করেছে। “শোভা হাত বাড়িয়েই ছিল--হাত টেনে নিল সে। না নিয়ে কি পারে! বাইশ বছরের জীবন তার এখানেই শেষ হয়নি, আরও আছে--আর বাইশ কি বত্রিশ বছর! শোভা কেমন করে নিঃসঙ্গ থাকবে এই দীর্ঘ দিন!”^{১৭} বিমল কর জীবনের চরম ব্যর্থতায়ও আশাবাদী মানসিকতার পক্ষপাতী ছিলেন। তার জীবনদৃষ্টিতে ফুটে উঠেছে এই সত্য--ব্যর্থতার গ্লানিতে জীবনকে পীড়ন করা কোন মহৎ উদ্দেশ্য নয়, ব্যর্থতাকে শুশ্রূষার মাধ্যমেই জীবনের আশাবাদী মানসিকতায় এগিয়ে যাওয়া যায়। তাই ব্যক্তিজীবনে বার বার চরম হতাশার মধ্যে পতিত হয়েও, জীবনের সাফল্যের পথে একমুখিক স্থলন ও ব্যর্থতার মধ্যেও অবিচল ছিলেন বিমল কর, সেই শুভবাদী মানসিকতার প্রতিফলন এই গল্পে শোভা চরিত্রের মধ্যে উজ্জ্বল হয়েছে।

‘ইদুর’ (১৯৫২) গল্পটির মাধ্যমে বিমল কর ছোটগল্পকার রূপে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা পান। ‘উত্তরসূরী’ পত্রিকায় প্রকাশিত এই গল্পটি তাঁকে রাতারাতি খ্যাতির সরণিতে নিয়ে আসে। তিনি

বলেছেন, “লেখকের ভাগ্য বলে যদি কিছু থাকে, তবে এই গল্পটি আমার সৌভাগ্যের সূচনা করে।”^{১৬} অর্থাৎ এই গল্পের হাত ধরেই তাঁর সৃষ্টির স্রোত উচ্ছলিত হয়ে ওঠে ‘দেশ’ ও অন্যান্য নামজাদা ও অনামা সাহিত্য-পত্রিকাকে কেন্দ্র করে। ‘ভয়’ গল্পের মাধ্যমে একটি নারীর চিত্তবিকারের ছবি থাকলেও যেমন তার মনস্তাত্ত্বিকতার বিষয়টিকে ফুটিয়ে তোলার প্রয়াস ছিল, ‘ইদুর’ গল্পে এসে তা পরিপূর্ণতা লাভ করল। গল্পাংশ থেকেও গুরুত্ব পেয়েছে চরিত্রের মনোবিশ্লেষণ এবং গল্পের বেশ কিছু অংশ পূর্বের কাহিনী বর্ণনার মাধ্যমে লেখক প্রকাশ করেছেন। যতীন এবং মলিনার আসানসোল শিল্প শহরে দারিদ্র্যের কারণে কুড়ি টাকায় ছোট, কিছুটা অপরিচ্ছন্ন ঘর ভাড়া নেওয়া, এবং মলিনার নিপুণ গৃহস্থালির সংসারে সার্বিকভাবে শ্রী ফিরে আসার ছবি এখানে অঙ্কিত হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমকালে কাজের সন্ধানে মানুষের শহরমুখী মনোবৃত্তি, শহরে স্থানান্তর, সুযোগ সন্ধানী মানুষের অর্থ রোজগারের মত্ততার পাশাপাশি দারিদ্র্যের সাথে হাসিমুখে লড়াই করার জীবনদর্শনের ছবি যতীন ও মলিনার সংসারে বর্তমান। “কুড়ি টাকা এক রকম তো সম্ভাই। সে আসানসোল আর আছে নাকি! যুদ্ধের হিড়িকে আসানসোলের জমিগুলো সোনা হয়ে গেল। আর বাড়ি—তা যেমনই হোক, মানুষকে বাঁচতে হলে চালচুলো রাখতেই হবে। খড়ের ছাউনি, খোলার চাল, টিনের চালা- চোখের পলকে এক একটা রাজত্ব বনে গেল। এই শালার ঘর তিন বছর আগে তিন টাকাতেও ভাড়া হত না। আর এখন—”^{১৭} যতীনের এই ভাবনা তৎকালীন পরিপ্রেক্ষিতে একান্ত ভাবেই বাস্তবিক।

এই বাস্তব চিত্র মলিনার আচরণের মাধ্যমেও প্রকাশিত হয়। রেশন ও বাজারের জন্য মাত্র সাত টাকা সে যতীনের হাতে দিতে পারে। পনেরো দিনের রেশন যে পাঁচ টাকায় হয় না তা তারা ভালো করেই জানে, তবু সংসারের অভাব ঘোচানোর পরিস্থিতি সহজলভ্য নয়। সাংসারিক অসচ্ছলতার কারণেও তাদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কথা কাটাকাটি হয়, মনে অভিমানও দেখা দেয়। তাই পাঁচ টাকা ডিয়ারনেস বাড়ার সংবাদে উত্তেজিত হয়ে ওঠে যতীন, বকেয়া প্রায় ষাট টাকা যত তাড়াতাড়ি আনা যায় সেই কারণে তার মনে অস্থিরতা বাড়তে থাকে। নিজের বউয়ের দায়িত্ব একপ্রকার বাসুদেবের হাতে তুলে দিয়ে কলকাতার উদ্দেশ্যে যাত্রার জন্য গোছগাছ করে যতীন। অভাবের বৈকল্যে মলিনার অভিমান বুঝতে পারলেও তার প্রতিকারের পথ খুঁজে পায় না সে, স্ত্রীর অভিমানশূন্য সুন্দর মুখের তারিফ করেও রোমান্টিকতার জায়গা থেকে সরে এসে কঠিন বাস্তবকে তুলে ধরে -- “ছিঃ অবুঝ হয়ো না। গরীব লোক আমরা। যে কটা টাকাই পাই না কেন হাতে না

পাওয়া পর্যন্ত ঘুম হবে না। কত লোকের কত দরকার, এই টাকাটা পেলে কাজে লাগবে সকলেরই।”^{২০}

দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে লড়াই করলেও যতীন সুখী, কারণ মলিনা তার সংসারকে সুপটু গৃহিনীর মতো সুন্দর ভাবে সাজিয়েছে। মলিনা দারিদ্র্যের সাথে সমঝোতা করলেও পারেনি নোংরা দর্শন ইদুরের সাথে, মনের কোনে লালিত হয়েছে ইদুরের প্রতি বিবমিষা। তাদের সংসারে প্রায়শই অতিথি রূপে উপস্থিত হয় যতীনের বন্ধু, সন্ন্যাসী বাসুদেব। বাসুদেবের উপস্থিতি মলিনা সহজভাবে মেনে নিতে না পারলেও যতীনের সরল মানসিকতা বিশ্বাস করে বাসুদেবকে, শুধু তাই নয় কর্মসূত্রে দু দিনের জন্য কলকাতায় যেতে হবে বলে মলিনার সংসারে বাসুদেবকে রেখে যায়। রাত্রে নিজের নিরাপত্তাকে সুদৃঢ় করার জন্য বন্ধ-দরজার কাছে ইদুর কল পেতে রাখে মলিনা, কিন্তু অবচেতন মনে বাসুদেবের আচরণ আবিষ্কার করার ইচ্ছা তার মনে জেগে ওঠে। যতীনের অনুপস্থিতির দুটি দিনে ইদুর কল পাতা ও শেষ রাতে বাসুদেবের প্রতি নজর করার অভ্যস্ত প্রক্রিয়া তৃতীয় দিন যতীনের উপস্থিতিতেও ঘটে যায়। এর ফলেই অলক্ষ্যে মলিনা নিজের ইদুর রূপী কৌতূহলী সত্তার দ্বারা নিজেই ইদুর কলে ধরা পড়ে যায়। বিমল কর অসাধারণভাবে গল্পটিতে মলিনার চরিত্র বিশ্লেষণ করেছেন। নিম্নমধ্যবিত্ত সংসারে দারিদ্র্য ও অপরিচ্ছন্নতার সাথে তার নিরন্তর লড়াই, যতীনের প্রতি স্বাভাবিক স্ত্রীসুলভ নজর এবং প্রগাঢ় আস্থা ও ভালোবাসা, তার মাধ্যমেই বাসুদেবের প্রতি সন্দেহ প্রবণতা তার চরিত্রকে বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির সাথে গড়ে তুলেছে।

মানুষের অবচেতন মনের ক্রিয়া যে মানুষের নিয়ন্ত্রণাধীন নয়, মনের কোন গোপন প্রকোষ্ঠে যে কার প্রতি দুর্বলতা সঞ্চারিত হয়, কেন যে এই অকারণ অসুস্থতা তা সম্পূর্ণই রহস্যজনক এবং মনস্তত্ত্বসম্ভূত। যে অপরিসীম ঘৃণার মাধ্যমে ইদুরকে মারার জন্য মলিনা ইম্পাতের ধারালো কল ব্যবহার করে, সেই কলেই অলক্ষ্যে নিজের পা কেটে যাওয়ার পর অসহনীয় যন্ত্রণার মধ্যেও স্বস্তি পায়-- “যতীন একটুর জন্য বেঁচে গেছে, এই তার ভাগ্যি।”^{২১} কারণ বাইরের নোংরা ইদুরকে মারার সে ব্যবস্থা করতে পারে, কিন্তু “ওর ইদুর তো বাইরে নেই--ঘরেই রয়েছে। কুরকুর করে কাটছে দিনরাত--কত যে ক্ষতি করেছে তার কি লেখা জোখা আছে--না থাকবে কোনও দিন। আরও কত হয়তো করবে।”^{২২} এখানে ‘হয়তো’ শব্দের দ্বারা লেখক বোঝানোর চেষ্টা করেছেন বহু সময়ই প্রবৃত্তির কাছে মানুষ পরাভব মানে। মলিনাও সেই প্রবৃত্তির দ্বারা পরিচালিত। কারণ যে

মলিনা তাদের সংসারে বাসুদেবের উপস্থিতি ভালো চোখে দেখেনি; সরাসরি বাসুদেবকে টিপ্পনি কেটে বলেছে-- “বেবাগী লোকের বউতে কি যায় আসে? কথায় আছে না তাই—থাকলে সর, না থাকলে পর।”^{২৩} সেই মলিনা সন্ধ্যাবেলায় বাসুদেবের কাছে দুপুর বেলার ঘটনার জন্য লজ্জা প্রকাশ করেছে। যতীনের অনুপস্থিতিতে একলা ঘরে শুয়ে প্রতি মুহূর্তে যখন ভয় পেয়েছে এবং উঠানে শুয়ে থাকা বাসুদেবের প্রতি কদর্য মানসিকতা মনে ঠাই দিয়েছে, বৃষ্টির রাতে, বারান্দায় বিনদ্র রাত্রি যাপন করা সিজুদেহ বাসুদেবকে সেই মলিনাই নিজের ঘরে ঠাই দিয়েছে, এবং তার মনে হয়েছে — “বড্ড ছোট ঘরে ও বাস করে, বড্ড ছোট মন নিয়ে। নোংরা মন। ইদুর কি!”^{২৪} শুধু তাই নয়, এই মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বের সে খই পায় নি, তার চোখ ভরে জল এসেছে জ্বর গায়ে বাসুদেব চলে যাবার পর। এটা কি শুধুই মমত্ব? না। মানুষের মনের অতলাস্ত গভীরতায় প্রতি মুহূর্তে চলে নানা দ্বন্দ্ব; উপর থেকে নিম্নরঙ্গ মনে হলেও গভীর প্রদেশে বয়ে চলা হিল্লোল সর্বদা প্রকাশ পায় না। বাসুদেবের সন্ধ্যাস ব্রত মলিনার কাছে পরিষ্কার নয়। তার মনে হয়, বাসুদেব “নিজের ঘর ছেড়েছে বটে কিন্তু জুড়ে বসেছে অপরের ঘর, অপরের ঘরনী।”^{২৫} “অপরের ঘরনী” কে জুড়ে বসার ভাবনা মলিনার একারই, তাই যতই বাসুদেবকে সে দূরে রাখার চেষ্টা করুক না কেন, ততবারই তার চিন্তাস্রোত বাসুদেবের সামিধ্য লাভ করে। বাসুদেবের কথা ভেবে নিজের নিরাপত্তার জন্য দরজার পাশে ইদুর কল পেতে রাখলেও, দরজার খিল শক্ত করে দেওয়ার পরও, দ্বিতীয় রাত প্রায় বিনদ্র কাটার পর মলিনার মনে হয়েছে— “আজও এল না তাহলো।”^{২৬} এ তো চরম প্রতিরোধের মধ্যেও আত্মসমর্পণের স্বৈচ্ছা-বিলাস, যা মলিনার আত্মনিয়ন্ত্রণের বাইরে। ঘরের দরজায় খিল ঐটে, দরজার মুখে ইদুর কল পেতে ইদুর শিকারের আয়োজন করেও সে ব্যর্থ, তৃতীয় রাতে অবচেতনের দ্বারা চালিত হয়ে যতীনের পাশ থেকে উঠে দরজা খুলে বাসুদেবকে আবিষ্কার করার মোহ তার মনের ইদুর সত্তাকে প্রকাশিত করেছে, তাই সে নিজেই আক্রান্ত হয়েছে নিজের পাতা ইম্পাতের ইদুরকলে; এবং এই নিজের মনের ইদুর থেকে কোনদিন রেহাই পাবে কিনা সেটা তার নিজের মনেই প্রশ্নচিহ্ন ঐকে দিয়েছে। একদিকে মধ্যবিশ্ত সুলভ সতীত্বের প্রতি বিশ্বাস ও আচরণ, অপরদিকে পারিবারিক বন্ধুর প্রতি মানবিক আবেদন; একদিকে মনের কুঠা ও শুচিতার প্রতি মান্যতা, অপরদিকে অবচেতনের সাথে সংগ্রাম মলিনা চরিত্রটিকে দ্বন্দ্বমুখর করে তুলেছে। এই দ্বন্দ্বের পিছনে মলিনা একাই দায়ী নয়। বাসুদেবের অযাচিত উপস্থিতি, তার মনের দ্বন্দ্বমূলকতাকে প্রশ্ন দিয়েছে।

‘বরফ সাহেবের মেয়ে’ (১৯৫২) গল্পটি ‘দেশ’ পত্রিকার সম্পাদক সাগরময় ঘোষের অনুরোধে বিমল কর লেখেন, এবং এটি তাঁর দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত প্রথম গল্প। ‘ইদুর’ ও ‘বরফ সাহেবের মেয়ে’ দুটিই তাঁর বিখ্যাত গল্প এবং এর পর থেকেই আলোড়ন সৃষ্টিকারী আরও বহু ছোটগল্প প্রকাশিত হতে থাকে। এ প্রসঙ্গে লেখক নিজেই বলেছেন, “সত্যি কথা বলতে কী, ১৯৫২ সাল থেকেই আমি প্রফেশন্যালি গল্প লেখক হবার চেষ্টা করতে শুরু করলাম। তার আগে শখের লেখা লিখেছি।”^{২৭} একারণেই ‘বরফ সাহেবের মেয়ে’ গল্পটিতেও আমরা লেখকের সাহিত্যকর্মের প্রতি যত্নশীলতার স্বাদ পাই।

‘বরফ সাহেবের মেয়ে’ গল্পের কাহিনী ফ্ল্যাশব্যাকে দেখা, এবং কাহিনী অংশটি বিস্তৃত। গল্পের শুরুতে লেখক বরফ সাহেবের মেয়ের নাম ‘জিনি’, একথা জানিয়ে দিয়েছেন, এবং গোটা গল্পের সর্বত্রই জিনি তার নামের মাধ্যমেই চিহ্নিত। তবু গল্পের নাম রেখেছেন লেখক ‘বরফ সাহেবের মেয়ে’। জন্মসূত্রে সকলেই কারোর না কারোর ছেলে বা মেয়ে হিসেবে পরিচিতি পায়, তবুও মনে করা যায় গল্পের এই নামকরণটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি সঞ্জাত, কিছুটা প্রতীতি মুখ্য। কাহিনীর বক্তা পীচুদার মতে, ‘মরাল রেসপনসিবিলিটির ভূত’ প্রথম যৌবনে তাদের ঘাড়ে চেপেছিল। এর মাধ্যমে তারা তাদের বাস্তবী জিনির উপর নিজেদের প্রভাব খাটাতে চেয়েছিল এবং ব্যর্থ হয়েছিল। তারা ভেবেছিল ছোট জিনি যে বরফ সাহেবের মেয়ে পরিচয়ে তাদের শৈশব ও কৈশোরের দিনগুলিকে সুরে-ছন্দে-অলংকারে পূর্ণ করে তুলেছিল যৌবনে পৌছেও সেই পরিচয়েই সে আবদ্ধ থাকবে, কিন্তু তা হয় নি, সংসার ও সমাজের প্রভাবে এবং হতাশায়, যজ্ঞণায় জিনি নিজে তার নারীত্বের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করেছে। যেখানে ছোট জিনি ও নারী জিনির মধ্যে বিস্তর প্রভেদ। এই প্রভেদটা মেনে নিতে পারেনি বীরা, তিনু বা পীচু’র মত শৈশবের বন্ধুরা। তাদের অধিকারবোধের কাছে ছোট জিনিই পরিচিত বরফ সাহেবের মেয়ে হিসেবে।

তিন বন্ধুর সাথে শৈশবের দিনগুলি খুব ভালোভাবে কেটেছিল জিনির, কিন্তু কৈশোরেই বরফ সাহেবের মৃত্যু চরম অনিশ্চয়তার মুখে ঠেলে দেয় তাকে। “জিনি বিহনে আমাদের কিশোর জীবন অস্বকার।”^{২৮} —ভাবলেও বন্ধুরা অর্থাৎ বীরা, তিনু ও পীচু সাংসারিক ঝামেলার কথা নেহাত কল্পনা করেই জিনিকে নিজেদের ঘরে ঠাই দেওয়ার পক্ষপাতী হয় নি, পেসরানজীর পাউরুটি কারখানায় ইদ্রিস, নুলো’র মত অনেকের লুপ্ত চোখের সামনে কায়িক পরিশ্রমের মাধ্যমে দিন দিন বেড়ে উঠতে থাকে জিনি। এরপর সিনেমা হলে চাকরি করা এবং চাকরি চলে যাবার পর বাজারের

কোণে নানা দরিদ্র ও খারাপ লোকের দৃষ্টিপথের সামনে ছোট ঘরে বাস করতে থাকে সে এবং এই অবস্থার পরিপ্রক্ষিতে একদিন আলু ওয়ালা নন্দকেই বিয়ে করে ফেলে। জিনির এই যন্ত্রণাময় জীবন-কাহিনীর পিছনে তার তিন পুরুষ-বন্ধুর অবদান কোন অংশেই কম নয়।

লেখক বিমল কর মধ্যবিত্ত স্তরের তিন বন্ধুর ভিত্তি মানসিকতা অথচ অধিকার ভোগের লড়াই ও ব্যর্থতায় প্রতিহিংসা পরায়ণতার ক্রোদান্ত পরিণতিকে ব্যক্ত করেছেন; অপর দিকে ব্রাত্য একটি নারীর জীবন যুদ্ধ, আত্মপীড়নের মাধ্যমে নিজের নারীত্ব ও জীবনে জয়ী হওয়ার দুর্বীর মানসিকতার দ্বন্দ্বকে অসাধারণ ভাবে দেখিয়েছেন।

জিনি ও তার বন্ধুদের প্রথম যৌবনে উত্তীর্ণ হওয়ার পর থেকেই কাহিনীর মধ্যে নাটকীয়তা এসেছে। কৈশোরে যে বন্ধুত্বের মধ্যে অনাবিল গতি ছিল, সহানুভূতির মেঘমুক্ত আকাশ ছিল, যৌবনে তার মধ্যে এল ইগো প্রভেদ, সন্দেহের বীজ ও তার সূত্র ধরে ‘মরাল রেসপনসিবিলিটির ভূত’। সে কারণেই শৈশবের বন্ধুরা জিনির চলা ফেরার উপর নজর রাখতে থাকে, ওদেরকে ফাঁকি দিয়ে অপর কোন পুরুষের সাথে তার বন্ধুত্ব হচ্ছে কিনা তা গবেষণার চেষ্টা করে এবং সেই যোগাযোগ ও বন্ধুত্বকে ধ্বংস করার চেষ্টা করে। কিন্তু এর পিছনে ওদের উদ্দেশ্য কি, তাও ওদের কাছে পরিষ্কার নয়। একজন আত্মীয়হীন, নিরাপত্তাহীন যুবতীর কাছে আশ্রয় পরিস্থিতি, এমন কি আশ্বাসের আকাঙ্ক্ষিত বাণী তিন বন্ধু শোনাতে পারেনি বরং বিদ্রুপাত্মক সমালোচনা করেছে, “-ও কিছুতেই সাহেব টাহেব নয়, একেবারে লেড়িকুস্তার জাত। ময়ূর পুচ্ছ গুঁজে বসেছিল। এখন সব পুচ্ছ খসে গেছে।”^{২৯} বীরু, তিনু কিংবা প্যাঁচু বার বার জিনির স্বাধীনতার ব্যাঘাত ঘটালেও তার জীবনে নিরাপত্তা দিতে পারেনি। ওদের মধ্যে স্থির বিশ্বাস বোধও ছিল না, মানসিক দোলাচলতায় নিজেদের আচরণেই প্রশ্টিত খাড়া করেছে -- “জিনি কি আমাদের ? আমি ভাবলুম। শুধুই কি আমি ভেবেছি? না, না—বীরু, তিনু, আমি—আমরা সবাই হয়তো সেদিন ভেবেছি—জিনি কি আমাদের?”^{৩০} এ তো অপরিণামদর্শী, ঈর্ষাকাতর, ভোগবিলাসী অথচ দায় গ্রহণে ভিত্তি মানুষের ক্লীব মানসিকতা। ইদ্রিস কিংবা নুলোর থেকে এরা আলাদা নয়--এরাও নিজেদের প্রয়োজনে ব্যবহার করতে চেয়েছে জিনিকে। তাই “ময়লা, রঙিন শাড়ি পরে, কোমর পর্যন্ত রুম্ম চুলের এক বেণী ঝুলিয়ে জিনি যখন আমাদের কাছে এসে দাঁড়ায়, আমরা তখন তার বাড়ন্ত দেহটাকে আড়চোখে লক্ষ্য করে জিনির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে শঙ্কিত হয়ে উঠি।”^{৩১} —এ কথা বলার পাশাপাশি বক্তা প্যাঁচু ও তার বন্ধুরা সমাজকে কলঙ্ক মুক্ত করতে ও জিনির প্রতি ‘মরাল রেসপনসিবিলিটি’

দেখানোর অজুহাতে জিনির পুরুষ বন্ধু সুখেন্দু এবং পরবর্তী কালে আলুওয়াল নন্দকে আঘাত করে এবং জিনিকে সিনেমা হলের চাকরি থেকে উৎখাত করে নিজেদের অপৌরুষোচিত ঈর্ষাকে নগ্নভাবে প্রকাশ করেছে। আবার তিনবন্ধু একত্রে জিনির সমালোচনা করলেও, কিংবা তার সর্বনাশের যুক্তি করলেও প্রত্যেকেই স্বতন্ত্রভাবে জিনির প্রতি কৌতূহল প্রকাশ করেছে। তাই এককালের বাল্যবন্ধু আলুওয়াল নন্দ ও বাস্কবী জিনির বিয়ে গায়ের জোরে ও জিনির কাছে যুক্তির জোরে ব্যাহত করতে না পেরে উকিলের সামনে সাক্ষীর স্বাক্ষর করার আগে সকলেই পালিয়ে গেছে। আবার কিছু সময় বাদে স্বতন্ত্রভাবে সকলেই লুকিয়ে লুকিয়ে ফিরে এসেছে জিনি ও নন্দ'র প্রতি বর্বরোচিত কৌতূহল দেখিয়ে এবং বন্ধুদের কাছে ধরা পড়ে প্রত্যেকেই নিজের সম্পর্কে সাফাই গাওয়ার চেষ্টা করেছে। তিনবন্ধুর আচরণের মাধ্যমে লেখক তাদের অপদার্থতা ও পরাজিত মানসিকতার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। অত্যন্ত নীচ মানসিকতার তিনটি বন্ধু চরিত্র নিজেদের আখের গুছানোর জন্য অপরের সম্পর্কে যে অশ্লীল ও অন্যায় মূল্যায়ন করেছে সেই বৈশিষ্ট্য ও বিশ্লেষণ তাদের চরিত্রের ওপরই বুঝেরাং ভাবে পতিত হয়েছে।

অন্যদিকে জিনির চরিত্রের মাধ্যমে লেখক অসহায় নিরাপত্তাহীন একটি নারীর নিজের নারীত্ব ও ব্যক্তিত্বের জোরালো আবেদনে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার যন্ত্রণাময় কাহিনীকে রূপ দিয়েছেন। বরফ সাহেবের মৃত্যুর পর মাতৃ-পিতৃহারা অবস্থায় চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে পতিত হয় জিনি। অভিন্নহৃদয় তিন কিশোর বন্ধু কেউই তাকে আশ্রয় দিতে পারে নি। যে বরফ সাহেব ধর্ম ও সংস্কারের উর্ধ্বে উঠে জিনি ও তার তিন বন্ধুর সকল আদার মেনে নিতেন, সরস্বতী পূজোয় চাঁদা দিতেন, ঠাকুর সাজাতেন, বিসর্জনে যেতেন সবার আগে, তার মৃত্যুর পর তার সরস্বতী পূজোয় অঞ্জলি দেওয়া মেয়ে জিনি হঠাৎ বন্ধুদের চোখে স্বীকৃতি হয়ে উঠল। ‘গলায় যীশু ঝোলানো মেয়েকে’ কেউই ঘরে ঠাই দিল না। নিতান্তই শ্রেণীভুক্ত অবস্থায় পরিচারিকার সাথে জিনিকে আশ্রয় নিতে হল পেসরানজীর পাউরুটি কারখানায়। এই জীবনযুদ্ধও হয়তো নানা প্রতিকূলতার পাশাপাশি একই ভাবে এগিয়ে চলত, কিন্তু তার সাথে যুক্ত হল বাল্যবন্ধুদের ঈর্ষাকাতর অন্যায় প্রতিবাদী স্পর্ধা। ইদ্রিসের সাথে তাকে দেখতে পাওয়া, কিংবা সিনেমা হলের অপারেটর সুখেন্দুর সাথে তার মেলামেশা চক্ষুশূল হয়ে দাঁড়ালো বন্ধুদের। জিনিকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করেও তারা থামলো না, অযৌক্তিক সন্দেহের বশে আলুওয়াল নন্দকে ঘায়েল করে তুলে দিয়ে এল জিনির হাতে, এবং যথার্থ ভাবে জিনির প্রতি প্রতিহিংসা চরিতার্থ হয়েছে বলে মনে করে বলে উঠেছে--

“নোবল্ রিভেঞ্জ!”^{৩২} আর জিনি বেমানান নন্দকে স্বামীত্বে বরণ করে যোগ্য প্রতিবাদ জানাতে পেরেছে ‘মরাল রেসপনসিবিলিটির’ ধারক বাহক বন্ধুদের উদ্দেশ্যে। শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়েছে জিনি। হয়তো বা মদ্যপায়ী, আলুবিক্রেতা নন্দ থার্ড ক্লাস লোক, তার স্ট্যাটাস নেই, ভদ্র সমাজে তার জায়গা হয় না, হয়তো বা সে সুদর্শন নয়, তবুও তার মধ্যে শোভন সুন্দর মন আছে, বিয়ে করে দায়িত্ব নেওয়ার মত শক্তি আছে। এটাই তো জিনিকে নিরাপত্তা দেবে, সমাজে প্রতিষ্ঠা দেবে যা তাকে তার বাল্যবন্ধুরা দিতে পারে নি। তাই জিনি নিজের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে বন্ধুদের কাছে হতাশা প্রকাশ করেনি, স্পষ্টভাবে উত্তর দিয়েছে— “ভদ্র সমাজে জায়গা তো আমারও নেই।”^{৩৩}

জিনির মধ্যে উদ্দীপ্ত হয়েছে সেই ব্যক্তিত্ব, যে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে হতাশায় ভেঙে পড়ে না। সমরোপযোগী সিদ্ধান্ত নিয়ে নিজের সাফল্যের পথে এগিয়ে যায়। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে, আধুনিক সমস্যাবহুল নিরাপত্তাহীন সমাজে সে নিজের যোগ্যতার নিরিখে বেঁচে থাকতে চেয়েছে। পুরুষ বন্ধুরা যখন কর্মহীন বেকার অবস্থায় পরচর্চার মাধ্যমে সময় কাটাচ্ছে, তখন সে সিনেমা হলের চাকরির মাধ্যমে নিজের আর্থিক সংস্থান করে নিয়েছে। সুখেন্দুর সাথে বন্ধুত্ব করে হয়তো সে ভবিষ্যতের সংস্থান করার পথ ভেবেছে, কিন্তু আধুনিক সমস্যাসঙ্কুল, সন্দেহপ্রবণ সমাজ তার পরিচ্ছন্ন পথ থেকে তাকে বিযুক্ত করে নিরাশ্রয় করার চেষ্টা করেছে। এখানেও জিনি নিজের ব্যক্তিত্ব ও শোভনতার প্রতি দৃষ্টি রেখে অর্থ উপার্জনের পঙ্কিল পথ ধরে নি, স্বামী-নন্দের উদার মানসিকতার শরিক হয়ে বেঁচে থাকতে চেয়েছে। জিনির জীবনের এই স্বপ্ন প্রাপ্তিই তার জোরালো প্রতিবাদ স্বরূপ বাস্তব হয়ে উঠেছে। জন্মসূত্রে খ্রীষ্টান হওয়ার জন্যই যে শুধু সে ভদ্র সমাজে স্থান পেল না, তা নয়; পিতৃ-মাতৃহীন একটি মেয়েকে সকলেই ব্রাত্য করে সরিয়ে রেখেছে। নন্দকে বিয়ে করা যদি আত্মপীড়নই হয় তবুও তা তার কাছে সান্ত্বনা। এই সমাজে যখন তার স্থান নেই, এই সমাজের ভদ্রতার মুখোশ পরা মানুষের কাছে তাই সে ধরা দেয় নি। জিনির এই লড়াই যেন সমাজের কাছে নিজের স্বীকৃতি লাভের লড়াই।

‘মানবপুত্র’ (১৯৫৩) গল্পটি তের’শ পঞ্চাশের মহা মন্বন্তরের প্রেক্ষাপটে লেখা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির পরিমাণ প্রতিদিনেই আকাশছোঁয়া হচ্ছিল। হাজার হাজার সৈন্যের রসদের প্রয়োজনে খাদ্যশস্য প্রতিদিনই রপ্তানী হচ্ছিল কলকাতার ডক থেকে। এছাড়া ৪২’এর প্রলয়ঙ্কর ঝড় ও সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস, তার আগের বছরের অজন্মার উপরে বিষ-ফোঁড়ার মতো হয়ে গেল। মেদিনীপুর, চব্বিশ পরগণার বিস্তৃত অঞ্চলের মানুষ গৃহহীন, স্বজনহীন হয়ে

শহরাভিমুখী হয়ে উঠল। এর ফলে শহরের স্থান সংকুলান হ'ল না। রাস্তার পাশে ভিক্ষুক ও হাভাতে মানুষে ভরে উঠল। সরকারের গাফিলতিতেই খাদ্যশস্যের এই অপ্রতুলতা দেখা দেওয়ায় অবশেষে কন্ট্রোল ও রেশন খোলার চেষ্টা করেন সরকার। কিন্তু ততদিনে সাধারণ মানুষের পরিস্থিতি দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। বহু মানুষ আত্মহত্যার মাধ্যমে সমাধানের পথ খুঁজেছে, বহু জন ভিক্ষার উপর নির্ভর করে বেঁচে থাকার অক্ষম প্রচেষ্টা চালিয়েছে। ডাস্টবিনে কুকুরের সাথে লড়াই করে যেমন খাদ্য সংগ্রহে প্রবৃত্ত থেকেছে মানুষ, তেমনি নারীর সামনে ছদ্মসহানুভূতির আভাস দিয়ে তার শরীর ভোগ করে ছুঁড়ে দিয়েছে ভদ্র-মানুষের মুখোশ-ধারী ও হঠাৎ অর্থসঞ্চয়ী মানুষেরা। কালোবাজারী, মজুতদার মানুষেরা সুযোগ খুঁজেছে অপরকে বঞ্চিত করে নিজের আখের গুছানোর। ‘মানবপুত্র’ গল্পে এই পরিস্থিতিকে সুন্দর ভাবে দেখিয়েছেন লেখক। একদিকে অর্থপিপাসু মানুষের অমানবিকতা, অপরদিকে অন্ত্যজ শ্রেণীর উপেক্ষিত মানুষের সমব্যথী হৃদয়; একদিকে নারীর হৃদয় ও দেহ লুণ্ঠ করে নেওয়া নির্মম পৈশাচিকতা, অপরদিকে উদার ধর্মের আশ্বাস-বাণীকে স্মরণ করে মহামানব হয়ে ওঠার বাস্তব পরিপ্রেক্ষিত এই গল্পে প্রকাশিত হয়েছে।

গঙ্গামণি দুর্ভিক্ষের প্রবল স্রোতে ভেসে এসেছিল চাঁচুরিয়ায়। এখানেই তার সাথে আলাপ হয় টাউন রেঞ্জুরেন্টের কর্মী, তার পাশের গ্রামের ছেলে কেঁষ্টর। এই কেঁষ্টর একদিন গঙ্গামণির খাদ্যের সংস্থান ও মানবিক আশ্রা দানের মহান ব্রত গ্রহণ করেছিল। চারিদিকে আকালের প্রভাব পড়েছিল চাঁচুরিয়ার ওপর এবং এখানে ছিন্ন-মূল গ্রামের মানুষ পথে পথে ভিড় করেছিল। “দেড়বিশের শহর চাঁচুরিয়া। সেই শহরই ভরে গেল হাভাতেদের ভিড়ে! এ শহরেও তখন চাল বাড়ন্ত। ইট টালির কারখানা স্টোর থেকে চুপিচুপি চড়া দরে চাল এসে আরও চড়া দরে বাজারে বিক্রি করেছে মহাজনের ছুটকো দালালরা। রেল রেশনের গুদাম থেকেও আসছে চোরা পথে; সে চাল তো চাল নয়, যেন সাদা হাড় বাঁধানো পালিশ দেওয়া খুরো গুঁড়ো।”^{৩৪} রসদের যখন এই অপ্রতুলতা তখন সমকালীন সুযোগ সন্ধানী, মজুতদার, কালোবাজারী মানুষদের ভয়ঙ্কর লোভের দৃশ্য কেঁষ্টর চোখের সামনে রহস্যময় ভাবে প্রকাশিত হয়েছে। চারিদিকে যখন আকাল তখন চোখের সামনে কিছু মানুষের বিপরীতধর্মী আচরণ ও জীবনচর্যা সে মেলাতে পারে না। বাইবেলের মথি, লুক, যোহনের সুসমাচার তন্ন তন্ন করে খুঁজে ভাবতে বসে “কোথায় ছিল এই সব খদ্দেররা? চপ কাটলেট আর ডিমের ঝোল যারা তারিয়ে তারিয়ে খায়—সিগারেট ফোঁকে, চায়ের কাপে ঠোট ঠেকিয়ে ফিসফিসিয়ে কথা বলে? চোখের টোপ নিয়ে বসে আছে সর্বক্ষণ?”^{৩৫}

এই রকম এক বাবু গোছের মানুষের ‘চোখের টোপে’ ধরা দিয়েছিল গঙ্গামণি। যে গঙ্গামণি একদিন কেঁস্ট’র চোখের সামনে রাস্তায় পড়ে থাকা আবর্জনায় সামান্য খাবারের সন্ধান পেয়ে চলন্ত লরির সামনে ‘চিলের মতো’ ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। তার মনে নিষ্ঠুরতম জীবনদর্শন প্রতিভাত-- “পেরাণ গেলে পেট থাকতো লাই। পেটের জ্বালা সর্বনেশে জ্বালা; কেউটে সাপের কামড়া। সে জ্বলনের কাছে মরণ ডরায়।”^{৩৬} তাই দুমুঠো ভাতের প্রত্যাশায় অপরিচিত মানুষের সাথে নির্দিষ্টায় চলে যেতে পারে, কিন্তু সেই মানুষটি যখন নিজের ভোগ চরিতার্থের পর গঙ্গামণিকে ফেলে পালায়, তখন গঙ্গামণির হতাশা চরমে ওঠে। নিজের গর্ভে পাপের বীজকে যেমন সে দূর করতে পারে না, তেমনি দূর করতে পারে না জীবনের দুর্দশা ও দীর্ঘশ্বাসকে। বেলসেবুরের শয়তানদের মতো স্বার্থপর মানুষেরা দরিদ্রের ক্ষুধার সুযোগ নিয়ে পৃথিবীতে ও মনে ভরিয়ে ফেলে আবর্জনার জুপ।

যে গঙ্গামণিকে দেখে কেঁস্ট’র মনে হত-- “মেয়েটা যেন গঙ্গাকেরই বাড়ি! কটু, তীব্র, বিস্মাক্ত।”^{৩৭} তার প্রতিই একদিন মানবিক মূল্যবোধের কারণে সে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। শালবনীর মেলা থেকে তাকে নিয়ে এসেছে চাঁচুরিয়ায়। একদিকে সমাজে অর্থলোভী, বিলাস ব্যসনে অভ্যস্ত হৃদয়হীন, বীভৎস, যজ্ঞগাদায়ক শোষণ পোকার মতো মানুষ, অপর দিকে কেঁস্ট’র মত সামান্য রেকর্ডের কর্মীর মানবিকতা; একদিকে লোভী বর্বর মানুষদের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও মানুষকে সাহায্য না করার নির্মমতা, অপরদিকে কেঁস্ট’র সামান্য সাথের মধ্যেও নিজেকে সর্বাংশে উজাড় করে দেওয়ার মানসিকতা গল্পে প্রকাশ করেছেন লেখক। কেঁস্ট তার চোখ দিয়ে দুর্ভিক্ষ পীড়িত মানুষগুলিকে দেখে, যাদের মধ্যে, “দু-দশজন সরে পড়ে, রেলের চাকার তলায় গলা দেয় ক’জন, একদল যায় কলেরায়, একদল বসন্তে, না খেয়ে খেয়ে ঘিয়ে ভাজা কুকুরের মতো কুৎসিত, নগ্ন ধড়টাকে রাস্তায় ফেলে রেখে কেউ কেউ আবার স্বর্গবাসী হয়।”^{৩৮} এদেরই প্রতিনিধি গঙ্গামণিকে গল্পের শেষ পর্যন্ত কেঁস্ট সাহায্য করেছে। গঙ্গামণির মত, মানুষেরা দূর ভবিষ্যৎকে কল্পনা করতে পারে না, চায়ও না। তাদের কাছে প্রতিটি দিনকে অতিক্রম করার যুদ্ধে প্রবৃত্ত হতে দেখা যায়। ভবিষ্যতের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা তাই আজ ঈশ্বরের কাছে তাদের প্রার্থনার বিষয় নয়। “সাধ তো কত লয় মনে, পূজাখানে আজ মানসিক দিয়ে পেরখনা করি--রাত পোয়ালে ভাতে ভাত হয় ঠাকুর গো, আর কিছু লয়।”^{৩৯} কেঁস্ট ঈশ্বরের আশীর্বাদের মতো তার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। নিজের ভাগের খাবার প্রতিরাত্রে তুলে দিয়েছে গঙ্গামণি ও তার সন্তানের মঙ্গল আকাঙ্ক্ষায়। কেঁস্ট’র সাধ্য সীমিত হওয়া সত্ত্বেও মানবিক উদারতায় সে হয়ে উঠেছে এখানে

‘মহামানব’। কেঁচু জানে যখন পৃথিবীতে পাপের মাত্রা বেড়ে ওঠে, তখনই আগুন ও গন্ধকের বৃষ্টি প্লাবন ঘটিয়ে পাপ নিশ্চিহ্ন করে দেবে—জন্ম হবে মনুষ্য পুত্রের। আজকের পৃথিবীর এই অন্ধকারাচ্ছন্ন অবস্থার পর ফিরে আসবে ধর্মরাজ। ক্রুসেডের মালিক মদনবাবু যখন গঙ্গামণির হাত থেকে খাবার ও চপ কেড়ে নেওয়ার পাশবিক যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছেন, তখন মালিক ও ধনী শ্রেণীর প্রতি সে বিতৃষ্ণ হয়েছে। এছাড়া মদনবাবু তার উপরে আক্রমণ করলেও সে মুখ বুজে তা সহ্য করেছে, তাঁর দেওয়া চোর বদনাম তার চিন্তকে আন্দোলিত করতে পারে নি। প্রভু যিশুর প্রতি আস্থা রেখে সে পুলিশের ভয়ে গঙ্গামণিকে ছেড়ে চলে যায়নি। মদনবাবুর মুখ থেকে অহেতুক অন্যায় দোষারোপ শুনেও গঙ্গামণি ও তার সদ্যজাত সন্তানের জীবনের দাবিতে নিজেকে মানবিক কর্তব্যে অবিচল রেখেছে। সভ্যমানুষ ও তার সমাজ যখন ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য ব্যবহার করে দরিদ্র, অসহায় মানুষকে এবং তারপর বদনাম সহকারে বীভৎস ভাবে পরিত্যাগ করে, তখন প্রকৃত মানবাত্মার পূজারী কেঁচু’র মতো মানুষ মনুষ্যকৃত পাপের ভার সর্বসহা মহামানবের মতো গ্রহণ করে অবিচল নিষ্ঠায় এগিয়ে যায় ঈশ্বরের প্রদর্শিত পথে—এই বক্তব্য উপস্থাপিত হয়েছে ‘মানবপুত্র’ গল্পে।

বিমল করের বেশ কিছু গল্পে ঈশ্বর ও ধর্মবিশ্বাসের প্রসঙ্গ এসেছে। তবুও তা ধর্মাত্মতা ও ধর্মের আচার সর্বস্বতায় আচ্ছন্ন নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে খ্রীষ্টধর্মের কথা ও তার উদার মমত্বের বাণী প্রকাশিত হয়েছে তাঁর গল্পে। ‘বরফ সাহেবের মেয়ে’ গল্পেও তার প্রকাশ লক্ষ্য করা গেছিল; ‘মানব পুত্র’ গল্পে তা জোরালো ভাবে প্রতিষ্ঠিত। বিমল কর পারিবারিক ঐতিহ্যের মধ্যে ধর্ম বা অধ্যাত্মবাদের কড়াকড়ি লক্ষ্য করেন নি, বরং দেখেছিলেন উদারতা। কৈশোর থেকেই বিভিন্ন স্থানে থাকার সুবাদে কিছু অন্তর্জ্ঞ শ্রেণীর মানুষকে দেখেছিলেন বাইবেলের শরণাপন্ন হতে। এই সকল কারণে তাঁর জীবনে ও গল্পে ধর্মের মানবিক দিকটিই প্রকাশিত। তাঁর জীবনে একটি ঘটনা এই বিষয়ে তাঁকে আলোক দান করেছিল। একদিন ধানবাদ থেকে জামাডোবায় ট্রেনে ফেরার সময় এক পাদ্রীর সাথে তাঁর আলাপ হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন বিশ্ব রাজনীতির চরম দুর্যোগের সময় সেই পাদ্রী ঈশ্বরের প্রতি আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন— “...তুমি দেখো, আমাদের সামনে এক ভয়ঙ্কর দুঃসময় এসে দাঁড়িয়েছে; এত বড় দুঃসময় আগে আর আসেনি। সব ওলট পালট হয়ে যাবে; আকাশ থেকে আগুন ঝরে পড়বে; ধ্বংসের মধ্যে প্রভু যিশু আবার কি একদিন এসে দেখা দেবেন? কষ্ট দুঃখে অত্যাচার হাহাকারের মধ্যেই না প্রভু একদিন এসেছিলেন।”^{৪০} এই বিশ্বাস

বোধ কেঁটের মাধ্যমে ‘মানব পুত্র’ গল্পে প্রকাশিত হয়েছে। গভীর রাতে বহু দিন আগে মিশনারি থেকে পাওয়া প্রভু যিশুর ছবিটার দিকে তাকিয়ে থাকে কেঁট। “খুপির শিশু ওঠা লালচে আলোতে সে মুখ সে চোখ, সে নগ্ন গাত্র যিশু কেঁটের কাছে আজকাল আরও রহস্যময় মনে হয়।”^{৪১} মদন বাবুর তীব্র লাথির ঘায়ে জ্বলন্ত উনুনের ওপর হাঁড়িতে আছড়ে পড়ে যখন গঙ্গামণি ককিয়ে উঠেছে এবং তার পর দুর্বল সন্তান প্রসব করেছে, তখন ভয় পেয়ে সমস্ত দায় কেঁটের ওপর চাপানোর অভিপ্রায়ে পুলিশ ডাকতে পালিয়েছে মদন বাবু। কেঁট কিন্তু স্থির বিশ্বাস ও আস্থা নিয়ে দাঁড়িয়ে থেকেছে। চেতনা প্রবাহের মাধ্যমে সে ফিরে গেছে অতীতে, যেখানে চার্চের ভিতর পাদ্রী বুড়ো বলছে, “মাটি ও আকাশ লোপ পেতে পারে কিন্তু আমার কথা অন্যথা হবে না। সে সময় সেই দুর্ঘটনার পর সূর্য অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়বে, চাঁদ আর আলো দেবে না, এবং সমস্ত নক্ষত্র আকাশ থেকে খসে পড়বে। আকাশের জ্যোতিষ্ক মণ্ডল কাঁপতে থাকবে। তার পর আকাশে মানুষ পুত্রের নিদর্শন দেখতে পাওয়া যাবে।”^{৪২} এই বক্তব্য যেমন বাইবেলের, তেমনি গীতার, এই সত্য সমস্ত ধর্মের। আগাগোড়া নাটকীয়তায় সমৃদ্ধ এই গল্পটিতে যেমন কাহিনী দৃঢ় সংবদ্ধ, তেমনি চরিত্র পরিকল্পনায়ও লেখক কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। কেঁটই মুখ্য চরিত্র যার মাধ্যমে ফ্লাশব্যাকে কিছু ঘটনা দেখানো হয়েছে, এবং লেখকের বক্তব্যের অনুসারী চরিত্র রূপে কেঁট অসাধারণ। সংলাপ রচনার ক্ষেত্রে কথ্যভাষাকে গুরুত্ব দিয়েছেন লেখক। শহুরে চরিত্রগুলির ভাষা কিছুটা পরিশীলিত হলেও গঙ্গামণির ভাষায় আঞ্চলিকতা রয়েছে। কেঁটের ভাষা মদন বাবুর সাথে শহুরে রীতি অনুযায়ী হলেও, গঙ্গামণির সাথে বক্তব্যে আঞ্চলিকতার প্রভাব রয়েছে। সংলাপের মাধ্যমেও লেখক তীব্র ভাবে সমকালীন পরিস্থিতির আমেজটাকে দিতে পেরেছেন। যখন গঙ্গামণি বলে, “আগ সৈকে কাজ নাই। তু দেখ ক্যানে--আমি হদ হদ করে খেয়ে লিবা। সারা রাত ঠায় চোখ ফাবড়ে বসে আছি তো বসেই আছি। ই-বাবা এত কি যজ্ঞি রে কিষ্টো। মানুষগুলো খায় তো রাত ভোর করেই খায় সব।”^{৪৩}

এ.আর.পি. তে কাজ করার সময় বিমল কর এই দুর্ভিক্ষের ছবি খুব কাছ থেকে লক্ষ্য করেছিলেন। ‘মানব পুত্র’ গল্পে তারই প্রকাশ। তৎকালীন দুর্য়োগময় পরিস্থিতি, অসহায় মানুষের হাহাকার, ক্ষমতালোভী, বর্বর, অর্থপিপাসু মানুষদের জিঘাংসা, কিছু মানুষের সহমর্মিতা, ধর্মবিশ্বাস, মানবিক উত্তরণের শপথ সব কিছুই তাঁর জীবনদৃষ্টির নিরিখে ‘মানবপুত্র’ গল্পে পতিত হয়েছে।

‘কাচঘর’ (১৯৫৩) গল্পটি নর-নারীর প্রেম সম্পর্ক নিয়ে গড়ে উঠেছে। প্রেমের ক্ষেত্রে দেহ ও মন কোনটার বেশী প্রয়োজনীয়তা, এই তাত্ত্বিক প্রশ্নের উত্তর না খুঁজে মানুষের জীবন ও মনের সম্ভান, বিশেষত মানসিক আকাঙ্ক্ষার ময়না তদন্ত করে ভাবনার নির্যাসটুকু লেখক ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। অনেকেই বলে থাকেন আধুনিক পৃথিবী ব্যক্তির পৃথিবী। তাই ব্যক্তিমানসের মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বই আধুনিক সাহিত্যের বিশেষ চর্চিত বিষয় হয়ে উঠেছে। ‘কাচঘরে’র প্রতীকের মাধ্যমে লেখক হিরণ সেন ও শোভনা মিত্রের প্রেম সম্পর্ক ব্যক্তি মানসের চাহিদার নিরিখে বিচার বিশ্লেষণ করেছেন।

কাহিনী অংশের দুটি স্তর, একটি শোভনার অতীতচরিত্রা গল্পের কালের সাথে ঘটনার ঐক্যে সংযুক্ত, অপরটি হিরণ সেনের সাথে প্রেমসম্পর্ক। নারীদেহের বাহ্যিক অপূর্ণাঙ্গতা তার দেহ সৌষ্ঠবের ক্ষেত্রে ত্রুটি-জনক হওয়াতে পুরুষের আবেদন অচরিতার্থ হয়, এবং শ্রীমুখের অধিকারী হওয়ার পরও, হৃদয়ের প্রেমতপ্ত মানসিকতার চরম মুহূর্তে পুরুষের দ্বারা নারীর উপেক্ষিত হওয়ার ঘটনা ‘কাচঘর’ গল্পে শোভনার জীবনপ্রবাহে মধ্য দিয়ে লক্ষিত হয়েছে। জুনিয়ার মিডওয়াইফারি পাশ করা, সুন্দরী, রুচিশীলা, মমতাময়ী নারী শোভনা আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব সকলকে পরিত্যাগ করে স্বৈচ্ছা নির্বাসন গ্রহণ করেছে। যৌবনের প্রথম লগ্ন থেকেই ওর শরীরে অপূষক, নিষ্ফলা গাছের মত অপূর্ণাঙ্গতা লক্ষ্য করে পরিবারের সকলে দুঃখ পেয়েছিল, বন্ধু-বান্ধবেরা সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করলেও তা শোভনার কাছে বিষের জ্বালার মত যন্ত্রণাময় হয়ে উঠেছিল। তার মনে হয়েছিল, “কি নিষ্ঠুর সেই সান্ত্বনা। বিশ্ব সংসারের ওপরই বিরূপ হয়েছে সে। মাঝরাতে বিছানায় উঠে বসে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছে শোভনা। কুটি কুটি করেছে ভগবানকে। নির্মম আক্রোশে দেওয়াল থেকে মার গুরুদেবের টাঙানো পটখানা টেনে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে মেঝেতে। না না, মানে না ঈশ্বর, গুরু, তুক-তাক, ধর্ম কিছুই না!”^{৪৪} পরে অবশ্য সে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার চেষ্টা করেছে এবং অঙ্গের ত্রুটি কৃত্রিম ভাবে দূর করার চেষ্টা করেছে, যা বাইরের লোকের কাছে লজ্জার হাত থেকে তাকে বাঁচিয়েছে।

কিন্তু যৌবনের ধর্ম অনুযায়ী তার মনেও যেমন কোন না কোন পুরুষের প্রতি বিশেষ ভাবে ভালোবাসা সঞ্চারিত হয়, তেমনি তার সৌন্দর্যও অপরের কাছে হয়ে ওঠে অভিপ্রেত। তবুও জীবনের বিষময় অভিজ্ঞতা ঘটে গেছিল অর্থোপেডিক্স এর হাউস সার্জেন একজন কমবয়সী ডাক্তারের কাছ থেকে। তার বীভৎস উপেক্ষার মাধ্যমে পুরুষদের আকাঙ্ক্ষা ও মানসিকতা সম্পর্কে

স্বচ্ছ অভিজ্ঞতা শোভনা লাভ করেছিল। তাই চার বছরের চাকরি জীবনে একাধিক বার চাকরি ছেড়ে নতুন জায়গায় তাকে চাকরি গ্রহণ করতে হয়েছে। সমস্ত স্থানেই পুরুষের কাছে যখনই সে প্রার্থিত হয়ে উঠেছে, তখনই সে সেই স্থান পরিত্যাগ করেছে পূর্ব অভিজ্ঞতার নিরিখে। “ভয় পেয়েছে শোভনা। ও জানে, ওদের মোহ কোথায়। আর জানে তার শেষ কোথায়। ধরা দিতে গেলে ধরা পড়তে হবে। শোভনা ধরা পড়তে চায় না।”^{৪৫} তাই হিরণ সেনের চোখে অনুরাগতপ্ত অভিব্যক্তি লক্ষ্য করে সে এই স্থানও ত্যাগের সিদ্ধান্ত নেয়। তবুও বোধ-বুদ্ধি-বিচার-বিশ্লেষণ ও মানসিক আকাঙ্ক্ষা একই সূত্রে চলে না, সুখের আকাঙ্ক্ষা মানুষকে বারবারই পদস্থলনের পরিস্থিতিতে পতিত করে। সেই ভুল আবার ঘটেছে হিরণ সেনের সামিথ্যে। শোভনার বার বার মনে হয়েছে, “হিরণ তো তাকে ভালোবাসে। সত্যি ভালোবাসে। হয়ত হিরণ সব সহ্য করে নেবে।”^{৪৬} কারণ “এ জগতে সব তো এক নয়! নিজের দিকে তাকিয়ে শোভনা তাও বুঝতে পারে। সকলেই সেই অর্থোপেডিক্স এর হাউস সার্জেন নয়! সকলেই নীল খামে প্রেমপত্র লিখে প্রাণ নিবেদন করে না। এ জগতেও মানুষ আছে! আছে মমতা, করুণা, স্নেহ, আর সেই ফুলের মত ভালোবাসা যাতে কাঁটা নেই, যা আগুন চায় না, রূপ ও নয়। শুধু বুক ভরা ভালোবাসা, সেবা, নিবিড় ছায়ার আশ্রয়, শান্তি—এতেই যে খুশি, এতেই যার সব পাওয়া।”^{৪৭} কিন্তু শুধু আগুন, রূপভিন্ন বুক ভরা ভালোবাসা বস্তুর পৃথিবীতে আজ কে তাকে দেবে। হিরণ সেনও যৌবনে উদ্দীপ্ত ভোগবাদী পুরুষ দলের শরিক, তাই নিবিড় ঘনিষ্ঠ মুহূর্তে শোভনার শারীরিক অপূর্ণতা তাকে দিশেহারা করে তুলেছে। চিৎকার করে প্রবল ঝড়ের মধ্যে সে ছুটে বেরিয়ে গেছে এবং হাজির হয়েছে কাচঘরের সামনে। আর যথার্থভাবে সম্বিত ফিরে পেয়ে শোভনা হিরণের ফেলে যাওয়া টচটা নিরাবেগ, নিরাসক্ত মনে ফেরত দিয়েছে। শোভনার এই বক্তৃকাটিন্য তার পূর্ব অভিজ্ঞতার ফসল। জীবনে দ্বিতীয়বার ভুল করার ফলে হয়তো সমস্ত পুরুষ সম্পর্কে তার দর্শন আরও স্বচ্ছ হল, তাই কাচঘরের সাথে সে নিজের অস্তিত্বকে শেষকালে মিলিয়ে দিল কাচঘরে আশ্রয় নিয়ে।

কাচঘর রেল কোম্পানীর হাসপাতালের অপারেশন থিয়েটার হলেও তা পরিত্যক্ত ও অব্যবহার্য হয়ে পড়েছিল, তবু তার সৌন্দর্য দিয়ে সে মানুষকে কাছে টানতে পারত। যেমন শোভনা তার শ্রীমুখের দাবিতে পুরুষের কাছে প্রাথমিক ভাবে প্রার্থিত হয়েও অঙ্গের অপূর্ণতার জন্য অব্যবহার্য হয়ে পড়েছে। তাই তার মানসিক ঝড়ের সাথে লেখক বাইরের ঝড় কেও মিলিয়ে দিয়েছেন।

বাইরের ঝড়ে যেমন কাচঘরের কাচ ভেঙে তার সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে গেছে, তেমনি শোভনার মনের ঝড় তার ও হিরণের আশ্রিত দূর করে দিয়েছে। হিরণের চলে যাওয়ার মধ্যে সেই শূন্যতার অনুভব দ্যোতিত হয়েছে যে শূন্যতা কাচঘরের সমধর্মী। “পড়ে থাক পিছনে কুহক-আচ্ছন্ন রহস্যময় ওই কাচঘর, পড়ে থাক ওর বাইরের সৌন্দর্য, থাক ওই শূন্যতা। অত শূন্যতা, অত হাহাকার ও সহ্য করতে পারে না। পারবে না।”^{৪৮} রবীন্দ্রোত্তর সাহিত্যিক বিমল কর তাঁর গল্পের মধ্যে শোভনতার মাত্রা অতিক্রম না করেও প্রেমের ক্ষেত্রে দেহের প্রয়োজনীয়তা, বিশেষত দৈহিক সুখের বিষয়টিকে উপেক্ষা করেন নি। তবুও তার পাশাপাশি দৈহিক প্রেমের অন্তঃসার শূন্যতা, স্বল্পজীবিতার কথা প্রকাশ করেছেন। কাচঘর সেই ভাবনার সমধর্মী।

‘জোনাকি’(১৯৫৩) গল্পটিতে গড়ে উঠেছে নর-নারীর সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে একটি যুবকের আত্মপীড়নের কাহিনী। উত্তম পুরুষে লেখা গল্পটিতে বক্তার বন্ধু স্যামুএল পল মফস্বলের মিশনারি কলেজে পড়াকালীন কয়েকটি ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে যে কার্যকারিতা দেখিয়েছিল সেটা যেমন আলোচ্য বিষয়, তেমনি তার মধ্য দিয়ে নারীজাতির প্রতি তার অশ্রদ্ধা ও সেই মতানুযায়ী ঘটনা প্রবাহকে অনিয়ন্ত্রিত গতিতে প্রবাহিত করে দেওয়ার মত তার দুর্নিবার মানসিক শক্তি এই গল্পের মুখ্য আকর্ষণ। স্যামুএল পল এর নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা ছিল। পড়াশোনায় মনোযোগী না হলেও, ফুটবল, হকি খেলায় যমুন সে অপ্রতিরোধ্য, বাঁশির সুরের মাদকতায় যেমন সকলকে বশীভূত করতে পারে, তেমনি বন্ধুত্বের দাবিতে এবং পুরুষদের সম্মান রক্ষার দাবিতে সে স্পষ্টবাক ও দুর্নিবার। সুশাস্ত সরকারের মত নামকরা বখাটে ছেলের পক্ষ অবলম্বন করে অরুণা হালদারের মত অভিজাত যুবতী ছাত্রীর বিরুদ্ধে আন্দোলনে সে ‘হ্যাঙ্গার স্ট্রাইক’ পর্যন্ত করেছে। বাধ্য করেছে অরুণা হালদারকে ক্ষমা চাইতে। কিন্তু তার এই নারীবিরোধী মানসিকতা তার কাছে সখের বিরোধিতা নয়, তার পেছনে রয়েছে ব্যক্তিজীবনের চরম যন্ত্রণাময় ইতিহাস। তার মায়ের বত্রিশ বছর বয়সে অবৈধ প্রেমের জেরে স্বামী, সন্তানকে পরিত্যাগ করে চলে যাওয়া যেমন তার কাছে মর্মান্তিক, তেমনি তার এক দূর সম্পর্কের বোনের হৃদয়হীন ব্যবহার তাকে একসময় বিচলিত করে। যে বোন স্যামুয়েলের প্রেমে পড়ে ব্যর্থ হয়ে একটি হিন্দু ব্যবসায়ীর ছেলের সাথে বিয়ে করে সাংঘাতিক হিন্দু বনে যায় এবং তার সাথে দেখা করতে আসা স্যামুয়েলকে সামান্য জলযোগ করিয়ে বলে জায়গাটা ধুয়ে দিতে। এই দুটি ঘটনা স্যামুয়েলের মনে নারী জাতির প্রতি প্রবল বিদ্বেষ সঞ্চারিত করেছে। দুটি ঘটনার পরই স্যামুয়েলের মনে হয়েছিল আত্মহত্যাই একমাত্র পথ

তার কাছে, কিন্তু বাঁশিই তার কাছে সান্ত্বনা, বাঁশির মাধ্যমে তার মনে হয়েছে আত্মহত্যার মধ্যে পুরস্কার নেই, সে কথা সে স্বীকারও করেছে গল্পের বক্তার কাছে— “আমার মরতে ইচ্ছে করে। তবে অসুখ-বিসুখে ভুগে বা রাগ-মাগ করে গলায় দড়ি দিয়ে নয়--খুব সুন্দর ভাবে, অনেক দুঃখ-কষ্ট বুকে নিয়ে ঠিক একজন পুরুষ মানুষের মতন।”^{৪৯}

এই পৌরুষই তার কাছে একমাত্র আরাধ্য বিষয়। অরুণা হালদারের ক্ষমা চাওয়ার দাবিতে স্যামুয়েল হ্যান্সার স্ট্রাইক করার সময় অরুণা হালদার নিজে তার কাছে এসে প্রকাশ্যে ক্ষমা চাওয়ার অঙ্গীকার করেছে। কিন্তু প্রকাশ্য সভায় স্যামুয়েল নিজে ছাত্রদের মুখপাত্র হয়ে অরুণা হালদারের এই দৃষ্টিভঙ্গির প্রশংসা করেছে এবং প্রকাশ্যে ক্ষমা চাওয়া ব্যাপারে নিরস্ত করেছে, কারণ ইতিমধ্যে তার নৈতিক জয় হয়েছে। এই হঠাৎ পরিবর্তিত সিদ্ধান্তের ব্যাখ্যায় সে বলেছে-- “রিভেনজ্ মাস্ট বি নোবল! পুরুষ মানুষ স্টেন লাইক হবি, বাট নেভার এ স্যাটান!”^{৫০} সে কারণেই আত্মপ্রবঞ্চনার পথ ধরে সে আত্মপীড়ন করেছে, তবুও অপরের পথে ব্যাঘাত ঘটায় নি। লেখাপড়ার প্রতি উপেক্ষা, নিজের জীবনের প্রতি নিরাসক্ত ভাবনা তাকে আত্মপ্রবঞ্চনার পথে নিয়ে গেছে, অরুণা হালদারের সাথে তার প্রেমের গুজব তার মনে কোন ভাবান্তরের সৃষ্টি করেনি; কারণ একবুক দীর্ঘশ্বাস ও অসীম যন্ত্রণা নিয়ে সে যে নিভূতে অপরের মনে দাগ কেটে যেতে চায়, এই ব্রতই তার একমাত্র উদ্দেশ্য। সেকারণেই প্রতি সন্ধ্যায় চন্দন ঝিলের ধারে হোস্টেল সুপারিন্টেন্ডেন্ট অমিয় দাস ও অরুণা হালদারের প্রেমের মধ্যে উদ্দীপন বিভাবের সঞ্চার করে বাঁশির মৃদু সুরের মাদকতায়। যদিও এর পেছনে স্যামুয়েলের নারী বিদ্বেষজাত যন্ত্রণাময় অভিব্যক্তি ধরা পড়ে, তবুও পৃথিবীর স্বাভাবিক ধর্ম, মানুষের আকাঙ্ক্ষাময় প্রেমের প্রতি অদ্ভুত নিরাসক্ত দৃষ্টিভঙ্গি তাকে রহস্যময় করে তুলেছে। স্যামুয়েল শয়তান হতে চায়নি, অপরের ভোগসুখের ভেতরে যে আত্ম-নিগ্রহের বীজ আছে তাও চিনিয়ে দেয় নি, শুধু জোনাকির মতো নিজেকে ব্যবহার করে নিঃশেষিত হতে চেয়েছে। তার বক্তব্যে ঝরে পড়েছে এক প্রকার করুণ আর্তি, “তার বেশি কিছু আমার করার ক্ষমতা নেই, পরিমল! বিয়াল্লিশ বছরের অমিয় দাস কে অরুণার ভালো নাও লাগতে পারে! কিন্তু চন্দন ঝিলের মধ্যে অমন জোনাকি জ্বলা অন্ধকারে বাঁশির সুর শুনতে শুনতে বিয়াল্লিশ বছর কি বিয়াল্লিশই থাকে! কখনই নয়। আমার মা-ও বত্রিশ বছরের অমিয় দাসকে দেখে ভুলেছিল। অরুণাও ভুলুক--ভুলুক।”^{৫১} অদ্ভুত এক যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে শেষ হয়েছে গল্পটি, যে যন্ত্রণার মধ্যে লুকিয়ে আছে অপরিণামদর্শী একটি মায়ের দ্বারা সন্তানের মনে শেল তীব্র যন্ত্রণা দানের বিভীষিকা,

একটি বোনের নিজস্ব ভোগ সুখের অচরিতার্থতার ভায়ের মনে দুঃখ দেওয়ার অমানবিক প্রয়াস, একটি বাস্তবীর আত্মসুখী মনোবৃত্তির পেছনে লুকিয়ে থাকা আত্মপীড়ন, এর ভবিতব্য অনুভবকারী একটি যুবকের ক্ষত বিক্ষত হৃদয়। এত কিছুর পরও আমরা স্যামুয়েল চরিত্রের মধ্যে নারীবিশেষী মানসিকতার থেকেও নারীর প্রতি ক্ষমাসুন্দর মনোবৃত্তির প্রতিফলন দেখতে পাই। তার মায়ের পালিয়ে যাওয়া, বোনের অমানবিক ব্যবহার, অরুণা হালদারের এ্যারিস্টোটেলিসী তাকে বিক্ষুব্ধ করেছে ঠিকই, তবুও সে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি দিয়ে সমস্ত বিষয়কে দেখার চেষ্টা করেছে। অরুণা হালদারকে তাই প্রকাশ্যে ক্ষমা চাওয়া থেকে বিরত করেছে, তার প্রেমের পথে বিরুদ্ধাচরণ করেনি, বরং সহযোগিতা করে নিজের পৌরুষকে দীপ্তিময় করে তুলেছে। নারীর অন্যায় মানবিকতার বিরুদ্ধেও প্রকৃতপক্ষে মানবিকতার আলোয় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে স্যামুয়েল চরিত্রটি।

বিমল কর তাঁর গল্পের মধ্যে মানুষের মানবিকতার জয়ধ্বনি বার বার ঘোষণা করেছেন। ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধি থেকেও মানুষের দাবি অনেক বেশি অর্থবহ হয়ে উঠেছে। ‘জোনাকি’ গল্পটি সেই ভাবনারই প্রতিফলন একথা বলা যায়।

‘বকুলগন্ধ’(১৯৫৩) গল্পটিতে একটি নারীর অন্তরে মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব তার ফেলে আসা দিনের স্মৃতিরোমস্থনে বা অতীতচরিতার নিরিখে রূপ পেয়েছে এবং এরই সূত্র ধরে অবচেতন মনের সক্রিয়তায় তার মানসিক অসুস্থতার ছবি অঙ্কিত হয়েছে। কেন্দ্রীয় চরিত্র অঞ্জনা শারীরিক অসুস্থতায় চেষ্টা এসেছে, তার পিতালয়ে। এখানে পূর্বতন প্রেমিক শ্যামলের হঠাৎ উপস্থিতিতে এবং পরিচিত প্রকৃতির অনুষঙ্গে তার ফেলে আসা দিনের অচরিতার্থ প্রেমের স্মৃতি প্রকট হয়ে উঠেছে। অঞ্জনার ডাক্তার স্বামী সুখাংশু ও ছোট্ট মেয়ে মিন্টু এবং তার চার বছরের দাম্পত্য জীবন এক লহমায় ভেসে গেছে স্মৃতির স্রোতে। ভোর রাতে দেখা স্বপ্নে আকাঙ্ক্ষিত সেই স্পর্শমাধুরী অচেনা সেই মানুষটির প্রতি অনুরক্ত করে ফেলে অঞ্জনাকে। অঞ্জনা বুঝতে পারে বহু চেনা সেই রহস্যময় স্পর্শসুখের সাথে যে নিবিড় ভাবে সংযুক্ত, সে তার অচরিতার্থ প্রেমের প্রেমিক শ্যামল। শ্যামলের সাথে দেখা হওয়ার পরই অতীতের ঘটনাস্রোত যেন বড় বেশী আগ্রাসী ক্ষুধা নিয়ে অঞ্জনাকে পরিব্যাপ্ত করে রেখেছে, তারই ফলশ্রুতি অদ্ভুত রোমাঞ্চক স্বপ্ন। যে ভালোবাসায় মিলন ঘটেনি—যার জন্য আজও অঞ্জনার মন হুহু করে কেঁদে ওঠে, সেই প্রেমের অনুষঙ্গগুলি থেকে সে দূরে থাকতে চাইলেও পারে না। প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়ে হারানো স্মৃতি অত্যন্ত দুর্ভার হয়ে তার মনে ঠাই নিয়েছে, বর্তমান পরিস্থিতির প্রতি আকাঙ্ক্ষিত না হয়ে মৃত্যুর প্রতি অভিলাষী

হয়েছে অঞ্জনা, যে মৃত্যুর হাতছানি থেকে একদিন শ্যামলই তাকে বাঁচিয়ে ছিল। আসলে পূর্ব প্রেমের স্মৃতির দ্বারা এখানে অঞ্জনা বিপর্যস্ত হয়েছে। একদিকে তার স্বামী, কন্যা, সংসার, অপর দিকে আকাঙ্ক্ষিত সেই হারানো প্রেম -- এই দ্বিমুখী জটিলতায় চরিত্রটি হয়ে উঠেছে দ্বন্দ্বময়।

একজন নারী হিসেবে--সুখাংশুর স্ত্রী হিসেবে পূর্ব প্রণয়ীর সাথে সাক্ষাতে আড়ষ্টতা, দ্বিধা ও দ্বন্দ্বময়তা অঞ্জনার চরিত্রে পরিলক্ষিত হয়েছিল। কেননা শ্যামলের সাথে দীর্ঘ ভালোবাসার পরও ঘটে যাওয়া বিচ্ছেদের স্মৃতি তাকে হতাশাগ্রস্ত করেছিল। স্বামী, সুখাংশুর আসার সংবাদে সেই ক্ষততে খানিকটা শুশ্রূষার আবহ নিয়ে এসেছে। তাই শ্যামল ও হারানো প্রেমের স্মৃতিকে এবং তার অনুষ্ণুগুলিকে সে জোর করে দূরে ঠেলে দিতে চেয়েছে। এই মানসিক ক্রিয়ার কষ্টকর প্রয়াসের প্রভাব অঞ্জনার চোখে-মুখে পড়েছে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে তার মনে হয়েছে চোখে মুখে খুশি ও সুস্থতার চিহ্ন যেন অবলুপ্ত হয়ে গেছে। কিন্তু এটা তো প্রাথমিক নয়, তাই পরিচর্যার মাধ্যমে তা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেছে সে, যাতে সুখাংশুর চোখ তার মানসিক অসুস্থতা বুঝতে না পারে, যেন বুঝতে না পারে অপ্রতিরোধ্য অতীতের স্মৃতি এখনো তার হৃদয়কে আচ্ছন্ন করে রেখেছে; এই স্মৃতির সর্বাংশে রয়েছে সেই শ্যামল, “যে একদিন ওকে সাপের ছোবলের মুখ থেকে বাঁচিয়েছে আর একদিন নিজেই সাপের মত ছোবল দিয়ে সরে গেছে।”^{১২} হারানো স্মৃতিকে দূরে ঠেলে দেওয়ার দুর্নিবার প্রচেষ্টায় মিন্টুর বকুল ফুলে মালা গাঁথার প্রয়াসকে সে সর্বশক্তি দিয়ে প্রতিহত করতে চেয়েছে। অতীতের সাথে এই লুকোচুরির ফলে অতীত যেন আরও বেশি করে আচ্ছন্ন করেছে অঞ্জনাকে, এরই সূত্র ধরে তার মানসিক দ্বন্দ্ব যেমন আরও প্রবল হয়েছে, তেমনি তার ব্যবহারে অস্বাভাবিকতা তার মা কিংবা সুখাংশুকে বিমূঢ় করেছে। রাত্রিবেলা সুখাংশু যখন তার কাছে বকুলফুল কুড়িয়ে নিয়ে এসেছে উপহারের সৌজন্যে, আরও বেশি অনুরাগ পাওয়ার প্রত্যাশায়, তখন অঞ্জনা হয়ে উঠেছে দিশেহারা, তার স্বাভাবিক ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেছে, তীব্রভাবে বকুলফুলকে ‘জঞ্জাল’ বলে প্রতিপন্ন করতে চেয়েছে সে। কিন্তু বিনীত রজনীর পর অবচেতনের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে চুপিসাড়ে যখন সে বকুলতলায় এসে কোঁচড় ভর্তি ফুল তুলে সুখাংশুর কাছে ধরা পড়েছে তখন তার মুখ ভয় ও বিস্ময়ে বকুল ফুলের মত সাদা হয়ে গেছে। আসলে বকুলফুল জঞ্জাল নয়, বকুলফুলের সাথে সম্পৃক্ত ব্যাখ্যাতুর স্মৃতিগুলিই জঞ্জাল বলে মনে হয়েছে অঞ্জনার। যে স্মৃতি তার কাছে সুখের ঘনিষ্ঠতা নিয়ে আসে, লোকচক্ষুর সামনে তাকেই সে দূরে

ঠেলে দিতে চায়। নিজেকে সুস্থ স্বাভাবিক রূপে পরিচিত করতে গিয়ে মানসিক দৌর্বল্যের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে পড়ে অঞ্জনা নিজেই।

অবচেতন মনের আকাঙ্ক্ষাকে মানুষ পরিনিবৃত্ত করতে পারে না, তার প্রভাবের কাছে আত্মসমর্পণ ব্যতীত সাধারণ মানুষের কিছু করার নেই, তাই ‘ইদুর’ গল্পে মলিনা, ‘ভয়’ গল্পে শোভা, কিবাং ‘বকুলগন্ধ’-এর অঞ্জনা সকলেই হতাশগ্রস্ত। তাই অঞ্জনার পুরোনো প্রেমের স্মৃতি আজ সকল প্রাপ্তির হর্ষকে ভুলিয়ে দেয়—তাকে বর্তমান অবস্থা থেকে টেনে নিয়ে যায় অতীতে; “অঞ্জনার সাধ্য কি সেই বিকার থেকে মুক্ত করে নেয় নিজেকে। পারে না, পারে না সে। স্বামীর পাশে শুয়ে শুয়ে যদি অনেক পুরোনো কথাই মনে পড়ে—কী করতে পারে অঞ্জনা? ভাবতে তা চায় না, তবু স্মৃতি যদি সব কিছুর আগল টপকে অন্ধকারে এসে দাঁড়ায়, কেমন করে তাড়িয়ে দেবে অঞ্জনা তাকে! সে সাধ্য তার কই।”^{৫০} মনোবিজ্ঞানী ফ্রয়েড তাঁর গবেষণায় Id, Ego ও Super Ego-র বর্ণনায় দেখিয়েছিলেন অবচেতন (sub-conscious) মনই মানুষের নিয়ামক শক্তি। বিমল করের রচনায় মানুষের মন সম্পর্কিত ভাবনা নানা ভাবে প্রকাশিত হয়েছে। অঞ্জনার চরিত্র ও তার ব্যবহারিক বৈচিত্র্যের মাধ্যমে সেটিকে উপস্থাপিত করতে চেয়েছেন লেখক। ‘বকুলগন্ধ’ সেই স্মৃতির প্রতীক, যে স্মৃতি মেদুরতায় মাদকতা আছে, স্বপ্ন দেখার সাধ আছে। তবুও পারিবারিক ও সামাজিক মানুষ তার ইচ্ছার স্রোতে ডানা মেলে মুক্ত মনে যেতে পারে না, বন্ধন তাকে নিষেধিত করে কর্তব্য বোধের অঙ্গীকারে, ‘বকুলগন্ধ’ গল্পে সেই টানাপোড়েন ব্যঞ্জিত হয়েছে।

‘পার্ক রোডের সেই বাড়ি’ (১৯৫৩) গল্পে ঘটনা প্রবাহ থেকে মূল্য পেয়েছে প্রকৃতির সাহচর্যে একটি নারীর একাকিত্বের যন্ত্রণা ও মনস্তাত্ত্বিক টানাপোড়েন। মুখ্য চরিত্র চন্দনার সহবত, শিষ্টতা, শালীনতাশিক্ষা ও কেতাদুরস্ত জীবনে অভ্যস্ত হওয়ার রিহাসাল চলছে বার্নপুরের পার্করোডের মেসো-মাসির বাড়িতে। যেখানে তাকে ইংরেজী ট্রান্সলেশন কিংবা আরও কয়েকটি প্রয়োজনীয় পড়াশোনায় গভীরতা আনতে হবে, চলা ফেরা, হাসি-তামাশা, খাওয়া-দাওয়া সর্বত্রই শিষ্টরুটির পরিচয় দিতে হবে এবং বিবাহে ভালো পাত্রের উপযোগী হয়ে উঠতে হবে। চন্দনার মন এই কৃত্রিমতায় সায় দেয় না। তার মনে হয় দিদি জামাইবাবুরা পাইক পাড়ার যে বাড়িতে থাকেন যেখানে ওকেও কিছুদিন থাকতে হয়ে ছিল, অনেক না পাওয়ার মধ্যেও সেটাই তার কাছে ভালো ছিল, অন্তত ঐ বাড়িতে প্রাণ ছিল। পাইকপাড়ার মণীন্দ্র রোডের মাঠকোঠা বাড়িতে বহু মানুষের

ভিড় ছিল ঠিকই, কোন রকমে স্থান সংকুলান করতে হত, এতগুলি পরিবারের জন্য খুব তাড়াতাড়ি বাড়ির উঠোন নাওয়া হয়ে উঠত, ঝগড়া ঝাটি, হাসিতামাসা, জঞ্জাল, মশা ছিল, নীচের ঘরে হাওয়া থাকত না, “তবুও সে বাড়ি, চন্দনার মনে হয়, সেই পাইক পাড়ার বাড়িই বেশ ছিল। পার্করোডের এই সাত নম্বর বাথলোর চেয়ে সেখানেই যেন হাত পা ছড়িয়ে, মন এলিয়ে বেঁচে ছিল ও, বেশ ছিল!”^{৫৪}

মাসির কাছে অতিনিয়ন্ত্রিত জীবন যাত্রা চন্দনার মনকে ভারাক্রান্ত করে তোলে। মেসো-মাসির আত্মীয়তা, বোন-ঝিকে নিজের দায়িত্বে বিয়ে দেওয়ার জন্য নিয়ে আসার মত মহৎ আদর্শ তাকে মুগ্ধ করে ঠিকই তবুও মনটাকে সে ইচ্ছে-ডানায় ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে না। তাই তার স্মৃতিচারণিতায় যেমন অতীত বার বার ফিরে আসে, তেমনি ভবিষ্যতের নানা সম্ভাব্য কল্পনা তার চিন্তা স্রোতের মধ্যে ধরা দেয়; যে ভবিষ্যতের মধ্যে ধরা দেয় তার দাম্পত্য জীবনের নানা পরিকল্পনা। কিন্তু এই ভাবনা ছাড়া তার কিছুই করার নেই, সিদ্ধান্তের ব্যাপারে মাসি ও মেসোর উপর তাকে নির্ভর করতে হবে। সকল আত্মীয়ের হাত ধরে বহু সেন, সরকার, মজুমদার, ঘোষ, মিত্র, ধর, পাল, মুখার্জী পরিবারের পাত্রের খবর এলেও তারা কোন অংশেই মেসো-মাসির চোখে চন্দনার উপযুক্ত হতে পারেনি। কিন্তু চন্দনা জানে এরা সকলেই তার উপযুক্ত। দিদি জামাইবাবুরা অনেক না পাওয়ার মধ্যেও আর্থিক অনটন সত্ত্বেও কত সুন্দর ভাবে দিন কাটাচ্ছে, চন্দনাও পারবে। কিন্তু সে সুযোগ আসে না। মাসি পাত্রের আর্থিক, চাকুরিগত, সামাজিক, শারীরিক বিষয়গুলি পর্যালোচনা করে সকলকেই অনুপযুক্ত বলে মনে করেন। আর চন্দনা অবসরের সময়, দুপুরের নির্জনতায় এমন কি কাজের ফাঁকেও সেই যুবকদের কল্পনা করে নিজের ভবিষ্যৎকে রঙিন করে তোলে।

গল্পের শুরুতেই বলা হয়েছে, “বার্ণপুরের পার্ক রোডের এই বাড়িতে চন্দনা নিঃসঙ্গ।”^{৫৫} এই মানসিক নিঃসঙ্গতা কাটানোর কোন উপায় তার কাছে নেই, ভোরের বেলায় রোদের খেলা, চডুইয়ের কিচির মিচির, ওদের ঘর বানানোর ক্লাস্তিহীন প্রয়াস, রেডিওর গান তার এই একাকিত্বকে আরও বেশি নিবিড় করে তোলে। চন্দনা বোঝে না, পাত্র বাছাইয়ের মধ্য দিয়েই কি জীবনে যথার্থ নিরাপত্তা ও সুখ আনা যায় কিনা। মানুষের জীবনের সুখ তো আপেক্ষিক, সে তো সর্বদা কার্যকারিতার ওপর নির্ভর করে না, সে যে সম্পূর্ণ মনের রসায়ন। তবুও তার উপর জোর খাটানোর প্রক্রিয়া চলছে চন্দনার জীবন ঘিরে। কৃত্রিম জীবনাচরণে ইচ্ছের বিরুদ্ধে অভ্যস্ত হতে

হতে রাজির অন্ধকারে ভয় হয় চন্দনার। “নির্জনতার নিস্তরতার এই ভয়, এবং আশ্চর্য কোন বেদনার। একাকিত্বের দুঃসহ মুহূর্তগুলির অবিরাম ঢেউ গুনে যাবার ক্লান্তি।”^{৬৬} বিমল কর এই গল্পে কেতাদুরস্ত জীবনাচরণের সাথে অকৃত্রিম মধ্যবিত্ত বা নিম্ন মধ্যবিত্ত জীবনের স্বাভাবিকতা, উচ্ছ্বাসময়তার বিভেদকে প্রকটিত করেছেন। মানুষের মনের স্বাভাবিকত্বের উপর আভিজাত্যবোধের অলংকার কতটা তার মনের থেকে দূরবর্তী তার প্রকাশ ঘটেছে চন্দনার ভাবনার মাধ্যমে। তবুও সামাজিক ও পারিবারিক আদর্শে প্রাণহীন সেই জীবনাচরণ যা আধুনিক জীবনের সাথে ওতপ্রোত-ভাবে যুক্ত তাতে চন্দনার মত সাধারণ মেয়েকে অভ্যাস করতে হয়; অপেক্ষা করতে হয় সেই জীবন সঙ্গীর জন্য, যতদিন না সে আসে ‘অনেক ফিলটারেশনের পরও স্পেকট্রামের আভা নিয়ে;’ চন্দনাকে “আরও নরম, আরও কোমল করতে হবে মুখ, হাত, পা, সাবানের ফেনা আর গ্লিসারিন মেখে। আর পাখির ডাক শুনে শুনে তার সকাল ও দুপুর কাটবে। কুল কাঁটা বুকে নিয়ে রাত।”^{৬৭} নিরন্তর এই অপেক্ষা ও তার যন্ত্রণা অনাবিল, উচ্ছ্বাসময় মনের অধিকারী একটি মেয়ের কাছে কতটা দুঃসহ তা ‘কুল কাঁটা বুকে নিয়ে রাত’ --এই বাক্যের মাধ্যমে যথার্থভাবে প্রকাশ করেছেন লেখক।

গল্পটিতে মেসো-মাসির উদারতা, চন্দনার নিঃসঙ্গতা, তার ভাবনার গভীরে তলিয়ে যাবার বিষয়টি যেমন স্বচ্ছভাবে উপস্থাপিত হয়েছে, তেমনি আলোচনার মত বিষয় হল গল্পটির শব্দ যোজনা ও ভাষার কবিত্বগুণ। এই কবিত্বময় ভাষা সঞ্চারের পাশাপাশি পরিস্থিতির বর্ণনায় অদ্ভুত ভাবে অনুভববেদ্য গুণ প্রকাশ পেয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, রাতের অন্ধকারে বিছানায় বিনিদ্র অবস্থায় চোখ মেলে থাকে চন্দনা, “এত ঘন অন্ধকারে একা একা চোখ খোলা যায়। এই নিস্তরতায় নিজের বুকে, গালে, চোখে নিজের হাত দেওয়া যায়। স্পর্শ করে নিজেকেই নিজে বোঝা যায়। বোঝানো যায়।”^{৬৮} --এই অন্ধকার কোন কৃত্রিমতাকে প্রকাশ করে না, নিজের মুখোমুখি নিজেকে দাঁড় করিয়ে সকল স্বাভাবিকত্বকে ফুটিয়ে তুলতে সাহায্য করে, অপরের দৃষ্টি থেকে মুক্ত করে মানুষকে স্বাধীনতা দিতে পারে। এছাড়াও চন্দনার মনের চরম হতাশাময় অনুভূতি প্রকাশিত হয়েছে অপূর্ব ভাষার বন্ধনে, যে ভাবনায় সে পার্করোডের বাড়ির সাথে নিজের মনকে বা মনের আকাঙ্ক্ষাকে মেলাতে পারে না। “পার্ক রোডের সাত নম্বর বাংলোর ফিট ফাট সাজানো ঘরে বাসা বাঁধা সহজ নয়। বুল ঝাড়া বাঁশটা হাতে করে মালি এসে ঢুকবে। বেলা আটটাই হোক, কি দশটাই হোক, কাচের দরজা, শার্সি বন্ধ হয়ে যাবে। আলো আসবে, রোদ্দুর নয়--পাখির ডাক

ভেসে আসবে স্বাইলাইটের অল্প একটু ফাঁক দিয়ে, চড়ুই নয়। পার্ক রোডের সাত নম্বর বাড়িতে খড় কুটো দিয়ে বাসা বাঁধার জায়গা নেই, মাঠ-ঘাটের আলো আর ধুলোর আমন্ত্রণ নেই।”^{৫৯} গল্পটির প্রতিটি ছত্রে ছত্রে চন্দনার হৃদয়ের যন্ত্রণাকে অনুভববোধ্য ভাষায় রূপ দিতে চেয়েছেন লেখক। সর্বত্র প্রবাহিত করে দিয়েছেন গভীর বিষাদময়তা। মানব মনের যান্ত্রিকতাবিরোধী, স্বাভাবিক উজ্জ্বল ভাবনার ছবি এই গল্পের মাধ্যমে বিমল কর ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন।

নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের সহোদরা দুই বোনের মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব নিয়ে লেখা গল্প ‘দুইবোন’ (১৯৫৩) বিমল করের মনস্তাত্ত্বিক গল্পের শ্রেণীতে বিশেষ মাত্রা যোগ করেছে। বেশ কিছু ক্ষেত্রে মানুষের নিজের নিরাপত্তা ও সুখের ব্যাপারে অপরের সাথে ঠান্ডা লড়াই-এ প্রবৃত্ত হওয়ার বিষয়টি এই গল্পে আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। এই গল্পে কাহিনী অংশ কম হলেও চরিত্রগুলির মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা গল্পটিকে বিশেষত্ব দিয়েছে। নিরু ও অনু দুই পিঠোপিঠি সহোদরা বোন, যারা একে অপরকে খুব ভালো ভাবে চেনে এবং দুজনের কোন কিছুই দুজনের কাছে গোপন নেই। “যোলয় আর আঠারোয় যে কোনও তফাৎ থাকতে পারে না, অন্তত নিরু-অনুর মধ্যে নেই, তা ওরা নিজেরাই ভালো করে জানে। কারুর কাছে অন্যের গোপন কিছু লুকানো থাকে না। যেন থাকতে নেই। সেটা দোষের।”^{৬০} কিন্তু এই স্বচ্ছতা ও মুক্ত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কেমন ভাবে পরিবর্তিত হয়ে যায় তাই আলোচ্য বিষয় এই গল্পের। নিরু ও অনুর বাবা মাধববাবুর অফিসের বড়বাবুর শালার বিয়ের জন্য পাত্রী দেখা চলছে, সেই সূত্রে দুই মেয়েকেই বড়বাবু চাটুজ্যে মশাই দেখতে চান। একটি পাত্রের পছন্দের জন্য দুটি পাত্রীর মধ্যে যে কোন একটি পাত্রী বাছাইয়ের কঠিন পরিস্থিতিতে দুই সহোদরার মধ্যে প্রতিযোগিতা দেখা গেছে। একজন অপরজনকে ছাপিয়ে কতটা বেশী প্রসাধন ব্যবহার করতে পারে, কিংবা নিজের পছন্দের শাড়ি পরে কতটা মোহময়ী হতে পারে তার ঠান্ডা লড়াই শুরু হয়ে গেছে উভয়ের মধ্যে। শুধু তাই নয় প্রতিদিনের চুল বাঁধার ক্ষেত্রে একজন আর একজনের উপর নির্ভরশীল হলেও আজ সেই কাজের মধ্যে সন্দেহের বীজ খুঁজে পেয়েছে। এইভাবে নিবিড় সম্পর্কের মধ্যে চিড় ধরেছে, যা অভিপ্রেত ছিল না দুজনের কাছেই। দুই বোনের মধ্যে পাত্রপক্ষের কারোকেই পছন্দ না হওয়ার পর কৃতকর্মের জন্য দুজনেই লজ্জা বোধ করেছে। সম্পর্কের অবনতি যা তাদের কাছে পীড়াদায়ক হয়েছিল এবং তার জন্য নিজদের স্বার্থপর মনে করে উভয়েই আড়ষ্ট হয়ে গেছিল, তা শুশ্রূষার জন্য উভয়েই সচেতন হয়ে উঠেছে। দুই বোনই একে অপরের পছন্দের শাড়ি, যার জন্য তাদের এত কলহ, তাই পুরোপুরি

উৎসর্গ করে স্বার্থত্যাগের চেষ্টা করেছে এবং হারানো সম্পর্কের মাধুরী ফিরে পাওয়ার চেষ্টা করেছে, কিন্তু একবার চিড় ধরা মন আবার কি ঠিক মতো জোড়া লেগে যায়, এই প্রশ্ন গল্পের শেষে উদ্ভিত হয়েছে।

নিজ সুখের জন্য স্বার্থপরতা অবস্থান্তরে কতটা পীড়াদায়ক হতে পারে লেখক তাই দেখাতে চেয়েছেন। গল্পের শেষাংশে প্রশ্নমূলকতা ও বিস্ময় বোধ প্রকাশিত, যার মধ্য দিয়ে মানব মনের চির রহস্যময়তা প্রকাশিত। “দুই বোন পাশাপাশি গলা জড়াজড়ি করে আবার শুয়ে পড়ল। ঘুমিয়ে পড়ল বোধ হয়। কিংবা হয়তো ভাবছিল, বিলু-অশোককে নিয়ে তো এমন রেষারেষি কই হয় না! হয়তো এও ভাবতে পারে, ষোলয়-আঠারোয় এসে যে তফাৎটুকু হয়ে গেল আজ দুই বোনে, আর কি তা ঘুচে যাবে!”^{৬১}

নিরুর সাথে বিলুর বা অনুর সাথে অশোকের গোপনে প্রেমের সম্পর্ক থাকলেও তা জোরালো ভাবে সংসারে প্রতিষ্ঠার দাবি দেখাতে পারে না দুই বোনই। বিবাহের যোগাযোগে পাত্রী দেখার বিষয়েও তারা নিজ পছন্দের দাবি প্রতিষ্ঠার বিলাসিতা করে না, এবং এই ক্ষেত্রে নিজের সহোদরার সাথেও প্রতিযোগিতায় তারা কুষ্ঠাহীন। এই চরিত্রের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে প্রকাশিত হয় তাদের সংসারের আর্থিক ভারসাম্য হীনতা এবং তার ভিতর থেকে উদ্ভূত আত্মপ্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা। কন্যাদায় যেখানে বড় দায় হিসেবে প্রতিপন্ন সেই নিম্নমধ্যবিত্ত সংসারের আর্থিক পরিকাঠামোয় নিজ সুখের জন্য স্বার্থপরতা লজ্জাজনক হলেও কঠিন বাস্তব। এই বাস্তবতার স্বচ্ছচিত্র ‘দুইবোন’ গল্পে প্রকাশিত হয়েছে।

‘আত্মজা’ (১৯৫৪) গল্পটি বিমল করের গল্পকার তথা সাহিত্যিক জীবনে বিশেষ মাইলস্টোন হয়ে রয়েছে। ‘দেশ’ পত্রিকায় গল্পটি প্রকাশের পর প্রায় সর্বক্ষেত্রেই লেখকের প্রতিষ্ঠা লাভ ঘটে। বাণিজ্যিক ও অবাণিজ্যিক পত্রিকায় যেমন এর পর থেকে তিনি অত্যন্ত পরিচিত নাম হয়ে ওঠেন, তেমনি সাগরময় ঘোষ তাঁকে ডেকে এনে দেশ পত্রিকায় পুফ রিডারের চাকরি দেন, এই সূত্রেই পরবর্তীকালে তিনি সাব-এডিটর হতে পেরেছিলেন। লেখক নিজেও বলেছেন, “‘আত্মজা’ গল্পটি সে সময় কিছু তর্ক বিতর্কের অবতারণা করেছিল, খ্যাতি-অখ্যাতি দুই দিয়েছিল লেখককে, তবু বোধহয় ঐ লেখাটি আমায় সে সময় বিশেষ ভাবে চিহ্নিত করেছিল।”^{৬২} বিশেষ ভাবে বলা যায় ‘শনিবারের চিঠি’ ও অন্যান্য বেশ কিছু পত্রিকা ও ব্যক্তি সরাসরি বিমল

করকে আক্রমণ করে তাঁর চরিত্র সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশের পাশাপাশি রচনাটিকে অশ্লীল বলতে শুরু করেন।^{৩০} লেখক নিজে অবশ্য এর মধ্যে কোনও মালিন্য খুঁজে পাননি।

‘আত্মজা’ গল্পটি একটি পরিবারকেন্দ্রিক আবহের মধ্যে গড়ে উঠেছে, যেখানে খানিকটা অসুস্থ স্ত্রী, স্বামী ও তাদের কন্যা রয়েছে। বাবা ও মেয়ের মধ্যে নিবিড় স্নেহের সম্পর্ক ছিল, স্ত্রীর প্রতি সকল কর্তব্য সম্পাদন করেও খুব সুখ ও আনন্দের আতিশয্যে বাবা তার মেয়েকে ভালোবাসতো। মেয়ে পুতুলের প্রাণোন্মাদনার তীব্রতা মুগ্ধ করতো বাবা হিমাংশুকে। ফ্রয়েডিয়ান সাইকোলজির তত্ত্বে কথিত যে ‘লিবিডো’ মানুষের আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে সেখানে মানুষের ইচ্ছা ও প্রবৃত্তি ‘লিবিডো’র দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়। তাই শুধু এ গল্পেই নয় অন্য সকল ক্ষেত্রেও বাবা ও মেয়ের প্রতি নির্ভরতা ও ভালোবাসা সহজাত ভাবেই গড়ে ওঠে। ‘আত্মজা’ গল্পে তাই প্রাণস্পর্শী আবেগ আকুলতা তীব্র ভাবে প্রকাশিত হয়েছে। মেয়ের সৌন্দর্য, চলাফেরা, আদব কায়দা সব কিছু হিমাংশুকে মুগ্ধ করতো। বিশেষত অবসর বিনোদনের সঙ্গী হিসেবে এবং প্রাণ প্রবাহে সজীবতা সৃষ্টির ক্ষেত্রে পুতুল যথার্থ ভাবেই হিমাংশুর মনে ঠাঁই পেয়েছিল। কিন্তু এই নিবিড়তা, ভালোবাসার চূড়ান্ত প্রকাশের ওপর নেমে এল সমাজের বক্র দৃষ্টি। স্ত্রী যুধিকার পিসতুতো বোন শিপা বাবা-মেয়ের ঘনিষ্ঠতার মধ্যে খুঁজে পেয়েছে কমপ্লেক্স। এবং তার প্রভাবে যুধিকার কাছ থেকে চরম ভৎসনা পেয়েছে হিমাংশু, যার মধ্যে ছিল মেয়ে পুতুলকে নিয়ে কদর্য ইঙ্গিত। অভাবনীয় এই আক্রমণে দিশেহারা হিমাংশু আত্মহত্যার মাধ্যমে তার যন্ত্রণার অবসান ঘটিয়েছে।

গল্পটির সাইকোলজিক্যাল পয়েন্ট সম্পর্কে লেখক বিমল কর বলেছেন--

“আপাতভাবে গল্পটি মনে হয়, ফ্রয়েডিয়ান সাইকোলজি নিয়ে লেখা, কিন্তু এর মধ্যে একটা ‘রিজেকশন’ ছিল। এখানে যে-ভাবনা তা তো সত্যি নয়, জোর করে চাপিয়ে দেওয়া। বাবা তার মেয়েটিকে দারুণ ভালোবাসতো, তার স্ত্রী ছিল অসুস্থ। বাচ্চা মেয়েটিকে সমস্ত জীবন দিয়ে সে ভালোবেসেছিল। মেয়েটাও ছিল খুব লিভিং মেয়ে। এ জিনিসটাকে অন্য লোক এসে একটা খোঁচা দিয়ে গেল। সেই খোঁচাটাই আস্তে আস্তে বাড়তে লাগল। কিন্তু বাবা তখন ভাবছে, কই আমি তো এমন কিছু ভাবিনি, কোনও দিনই ভাবিনি, মেয়ে তো আমার। তো, এই যে রিজেকশন, কমপ্লেক্সের রিজেকশানটা তো আমাদের করা উচিত। যদি আমরা ধরেই নি, যে এটা ছাড়া হয় না, সমাজে সভ্যতায় তো সে জিনিস চলে না। এই যে দ্বন্দ্ব। এর ফলেই মানুষটার মনে ঢুকে গেল অকারণ পাপ বোধ। এই গিল্টি কমপ্লেক্স থেকে লোকটি শেষ পর্যন্ত আত্মঘাতী হল।”^{৩৪}

হিমাংশুর এই মৃত্যুর পিছনে লেখকের মৃত্যুদর্শনের বিশেষ দিক অবশ্যই রয়েছে, তবুও তার সাথে ওতপ্রোত ভাবে যুক্ত হিমাংশু ও যুথিকার মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব, যা এই কঠিন সমস্যার সমাধানে তাকে প্রবৃত্ত করেছে। মেয়ের প্রতি হিমাংশুর ছেলেমানুষীপূর্ণ ব্যবহার, বাবার প্রতি মেয়ের অতিঘনিষ্ঠতা যুথিকার চোখে অস্বাভাবিক মনে হয়েছে। বাবা ও মেয়ের আদিখ্যেতার ওপর নজর রাখতে চেয়েছে সে, কিন্তু হিমাংশুর প্রাণচঞ্চলতার কাছে সমস্ত বাধা দূর হয়ে গেছে। কিন্তু যখন এই অতি প্রাণোচ্ছলতার বিশ্লেষণ করেছে শিপ্রা কমপ্লেক্সের বিশেষণ চাপিয়ে তখন যুথিকার মনেও সৃষ্টি হয়েছে অন্তর্দ্বন্দ্ব। মেয়ের ভবিষ্যতের সামাজিক সুরক্ষা, বাইরের লোকের সমালোচনা, সামাজিক লজ্জা, বাবা মেয়ের সম্পর্কে রাশ টানার চেষ্টা এবং সর্বোপরি নিজের শারীরিক অসুস্থতা তার এই অন্তর্দ্বন্দ্বকে জটিল করে তুলেছে।

অপর দিকে হিমাংশু যুথিকার আক্রমণাত্মক সমালোচনার জেরে মানসিক ভাবে সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছে। এর পর থেকেই শুরু হয়েছে তার মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব, যেখানে একদিকে রয়েছে আত্মসমালোচনা ও আত্মআবিষ্কারের প্রচেষ্টা, অপরদিকে নিজের নিষ্কলুষতার সাপেক্ষে সমাজকে দূরে রেখে নিজের মেয়ের প্রতি প্রগাঢ় ভালোবাসাকে তীব্রভাবে স্মরণ করার দুর্লভ সুযোগ গ্রহণের ইচ্ছা। ছত্রিশ বছর বয়সের সুস্থাস্থের অধিকারী, প্রাণচঞ্চল, যৌবনদীপ্ত হিমাংশু সাইকেল চালানোয়, টেনিস খেলায় কিংবা সাঁতারে দুরন্ত, সকল শ্রেণীর আড্ডাতে সে প্রাণবন্ত ও সংস্কারমুক্ত। তাই সাইকেলের পিছনে পনেরো বছরের পুতুলকে বসাতে, বা তাকে ফ্রক পরাতে সে দ্বিধাহীন, যুথিকার সমালোচনায় সে পরিহাস মত্ত। কিন্তু বাইরের লোক শিপ্রার বাঁকা হাসি ও মন্তব্য, বিশেষ করে ঐ সূত্র ধরে যুথিকার তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ ও আক্রমণ পরিহাসের উর্ধ্বে তুলে তাকে অন্তর্দ্বন্দ্বময় করে তুলেছে। পুতুলের জন্ম দেওয়ার পর ষোল বছরের সুন্দরী যুথিকার সৌন্দর্য বিলুপ্ত হয়ে গেলেও হিমাংশু তাকে ভালোবাসে। আবার অন্যদিকে পুতুলের সৌন্দর্য তার চোখে এনেছে কামনাহীন মুগ্ধতার স্বাদ। শিপ্রার কথায় যদিও এটা ‘কমপ্লেক্স’, তবুও এই Electra Complex-এর পিছনে পুতুল ও হিমাংশুর প্রাণোচ্ছলতাই বেশি। তবুও বলতে হয় যুথিকার ক্রমাগত সমালোচনা যতই হিমাংশু পরিহাস করে উড়িয়ে দিক না কেন তার সুপ্ত মনে এর একটা প্রভাব পড়তে শুরু করেছিল। বিশেষ করে শিপ্রার দৃষ্টিভঙ্গি ও বিদ্রূপাত্মক বক্তব্য পরিবেশন এবং তার চলে যাওয়ার পর যুথিকার শয্যা-গ্রহণ ও মৌনতা পরিবেশকে ধমথমে করে তুলেছে। হয়তো তখন থেকেই হিমাংশুর মনে মন খারাপ করা অনুভূতিগুলো প্রকট হয়ে উঠেছে। তবুও পুতুলের কাশির শব্দ

শুনে ঘরে আলো জ্বালিয়ে এসে তার বুকের কাছে টিপকলটা এঁটে দিয়েছে এবং লেপটা গলা পর্যন্ত টেনে দিয়েছে স্বভাবসিদ্ধ ভাবেই। হিমাংশুর সরলতা ও মেয়ের প্রতি ভালবাসাকে মূল্য দেয়নি যুথিকা, বলেছে, “তোমার কীর্তি দেখছিলাম।”^{৬৫} —এই ‘কীর্তি’ শব্দটির মধ্যে রয়েছে সেই ইঙ্গিত, যা বাবা ও মেয়ের সম্পর্কের মধ্যে অশ্লীলতা জ্ঞাপন করে। শুধু তাই নয় হিমাংশু সেই মুহূর্তে যুথিকার কাছে ঘৃণার বস্তু হয়ে উঠেছে। তাই তাকে দেখতে চায় না বলে যুথিকা ঘরের আলো নিভিয়ে ফেলে অমানবিকভাবে আক্রমণ করেছে হিমাংশুকে। শুধু ঘৃণার কারণে কি আলো নিভিয়েছে যুথিকা? তা মনে হয় না, অত্যন্ত সিরিয়াস ভাবে হিমাংশুকে আক্রমণ করার জন্য হিমাংশুর ভালো মানুষের মত মুখটা সে দেখতে চায়নি। সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিটাই তার কাছে সেই মুহূর্তে বেশি প্রাধান্য পেয়েছে। নিজের মৃত্যু কামনা করে সে কঠিন বাস্তবকে মেলে ধরে হিমাংশুর কাছে— “তুমি বাপ হতে পার, কিন্তু সে মেয়ে, তার রূপ আছে, বয়স আছে। তার কী নেই, কী হয় নি। জ্ঞান না তুমি?”^{৬৬} তখন হিমাংশুর কাছে পুতুল শুধু তার ছোট্ট মেয়ে বলে ব্যাখ্যাত হয় না, হিমাংশুর ওপর এসে পড়ে সমাজ প্রদত্ত ‘কমপ্লেক্স’র চাপ। Complex সম্পর্কে ফ্রয়েডীয় তত্ত্বের সূত্র ধরে বলা যায় মানুষের অচরিতার্থ কামনা অবদমিত কামনার বেশ ধরে মনের গোপন প্রকোষ্ঠে লুকিয়ে থেকে Complex রূপে আত্মপ্রকাশ করে। বিশেষ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সে কাজ শুরু করে যে কোন মানুষের ক্ষেত্রেই, কেননা সাধারণ মানুষ মনের দাস। বিশেষ করে অবচেতন মনকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা সাধারণ মানুষ লাভ করতে পারে না। “These complexes are repressed into the unconscious at certain strictly defined periods they occur throughout the history of the life of every human being.” (Freudianism. A Marxist Critique, Academic press, New York, Page-35)

সমাজপ্রদত্ত ‘কমপ্লেক্স’র চাপে হিমাংশুর মনে হয় সে “—এই ঘর, পরিবেশ, সংসার, স্ত্রী-কন্যা সমস্ত থেকে ছিটকে এক বীভৎস অন্ধকারে গিয়ে পড়েছে।”^{৬৭} এই অন্ধকারে সে নিজেকে স্পষ্টভাবে দেখতে চেয়েছে, আকাঙ্ক্ষা করেছে অন্ধকারের। যে অন্ধকার জীবনের অসুস্থ চিন্তায় ক্লেদাক্ত নয়, সে অন্ধকার আলোরও অধিক, জীবনকে স্বচ্ছভাবে, সঠিক ভাবে দেখার মধ্য দিয়ে। এই পটভূমিতে একাকী মানুষ নিজের প্রতি সঠিক মূল্যায়ন করতে পারে। অন্যের দেখানো, প্রভাবিত করা পথে জীবনকে না দেখে—আত্মসমীক্ষার ভিতর দিয়ে জীবনের ধ্রুব, সনাতন প্রত্যাশার কাছে ফিরে আসার প্রতিশ্রুতি অর্জন করতে পারে।

হিমাংশু তাই নিজেকে দেখেছে, পুতুলকেও দেখেছে। পুতুলের ভিতর সম্ভাবনাময় এক যুথিকাকে দেখেছে, যার ফলে আজ পুতুল তার ভালোবাসার কাছে অভিন্ন হয়েও বাস্তববাদী ভাবনায় স্বাতন্ত্র্যের অধিকারিণী। তাই একদিন অনিবার্য পরিণতিতে পুতুল যখন যুথিকা হয়ে উঠবে তখন সে শূন্য হয়ে পড়বে এই ভাবনা হিমাংশুকে নিঃসঙ্গতাজনিত পীড়া দিয়েছে। সে শঙ্কিত হয়ে উঠেছে এই ভেবে যে পুতুলও যখন, যুথিকার মতো হয়ে উঠবে তখন তার মনেও ব্যাপ্ত হবে জটিলতা, কুটিলতা এবং সমাজের প্রতি সঙ্কস্ত ভাব। একারণে সমাজ ও জাগতিক নিয়মের বিপক্ষে গিয়ে, নিষ্ফলতা অনিবার্য জেনেও স্বভাবসুলভ সরলতায় প্রত্যাশা ও প্রার্থনা করে, “ঈশ্বর, তুমি ওকে যৌবন দিয়ো না, প্রজাপতির রং ছুঁড়ো না ওর মনে। ও যে আমার সেই ছেলেবেলা, আমার সেই সুখ, সেই মন আর আনন্দ,”^{১০} সমাজ প্রদর্শিত পথে আত্মবিশ্লেষণের মাধ্যমেও হিমাংশু নিজের কোন দোষ দেখতে পায় না। নিজের দেহে অন্য মানুষটিকে খুঁজতে গিয়েও তার হৃদিস না পেয়ে আত্মবঞ্চনা ও মৃত্যুর মাধ্যমে শুশ্রূষার পথ অবলম্বন করেছে। গভীর অন্তর্দ্বন্দ্বের ভিতর থেকে ভেঙে পড়া মনকে বিদায় দিয়েছে আলোর পথের সঞ্চারী করে।

বিমল কর হিমাংশুর আত্মহত্যার মাধ্যমে জীবন থেকে পলায়ন প্রবৃত্তিকে প্রতিষ্ঠিত করতে চান নি। হিমাংশু সমাজ ও পরিবারের প্রতি প্রতিবাদের পথ বেছে নিয়েছে মৃত্যুর মাধ্যমে। জীবনের চরম হতাশা থেকে সে বেরিয়ে আসতে পারে নি। এই আত্মহত্যার মধ্যে তার দায়িত্বজ্ঞানহীনতার প্রসঙ্গ উঠতেই পারে। কিন্তু যে মানুষ কর্মের স্বীকৃতির পরিবর্তে ধিকার পায়, প্রশংসার পরিবর্তে বিদূষ লাভ করে, নিজের পঙ্কু, অসুস্থ স্ত্রীকে ভালোবাসার প্রতিদানে ঘৃণিত হয় এবং প্রাণোচ্ছল ভাবে বেঁচে থাকার পরিবেশ পায় না, সেই মানুষটির প্রাণপ্রেরণা ধীরে ধীরে নিঃশেষিত হয়ে যায়। জীবনানন্দ দাশ কথিত “বিপন্ন বিস্ময়” এর অতলে তলিয়ে গিয়ে সেই মানুষটি মৃত্যুকেই যথার্থ পথ মনে করে; হিমাংশুও তাই চেয়েছে।

‘উদ্ভিদ’ (দেশ, ১৯৫৪) গল্পটিতে প্রকাশিত হয়েছে ভীকু, অস্পষ্টবাক অথচ বিকৃত রুচিসম্পন্ন একজন মানুষের কথা। রানি সুবর্ণমঞ্জরী পরিচালিত রাজা প্রদীপ নারায়ণ কলেজে পূর্ণেন্দুবিকাশ বটানির অধ্যাপক হয়ে এসেছে রাজকুমারী চন্দ্রার বটানি পড়ার আকর্ষণে। পূর্ণেন্দুবিকাশ বটানির ল্যাবরেটরি ও বাগান নিজের হাতেই করেছিল রাজ আমলের ঝিলসংলগ্ন উদ্যানে। পূর্ণেন্দু সাধারণের থেকে কিছুটা স্বতন্ত্র গোত্রের মানুষ ছিল। সে ছিল অনেক ক্ষেত্রেই মৌন, নিস্তরঙ্গ, নিরাসক্ত, প্রতিবাদহীন, আত্মবিস্তৃত। ছাত্র মহলে প্ল্যান্ট প্রফেসর বলে তার

পরিচিতি ছিল। তার অন্তর-জগতে, গোপনে রাজকুমারী চন্দ্রার প্রতি যে দুর্বলতা ছিল তা সে মুখে প্রকাশ করতে পারে নি, কিন্তু তার প্রকাশ ঘটেছে বিকৃত কামনার মাধ্যমে। বটানির বাগান সংলগ্ন ঝিলের পাশেই ছিল একটি শ্বেতপস্তরের একটি নগ্ন নারীমূর্তি। একদিন তার উপর রঙিন চক দিয়ে অলংকারের চিত্র ফুটে উঠল, এবং চন্দ্রার নামের সাথে এর সম্পর্ক স্থাপিত হল। শিল্পী যতই গোপনে থাকুক না কেন রানি সুবর্ণমঞ্জরীর সাথে পূর্ণেন্দু বিকাশের কথোপকথনে তা ইঙ্গিতে প্রকাশ পেল শিল্পী পূর্ণেন্দুবিকাশই। এর পর থেকে সমস্ত মহলে পূর্ণেন্দুবিকাশ ও চন্দ্রার সম্পর্ক নিয়ে নানা আলোচনা চললেও পূর্ণেন্দুবিকাশের তেমন কোন দুর্বলতা প্রকাশ পেল না। উভয়ের দুর্বলতা থাকলেও তা প্রকাশ করার মত ব্যক্তিত্ব পূর্ণেন্দুবিকাশের ছিল না। তাই চরম হতাশার মধ্যেও বিত্তবান পাত্রকে বিবাহে সম্মতি দিয়েছিল চন্দ্রা। বিবাহের দিন সেই পস্তর মূর্তিকে আলিঙ্গন করে আত্মবিস্মৃত পূর্ণেন্দুবিকাশকে আবিষ্কার করল তার সহকর্মীরা। রানি সুবর্ণমঞ্জরী তাঁর দূরদর্শী মানসিকতার সাপেক্ষে সহজ বাস্তব কথাটিকে চন্দ্রার সামনে বক্তোক্তির মাধ্যমে তুলে ধরলেন “তোমার বটানির প্রফেসর তো একটা প্ল্যান্ট। উদ্ভিদ। ওর একটু অ্যানিম্যাল হওয়া উচিত ছিল। নয় কি?”^{৬৯}

ছোটগল্পের মনস্ত পাঠক, ছোটগল্পের সচেতন রচয়িতা, নানা পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে ছোটগল্পকে নানা পথের দিশারি করে তোলার উৎসাহী ভাবুক বিমল কর প্রতিনিয়ত নানা গল্প রচনার মাধ্যমে তাঁর ক্রমপরিবর্তনশীল মানসিকতাকে বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন। সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, “...আমার লেখা পালটে যাচ্ছিল। যেমন ধরো, ‘উদ্ভিদ’ গল্পটা, কি ‘মানবপুত্র’ এর কথাই ধরো, এগুলো থেকে বোঝা যায়, আমি একটা কিছু চেষ্টা করছিলাম।”^{৭০}

‘উদ্ভিদ’ গল্পে উত্তমপুরুষের বচনে লেখক কাহিনীর বর্ণনা করেছেন। এই গল্পে প্রতীকময়তার প্রাধান্য রয়েছে, যে প্রতীকের সাথে মানুষের চরিত্রগত প্রসঙ্গ যুক্ত হয়েছে; এবং এই চরিত্রের ব্যাখ্যা মূল গল্পে বারে বারে ফিরে এসেছে। গল্পের শুরুতে রানি সুবর্ণমঞ্জরীর বক্তৃতায় প্রকাশ পেয়েছে “...আমরা অ্যানিম্যাল হায়ার অ্যানিম্যাল। আমরা রেসপন্ড করতে পারি, রি-অ্যাক্ট করতে জানি।”^{৭১} এই বক্তব্য পূর্ণেন্দুবিকাশের লেখচারের সাথেও সমধর্মী, সেও বলেছে, “কোন জীবন উপযুক্ত বেশি; সেই জীবন, যা রেসপন্ড করতে পারে, রি অ্যাক্ট করতে জানে, প্রয়োজনে হিংস্র, ক্রয়েল—অথবা অসহায়, অনড়, মূক জীবন—যা সম্পূর্ণ ভাবেই দাক্ষিণ্যের উপর নির্ভর করে আয়ু আর ক্ষুধা নিয়ে পড়ে আছে।”^{৭২} এই বক্তব্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বলা যায়

পূর্ণেন্দুবিকাশ চন্দ্রার প্রতি তার ভালোবাসার কথা প্রকাশ করতে পারে নি। চন্দ্রার অনুরাগেরও কোন দাম দিতে পারে নি। উদ্ভিদের মত সে বি-অ্যাক্ট করতে পারে নি। বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে পড়ে নিজীব স্ট্যাচুকে অবলম্বন করে চন্দ্রার বিয়ের রাতে কামনাকে প্রকাশ করতে চেয়েছে— “যে সুখে এমন স্তব্ধ রাতেও একটি লতা চুপি চুপি তার সবুজ ডগা তিল তিল করে বাড়িয়ে জড়িয়ে একটা অদ্ভুত কামনাকে প্রকাশ করেছে।”^{৭৩} তাই রানি সুবর্ণমঞ্জরীর চন্দ্রার উদ্দেশ্যে করা সেই শ্রেষবাণী অত্যন্ত বাস্তব, “...ইঁশ থাকে না কার, কাদের— ? যাদের চেতনা নেই, যে চেতনা রেসপন্ড করতে জানে না, তাদেরই। নয় কি চন্দ্রা? আর তোমার বটানির প্রফেসর তো একটা প্ল্যান্ট। উদ্ভিদ।”^{৭৪}

পূর্ণেন্দুবিকাশ যেমন নিজের মনের প্রেমের স্বরূপকে প্রকাশ করতে পারেনি, তেমনি চন্দ্রার মনের আকাঙ্ক্ষাকে উপলব্ধি করতে পারেনি। অথবা উপলব্ধি করতে পারলেও তার সপক্ষে মত দেওয়ার মতো তার মানসিক বল ছিল না। এই কারণে একটি অবদমিত প্রেম অকালে ঝরে গেছে। আস্থা হারিয়েছে চন্দ্রার মতো মেয়েও। উপেক্ষার পাত্র হয়ে উঠেছে পূর্ণেন্দুবিকাশ। জীবনটাকে গল্প-উপন্যাসের প্রেমকাহিনীর মতো সহজ ও মিলনান্তক পরিণতিসম্পন্ন ভাবতে পারেনি পূর্ণেন্দু, আশ্রয়দাতার মেয়ের সাথে প্রেমের ভাব স্থাপিত হলেও বিবাহ পর্যন্ত তা গড়িয়ে নিয়ে যেতে সাহস হয়নি তার। কেননা এই সমাজে আর্থিক সহাবস্থান ছাড়া বিবাহের পর দুটি পরিবারের সুসম্পর্ক সর্বদা থাকে না। রানি সুবর্ণমঞ্জরীর সাথে পূর্ণেন্দুর আর্থিক সহাবস্থান সম্ভব নয়। চন্দ্রার মুগ্ধতাও সময় সাপেক্ষ, তা সারাজীবন অব্যাহত নাও থাকতে পারে, এই সকল কারণ আধুনিক জীবন-সমস্যার সাথে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। তবুও বলা যায় লেখক এই গল্পে পূর্ণেন্দুবিকাশের ভাবনার সাথে এই সূত্রগুলিকে যুক্ত করেননি। পূর্ণেন্দু স্বল্পভাষী, তাই তার মনের আকাঙ্ক্ষা বা প্রত্যাশার কোন স্পষ্টচিত্র পাওয়া যায়নি। রানি সুবর্ণমঞ্জরীও যথেষ্ট আধুনিক ও মুক্তমনের অধিকারিণী। চন্দ্রার ভালবাসাকে তিনি ব্যর্থ করে দিতেন না, তিনিও প্রত্যাশা করেছিলেন সুস্থ স্বাভাবিকভাবে পূর্ণেন্দুবিকাশ তার নিজের ভাবনায় ‘রেসপন্ড’ করুক।

গল্পটির শুরুতেই লেখক এই উদ্ভিদ সত্তার ইঙ্গিত দিয়ে রেখেছিলেন যা গল্পের শেষে যথার্থ ভাবে প্রকাশ পেয়েছে। বিমল করের পরবর্তীকালের ছোটগল্পের ক্ষেত্রে যে আইডিয়ার প্রাধান্য ছিল, তার সূত্রপাত এই সময়ের গল্পের মধ্যদিয়েও ধীরে ধীরে ঘটছিল তা বলা যায়। এছাড়াও বলা যায় ঘটনা থেকেও চরিত্র বিশ্লেষণ তাঁর গল্পে বিশেষ ভাবে প্রাধান্য পাচ্ছিল এই সময়কালের গল্পে।

‘উদ্ভিদ’ গল্পেও সেই সূত্রে পূর্ণেন্দুবিকাশ কিংবা রানি সুবর্ণমঞ্জরীর চরিত্র বিশেষভাবে আলোকিত হয়েছে।

‘বুদবুদ’ (১৯৫৪) গল্পে নিম্নশ্রেণীর উপেক্ষিত একটি নারীর জীবনের দুঃসহ যন্ত্রণার ছবি অঙ্কন করেছেন বিমল কর। ‘বরফ সাহেবের মেয়ে’ গল্পের জিনির মতো এই গল্পের বেলা মনডিয়াল খ্রীষ্টান হলেও, জিনি নিজের ব্যক্তিত্বের জোরে নিজের পরিণতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পেরেছিল, কিন্তু বেলা হতাশার অন্ধকার স্রোতে নিজেকে হারিয়ে ফেলে, সভ্য সমাজের কাছে উপেক্ষিত হয়ে, অপকৃতিস্থ হয়ে যায়। বেলা মডল বাঙালি ঘরের মেয়ে, মিশনারিদের উচ্চারণে বেলা মনডিয়াল -এর প্রথম জীবনটা স্বাভাবিক ভাবেই কাটছিল মিশনারি স্কুলে পড়াশোনা এবং সুরেন দাশের মত সহপাঠীকে ভালোবাসে। কিন্তু যখন যুদ্ধ শুরু হল তখন স্কুলটি বন্ধ হয়ে তৈরি হল সৈন্যদের ব্যারাক এবং তার পাশে এয়ারফোর্সের রানওয়ে। স্কুল ভেঙে যাওয়ার পর সুরেন দাশ অদৃশ্য হল, বেলার বিয়ে হল কোলিয়ারির ফিটার, বন্ধ মাতাল রবিনের সাথে। মিলিটারি কমপাউন্ডে ইলেকট্রিক সুপারভাইজারের চাকরি নিয়ে চলে আসার পর রবিন বেলা কিংবা তার ছয় মাসের সন্তানের খোঁজ খবর নিতে যেত না। অসুস্থ সন্তানকে নিয়ে বেলা দেখা করতে এসেও দেখা না পেয়ে সঙ্কেবেলায় ফিরে যাওয়ার সময় বিদেশী সেনাদের দ্বারা ধর্ষিতা হল, কোলের ছেলেটিকে টেনে নিয়ে গেল শাপদ জন্তু। এই অবস্থায় রবিন তাকে গ্রহণ না করায় চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়েছিল বেলা। অবশেষে প্লাণের তাগিদে নিজের দেহ বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছিল সে। পঞ্চজ বোস বিলুপ্ত প্রায় সৈন্য ক্ষেত্রে চাকরি সূত্রে আসার পর তার ঘরকন্নার কাজে নিযুক্ত হয় বেলা। সে বেলার কাজে মুগ্ধ হলেও, কিংবা তার ব্যবহারে মনের সংগোপনে দুর্বলতা সৃষ্টি হলেও তা স্থায়ী হতে পারেনি। পঞ্চজ বোস বেলার জীবনকাহিনী শোনার পর তার দায়িত্ব গ্রহণ করেন নি। উপেক্ষিত বেলা পরবর্তী কালে পথে পথে অপকৃতিস্থ অবস্থায় ঘুরে বেড়ায়। বেলা মনডিয়ালের জীবনের এই যন্ত্রণাময় চিত্র প্রকাশিত হয়েছে ‘বুদবুদ’ গল্পে।

আর দশটা সাধারণ বাঙালি ঘরের মেয়ের মত বেলারও চরিত্র-বৈশিষ্ট্য গড়ে উঠেছিল। জীবনের বহু ঝড়-ঝাপটা, স্বামী-সন্তান হারানোর দুঃখও সে ভুলতে চেয়েছিল অনুকূল সভ্য সমাজে এসে। লেফটেন্যান্ট পঞ্চজ বোসেরও বেলার শিষ্টাচার, আদব-কায়দা, কাজের দক্ষতা সব কিছু দেখে মনে হয়েছিল-- “মেয়েটা যেন ধুলোয় ঢাকা ফুলা ওর পাপড়িগুলো সত্যিই বিবর্ণ নয়, কিন্তু পথের ধুলোয় ধুলোয় রং, রূপ সব যেন ঢাকা পড়ে গেছে।”^{৭৬} এই ধুলো সে সরাতে চেয়েছিল, বেলাকে

গৃহস্থের পরিচিত রূপে দেখতে চেয়েছিল। তাই সে বেলাকে শাড়ি পরতে বলেছিল, বাদামী রঙের সোয়েটার এনে দিয়েছিল, শুধু তাই নয় খ্রীষ্টমাসে টবের লাল গোলাপটিও উপহার দিতে চেয়েছিল। পঞ্চজ বোস এখানেই থেমে থাকেনি, তার স্বর্গত মায়ের উদ্দেশ্যে জানিয়েছে, “এখানে একটা মেয়ে দেখেছি— ঠিক তোমার মতন; সে যেন আড়ালে সব সময় আমায় দেখছে।”^{৭৬} তবুও এই শখ তার ভেঙে গেল। বেলার কাছে তার জীবনের কলঙ্কজনক অধ্যায় শুনে শুধু ‘সরি’ বলেই দায়িত্ব সারল সে। নতুবা একদিন যে বেলাকে ফুল উপহার দিয়ে নিজের মনটাকে কুঁড়ি থেকে ফুলের মতো প্রস্ফুটিত করে তুলেছিল, তার কাছ থেকেই বা বেলা উপেক্ষা লাভ করল কেন? এখানে বেলার স্বামী রবিন, কিংবা পঞ্চজ বোস সকলেই এক গোত্রের। এরা সভ্য সমাজের দোহাই দিয়ে নিজেদের পরিচ্ছন্ন রাখার চেষ্টা করে। যাকে ঘিরে স্বপ্ন দেখে তার দেহগত বিশুদ্ধিই যেন একমাত্র যোগ্যতা বলে মনে করে। তাই রবিন কিংবা পঞ্চজ বোস নিজের ঘরে স্থান দেয় না বেলাকে, ঠেলে দেয় চরম অনিশ্চয়তার পথে। একটু উষ্ণ সমবেদনা, স্বচ্ছ মানবিকতা যেখানে একটি মানুষকে জীবনের চরম যন্ত্রণা থেকে জীবনের স্বীকৃতি ও প্রতিষ্ঠার মঞ্চে তুলে আনতে পারে, সেখানে এই সমাজের নারীলোভী, সভ্যতার ভেক্ষারী পুরুষেরা নারীর জীবনে এনে দেয় চরম ঘৃণা ও উপেক্ষার নির্লজ্জ অমানবিকতা।

বেলা মনডিয়ালই সঠিক ভাবে চিনতে পারে এই পুরুষদের। তাই শাড়ি পরার কথায় চমকে ওঠে, সিঁদুরের মতো গোলাপের রক্তিমতাকে উপেক্ষা করে। ডুবে যায় চিন্তা স্রোতে— “Stream of consciousness” এর গভীরে, যেখানে অতীত তাকে শিক্ষা দেয়, অতীত দেয় সান্ত্বনার প্লেপ, দুঃখ ভোলার মানসিক জোর। বেলা মনডিয়ালের জীবনই আজ তার কাছে মূল্যবান। এই জীবনই তাকে দিয়েছে অভিজ্ঞতা, এই অভিজ্ঞতাই জানিয়েছে জীবনের প্রকৃত সংজ্ঞা। তাই “—এত সহের পর সে জীবনকে অনায়াসে আজ নিতে শিখেছে — সব কিছুকে অবজ্ঞা ক’রে, অবিশ্বাস ক’রে। জীবন আজ বেলা মনডিয়ালের কাছে পরম লঘু।”^{৭৭}

জীবন সম্পর্কে এই দৃষ্টিভঙ্গি বিমল করের সাহিত্যে বহু চরিত্রের মূল আইডিয়া; এই নিরাসক্তি বহু চরিত্রকে জীবনের দাবিতে ফিরিয়ে এনেছে প্রতিশ্রুতি ও প্রত্যাশার স্বাভাবিক গতিতে। কিন্তু বেলার চরিত্রের ট্রাজেডি এখানেই, সে যখন সব কিছু ভুলে গিয়ে বৈচে উঠতে চেয়েছে, তখনই সভ্য মানুষের আশ্রয় থেকে বহিস্কৃত হয়েছে। অন্ত্যজ শ্রেণীর এই সকল চরিত্র যেমন ভাবে নিজের জীবনের সুখ দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, প্রত্যাশা ও নৈরাশ্যকে বুদবুদের মতো সামান্য মনে

করে, ঠিক তেমনি এই চরিত্রগুলিও সমাজে ও পৃথিবীতে বুদ্ধবুদ্ধের মতো। জলের বুদ্ধবুদ্ধ যেমন ক্ষণস্থায়ী ও মানুষের কাছে উপেক্ষার বস্তু, তাকে যেমন মানুষেরা কেউ মনে রাখে না, এই সমস্ত সাধারণ, অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষেরা গুরুত্ব পায় না, সমবেদনা লাভ করে না। বেলা মনডিয়ালের মাধ্যমে লেখকের ব্রাত্যজীবন ভাবনাও বিশেষ ভাবে রূপ পেয়েছে বলে মনে হয়।

‘পিঙ্গলার প্রেম’ (শারদীয় ‘দেশ’, ১৯৫৪) গল্পে গ্রীক ট্রাজেডির সম্পর্ক আছে বলে বিমল কর নিজেই স্বীকার করে নিয়েছিলেন একটি সাক্ষাৎকারে। লেখক বলেছিলেন, “আমি যদি এখন বলি ভাল লিখেছিলাম, তা তো আর হয়না। তবে লোকের বোধহয় ভাল লেগেছিল। অনেকে বলেছিল। পরে বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় পিঙ্গলার প্রেম গল্পগ্রন্থের সমালোচনা করতে গিয়ে বলেছিলেন যে, গল্পটার মধ্যে গ্রিক ট্রাজেডির একটা ব্যাপার আছে। আমাকেও বলেছিলেন কথাটা। আমি বলেছিলাম, ই্যা তা তো আছেই। নইলে গল্পটা লিখব কেন?”^{৭৮} তবে এই সম্পর্ক নিয়তিবাদের ধারণার সাথে যুক্ত, এবং গল্পের প্রধান চরিত্র কিরণশশীর জীবনে প্রতিভাত হয়েছে এই নিয়তি। কিরণশশী, ভুবন চৌধুরী ও তার দলবল ফ্রেডস ড্রামাটিকের পরিচালনায় নাটক অভিনয় করতে এসেছিল মনোহরপুরে। কিরণশশীর সাথে নায়কের অভিনয় করেছিল সেখানকার স্থানীয় যুবক মৃগাঙ্ক। কিরণশশী অল্পবয়সী, অপেশাদার অভিনেতা মৃগাঙ্ককে প্রথমে গুরুত্ব না দিলেও তার অভিনয় এবং সুন্দর দেহসৌষ্ঠবের প্রতি কিছুটা আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। তিনদিনের নাটকে প্রিয়া, জয়া, জননী তিনরূপে অসাধারণ অভিনয় করে কিরণশশী যেমন প্রশংসা পেয়েছে, তেমনি তার মৃগাঙ্কের প্রতি মুগ্ধতা প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেছে কলকাতার থিয়েটারে অভিনয়ের ব্যবস্থা করার। এর পর মৃগাঙ্ক কলকাতায় ভুবন চৌধুরীর লেখা নাটকে রাজপুত্রের অভিনয়ের সুযোগ পেয়েছে। প্রথম রজনীতে অভিনয়ের সময়ই হঠাৎ নাটকের শেষ দৃশ্য বদলে ফেলেছে ভুবন চৌধুরী। রাজকুমারী পিঙ্গলার চরিত্রে অভিনেত্রী কিরণশশী সেই পরিবর্তিত শেষ দৃশ্যের অভিনয় করতে অস্বীকার করলেও তাকে অবশেষে বাধ্য হতে হয়েছে। ভুবন চৌধুরী অত্যন্ত নিষ্ঠুরতার মধ্য দিয়ে নাটকটিকে শেষ করতে চেয়েছিল। যেখানে রাজকুমারী পিঙ্গলা বরমালা নিয়ে আত্মবিস্মৃত প্রেমিক যুবকের জন্য অপেক্ষা করার পর জানতে পেরেছে, সেই যুবক তারই সন্তান। এই অভিনয় করার পর কিরণশশী বিগত কালের স্মৃতিচরিতার মাধ্যমে নিজ অন্যায়ের জন্য হতাশায় অপ্রকৃতিস্থ আচরণ করেছে এবং তারই জেরে মৃগাঙ্কের কাছে ঘণার পাত্রী হয়ে উঠেছে।

অভিনেতা ভুবন চৌধুরী নাট্যকার রূপে আত্মপ্রকাশ করল সেই নাটক লিখে যে নাটক লেখার প্রেরণা তার মনোহরপুরে আসার পর ঘটেছিল। এই গল্পে সে কিরণশশীর জীবনে খলচরিত্র রূপে কাজ করলেও অত্যন্ত গোপনে সে তার কর্মপন্থাকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। কিরণশশীর সাথে মৃগাঙ্কের বয়সের যথেষ্ট ব্যবধান থাকলেও, তাদের ক্রমশ ঘটে থাকা অন্তরঙ্গতা তার কাছে পরিহাসের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। মদ্যপ অবস্থায় তাই সে বলে, “কিরণ, আমার বাহির দুয়ারে কপাট লেগেছে, ভিতর দুয়ার খোলা।”^{৭৯} -- এই ভিতর দুয়ারে কিরণশশীকে কেন্দ্র করে হয়তো কোন সন্দেহ দানা বেঁধেছিল ভুবন চৌধুরী। কেননা এই কিরণশশী একদিন তার স্বামী ও কোলের সন্তানকে ফেলে তার সাথে চলে এসেছিল, সেই প্রবৃত্তি আবার হয়তো মৃগাঙ্ককে কেন্দ্র করে ঘটে যেতে পারে -- সে কারণে এই শঙ্কা ভুবন চৌধুরীর মনে অমূলক নয়। আমরাও গল্পে দেখতে পাই কিরণশশী মৃগাঙ্ককে প্রজাপতি ধরার ব্যাপারে বলতে গিয়ে মৃগাঙ্কের দ্বারা গতরাতের অভিনয়ের সময়কার চুষনের দাগ নিজের হাতে খুঁজতে খুঁজতে বলেছে, “অবশ্য তেমন করে কেউ যদি ধরতে পারে।”^{৮০} কিরণশশীর এই নিজেকে প্রজাপতি স্বরূপে ধরা দেওয়ার মানসিকতা মৃগাঙ্কের কাছে পরিণতি লাভ করে নি। কিরণশশীর মন থেকে মৃগাঙ্কের প্রতি অনুরাগ নষ্ট করার জন্য ‘পিঙ্গলার প্রেম’ নাটকেই ব্রহ্মাস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেছে ভুবন চৌধুরী। ‘পিঙ্গলার প্রেম’ ভুবন চৌধুরীর কাছে নাটক হলেও কিরণশশীর কাছে তার বিগত দিনগুলির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। নয়নতারা নামের একটি গৃহবধূ তার স্বামী ও সন্তানকে ত্যাগ করে একদিন হয়ে উঠেছিল কিরণশশী। আজ কিরণশশীর বয়সের প্রায় অর্ধেকবয়স্ক মৃগাঙ্ক তারও পরিত্যক্ত সন্তান হতে পারে, যেমন ভাবে নাটকে পিঙ্গলার ক্ষেত্রে ঘটেছে। কিরণশশীর জীবনে এই নিষ্ঠুর আঘাত আনার ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত অধিকারবোধ ভুবন চৌধুরীর মধ্যে আন্দোলিত হয়েছে তা মনে করা যায়। তাই নাটকের মাধ্যমে কিরণশশীর মৃগাঙ্ক সম্পর্কিত প্রত্যাশাকে যেমন বধ করেছে সে, তেমনি মৃগাঙ্কের সামনে কিরণশশীর বিকৃত অসংলগ্ন ব্যবহারকে উন্মোচিত করে তার মনেও এনে দিয়েছে বিবমিষার বোধ। দুই মানব-মানবীর মধ্যে অভাবনীয় ভাবে সম্পর্কের জটিলতার ইন্ধন জুগিয়ে অবশ্যম্ভাবী নিয়তির মতো নিজে আত্মপ্রকাশিত হয়েছে।

কিরণশশী, যার একদিন নাম ছিল নয়নতারা, সে স্বামী-সন্তান কে উপেক্ষা করে ভুবন চৌধুরীর সাথে চলে এসেছিল, এবং জীবনের প্রবাহে একদিন মৃগাঙ্কের প্রতি মনে মনে দুর্বলতা পোষণ করেছিল, কিন্তু তার জীবনের এই বহুভোগ্য মানসিকতা পরিণতি লাভ করেনি। এটাই তার

জীবনে ট্রাজেডি নিয়ে এসেছে এবং তা নিয়তির আকস্মিকতার মাধ্যমে। অবচেতনের প্রভাবে কিরণশশী অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায়ও বলতে থাকে — ‘জীবনে অমৃত দিতে পারলাম না, বিষ দিলাম তোমায়। প্রিয়তম-এ আমার নিয়তি।’^{৮১} কিংবা মনোহর পুরের তৃতীয় রাতের নাটকের সংলাপের সাথে সায়ুজ্য রেখে বলে ওঠে — ‘তুই ফিরে এসেছিস-খোকা।’^{৮২} কিরণশশী চরিত্রের এই ভগ্নহৃদয়ের রূপ অত্যন্ত মর্মস্পর্শী হয়ে উঠেছে।

বিশেষত একটি বিষয় বলা যেতে পারে, বিমল কর সমাজের মানুষের মধ্যে সহজ স্বাভাবিক সম্পর্কের ওপর আস্থাশীল ছিলেন। পরিবারের সকলের সাথে বেঁচে থাকতেই তিনি আনন্দ লাভ করেছেন। নয়নতারার নিজের গতি থেকে বিচ্যুতি, পারিবারিক নিয়মের স্বাভাবিকতা থেকে স্থলন, নিজের ভোগতৃষ্ণাকে উদ্দীপ্ত করে তোলার অসংলগ্নতা তিনি সমর্থন করেন নি। তাই নিয়তির প্রবল আঘাত হেনেছেন চরিত্রটির ওপর।

‘পালকের পা’ (১৯৫৫, দেশ) গল্পে বিমল করের সনাতন প্রথা ও বিশ্বাসের প্রতি আস্থা প্রকাশিত হয়েছে, যেখানে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে সরল মধুর আস্থা বিনষ্ট হয়নি বাহ্যিক পরিবেশের কামনাময় আমন্ত্রণের ঘূর্ণিতে। বিমল কর প্রেমের ক্ষেত্রে অহেতুক যৌনতাকে যেমন প্রশয় দেননি, তেমনি বিশ্বাসভঙ্গের দিক প্রকাশ করে অশোভন ভোগবাদিতাকে সমর্থন করেন নি। দাম্পত্য প্রেমের ছবি আঁকতে গিয়ে নরনারীর চিরন্তন বিশ্বাস বোধ ও নির্ভরতাকে ফুটিয়ে তুলেছেন। ‘পালকের পা’ গল্পে তুষারকণার অচরিতার্থ যৌনতাকে তীব্র ভাবে প্রত্যাখ্যান করে নিজের পারিবারিক শৃঙ্খলের মধ্যে চরম সুখের সন্ধান পেয়েছে তার এক সময়ের বন্ধু, বর্তমানে তার স্বামী মিত্রসাহেবের অধীনে কর্মরত মৃণাল। নৃপেন্দ্র মিত্র বা মিত্র সাহেবের অফিসে কর্মরত মৃণাল একদিন কর্মসূত্রে তাঁর বাথলোয় এসে আবিষ্কার করেছিল এককালের বান্ধবী, তুষারকণাকে, যে বর্তমানে মিত্র সাহেবের স্ত্রী। বন্ধুত্বকে ঝালিয়ে নেওয়ার পাশাপাশি সুন্দরী, কেতাদুরস্ত তুষারকে দেখে মনের সংগোপনে মিত্র সাহেবের সম্পর্কে ঈর্ষার মানসিকতা পোষণ করেছে মৃণাল। তুষারকণা মিত্রসাহেবের জীবনে কর্মের প্রেরণা, অবসরের গ্লানি হরণকারিণী, এক কথায় অসাধারণ। বিপরীত পটে মৃণালের মনে হয়েছে তার স্ত্রী কমলা ও তার সংসার বর্ণহীন, অনুজ্জ্বল, অতি সাধারণ এবং কষ্টদায়ক। তুষারকণার প্রতি মুগ্ধতা বশত নিজের স্ত্রী কমলাকে সে আবিষ্কার করে ঘাড়, মুখ গুঁজে বসে থাকা একতাল ছায়ার মতো, কিংবা— ‘একটা পদ্ম গরু কি ছাগল যেন আন্তার্কটের পাশে বসে জাবর কাটছে’।^{৮৩} এছাড়াও কমলার সাহচর্য, স্বাভাবিক কর্তব্যপরায়ণতা তার কাছে বিরক্তিকর মনে

হয়েছে। কমলার দেহের সামান্য বিসদৃশতা তার মনে জাগিয়েছে ঘৃণাবোধ; এর প্রমাণ মেলে সামান্য দাম্পত্য কলহেও মৃণালের অপরিসীম বিদ্বেষ প্রকাশ করার মাধ্যমে। মৃণাল মনে মনে নিজের স্ত্রীর মধ্যে তুষারকণার মতো সৌন্দর্য ও কেতাদুরস্ত ব্যবহার প্রত্যাশা করেছে। যা সম্ভব নয়, এবং তাই নিজের অপ্রাপ্তির বেদনা তার মনে ক্ষোভের সঞ্চার করেছে। সহকর্মী সামন্তের সাথে এই বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে মিত্র সাহেব ও তুষারকণার প্রসঙ্গ এনেছে মৃণাল। সে বলেছে, তুষার, “প্রতিদিন তার স্বামীর মধ্যে নতুন দিনের কাজ শুরুর আগুন জ্বালিয়ে দিচ্ছে। লোকটা তাই আজও এত খাটে, খাটেতে পারে। আমরা পারি না। আমাদের জীবনে কোন আকর্ষণ নেই। উৎসাহ পাব কোথায়? কার মুখ চেয়ে করব এই রক্ষা সংগ্রাম।”^{৮৪}

মৃণাল নিজের পরিবারকে উপেক্ষা করে তুষারের চোখ ধাঁধানো দীপ্তিতে আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। বোধ বুদ্ধিহীন মানুষের মতো তুষারের প্রতি তার উন্মাদনার সমধর্মী পরিবেশ তার সীমিত আর্থিক অবলম্বনের মধ্য দিয়েও সংসারে প্রত্যাশা করেছে। সে সামন্তকে বলেছে, “ঘরের মধ্যেই এসমস্ত ছোটখাট সুখ, উৎসাহ পাওয়া যায়। তোমার আমার স্ত্রী ইচ্ছে করলে স্বামীদের কি আর তা দিতে পারে না।”^{৮৫} জীবনের এই উজ্জ্বল আলোর প্রতি মুগ্ধতা, বাহ্যিক সৌন্দর্য ও আড়ম্বরতার প্রতি উৎসাহ তার মনে দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। তার বিভ্রান্তি সে নিজেই আবিষ্কার করেছে, তুষারের অন্তঃকরণের হৃদিস পেয়ে। অন্তঃসারশূন্য তুষারের পারিবারিক ও মানসিক ভাবনার রূপটিকে উপলব্ধি করার মধ্য দিয়ে মৃণালের বিশ্বাসের স্বর্গ খান খান হয়ে ভেঙে গেছে। অতি সাধারণ মানসিকতার মৃণাল তুষারের অশান্ত, অতৃপ্ত, অখুশি রক্তাক্ত হৃদয়ের সন্ধান পেয়ে ফিরে এসেছে নিজের পুরোনো বিশ্বাসের জায়গায়। একসময় সে যতই বলুক, “এই যুগটা অন্য রকম। ওসব হৃদয়, আত্মা, স্বর্গ-শান্তি—এসবের পুঁজিটুজি কাবার হয়ে গিয়েছে। এখন, এসময় দুটো জিনিস আমরা বুঝি স্পষ্ট, এক সুখ আর অন্য যা তাকে বলা যায় উন্মাদনা।”^{৮৬} তবুও নিজের স্ত্রীর অস্বাভাবিক, রগরগে, উদ্দীপনাময় সাজ দেখে, তুষারের অন্তঃসারশূন্যতাকে মনে পড়েছে এবং তারপরই নিজ পরিবারের সনাতন ভাবমূর্তিকে রক্ষা করার চেষ্টা করেছে সে। নিজের স্ত্রীর মধ্যে হৃদয়ের উষ্ণতা অনুভব করে খুশি হয়েছে। পাশে শুয়ে থাকা স্ত্রীকে গভীর সোহাগে আলিঙ্গন করে ভাবতে পেরেছে, “এখানে সে বা তারা ব্যর্থ নয়, একটা আবরণ থাকলেও এখন ওর পাশে পাতায় ঢাকা পদ্মকুঁড়ির মতন একটি হৃৎপিণ্ড ধুকধুক করছে।”^{৮৭}

মৃণালের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে বিমল কর আধুনিক মনস্তত্ত্বের অন্তঃসারশূন্যতার বিষয়টিকে সুন্দর ভাবে দেখিয়েছেন। ষাটের দশকের বহু লেখক আধুনিকতার নানা কদর্য ছবিকে তাদের সাহিত্যে রূপ দিয়েছেন। যেখানে অবৈধ সম্পর্কের ছবি যেমন আছে, তেমনই মানুষের বিশ্বাসের অপমৃত্যুকেও দেখানো হয়েছে। অন্তঃসারশূন্যতা, চমৎকারিত্ব, পাপ-পঙ্কিলতার প্রতি আবিষ্টি হওয়ার ছবির সাথে সেই আধুনিকতাকে মিলিয়ে ফেলা হয়েছে। বিমল কর এখানে সেই অন্তঃসারশূন্য আধুনিক মানসিকতার ছবি আঁকলেও অবৈধ সম্পর্কে মেনে নেন নি। নিজ বিশ্বাস ও সনাতন ভাবনার প্রতি আস্থা ফিরিয়ে দিয়েছেন মৃণাল চরিত্রের মধ্য দিয়ে।

‘শূন্য’ (১৯৫৬) গল্পটির কাহিনীর থেকেও আইডিয়ায় অভিনবত্ব চোখে পড়ার মতো। উত্তম পুরুষে লেখা এই গল্পটিতে বক্তার অতীতের স্মৃতির প্রাধান্য সূচিত হয়েছে, এবং সেই স্মৃতি তার মনে কেমন ভাবে দুর্বিষহ বেদনার সঞ্চার করেছে তা বর্ণিত হয়েছে। এই স্মৃতির মধ্যে রয়েছে বক্তা নিশীথের বিয়োগব্যথা জনিত কষ্ট; প্রেমিকা জয়ন্তীর সাথে পাঁচ বছরের সম্পর্কের পর বিচ্ছেদ, নিজের পাঁচ মাসের পুত্র সন্তানের আকস্মিক মৃত্যু, স্ত্রী লতিকার অন্য পুরুষের সাথে চলে যাওয়া, সহোদরা বোন আভার আত্মহত্যা —এই ঘটনাগুলো নিশীথের কাছে অত্যন্ত পীড়াদায়ক হয়ে এসেছে। এই হাহাকার, যন্ত্রণা তার মানসিকতার ওপর ক্রমশ চাপ সৃষ্টি করেছে। দুঃখকে ভোলার জন্য বন্ধু যোগাড় করে মদ খাওয়া, রেসের মাঠে জুয়া খেলা, বেশ্যা বাড়িতে মনোরঞ্জনর চেষ্টা করার পরও যখন তা নিবৃত্ত হয়নি, তখন ঘরকে আশ্রয় করে নিজেকে আত্মগোপনের মাধ্যমে শুশ্রূষার চেষ্টা করেছে সে, চেষ্টা করেছে ভগবৎ ভক্তির মাধ্যমে মনকে শান্ত করতে। কিন্তু এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে, নিজের একাকিত্বের জন্য কোন দুঃখ ভোলার ক্ষেত্রেই সাফল্য আসেনি। রাত্রে অনিদ্রা, স্বাস্থ্যের ক্রমশ অবনতি নিশীথের মা ও কাকার কাছে উদ্বেগজনক হয়ে ওঠায় তাঁরা ডাক্তার ডেকেছেন; কিন্তু কোন ডাক্তারই তার এই মনোরোগের চিকিৎসার সুব্যবস্থা করতে পারেনি। নিশীথ চেয়েছে—“শুধু যদি পাঁচ ছ’বছরের কথা আমি ভুলতে পারি—যদি এই ক’বছরের স্মৃতি বলে আমার কিছু না থাকে...!” কিন্তু ডাক্তার অবাক হয়েছেন তার রোগীর এই কথা শুনে। কারণ স্মৃতি একটি প্রবাহিত অভিজ্ঞতা, এটিকে মন থেকে হঠাৎই তুলে ফেলা যায় না। এর পর নিশীথের কাকা মৈত্রসাহেব নিশীথের চিকিৎসা করতে এসে তার জীবন থেকে একটি দিনের অভিজ্ঞতা তার অজ্ঞাতে সরিয়ে দিয়েছেন তাকে ঘুম পাড়িয়ে। মৃত্যু এবং এই ঘুমের মধ্যে কোন প্রভেদ না বুঝতে পেরে নিশীথ ভয় পেয়ে তার স্মৃতি নিয়েই বাঁচতে চেয়েছে।

অভিনব এই মননসর্বস্ব কাহিনী বিমল করে ছোটগল্পগুলির মধ্যে পৃথক একটি মাত্রা যোগ করেছে। মননসর্বস্ব বহু গল্পই লিখেছেন গল্পকার। বহু গল্পে মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্ট মূল বিষয় হয়ে উঠেছে, কিন্তু ‘শূন্য’ গল্পটি অভিনব হয়ে উঠেছে লেখকের চিন্তা-ভাবনার নতুনত্ব। মানুষের অবচেতন মন মানুষের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বা পরিচালিত হয় না। জীবনের সকল অভিজ্ঞতা মনের চেতন স্তর থেকে অবচেতন স্তরে এসে জমা হয়ে থেকে বিভিন্ন সময়ে চেতন স্তরের স্মৃতিকে যেমন প্রভাবিত করে, তেমনি অবচেতনে দ্রবীভূত হয়ে থাকা ঘটনাকেও উজ্জীবিত করে তোলে। তাই মানুষ সর্বদা আত্মনিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে এই স্মৃতিগুলিকে উপেক্ষা করতে পারেনা। কিংবা তার ইচ্ছানুযায়ী স্মৃতিগুলি গুরুত্ব পেতে পারে না। “মানুষের স্মৃতি জিনিসটা এই রকম। অতীত যেন ওই কুয়া। সেখানে আমরা খুঁজে বেড়াই কত কী! তবে যখন যা খুঁজতে চাই--পাই না তা, সেখানেও আলোড়ন লাগে, অন্ধকারে কোথায় কোনটা হারিয়ে যায়, ভেসে ওঠে অন্য কিছু।”^{১৯} তাই নিশীথ তার জীবনের গত পাঁচ-ছয় বছরের হতাশাজনক স্মৃতিকে ভুলতে চেয়েও ভুলতে পারে না। তার মনে হয়েছে এই স্মৃতির জ্বালায় সে সুস্থ মানুষের মতো বেঁচে থাকতে পারবে না, হয়তো পাগল হয়ে যাবে, নতুবা আত্মহত্যা করবে। কিন্তু এটাই তার জীবনের উদ্দেশ্য নয়। কারণ সে মনের দিক থেকে বাঁচতে চেয়েছে, চেয়েছে অনুকূল সুযোগ ও পরিবেশ; তাই ঘরে বাইরে জীবন ধারণের নানা আচার-অনুষ্ঠানের, ভোগের পরিবর্তনের মাধ্যমে সে পথ খোজার চেষ্টা করেছে। এর সপক্ষে সে বলেছে, “আমি পাগল হয়ে যাই, কি মরে যাই --এ আমি চাই নি। বাঁচতেই চেয়েছি আমি। খালি বুঝতে পারছিলাম না, কি করে বাঁচব-- জীবনের কতকগুলো অস্বস্তিকর, যন্ত্রণাদায়ক দিনের কথা ভুলে গিয়ে কি করে আবার বাঁচতে পারি!”^{২০}

এই দিক থেকে নিশীথ জীবনানুরাগ সমৃদ্ধ মানুষেরই প্রতিনিধি। জীবনের কান্না-হাসি, দুঃখ-সুখ, বেদনা-আনন্দ, ব্যর্থতা-সাফল্য সমস্ত কিছুর ওম মেখেও যে সকল মানুষ এই পৃথিবীতে বেঁচে থেকে পৃথিবীর রূপসুখ, রসসুখকে আত্মস্থ করতে চায়, নিশীথ তাদের প্রতিনিধি। আবার নিশীথের সমস্যা ও তার হতাশার দিকটির সাথে আধুনিক মনস্তত্ত্বের ভাবালুতার সম্পর্কও বিদ্যমান। ‘Stream of consciousness’ এর গভীরে লুকিয়ে থাকা বেদনা নিশীথের কাছে সৃষ্টি করেছে সর্বব্যাপ্ত এক শূন্যতা, যেখানে কোন জ্ঞান-জাত উপলব্ধি সাপ্তনার আবহ তৈরি করতে পারে না। জয়ন্তী সুন্দরী নয়, তার অসাধারণত্বের কোন গুণ তেমন ভাবে চোখে পড়ত না নিশীথের, তবু সেই মোহ থেকে স্মৃতিকে বিচ্যুত করা যায় নি। খোকার প্রতি গভীর ভালোবাসা থাকলেও তার মৃত্যুর পর সেহ

স্মৃতি ক্রমহ্রাসমান হওয়া উচিত, তবুও তা হয় নি। লতিকার চলে যাওয়ার পেছনে তার বিবাহপূর্ব প্রেম এবং সেই পুরুষটির প্রতি আনুগত্য লাভের ইচ্ছার প্রমাণ লক্ষিত হয়েছে। শুধু আভার আত্মহত্যার পিছনে কোন যুক্তি নিশীথ খুঁজে পায়নি। তবুও ভাবা যায় স্বামীর সাথে বিচ্ছেদের যন্ত্রণা পিতৃগৃহে সান্ত্বনা লাভ করতে পারে নি। কারণ মানুষের অন্তর-জগৎ সমস্ত যুক্তি-বুদ্ধির উর্ধ্বে, এবং তা মানুষ ভেদে স্বতন্ত্র। “ভালোবাসা, সততা, স্নেহ, দাম্পত্য জীবন--এইসব ছোট ছোট চার কি পাঁচ অক্ষরের শব্দগুলোর মধ্যে যে-ধারণাগুলো থাকে সেগুলো কিন্তু ছোট নয়। এরা প্রত্যেকেই এক একটা জগৎ।”^{১১} মানুষের মনও এই জগৎগুলোকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। তাই প্রতিটি মানুষের কাছেই জগতের ও জীবনের অনুভূতি ও দর্শন বদলে যায়। আভার আত্মহত্যা, জয়ন্তীর সাথে বিচ্ছেদ, লতিকার পরপুরুষের সাথে চলে যাওয়ার মত আধুনিক সমস্যা যেমন আছে, তেমনি এর পেছনে রয়েছে মানুষের সূক্ষ্ম অনুভূতির নানা বৈচিত্র্য। পরিবারের ভাঙন, প্রেমে অবিশ্বাস ও সন্দেহ, মানুষের নিরন্তর চাহিদা মনের ধৈর্যহীনতা এবং তাই নিত্য-নতুন জীবনধারণার প্রতি আগ্রহ মানুষকে আরও বেশি নিঃসহায়, নিঃসম্বল করেছে; এনে দিয়েছে একাকিত্বের জ্বালা।

মৈত্র সাহেব নিশীথের মানসিক রোগের চিকিৎসার জন্য নিশীথের নিজের প্রকৃত অনুভূতির বৈচিত্র্যকে অবলম্বন করেছেন। একদিনের টানা ঘুমের ব্যবস্থা করে নিশীথের কাছ থেকেই জেনে নিয়েছেন এই অচেতন ঘুম ও মৃত্যুর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। নিশীথ নিজে ভয় পেয়েছে এই ভাবে বেঁচে থাকতে, কারণ তার কাছে এই বেঁচে থাকা--“আমি ছিলাম, কিন্তু সে থাকা একটা বন্ধ ঘড়ির মতন”^{১২} --গোত্রের। নিশীথ তা চায়নি; কারণ সে চায় প্রাগোম্পর্শী একটা মানুষের মত বেঁচে থাকতে, যে অনুভব করতে পারে--রিঅ্যাক্ট করতে পারে।

বিমল কর জীবনের এই আশাবাদী মানসিকতার প্রতিই তার আকাঙ্ক্ষাকে বার বার নানা চরিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন--যারা জীবনে শত শত ব্যর্থতার পরও জীবনকে ভালোবেসেছে। তার গল্পে নানা ভাবে মৃত্যুর প্রসঙ্গ এসেছে তবুও মৃত্যু জীবনভয়ে ভীত মানুষের পলায়ন প্রবৃত্তিতে আচ্ছন্ন নয়--মৃত্যুর মাধ্যমে পরিণতি টেনেছেন তিনি সেই জীবনের-- যেখানে মৃত্যু অনেক বেশি জীবনের উত্তাপে সমৃদ্ধ। আধুনিক জীবনের হতাশা, যন্ত্রণার রূপ মানুষের মনকে আচ্ছন্ন করলেও, এই সমৃদ্ধ জীবন ও সুন্দর জগৎ নিয়ে বেঁচে থাকাতেই প্রকৃত সুখ, প্রকৃত পরিতৃপ্তি। “আফটার অল শূন্য থেকে আমরা শুরু করেছিলাম এখন এক দুই করে নয় পর্যন্ত

এসেছি। আমরা শুধু আশা করব—পরের শূন্য আসুক,—কিন্তু শুরুর শূন্য নয়, শেষের শূন্য। লেট আস মেক টেন, টুয়েন্টি...।”^{১০}—এটাই জীবনে বেঁচে থাকার ক্ষেত্রে যথার্থভাবে আশাবাদী মানসিকতায় উত্তীর্ণ হওয়ার পথ বলে মনে করেছেন লেখক।

‘জানোয়ার’ (১৯৫৬) গল্পে আধুনিক জীবন সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে দুটি নরনারীর মনস্তত্ত্বকে ছোঁয়ার চেষ্টা দেখা গেছে। নিজস্ব জগতে আচ্ছন্ন হয়ে থাকা অপরের কাছে যে পীড়াদায়ক হতে পারে, এবং তার ফলে সম্পর্কের অবনতি হতে পারে, তা এই গল্পের বিষয়। সুধীবন্ধু সোম বা এস. বি. সোম মাত্র চল্লিশ বছর বয়সের মধ্যেই চাকরি জীবনে বিরাট সাফল্য লাভ করেছে। এই সাফল্যের পেছনে রয়েছে তার অত্যন্ত কড়া মানসিকতার প্রশাসনিক ক্ষমতা, যেখানে মানবিকতার স্থান নেই বললেই চলে। সোনাপুর এ্যালুমিনিয়াম কারখানায় সেই নিয়মের শৃঙ্খলে সকলকে বাঁধার প্রচেষ্টায়, অসদাচরণের সামান্যতম সুযোগ থেকে সকলকে বঞ্চিত করার ফলে কোম্পানীর উপরমহলে সে খুব খ্যাতির পেলেও, সাধারণ কর্মীদের কাছে তার নামকরণ হয়ে গিয়েছিল ‘শুয়োরেরবাচ্চা সোম’।

সোমের অতি পেশাকেন্দ্রিক মানসিকতা এবং তা থেকে জাত রূঢ়তা তার সামাজিক জীবনকেও করে তুলেছিল বন্ধুহীন, একাকী। সোমের আত্মকেন্দ্রিক মানসিকতা কিছু কিছু ক্ষেত্রে ভব্যতার মাত্রাকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিল। নিজের নিরাপত্তার জন্য সে বাহাদুর ও দুটো অ্যালসেসিয়ান কুকুর রাখার ব্যবস্থা করেছিল। কিন্তু সোমের এই আচরণ তার স্ত্রী অতসীর কাছে অত্যন্ত পীড়াদায়ক হয়ে উঠেছিল। সারাটা দিন বাংলাতে থাকার একাকিত্ব মোচনের জন্য পাশুবর্তী কোয়ার্টারগুলোতে সোমের সহকর্মীদের পরিবারের সাথে সময় কাটাতে গেলে বা বন্ধুত্ব স্থাপন করতে গেলেও তাদের কাছে স্বাভাবিক ভালো ব্যবহার পায়নি অতসী। সকলেই তাকে সোমের স্পাই বা ইনফরমার ভাবতে শুরু করেছিল। অতসীর যে একটা সামাজিক জীবন আছে, তারও যে একটা সময় কাটানোর বন্ধুত্ব স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা আছে তা স্বীকার করতে চায়নি সোম। বরং সোম প্রস্তাব দিয়েছে বাহাদুরের কাছে বন্দুক ছোঁড়া শিখতে। এই প্রস্তাব শুনে সোমের রুচি সম্পর্কে প্রশ্ন উঠেছে নিজের মনে এবং সে কারণেই সোমের মনের পশুত্বকে, অমানবিকতাকে শাস্তি দেওয়ার অভিপ্রায়ে তাকে প্রতারণা করার পথই সে বেছে নেয়।

এই গল্পে আধুনিক জীবনের যে সমস্যাকে দেখানো হয়েছে, সেখানে দুই নর-নারী, সোম ও অতসী নিজের বৃত্তের মধ্যে আবদ্ধ থেকে জগৎকে বিচার ও বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছে। অতসী সম্পর্কে

সোম ভেবেছে অতসীর মানসিক চাহিদা মূল্যহীন। মেয়েলি গল্প করার চেয়ে রেডিও বাজানো, রেকর্ড বাজানো, ছুঁচের কাজ নাচ-গান-নভেল পড়া অনেক গুরুত্বপূর্ণ; সময় কাটানোর জন্য বাগান, বাহাদুর এরাও যথেষ্ট ভালো উপকরণ। অতসীর সোমের এই প্রস্তাব অত্যন্ত মানবিকতা শূন্য ও অশীল মনে হয়েছে। কিন্তু সোমের প্রতি তার ঘৃণা যে সোমকে বিচলিত করবে না এটাও সে জেনেছে। বাহাদুর ও দুটো কুকুরকে নিয়ে জান্তব পরিবেশে থাকতে থাকতে সোমের মানসিকতাকে উপলব্ধি করে সোমকেও জন্তু বলে মনে হয়েছে তার। এই জান্তব পরিবেশে ও সমাজ বহির্ভূত জীবনের জন্য সে সোমকে দায়ী করে তার বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হয়েছে। বুঝিয়ে দিতে চেয়েছে আধুনিক সমাজের নারী হিসেবে সে সোমের প্রদর্শিত পথে চলতে পারে না। “বিতৃষ্ণা ও বিদ্বেষ বাড়তে বাড়তে চরমে উঠল। সোমকে আর সহ্য হয় না। তার কাছে পর্যন্ত যেতে অতসীর আজকাল অদ্ভুত একটা ঘৃণা হয়। সোম মানুষ নয়--স্বামী তো কিছুতেই নয়--পশু, পশুর চেয়েও অধম একটা জীব। যদি অতসীর সাহ্য থাকত এই লোকটিকে সে বুঝিয়ে দিত সারা সোনাপুর শুধু নয়--তার ঘরের স্ত্রী পর্যন্ত তাকে অত্যন্ত জঘন্য একটা মানুষ বলে ভাবে--ঘৃণা করে--ভীষণ ঘৃণা।”^{১৪} এই চিন্তাধারাকে পরিণতি দেওয়ার জন্য অতসী অবশেষে একদিন বাহাদুরের সাথে অবৈধ সংসর্গে লিপ্ত হয়ে নিজের স্বামী সোমকেই প্রতারণা করেছে।

আধুনিক জীবনে যেখানে নর-নারীর সমানাধিকার বন্টিত হয়েছে। ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যে নারীও সেখানে উজ্জ্বল ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত। তার নিজস্ব সামাজিক স্বীকৃতি সে অর্জন করতে পারে, এবং অন্তরায়গুলিকে সে দূর করার ব্যাপারে নিজেই সচেষ্ট হতে পারে। সোমের কাছে স্ত্রী হিসেবে ভালোবাসা, গুরুত্ব, সামাজিক জীবনে প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অনুকূলতা পেতে সে ব্যর্থ হয়েছে। সোম সম্পর্কে তার মনে হয়েছে— “সোম তেমন মানুষ যার কাছে দাম্পত্য জীবন কি স্ত্রী কিংবা সংসার বিশেষ একটা আকর্ষণ নয়। সকালের চা, দুপুরের ভাত, রাত্রে ঘুমের মতন স্ত্রী, সংসার সবই একটা স্বাভাবিক অভ্যাস। তার বেশি কিছু নয়।”^{১৫} তাই বাহাদুরের হিংস্রতার সাথে সোমের মানসিকতার কোন প্রভেদ তার কাছে থাকে না। বাহাদুরের কাছে তাই তাকে বলতে শোনা যায়— “তোমারা দেশ জঙ্গলমো। তোমারা আর তোমারা সাহেবকা। মালুম—।”^{১৬} অতসীর বাহাদুরের সাথে অবৈধ সংসর্গের পিছনে তার যৌনতার প্রকাশ ঘটেনি। নারীতে, ব্যক্তিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠার জন্য সোমের প্রতি প্রতিবাদ ধ্বনিত করে তুলেছে সে। এ কারণেই সোম তাকে আবিষ্কার করেছে সেই রূপে—যা সে কোনদিন কল্পনাও করেনি; নিজের কথাই বুঝেছে হয়ে তার দিকে ফিরে

আসবে এটা সোমের কাছে ছিল অপ্রত্যাশিত। অতসী বাহাদুরের কাছে বন্দুক ছোঁড়া শিখেছে, হাতে তুলে নিয়েছে ছুঁচের কাজ, কিন্তু তার সাথে যুক্ত হয়েছে তার দেহে ফুটে ওঠা অন্য পুরুষ বাহাদুরের দ্বারা ভোগসুখের চিহ্ন। আর অতসী ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল হয়ে, অবিচলিত ভাবে প্রকাশ করেছে, “এই সংসারটাই তো জানোয়ারের!”^{৯৭} এই বক্তব্যে একটি নারীর হতাশা কোন ভাবেই গোপন থাকতে পারে নি।

‘অশ্বখ’ (‘দেশ’, ১৯৫৬) গল্পটি একটি জটিল মনস্তত্ত্বমূলক গল্প। এই গল্পের প্রধান চরিত্র রেণু’র অবচেতন মন বেশ কিছুক্ষেত্রে তার চালিকাশক্তি রূপে কাজ করেছে। নিঃসঙ্গতা ও একাকিত্ববোধ বিশেষ ভূমিকা নিয়েছে রেণুর মনে। নবনী অর্থাৎ তার স্বামী কাজে বেরিয়ে যাওয়ার পর সম্পূর্ণ এক হয়ে যায় রেণু। তবুও এই একাকিত্ব তার কাছে পীড়াদায়ক মনে হয়নি। পুরোনো বাজারের যে বাড়িতে আগে তারা থাকত সেই বাড়ি ছিল লোকালয়ের মধ্যে এবং কলরবে পূর্ণ, কিন্তু রিভারসাইডের বাড়িতে আসার পর সম্পূর্ণ নিরিবিলি জগতে এসে হাজির হয়েছে তারা, যদিও এই বাড়টিকে বিশেষ কারণে পছন্দ করেছিল রেণু। এই বাড়িতে ছিল একটি অশ্বখ গাছ, রেণুর মনে হয়েছিল, ‘যার একটা বিরাট শাখা প্রশাখা পল্লবে পাতার জাফরি বুনে উঠোনের আধখানা ঢেকে ফেলেছে। আলো আর আকাশ, আর মেঘ এবং পাখি ও তারা সেই জাফরির বুননি আলগা করে করে রেণুকে হাতছানি দিচ্ছে সবসময়।’^{৯৮} এই বাড়িতে আসার পর সে ভালোবেসেছিল গাছটিকে। গাছের পাতাগুলো, শাখা-প্রশাখা, তার সাথে উড়ে আসা পাখি সব নিয়ে তার একাকী থাকার সময় খুব ভালো কাটতো। শীতের শেষে যখন পাতা ঝরার পালা শুরু হয়েছিল, তখনও পাতা ঝরার খেলার সাথে সে নিজেকে মাতিয়ে ফেলেছিল। নিজের মনে মনে অশ্বখের সাথে সে কথা বলত, --সে কথা ছিল গভীর ভালোবাসার। ঠিক এমনি এক দিনে নবনীর কাছে রেণু গাছটি সম্পর্কে ছদ্ম রাগ দেখিয়ে বলেছিল, “কচি ছেলে থাকারও অধম হয়ে উঠেছে বাড়িটা! কি যে জ্বালায় বাপু এই অশ্বখগাছটা, কি বলবা!”^{৯৯} এই বক্তব্য সম্পূর্ণ ভাবে সুখের অনুভূতিসম্পন্ন এবং গভীর স্নেহযুক্ত। কেননা নবনী যখন বলেছে, “তোমারই তো গাছ! একটু জ্বলা!”^{১০০} তখন রেণুর মনে ‘তোমারই’ শব্দটা গভীর অর্থবাহী হয়ে উঠেছে। যদিও গাছটা তার হাতে লাগানো নয়, ‘তবু তা যদি নিজের রক্ত-মাংস থেকে একটা সেই গাছ হত--এমনি করে জ্বালাতা!’^{১০১} এই কথার মাধ্যমে রেণু একজন পরিপূর্ণ নারী রূপে তার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাকে উজ্জ্বল করে তুলেছে।

রেণুর কাছে অবসর ও একাকিত্ব আরও নিবিড় হয়ে উঠেছে তার গর্ভে সন্তান আসার পর। কমহীনতা ও অবসর যাপনের গ্লানি তার মনে নিয়ে এসেছে সাত-পাঁচ কল্পনা ও স্বপ্নে বিভোরতার আবেশ। এক সময় অশ্বখকে নিয়ে এই জানাশোনা ও ভাববিভোরতা থাকলেও সন্তান জন্মানোর পর থেকে রেণু ক্রমশ অশ্বখ গাছটি থেকে মানসিক ভাবে দূরত্ব সৃষ্টি করেছে। শিশুকে গভীর ভাবে মনযোগ দিতে গিয়ে তার মনে হয়েছে বারান্দায় বা উঠানের রোদে সে শিশুটিকে নিশ্চিন্তে শোয়াতে পারে না অশ্বখের পাতা বা ডালে শিশুর কোমল দেহে আঘাত লাগার ভয়ে। একদিন পাখি-বাহিত মরা সাপ তার খোকনের পাশে পড়ে থাকতে দেখে সে ভয় পেয়ে যায়। এই সকল কারণে তার মনে হয়েছিল খোকনের নিরাপত্তার কারণে বাড়ি বদল করাই একমাত্র পথ। অশ্বখকে দোষারোপ করে নবনীরা কাছে বলেছিল, “যেদিন থেকে ছেলে কোলে এসেছে, ওটা যেন আমার সঙ্গে শত্রুতা করছে! ওই শত্রু একদিন আমার সব নেবে!”^{১০২} মনের অবচেতনে সৃষ্টি হওয়া এই দুষ্টিস্তার জেরে রেণু বাড়ি বদল করেছে। অপত্য স্নেহে একদিন যে গাছকে সে ভালবেসেছিল রক্তমাংসের শিশুর কাছে তাকেই প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করেছে সে। কিন্তু বাড়ি বদলের পরও আকস্মিক ভাবে যখন তার খোকার মৃত্যু ঘটেছে, রেণুর চোখের সামনে গোটা পৃথিবীটাই নিঃসঙ্গতায় ভরে উঠেছে। কিন্তু এই অবস্থায়ও অশ্বখের স্মৃতি তার মন থেকে মুছে যায় নি। বরং আরও বেশি মানবিক সংবেদনে ভরে উঠেছে তার হৃদয়ে। “ওই হিংসুক গাছটা খোকনকে সহ্য করতে পারেনি। তারপর বিষ-নিঃশ্বাস হাওয়া এখানে ছড়িয়ে দিয়েছে। তারপর যেন রেণুকে ঠিকমতন জব্দ করতে, উচিত শিক্ষা দিতে ছৌঁ মেরে খোকনকে উড়িয়ে নিয়ে চলে গেছে ভরা কোল থেকে। কি হংস আর হৃদয়হীন ওই তরু!”^{১০৩}

অশ্বখ সম্পর্কে এই সকল ভাবনা তার মনে যত আক্রোশ সৃষ্টি করেছে, মন থেকে সে গাছটিকে যতই ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করেছে, ততই যেন গাছটি সম্পর্কে তার অনুভূতির মাত্রা নতুন দিক খুলে দিয়েছে। সেই ভাবনার চরম রূপ প্রকাশ পেয়েছে একদিন, মেঘলা দুপুরে। নিজের মনের রিক্ততার সাথে যখন প্রকৃতির রিক্ততার মিল রেণুর কাছে অনুভূত হচ্ছিল, তখনই হঠাৎ বয়ে আসা দমকা হাওয়ার সাথে উড়ে এসেছিল একটি অশ্বখ পাতা, স্থান নিয়েছিল তার বুকের মাঝখানে। হঠাৎই পাতাটিকে ঘৃণা করতে গিয়ে থমকে গিয়েছিল রেণু অব্যক্ত বাসনা অবচেতনের মাধ্যমে ক্রিয়া শুরু করেছিল। পায়ে পায়ে কিছুটা দূরের সেই বাড়িতে হেঁটে চলে এসেছিল সে অজ্ঞাতে। উদ্বেলিত অপত্য স্নেহের আতিশয্যে অশ্বখের গোড়ায় নিজের স্তনভার মুক্ত করে দিয়ে

শাস্তি-স্বস্তি পেয়েছিল। সংজ্ঞা ফিরে পাওয়ার পর তার ফিরে আসার চিত্রের মধ্য দিয়ে লেখক ফুটিয়ে তুলেছেন রেণুর মাতৃস্বরূপকে, ‘দুখ খাইয়ে, আর এক আবোধ শিশুকে ঘুম পাড়িয়ে রেণু খুব নিশ্চিন্ত মনে এবার ফিরে যাচ্ছিল।’^{১০৪}

অবচেতনের দ্বারা এই কাজটি সম্পন্ন হলেও রেণুর মাতৃহৃদয়ের অপরিসীম অপত্যস্নেহ উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। অশ্বখকে ভালোবাসা, নিজের সন্তান আসার পর সেই অশ্বখের সঙ্গেই দূরত্ব সৃষ্টি হওয়া অত্যন্ত মানবিক গুণ। কেননা নিজের সন্তানের প্রতি মাতৃস্নেহ অত্যন্ত স্বার্থপর। কিন্তু যখন সেই সন্তানই ফাঁকি দিয়ে চলে যায়, তখন উদ্বেলিত মাতৃসুখা সকল সন্তানের সাথে নিজের সন্তানের প্রভেদ ঘুচিয়ে দেয়। তাছাড়া অশ্বখের সাথে তো রেণুর সম্পর্ক সন্তানের মতোই ছিল। তাই বুকে স্থান নেওয়া শুকনো অশ্বখ পাতা দেখে রেণুর মনে হয়েছে তার প্রিয় অশ্বখ যেন তার সন্তানের মতোই স্তনপানের জন্য উদগ্রীব হয়ে রয়েছে। গাছের সাথে মানুষের সম্পর্ক বহু ছোটগল্পেই প্রকাশিত হয়েছে। গাছের মধ্যে মানবিক গুণের আরোপ ও কিছু নতুন নয়। কিন্তু গাছের সাথে রক্তমাংসের সন্তানের প্রভেদহীনতা, এবং তার জন্য মাতৃহৃদয়ের উদ্বেলিত অপত্যস্নেহের আকর্ষণ বিমল করের গল্পটিকে একক স্বাতন্ত্র্যযুক্ত বৈশিষ্ট্যে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। বিমল করের বহু গল্পের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল উল্লেখযোগ্য কোন চরিত্রকে বিশেষ ভাবে আলোকিত করে তোলার প্রবণতা। এ কারণেই তাঁর গল্পে চরিত্র-প্রাধান্য স্বীকৃত হয়েছে। চরিত্রের মনোবিশ্লেষণ কিংবা তার নিরিখে বহু প্রকার আচরণের প্রতি তিনি অত্যন্ত মনোনিবেশ করেছেন। ‘অশ্বখ’ গল্পেও রেণু চরিত্রের প্রাধান্য স্বীকৃত হয়েছে। রেণুর চেতন ও অবচেতন মনের মধ্যে তার ভাবধারার প্রবাহ এই গল্পের বিশেষ দিক। রেণুর মাতৃহৃদয়ের যে অপত্যস্নেহ লেখক দেখানোর চেষ্টা করেছেন তা তুলনারহিত। অশ্বখ কিংবা নিজের সন্তান এই দুই বিপরীত ধর্মী বিষয়ের সাথে তার যে যোগসূত্র রচনার প্রয়াস তা ব্যাখ্যায্য। মাতৃমনে শিশুর প্রতি অনুকম্পা, তাকে ঘিরে ভাবনার জগৎ, কিংবা শিশু-প্রতিম অশ্বখের সাথে মানসিক সহাবস্থান এর ঔচিত্য, অনৌচিত্যের দিক কিংবা বাস্তব, অধিবাস্তব সম্পর্কিত ভাবনা—এর কোন যুক্তিগ্রাহী বিশ্লেষণ চলে না। অবুঝ মাতৃহৃদয়ের সারল্য, প্রাপ্তির হর্ষ, হারানোর হাহাকার সব মিলিয়ে রেণু চরিত্রটিকে একেবারে রক্তমাংসের স্পন্দনপূর্ণ মানবীতে রূপান্তরিত করেছেন লেখক।

গল্পটিতে বাস্তব ও পরাবাস্তবের মেলবন্ধন অত্যন্ত সুন্দর। “বিমল করের গল্পে একদিকে আছে ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য জগৎ, অন্যদিকে চেতনায় প্রতিফলিত জগৎ বা পরাবাস্তবতার জগৎ। বাহ্যিক

মৃত্যুর অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে চরিত্রগুলি আত্মজিজ্ঞাসার সম্মুখীন হয়। বাইরের প্রকৃতি সেক্ষেত্রে বিষণ্ণতার এক চালচিত্র হয়ে ওঠে। শান্ত, নিস্তব্ধ, নিস্তরঙ্গ প্রকৃতি থেকেও যেন জীবন্ত।”^{১০৫} রেণুর অশুখের প্রতি ভালোবাসা, সন্তান আসার পর মনে মনে গাছটিকে নিজের সন্তানের প্রতিদ্বন্দ্বী খাড়া করা, গাছটিকে দোষারোপ করা এবং মাতৃহৃদয়ের অকল্যাণকর সম্ভাবনার সার্থক রূপায়ণঘটা, অবশেষে অশুখ গাছটিকে সন্তানের মতো দেখার পেছনে বাস্তবের পাশাপাশি একটা বোধ-বুদ্ধির অগোচরে লুকিয়ে থাকা ঐন্দ্রজালিক গুণ, একটা পরাবাস্তববাদী জগত এই গল্পে সক্রিয় হয়ে উঠেছে। কাহিনী, চরিত্র, শিল্পসুখমা সমস্ত দিক দিয়েই গল্পটি অসাধারণ হয়ে উঠেছে।

সর্বশেষে একটি বিষয় আলোচনা করা প্রয়োজন বলে মনে হয়, তা হল বিমল করের গল্পে কিছু কিছু ক্ষেত্রে মৃত্যুজনিত বিয়োগ ব্যথা বড় তীব্র ভাবে হৃদয়কে নাড়া দেয়। শৈশবে নিজের সহোদরা বোনের আকস্মিক মৃত্যুর অভিজ্ঞতার সাথে পরবর্তী কালে পরিবার ও পরিবারের বাইরের কয়েকজন মানুষের মৃত্যু তাঁর মনে মৃত্যুভাবনার বিশেষ দিক উন্মোচিত করেছিল। তিনি নিজে যদিও বলেছেন “...আমার মাথায় ওই যুবক বয়স থেকেই ‘মৃত্যু’ একটা ভাবনা হিসেবে এসেছে। পরবর্তী কালে আমার অনেক গল্পেরই বিষয় মৃত্যুচিন্তা বা দুশ্চিন্তা।”^{১০৬} --তবুও মনে হয় তাঁর প্রথম দিকের এই সকল গল্পে মৃত্যুদৃশ্যগুলি অত্যন্ত নিষ্ঠুরতা নিয়ে এসেছে। সুতীর হাহাকার ও বেদনার বোধ এর মধ্যে সম্পৃক্ত হয়ে আছে, যা অত্যন্ত করুণ, তীব্র, হতাশাময়। ‘আত্মজা’ গল্পে হিমাংশুর মৃত্যু, ‘বুদবুদ’ গল্পে বেলার শিশুর বীভৎস মৃত্যু, কিংবা ‘অশুখ’ গল্পে রেণুর খোকনের মৃত্যুর যন্ত্রণা যেন নগ্নভাবে আঘাত করেছে হৃদয়কে।

‘আঙুরলতা’ (শারদীয় ‘দেশ’, ১৯৫৬) গল্পটির শুরুতে মৃত্যুর প্রসঙ্গ এলেও, তা নিষ্ঠুর ভাবে বর্ণিত নয়, বরং তাতে নির্লিপ্তি এসেছে। আঙুরলতা নন্দকে দেখেছে “একটা কালো পিপড়ে উঠেছিল পলকের তলায়। ঘাড়টা একটু কাত হয়ে রয়েছে। ঠোঁট সামান্য ফাঁক। সমস্ত মুখখানা সেদ্ধ করা বাসি ডিমের মতো শুকনো, শক্ত ফ্যাকাশো।”^{১০৭} নন্দর এই মৃত্যুতে আঙুরলতা কাঁদলো না, টেঁচামেচিও করল না। বরং তার এই প্রাক্তন প্রেমিক, বর বউ সেজে থাকার সঙ্গী, নন্দর ওপর তার বিরক্তি বোধ হয়েছে। মৃত নন্দকে যেমন সে গালাগালি দিয়েছে, তেমনি তার বুকের ভিতরে টনটন করে উঠেছে। নন্দের মৃত্যু, তার স্মৃতি আঙুরকে বার বার টেনে নিয়ে গেছে অতীতে। একদিন কান ফুসলে আঙুরকে নিয়ে এসেছিল নন্দ এই বেশ্যাপটুতে। প্রথমে চেষ্টা করেছিল নিজেই ভোগ করার। কিন্তু “বছর কাটতেই আঙুরের রস শুষে শুষে ছিবড়ে করে ফেলল

নন্দ। আর সুখ নেই, স্বাদ নেই, অরুচি ধরে গেছে। পালাল নন্দ। কিছু না বলে ঘর দেওয়ালের বন্ধন কাটিয়ে। তারপর চার বছর আর এ পথ মাড়াল না।”^{১০৮} মৃত্যুর আগে আঙুরের কাছে আশ্রয় নিয়েছিল সেই নন্দ। অনেক গালাগালি, ভৎসনা, কটুক্তি সত্ত্বেও শরীরটাকে ঈপ্সে দিয়েছিল সে আঙুরের আশ্রয়ে, সাহায্যের ভিক্ষায়। আঙুর মুখে তাকে দূর দূর করলেও শেষ পর্যন্ত স্থানীয় ডাক্তার ও পরে চটকলের বড় ডাক্তারকে দেখিয়ে সঞ্চিত অর্থ সমস্ত শেষ করেও সুস্থ করতে পারল না। এর পরই শুরু হয়েছে তার মানসিক দ্বন্দ্ব ও জীবন যুদ্ধের নতুন রূপ।

হিন্দু ঘরের মেয়ে আঙুরলতা, চক্রবর্তী বামুনের ছেলে নন্দের হিন্দু-প্রথামতে সংকারের চেষ্টা করেছে। কিন্তু বাস্তব হাতড়ে খুঁজে পেয়েছে একটাকা সাড়ে এগারো আনা। এর পর হিমুর কাছে দু’টাকা ধার করে ও নিজের একমাত্র ভালো পাটের শাড়িটা আতার কাছে বিক্রি করে পাওয়া আড়াই টাকা, সর্বসাকুল্যে প্রায় ছ’টাকা নিয়ে বিস্তার কাছে গিয়েছিল নন্দের সংকারের ব্যবস্থা করতে। কিন্তু বিস্তার সাথে অনেক দর কষাকষির পরও যখন প্রায় ছ’সাত টাকার ঘাটতি হল তখন আঙুরলতার জীবনে এল নতুন যুদ্ধ ও নতুন প্রত্যয়। ভোটভিক্ষা করতে আসা মানিকবাবু যখন ভদ্রতার মুখোশ পরে আঙুরকে এড়িয়ে গেল আঙুরের রাস্তা ততক্ষণে অত্যন্ত সংকীর্ণ হয়ে এসেছে। তার জীবনে নতুন পরীক্ষার আয়োজন ঘটেছে। বেশ্যা পট্টির মেয়ে হয়েও যে লোকটিকে সে ঘৃণা করত সেই প্রভুলালের কাছে পৌঁচেছে আঙুর। আঙুরকে দেখলেই প্রভুলালের “একটা চোখ চকচক করে, ভীষণ চক-চক, আর অন্য চোখটা—যেটা ঠেলে বাইরে বেরিয়ে এসেছে, বুলে পড়েছে মাছের পিণ্ডির মতন গলাগলা, সবুজ—সেটা যেন আরও কুচ্ছিত হয়ে ওঠে।”^{১০৯} —সেই প্রভুলালের কাছে স্বতন্ত্র রুচির পরোয়া না করে আঙুর নিজের শরীরকে মেলে ধরেছে নন্দের সংকারের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহের অভীপ্সায়। এরপর নন্দের মুখাঙ্গির সময় নিজের দেহের বাহ্যিক শুচিতার ব্যাপারে সন্দেহ হওয়ার গঙ্গায় ডুবে আসতে গিয়ে সে টের পেয়েছে একটা বিশী গন্ধ—যা তার কাছে খুব চেনা। “বিস্তার গায়ে এই গন্ধ ছিল, এই গন্ধ আছে আতা, বেদনামাসি, প্রভুলালের গায়ে। সর্বত্র।”^{১১০} তাই গঙ্গার জলে লাথি মেরে উঠে এসে বাস্তব জীবন বোধে উত্তীর্ণ হয়েছে আঙুরলতা। তার মনে হয়েছে, “...এই সংসারের আকাশ, মাটি, মানুষ, জন—সব তার চেনা হয়ে গেল। আর সে মরবে না, কাঁদবে না।”^{১১১} গঙ্গা যেখানে হিন্দু সংস্কারের সাথে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত, যে গঙ্গার বিশুদ্ধতা নিয়ে হিন্দুদের মনে কোন সন্দেহ নেই, তাকেই লাথি মেরেছে আঙুর। এর মাধ্যমে ধ্বনিত করে তুলেছে তার প্রতিবাদ। কারণ এই সমাজ সংসারের

উপাদানের মত গঙ্গাও আজ তার কাছে কলুষিত। সমাজ সংসারের কলুষতার রূপ আঙুরের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তার জীবন-যুদ্ধে। এই সমাজের একজন মানুষ হয়েও সে এই সমাজের দ্বারাই বলিপ্রদত্ত, সমাজের দ্বারা ব্যবহৃত। অথচ এই সমাজই তার সামনে তুলে দিতে পারেনি নিরাপত্তা, সুখের আবহ, বেঁচে থাকার ন্যূনতম স্বাভাবিক পরিকাঠামো। তাই গঙ্গাকে লাথি মারার মাধ্যমে সে প্রকৃতপক্ষে সমাজের প্রতি ছুঁড়ে দিয়েছে তার ঘৃণার আক্রোশ।

‘আঙুরলতা’ একটি অসহায় নারীর বেদনা গীথা জীবনকাব্য। গল্পের নাম-চরিত্র আঙুরলতা একজন প্রতারিত নারী। নন্দকে ভালোবেসে, বিশ্বাস করে তার মায়ের পঙ্কিল জীবনের ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে সুন্দর জীবন পেতে চেয়েছিল। কিন্তু নন্দ তাকে নিয়ে এসেছিল বেশ্যাপট্টির ঘরে। তাই নন্দের মৃত্যুর পরও আঙুরের গলায় ধিক্কার ধ্বনিত হয়েছে, “আমার মা না হয় পা পিছলে কাদায় পড়েছিল। কিন্তু আমি তো সাত ভাতার করে বেড়াই নি। তখন ফুসফাস করে ভাগিয়ে নিয়ে এলো।”^{১২২} --শুধু তাই নয় আঙুরের যতদিন রস ছিল, বর বউ খেলাতে মেতে ছিল নন্দ, তার পর তাকে ফেলে পালিয়েছিল। ঘৃণায়, যন্ত্রণায়, প্রতিবাদে. “সেই শাঁখা জোড়া আঙুর কবে টান মেরে খুলে ফেলেছিল হাত থেকে। তারপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল নর্দমায়। বিয়ের শাঁখা তো নয়। শখের শাঁখা, স্বামীর সিদুর তো নয়, যে লোকটা তাকে রেখেছিল মেয়ে মানুষ করে তার একচেটিয়া জ্বরদস্তির সীলমোহরও সিদুর।”^{১২৩} আঙুর সব কিছু ছুঁড়ে ফেলে পেটের দায়ে নিরুপায় হয়ে বেশ্যাবৃত্তির শিকার হয়েছিল। একজন বেশ্যার মেয়ে হয়ে আঙুর চেয়েছিল সেই জীবন থেকে বেরিয়ে আসতে, কিন্তু সমাজের মুখোশধারী দালাল শ্রেণীর মানুষ তার সেই স্বপ্নকে হত্যা করেছে। এরাই তার শরীরে ঢুকিয়ে দিয়েছে যৌনব্যবসার মারণ বিষ, এরাই ভোগ সুখের চরিতার্থতার পরে অন্ধকারে হাতে গুঁজে পালিয়েছে অচল পয়সা। কিন্তু আঙুরলতা, যার মধ্যে তখনও টিকে রয়েছে মানবিকতার প্রতিশ্রুতি, তখনও বেঁচেছিল কর্তব্যবোধে আচ্ছন্ন সুস্থ হৃদয়, সে নন্দের নিশ্চাপ দেহটাকে তুলে দেয়নি মেথর মুদোফরাসের হাতে। হিন্দু মতে সংস্কারের চেষ্টা করেছে নিজের সর্বস্ব দিয়ে। পাটের বাহারি শাড়ি, যেটা পরে আঙুর খরিদারের কাছে লোভনীয় হতে পারত, তাই সে বিক্রি করেছে আতার কাছে মাত্র আড়াই টাকায়, শুধু তাই নয় রোগাক্রান্ত শরীরটাকে সঁপে দিয়েছে প্রভুলালের কাছে। এমনকি প্রভুলালের মত খরিদারের কাছেও সে মনোরম ভাবে উপস্থিত হতে চেয়েছে তার যৎসামান্য সাধের মধ্যেও। কারণ তখন আঙুরের সমস্ত ধৈর্য, মনের তেজ নিশ্চভ হয়ে গেছে। তাই সে চায় না প্রভুলালও তার কাছে হাতছাড়া হয়ে যাক। নন্দের দেহটাকে

খাটের তলায় লুকিয়ে রেখে ঘরের আলো কমিয়ে দিয়েছে। কঠিন বাস্তবকে এই ভাবে প্রভুলালের সামনে উন্মুক্ত করতে চায়নি সে। জগতের সমস্ত যন্ত্রণার ভার একা বহন করেছে আঙুর। প্রভুলাল যখন খ্যাপা কুকুরের মত তাকে ছিড়ে খাচ্ছে তখন ‘আঙুরের শরীরটা যেন নদীর জলে ভাসছে—সাড় হারিয়ে। কি হচ্ছে ও জানে না, বুঝতেই পারছে না। মনটা শুধু সময় গুনছে—রাত কত হল। বিস্ত্র কি থাকবে হাঁদুর দোকানে? যদি বৃষ্টি আসে ঝামঝামিয়ে আবার! তবে কি হবে? সারারাত কি ফেলে রাখতে হবে। দোষ ধরল না তো! শনির দুপুরের মড়া।’^{১১৪}

আঙুরের মনের এই সংস্কার তা অত্যন্ত মানবিক গুণ সম্পন্ন। আঙুরের এই জীবন যুদ্ধের পিছনে তার মানবিকতাই উজ্জ্বল ভাবে প্রকাশিত হয়েছে। অপরের প্রতি এই মানবিকতা তাকে আরও বেশী আত্মপীড়নে উন্মুক্ত করে তুলেছে। এই জীবনের প্রতি তার ঘৃণা, সমাজের প্রতি ঘৃণা, সমাজে মানুষের মুখোশখারী জানানোয়ারদের প্রতি উপেক্ষার প্রতিবাদ সে করেছে আত্মবঞ্চনার মাধ্যমে। তাই প্রভুলাল যখন তাকে পীড়ন করছে তখন তার মনের জ্বালা বেড়ে গেছে। “কিসের ওপর, কার ওপর সে প্রতিশোধ নিচ্ছে, তা জানে না। তবে অনুভব করতে পারছে, এই কষ্ট—এই যন্ত্রণা অনেকটা তেমনি।”^{১১৫} এত যন্ত্রণার মধ্যেও আঙুর বাঁচতে চেয়েছে তার নবলব্ধ জীবন-বোধের মাধ্যমে। আঙুরের মধ্যে দেখা গেছে বহু ক্ষেত্রেই স্ববিরোধিতা। নন্দকে যেমন সে ভৎসনা করেছে, তেমনি আবার তার রোগের উপশমের জন্য সমস্ত টাকা খরচ করেছে। প্রভুলালকে উপেক্ষা করলেও, তাকেই প্রয়োজনে নিজেকে ডেকে এনেছে। একসময় ভেবেছে মেথর মুদ্রোফরাস নন্দকে টেনে নিয়ে যাক, আবার পরক্ষণেই সে অর্থ সংগ্রহের সংগ্রামে নেমেছে। প্রভুলালের কাছে নিজেকে মেলে দিয়ে মা কালীকে স্মরণ করেছে বৃষ্টি না আসার জন্য, আবার গঙ্গাকেই লাথি মেরে ফিরে এসেছে। নন্দের জ্বলন্ত চিতার দিকে ছুটে গেছে তার ঝলসানো পা দুটো বুকে চেপে ধরতে, আবার পরক্ষণেই তার মনে হয়েছে সে মরবে না। সকল ক্ষেত্রেই আঙুরের মধ্যে দেখা গেছে বাস্তব জীবন বোধ, নিজের অর্জিত দর্শন ও প্রজ্ঞা।

মাত্র কয়েক ঘণ্টার জীবন যুদ্ধে আঙুর দেখে ফেলেছে পৃথিবী সমাজ ও মানুষের প্রকৃত রূপ, সেই রূপ তার কাছে নিয়ে এসেছে নবতম প্রতীতি। অর্থ-টাকা-পয়সা এই সমাজের আকাক্ষিকত বস্তু, তার অভাবে মানুষকে নামতে হয় জীবনের শেষ ধাপে। নন্দের পরিণতি, তাকে হাসপাতালে দেখানোর ক্ষেত্রে অর্থাভাব, তার মৃত্যুর পর সংকারের জন্য আঙুরের দুশ্চিন্তা, মানিকবাবুর ভদ্রবেশ-ধারী মুখোশের আড়ালে সমাজের ক্ষমতাকে ক্রায়ন্ত করার প্রচেষ্টা সকল কিছুর পিছনেই

মানুষকে নিপীড়িত করার প্রচেষ্টা দেখিয়েছে এই সমাজ। আর সে কারণেই, “আঙুরের কষ্ট হচ্ছিল, অযথাই সে একা নন্দর ওপরই রাগ আর ঘেন্না আর জ্বালা নিয়ে থাকল।”^{১১৬} প্রভুলালকে সে ঘৃণা করত, কিন্তু আজ দেখল সে-ই অসহায়ের সহায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। নন্দর জ্বলন্ত চিতার সামনে দাঁড়িয়ে ভেবেছে সে, একটি নারীকে শোষণ ও বঞ্চনা করার ব্যাপারে সমাজের সকলেই এক। “সবাই। তুমি, হিমু, বেদানামাসি, হাসপাতাল, ডাক্তার, আতা, বিষ্ণু, মানিকবাবু, প্রভুলাল সবাই। তেমনি তোমাদের গঙ্গা। সবই তো এ—সংসারেরই কাদা, মাটি, জলা। এক ছাঁচ, একই নকশা।”^{১১৭} এই সমাজ ও সংসারের প্রতি আঙুরের এই বোধের মাধ্যমে লেখক ফুটিয়ে তুলেছেন তার প্রকৃত জীবনদৃষ্টিকে, যেখানে এক অসহায় নারী এই ভাঙা চোরা সমাজে নিজের অস্তিত্বকে জীবনের দাবিতেই মূর্ত করে তোলে।

বেশ কয়েকটি খণ্ড খণ্ড দৃশ্যের মাধ্যমে লেখক তাঁর এই গল্পটিকে সাজিয়েছেন, প্রতিটি দৃশ্যই চাবুকের আঘাত দিয়ে সমাজের প্রকৃত রূপটিকে প্রত্যক্ষ করে তোলে। আঙুরের অতীত জীবনের খণ্ড দৃশ্য, চায়ের দোকানে বিষ্ণুর সাথে তার দরকষাকষি, হিমু বেদানামাসি, আতার কাছে হাত পাতা, মানিকবাবুর কাছে নিজের অসহায়তা প্রদর্শন করা, প্রভুলালের সামনে অভিনয় ও দরদস্তুর করা, শ্মশান দৃশ্য সমস্ত ক্ষেত্রেই লেখক স্বল্পকথনের মাধ্যমে পাঠকের সামনে মেলে দিয়েছেন ভাবনার জগৎ; অদ্ভুত নাটকীয়তার মাধ্যমে দৃশ্যগুলিকে করে তুলেছেন জীবন্ত। পাঠক চমকে উঠেছে সমাজের বিকৃতরূপ প্রদর্শন করে। হারানো প্রেমিক নন্দের দেহটাকে খাটের তলায় লুকিয়ে রেখে উপরে আঙুর প্রভুলালের সামনে নিজেকে মেলে ধরেছে, আর চিন্তা করেছে মেঘের অবস্থা এ যেন আকাশ, মাটি ও পাতাল তিনটি স্তরেই আঙুরের ভাবনা তার যন্ত্রণার সাক্ষ্যকে পৌঁছে দিয়েছে। কিন্তু ঘরে ঢুকে বিষ্ণুরা মড়ার অবস্থান নিয়ে প্রশ্ন তুললেও আঙুর জবাব দেয় নি। লেখক আঙুরের মুখ থেকে জবাব শোনান নি, কারণ জবাব দেবে এই ভদ্র সমাজ।

‘পলাশ’ (দেশ, ১৯৫৭) গল্পটি মনস্তাত্ত্বিক গল্প, যেখানে অচরিতার্থ প্রেমের বিষয় মুখ্য হয়ে উঠেছে। জামাইবাবু রতিকান্তের দোলাচল মানসিকতা ও নারী রূপের প্রতি মোহ তার ও শ্যালিকা উমার মনে অপপ্রাণীয়েতর জন্য বেদনানুভব ঘটিয়েছে। উমা, তার দিদি-জামাইবাবুর বাড়ি বেড়াতে এসেছে। রেল চাকরির সুবাদে প্রতিদিনই রতিকান্তকে ট্রলিতে চেপে পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন স্থানে রেললাইন কিংবা বিভিন্ন কাজের পরিদর্শনে যেতে হয়। এই ট্রলিতে চেপে বেড়াতে যেতে চাওয়ায় উমাকে নিয়ে একদিন রতিকান্ত বেরিয়ে পড়েছে। মালভূমি অঞ্চলের ছোট ছোট পাহাড়, বোপ-

জঙ্গল, পলাশ ফুলের অনাবিল সৌন্দর্যে উমা নিজেকে যতই হারিয়ে ফেলেছে, ততই রতিকান্ত ও সে কাছাকাছি এসেছে। ওদের সান্নিধ্যের মধ্যে এসে পড়েছে অতীতের স্মৃতি এবং তার জন্য ঘটেছে অন্যমনস্কতা ও বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মানসিক বেদনাবোধ। বসন্তের বর্ণময়তায়, উতল হাওয়ায়, প্রকৃতির একান্ত সান্নিধ্যে এসে উমার মধ্যেও যেমন কেতাদুরস্ত জীবনের কোন অস্তিত্ব থাকেনি, তেমনি রতিকান্তের সংসার জীবন অনেকটাই স্তান হয়ে এসেছে। দুজনের রসিকতা, টিপ্পনি, হাসি-মশকরা, ইঙ্গিতে নিজেদের উজাড় করে দেওয়ার মানসিকতা তাদের অচরিতার্থতার গ্লানিকে বার বার প্রকাশ করেছে। সন্ধ্যাবেলায় ফিরে আসার সময় সারাটা দিনের মানসিক উত্তাপ, হৃদয়ের আনন্দময় অনুভূতি ব্যস্ত হয়েছে বেদনায়, চাপ চাপ বর্ণহীন অনুক্ত ও অব্যক্ত কথার ভাস্কর্যে।

‘পলাশ’ গল্পটিতে রতিকান্ত’র মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব প্রকট হয়ে উঠেছে। স্ত্রী বিনুর সাথে বিয়ের আগে, বিনুর মাসতুতো বোন উমার সাথেই তার প্রথম সম্বন্ধ হয়েছিল। কিন্তু পারিবারিক পছন্দের কারণে এবং অপেক্ষাকৃত বেশি সৌন্দর্যের কারণে উমার থেকে বিনুকেই এগিয়ে রেখেছিল রতিকান্ত; এবং তাই বিনুর সাথে বিয়ে হলেও উমার জন্য মনের সংগোপনে একটা দুর্বল স্থান বোধ হয় থেকে গিয়েছিল রতিকান্তের। এ কারণে বিয়ের চার বছর পর উমাকে নিয়ে বেড়াতে বেরিয়ে তাকে নতুন ভাবে আবিষ্কারের মোহ রতিকান্ত’র মনে দেখা যায়। অচরিতার্থ আবেগের আতিশয্যে উমাকে আঁজ যতই বুদ্ধিমতী, চপলা, সৌন্দর্যময়ী, আবেগপ্রবণ, বাকপটু ও সর্বোপরি অনাবিল উচ্ছল মনে হয়েছে, ততই রতিকান্ত’র হৃদয়ের গোপন রক্তধারা নিয়ে এসেছে অব্যক্ত যন্ত্রণা। এর ফলেই অদ্ভুত বিষাদ প্রস্তুতায় মুহ্যমান হয়ে উঠেছে সে। একদিকে তার স্ত্রী বিনু ছোট মেয়ে, সংসার, অপরদিকে উমা এই দ্বিমুখী সত্তার টানাপোড়েনে তার মানসিক ‘দ্বন্দ্ব প্রকট হয়ে উঠেছে। “শাখারীটোলার মেয়ে এত জীবন্ত — রতিকান্ত যেন জানত না। বুঝতে পারে নি, উমার মধ্যে এত সুন্দর আকর্ষণ এবং মাধুর্য লুকিয়ে আছে। এখন বুঝছে রতিকান্ত। উমার ছায়ায় নিজের ছায়াকে প্রায় মিশিয়ে দিয়ে এই নির্জনে হাঁটতে হাঁটতে।”^{১১৮} উমার প্রতি এই মনোনিবেশের পাশাপাশি তার মনে হয়েছে নিজের স্ত্রী বিনু কোন অংশেই ফেলনা নয়। সৌন্দর্য, শোভনতা সকল দিক দিয়েই সে এগিয়ে; রতিকান্তের স্বেচছা সে আত্মনিযুক্ত। “যা চায় মানুষ স্ত্রীর কাছে—যে সব সহজ, সাধারণ প্রত্যাশা—বিনু তার কোনটাই মেটাতে পারে না এমন নয়।”^{১১৯} তবুও এই নিভৃত অবসরে উমা যেন তার কাছে মেলে দিয়েছে আকাঙ্ক্ষার এক জগৎ; যেখান থেকে ফিরে যেতে মন

চায় না। প্রতিদিনের জীবনের একঘেয়েমি থেকে এ যেন এক দারুণ মুক্তির স্বাদ। জীবনের এই আকাঙ্ক্ষা যদিও অহেতুক, তবুও রতিকান্তর মনে হয়েছে, “এই ভাবে যদি ট্রলিটা রাতের পর রাত জ্যোৎস্না ডোবা মাঠ ঘাটের মধ্যে লাইন দিয়ে ছুটে যায়—রতিকান্তর ইচ্ছে হবে না, ওটা থামুক; রাত শেষ হোক।”^{১১০} এর মাধ্যমেই কি রতিকান্ত তার চার বছর আগেকার ভুলটাকে শোধরাতে চেয়েছে। তা নয়। রতিকান্ত সঠিক সমাধানে পৌঁছতে পারছিল না। বিনু তার মেয়ে, সংসার সব কিছুকে দেখভাল করেও কেন উমাকে হৃদয়ে ঠাই দেওয়া যাবে না এই প্রশ্নের সদুত্তর ও বাস্তব সম্মত উপায় খোঁজার প্রচেষ্টায় সে দিশেহারা হয়ে উঠেছে। “ইচ্ছে করাটা এক, আর ইচ্ছে করতে নিষেধ করাটা অন্য জিনিস। ইচ্ছেটা মনের, নিষেধটা অন্যের।”^{১১১}

আমাদের সমাজের পারিবারিক ও সামাজিক কাঠামোয় নিজের স্ত্রীর পাশে অপর নারীর প্রতি আসক্তি জন্মাতে পারে, কারণ তা মনের আকাঙ্ক্ষা। সময় ও ক্ষেত্র বিশেষে মানুষের কাছে প্রেমের পাত্রটি বহু ক্ষেত্রেই বদলে যায়। ভালোবাসায় আকাঙ্ক্ষিত হৃদয় অপর নারী-পুরুষের সান্নিধ্য প্রত্যাশা করতেই পারে। কিন্তু যা আমাদের পরিবার ও সমাজের চোখে অন্যায়, অবৈধ তার প্রতি প্রেমে স্বীকৃতি লাভ করা কষ্টকর হয়ে ওঠে। তাই রক্তাক্ত হয়ে ওঠে হৃদয়। রোদে বলসে যাওয়া নিষ্প্রাণ, নিস্তেজ পলাশ ফুলের সাথে নিজের হৃদয় ও জীবনের সাযুজ্য খুঁজে পায় প্রেমিক, রতিকান্ত। নিজের মনের কাছে এই ব্যর্থতাকে লুকানোর অভিপ্রায়ে, স্বস্তি লাভ করার জন্য ভাবতে থাকতে রতিকান্ত, “...ভালোবাসাটা একটা গুণ, কোয়ালিটি। নিজের মনের কাছে নিজের মুখ রেখেই রতিকান্ত তার এই সহসা আবেগ প্রকাশ করে ফেলো। যেমন দয়া, যেমন সততা ...তেমনি আমার আমাদের এ ভালোবাসা, এই ভালোবাসার ইচ্ছাটা একটা গুণ।”^{১১২} এই বক্তব্যের মাধ্যমে রতিকান্ত হৃদয়ের রক্তক্ষরণকে সান্ত্বনার প্রলেপে লুকানোর চেষ্টা করেছে।

অপর পক্ষে উমা রতিকান্ত’র কটাক্ষ ও হৃদয় উৎসারিত হতাশাকে হাল্কাভাবে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছে, কিন্তু নিজের হৃদয়ের যন্ত্রণাকে নিজেই আত্মস্থ করার চেষ্টা করেছে। আবার হালকা রসিকতার ভিতরও যেন তার লুকিয়ে আছে অনেক গোপন বাসনা। দিদির কাছে জামাইবাবু সম্পর্কে যখন বলেছে, “এই বয়সেই কেমন যেন একটু বুড়ো বুড়ো।”^{১১৩} একদিন তার একান্ত পছন্দের পাত্রটি দিদির কাছে বেহাত হয়ে গেলেও মনের সংগোপনে সেই মানুষটির রোমান্টিক ইমেজটিকে সে আশা করেছে। নতুবা এই চিন্তাও তার মনে আসা খুব স্বাভাবিক যে, সংসারের প্রয়োজনে যে পরিশ্রম জামাইবাবু করে চলেছে, উমা থাকলে হয়তো তা কিছু কম হতো

পারতো। বেড়াতে বেরিয়ে জামাইবাবু রতিকান্তকে ঘিরে তার স্মৃতি আরও বর্ণনীয় হয়ে উঠেছে। বিয়ের দিনের প্রসঙ্গে রতিকান্তের হাল্কা পরিহাস তাকে টেনে নিয়ে গেছে হতাশার অনুভূতিতে। কিন্তু এ সব ক্ষেত্রে উমা সচেতন ভাবেই প্রসঙ্গান্তরে চলে গিয়ে নিজের হৃদয়ঙ্গতকে লুকানোর চেষ্টা করেছে। যতটা উচ্ছল হলে এই সব দুঃখের স্মৃতি ভোলা যায় ও স্বাভাবিক আচরণে ফিরে আসা যায়, উমার মধ্যে সেই প্রক্রিয়া লক্ষিত হয়েছে। উমা তার অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের মধ্যে একটা সংযোগ সূত্র স্থাপন করতে পেরেছে। ভবিষ্যৎ কি তা সে জানে, তাই আকাঙ্ক্ষা দুঃখ ভোগের পথ তার নয়। রতিকান্ত যখন তার যন্ত্রণাময় হৃদয়ের সাথে পাংশু হয়ে যাওয়া পলাশ ফুলের সমধর্মিতা লক্ষ্য করেছে, উমাই তখন তার কাছে সান্ত্বনার বাণী নিয়ে এসেছে--“ছি, ওকথা বলবেন না। বলতে নেই।”^{২২৪} অপরাধীনের প্রতি দুঃখ প্রকাশ না করে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসাই মানুষের লক্ষ্য, এটাই যেন উমার জীবনদর্শন।

‘পলাশ’ গল্পটিতে কয়েকটি প্রতীক অর্থবহ হয়ে উঠেছে। ‘পলাশ’ এখানে রতিকান্ত ও উমার সামনে তার লাল রঙের মাধ্যমে কামনাকে প্রকাশ করেছে। একটি সম্ভাবনার অপমৃত্যুর পর তার স্মৃতিকে জাগিয়ে তুলে হৃদয়গত উচ্ছ্বাসকে নতুন রূপ দিয়েছে। ফুলের সূত্র ধরেই ওরা কাছাকাছি এসেছে। উমার চুলে ফুল গুঁজে দিয়েছে রতিকান্ত। ফাল্গুনের রোদ, হাওয়া, পরিবেশের উদ্দামতা, পলাশের রঙিন উদ্ভাস, উমার বাসন্তী রঙের শাড়ির মোহময়তা রতিকান্তকে উদ্বেল করে তুলেছে। আবার শুকনো পলাশ ফুলের সাথে নিজের জীবনের বর্ণহীনতা প্রকাশ করেছে রতিকান্ত। এছাড়াও এ গল্পে দেখতে পাই একটা পুকুরের ছবি। এই পুকুর পাড়ে বসেই রতিকান্ত ও উমা তাদের অতীতে ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করেছে। নিজের অবদমিত কামনাকে উমা প্রকাশ করেছে তার স্বপ্নদর্শনের উল্লেখ, “আমি ঘুমের মধ্যে মাঝে মাঝেই একটা পুকুর দেখি। জল টলটলে। এটা বোধ হয় সেই পুকুর, না জামাইবাবু।”^{২২৫} স্বপ্নের পুকুরের সেই কামনা আজ বাস্তবের সাথে মেলাতে চেয়েছে উমা। এই পুকুরের মতই তার হৃদয়—গভীর এবং সমবেদনা, সাহায্য, সহানুভূতি ও ভালোবাসার জলে পরিপূর্ণ। রতিকান্তও অবচেতনে উৎসারিত ভাবনা থেকে বলে ফেলেছে-- “এবার থেকে আমিও বোধ হয় দেখব।”^{২২৬} উমার সাথে রতিকান্তের হৃদয়ের যোগসূত্র এখানে রচিত হয়েছে। এই গল্পে কামরাঙা গাছের প্রসঙ্গ আছে। যে গাছে উমার শাড়ি জড়িয়ে যাওয়ার পর উমা গাছের নাম জিজ্ঞাসা করলেও রতিকান্ত তা প্রকাশ করতে পারে নি। কারণ গাছটির নামের সাথে রতিকান্তের প্রবৃত্তি একাকার হয়ে গেছে। তাই সে গাছের নাম বলতে গিয়েও উমার

সামনে তা গোপন রেখেছে। এর মাধ্যমেও তার হৃদয়ের অবদমিত কামনার কথা লেখক ইঙ্গিতে প্রকাশ করেছেন। মনস্তাত্ত্বিক গল্পের মধ্যে ‘পলাশ’ গল্পটিকে সকল দিক আলোচনার মাধ্যমে বেশ খানিকটা এগিয়ে রাখতে হয়।

‘সুধাময়’ (শারদীয় দেশ, ১৯৫৭) গল্পটি বিমল করের জীবনে একটি বিশেষ সৃষ্টি। এর মাধ্যমে তাঁর গল্পকার জীবনে একটি মোড় ফেরার ইঙ্গিত রয়েছে। স্বাধীনোত্তর কালে বাঙালির হৃদয়ে সংশয়, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, নানা তত্ত্বগত প্রশ্ন, অনুভূতিগত ভাবনা, যা মানুষকে ক্রমশ প্রশ্নমূলকতার মধ্যে আচ্ছন্ন করে তুলেছিল, তার খানিকটা নজির এই গল্পে প্রকাশিত হয়েছে। ‘সুধাময়’র পূর্বের লেখাগুলিতে যেখানে মূলত মনস্তাত্ত্বিকতার প্রাধান্য ছিল, এখানে থেকে তার সাথে যুক্ত হল তত্ত্ব। লেখক নিজেই বলেছেন, “সুধাময় থেকে আমার অধিকাংশ গল্পই তাই। আইডিয়া প্রধান। তত্ত্বগত ব্যাপার ভিতরে একটা রয়ে গেছে। সেটাকে আমি গল্পতে আনবার চেষ্টা করি।”^{১২৭} তত্ত্বই এই সব গল্পে কাহিনী ও চরিত্রকে এনেছে।

বিমল কর তাঁর ‘সুধাময়’ গল্পের মাধ্যমে সুধাময়ের যে ব্যক্তি-চরিত্রকে অঙ্কন করলেন, তার মধ্যে ফুটে উঠল তাঁর অন্তর্মনের ভাষা। পঞ্চাশ-ষাটের দশকের একজন যুবক যে চোখ দিয়ে তার জগৎ-দেশ-সমাজকে প্রত্যক্ষ করছে, এবং তার মধ্যে যে প্রতিক্রিয়া হয়েছে তা এই গল্পে প্রকাশিত। এর সাথে যুক্ত হয়েছে লেখকের নিজস্ব অনুভূতি। ছত্রিশ বছরের যুবক বিমল কর তাঁর নিজস্বভাবনা, মনোগত বৃত্তি ও আত্মানুসন্ধানের কথা ব্যক্ত করেছেন সুধাময়ের মধ্য দিয়ে। “সুধাময়” তো একটা সংশয়ের ব্যাপার। প্রশ্নের ব্যাপার। জীবনের অস্তিত্ব, স্নেহ, প্রীতি, প্রেম, সৌন্দর্য, দেহ ইত্যাদি নিয়ে সংশয়। ‘সুধাময়’ এর পর থেকেই আমি অনেক কাল ধরে লিখেছি মানুষের দ্বিধা, সংশয়, ভয়, উদ্বেগ এবং অসহায়তার কথা।”^{১২৮}

‘সুধাময়’ লেখার সময় লেখক বিমল করের জীবনেও পারিবারিক দিক থেকে বিশেষ চাপ আসছিল। দেশ পত্রিকায় চাকরি করার সুবাদে খানিকটা আর্থিক দৃষ্টিস্তামুক্ত হলেও খুব বেশি টাকা তখন উপার্জন করতে পারতেন না। এই সময় তাঁর জীবনে বিরাট আঘাত নিয়ে আসে তাঁর বাবার মৃত্যু। ১৯৫৭ সালের প্রায় মাঝামাঝি সময়ে এই ঘটনা ঘটার পর প্রায় মাস ছয়েক তিনি মানসিক কষ্ট ও অসহায়তা বোধের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিলেন। মায়ের দুগ্ধে খানিকটা সান্ত্বনা দেওয়ার উদ্দেশ্যে তিনি তাঁর মা ও ভাইকে নিজের কাছে রাখার চেষ্টা করে ছিলেন। তবুও এই সময়েই তাঁর ভগ্নীপতির হঠাৎ অসুস্থতা আরও এক দুর্ঘটনার বার্তা নিয়ে আসে। চারদিক থেকে

রোগ-শোক কিংবা অর্থাভাব তাঁকে যেন দিশেহারা করে তুলেছিল। মনের ভিতর থেকে এই সময়েই তাঁর এক প্রকার অসুস্থতা দানা বেঁধে উঠতে থাকে। মৃত্যুভয়, একাকিত্ব, রোগের প্রতি দুশ্চিন্তা তাঁকে প্রতি মুহূর্তে ক্রমশই কোণঠাসা করে তুলেছিল। লেখকের সেই সময়কার ব্যক্তিজীবনের প্রতিক্রিয়ার সাথে ‘সুধাময়’ গল্পের মিল খুঁজে পাওয়া যায়। তিনি জানিয়েছিলেন--

“আমার কেমন মনে হচ্ছে, আমি পালিয়ে পালিয়ে বাঁচবার চেষ্টা করছি। আমার বাবা যখন মারা গেল — আমি বাবার কাছে ছিলাম না। থাকতে পারিনি। ... বাবার মৃত্যুর শেষ মুহূর্তটা আমি নিজের চোখে দেখতে চাইনি। ভয় পেয়েছিলাম। নিজের কাছে নিজেকেই আজকাল গিল্টি মনে হয়। ... আর এই সময়েই—‘দেশ’ পত্রিকার শারদীয়া সংখ্যায় যে গল্পটা লিখেছিলাম তার নাম ‘সুধাময়’।

যতই সময় লাগুক, পরিশ্রম করতে হোক, যতই কেননা নার্ভাস হয়ে পড়ে থাকি লিখতে লিখতে--তবু জানি--ওই গল্পটিই আমার লেখার নিজস্বতা আর মানসিকতাকে সেই প্রথম প্রকাশ করতে পেরেছিল।”^{২৯}

সুধাময় গল্পটির কথক পরিমল চরিত্রটি সুধাময়ের বন্ধু হিসেবে সুধাময়ের জীবন কাহিনী বর্ণনা করেছে। কোজাগরী পূর্ণিমার রাতে সুধাময়ের জন্ম হওয়ায় তাঁর সৌন্দর্য-রসিক বাবা মনে করেছিলেন প্রকৃতির অনাবিল সৌন্দর্যরাশির সাথে সুধাময়ের ওতপ্রোত যোগাযোগ ঘটবে। এই সুধাময় মায়ের ঈশ্বর বিশ্বাস, বাবার সৌন্দর্যতত্ত্ব, উদার মানসিকতা নিয়ে বেড়ে উঠেছিল। “মনের বাইরের দিকটা তৈরি করেছিলেন বাবা, ভেতরটা মা। একজনের শিক্ষায় কৌতূহল এবং বিস্ময় দিন দিন বাড়ছিল; অন্য জনের প্রভাবে এমন একটা নরম স্বভাব গড়ে উঠছিল যা পুরুষ চরিত্রে অল্পই দেখা যায়।”^{৩০} স্বতন্ত্র চিন্তার মাধ্যমে সমসাময়িক অন্যান্য ছেলেদের থেকে সুধাময় ক্রমশ পৃথক হয়ে যাচ্ছিল। জগৎ ও জীবন সম্পর্কে অপারিসীম কৌতূহল, দর্শন, অধ্যাত্ম বিষয়ের প্রতি প্রশ্নমূলকতা তাকে ক্রমশই করে তুলেছিল নিঃসঙ্গ, একাকী, রোমান্টিক বিষাদে মগ্ন ও অন্তর্মুখী।

সুধাময় তার বাবার কাছ থেকেই দার্শনিক মনোভাবাপন্ন হৃদয়ের উত্তরাধিকার পেয়েছিল। জগৎ ও জীবন আনন্দময়; সেই আনন্দময়তার সাথে নিগূঢ় যোগাযোগ সম্ভব হবে তার মধ্যে, এই বিশ্বাস রেখেই সুধাময়ের বাবা তার নাম রেখেছিল ‘সুধাময়’। উদার মানসিকতার পাশাপাশি সাবলীলতা ও নিজস্বতার দীক্ষা সুধাময় তার বাবার কাছ থেকে পেয়েছিল। এই ভাবধারা তাকে বাঁধা জীবন ধারা থেকে ক্রমশ করে তুলেছিল অনিকেত জীবনধারার প্রতি উৎসাহী। তবুও সুধাময়

তার জীবনদৃষ্টি দিয়ে জীবনকে সহজ ভাবে পারেনি, এবং এখান থেকেই তার জীবনে এসেছে নিঃসঙ্গতা। সুধাময় মাকে চিঠিতে লিখেছে, বাবার প্রদর্শিত পথে এগিয়ে জীবনে আনন্দের সন্ধান সে পায়নি। “কত ভালো জিনিস দেখেছি, ভালোও লাগছে, কিন্তু কই তেমন আনন্দ তো হয় না। আমি পারছি না ...ভালোবাসতে পারছি না। ...তুমি বুঝতে পারবে কি মা, আমি কত নিঃসঙ্গ আর একা একা রয়েছি। আমার এখন একাই থাকতে হবে।...”^{১০১} --এই একাকিত্ব আরও নিবিড় হয়ে উঠেছে তার বাবার মৃত্যুর পর। অজস্র প্রশ্নমূলকতার পাশাপাশি মৃত্যু সংক্রান্ত ভয় তাকে পেয়ে বসেছে। মানুষের জীবনে প্রতি মুহূর্তে যে মৃত্যুভয় রয়েছে, স্থায়ী নির্ভরতা যেখানে নেই, সুধাময়ের মনে তা পীড়া দিয়েছে। “যে ঘরে আমরা রাত কাটাতে এসেছি, যদি সে ঘরের দীপশিখা সব সময় বাতাসে কাঁপে, নিভু-নিভু হয় -- তবে আর আশ্বাস কোথায়?”^{১০২}

এই আশ্বাসের প্রতি, নির্ভরতার প্রতি তার যে আকাঙ্ক্ষা তা তাকে ক্রমশই আত্মসুখ-বিনাসী করে তুলছিল। তাই মায়ের যক্ষ্মা রোগকে ভয় পেয়ে সে নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিল। কিন্তু একদিন ভালোবাসা, মায়ের প্রতি কর্তব্যবোধ তার মনের এই আত্মসুখসন্ধান প্রবৃত্তিকে দূরে সরিয়ে দিল। মায়ের পাশে এসে জীবনের দাবিতে জীবনকেই বর্জ্য করে তোলার অভিপ্রায়ে মৃত্যুভয়কে সে জয় করে নিয়েছে, মৃত্যু স্বাভাবিক ও অবশ্যম্ভাবী, এই সত্যজ্ঞানের মাধ্যমে। সুধাময়, “আত্মসুখ আর আনন্দ যে এক নয় একথা বোঝে নি, ধরতে পারেনি নিজেকে পশুর মতন রক্ষা করা ভালোবাসা নয়। মৃত্যু একটা নিয়ম, আঘাত যে অভিজ্ঞতা এসব তার জানা ছিল না। ...সুধাময় বুঝতে পারল, নিজেকে দুর্গের মধ্যে রক্ষা করায় আনন্দ নেই, তাতে আত্মা বাঁচে না -- চিতায় ওঠা থেকে রক্ষা পাওয়া যায় না।”^{১০৩} মৃত্যু দর্শন যখন তার বোঝা হয়েছে তখনই তার জীবনে দ্বিতীয় আঘাত এসেছে তার মায়ের মৃত্যুর মাধ্যমে। সুধাময় মায়ের মৃত্যুর আঘাত সহ্য করে নিলেও পরবর্তী কালে হৈমন্তীর মৃত্যুকে একই দৃষ্টি ভঙ্গি দিয়ে বিচার করতে পারে নি। মৃত্যুকে উপেক্ষা করেই একদিন সুধাময় মায়ের কাছে ফিরে এসেছিল, কিন্তু হৈমন্তীর মৃত্যু যেন তার চারদিকে জ্ঞান ও সান্ত্বনার জগৎকে ভেঙে দিয়েছে। হৈমন্তীর মৃত্যুকে সে স্বাভাবিকমনে মেনে নিতে পারে নি। হৈমন্তীর মৃত্যুর সাথে সাথে তার দৈহিক অস্তিত্বের বিনাশ তাকে করে তুলেছে ভয়, বেদনা ও হাহাকারে পরিপূর্ণ। অর্থাৎ আত্মার অবিশ্বরতা সম্পর্কিত ভারতীয় দর্শন সুধাময়কে সান্ত্বনা দেয় নি। ব্যক্তি স্বরূপের বাস্তব উপস্থিতি আর এক ব্যক্তিকে কতটা আনন্দ দেয়, কতটা নির্ভরতা দেয় তা সাধারণ মানুষের দৃষ্টির সাপেক্ষে সুধাময়ের চরিত্রের মাধ্যমে দেখিয়েছেন

লেখক। সুধাময়ের মনের এই অস্থিরতা পঞ্চাশ-ষাট দশকের ব্যক্তিসত্তার প্রতিফলন। যে ব্যক্তিসত্তা সুধাময়ের মত আনন্দের অভিলାষী, কিন্তু দিক ভ্রষ্ট।

আসলে সুধাময় আনন্দের সন্ধান করতে গিয়ে তার খুঁটি-নাটি তত্ত্বকে বোঝার চেষ্টা করেছিল। ব্যাকরণগত ভাবে তার পথ নির্দিষ্ট করতে সচেষ্ট ছিল। কিন্তু জীবন রহস্যময় তার কোন নির্দিষ্ট নিয়ম নেই। সুধাময় কর্মফল, ভাগ্য, ঠাকুর-দেবতার প্রতি আস্থা রাখেনি, জীবনকে সুতোর বাঁধনে বাঁধা ঘুড়ি বলেও বিশ্বাস করেনি। সাবলীলতার প্রতি আস্থা রেখে কর্তব্য সম্পাদনের প্রতি গুরুত্ব দিয়েছে সে। তার মতে— জীবন “আয়ুকে রক্ষা করার ইচ্ছা, আত্মাকে রক্ষা করার ইচ্ছা, মুক্তির পিপাসা, প্রেম আর আনন্দ। সৎকে রক্ষা করো, সত্তাকে রক্ষা করো -- জীবন পূর্ণ হবে।”^{১০৪} এই পূর্ণতার সন্ধানই তার জীবনে পথ চলার শুরু এবং অবশেষে বন্ধু পরিজন থেকে হারিয়ে যাওয়া। সুধাময় দেহের ভিতর দিয়ে পূর্ণতাকে চেয়ে পায় নি, আবার দেহের বাইরে ভাবকে আশ্রয় করেও পূর্ণতার সন্ধান পেতে ব্যর্থ। তাই রাজেশ্বরী ও হৈমন্তী দুই নারীকে কাছে পেয়েও সে পরিপূর্ণ ভাবে পূর্ণতাকে লাভ করতে পারে নি। পূর্ণতার পথই আনন্দের পথ বলে তার এক সময় মনে হলেও পূর্ণতা যেহেতু অধরা আনন্দও তাই নিশ্চিত ভাবে ধরা দেয়নি। তবুও কর্মের মধ্য দিয়ে মানসিক প্রশান্তির মাধ্যমে যে আনন্দকে লাভ করা যায় তার বোধগম্যতা সুধাময়ের মধ্যে ধরা দেয় নি। তাই সে অনিকেত জীবনধারার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে, পথ চলার মধ্য দিয়েই আনন্দের অনুেষণে নিরুদ্দেশ হয়েছে।

‘সুধাময়’ গল্পে প্রেমচেতনা নানা দার্শনিক প্রশ্নের মাধ্যমে তার যথার্থ স্বরূপ প্রকাশের পথে এগিয়ে গেছে। প্রকৃতিপ্রেমের মধ্যে যে আনন্দ রয়েছে, সেই আনন্দের আরও এক অবস্থান রয়েছে মানুষের প্রতি স্নেহ-ভালোবাসা-সম্মানের মধ্যে। জীবনের পূর্ণতার পথে প্রেম একটি বিশেষ বিষয়— যার প্রতি কৌতূহলী হয়েছে সুধাময়। মৃত্যুত্যাগিত এই জীবনে ক্ষণিক আয়াস ও আনন্দের স্বাদ মানুষ পেতে পারে ভালোবাসার মাধ্যমে। দার্শনিক চিন্তায় ব্যাকুল সুধাময় তেমনি জীবনের প্রবাহে দুটি নারীর মাধ্যমে তার ভালোবাসার পূর্ণতাকে খুঁজে নিতে চেয়েছিল। রাজেশ্বরীর রূপের দীপ্তি দেখে সুধাময়ের চোখ আচ্ছন্ন হয়ে আসত। রূপবিভোর শিল্পীর চোখ দিয়ে সুধাময় তাকে দেখতো, মুগ্ধ হতো। তবুও তার মনের মধ্যে প্রেমের উদ্যমতার বৈপ্লবিক ভাঙ্গিটি ছিল না। “সুধাময়ের স্বভাব ছিল পরীক্ষকের। সে হৃদয়-তুফান বিশ্বাস করত না।”^{১০৫} তাই রাজেশ্বরীর প্রতি তার এই মুগ্ধতাকে সে প্রেম বলতে চায় নি। রাজেশ্বরীর অপরূপ শরীরের সামিথ্যে এসেও তাকে ভোগ

করতে চায় নি। কারণ তার মনে হয়েছে মিলন প্রেমের সার সত্য নয়, একটি উপলক্ষ মাত্র। লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টিনিবদ্ধ রেখে সুধাময় এই উপলক্ষকে বিদায় জানানোর অছিলায় রাজেশ্বরীকে চলে যেতে বলেছে। আনন্দের ও পূর্ণতার স্বরূপ-সন্ধানী সুধাময় দেহজ প্রেমকে উপেক্ষা করে দেহান্তরে প্রেমের সার-সত্যকে খুঁজে নিতে চেয়েছে। রূপ থেকে অরূপে যাত্রা কলুষমুক্ত ভালোবাসার সংজ্ঞা নির্ণয় করতে চেয়েছে। তীব্র মিলন বাসনায় যখন সুধাময় কাতর তখন তার ভালোবাসার পূর্ণতা নিয়ে রাজেশ্বরীকে খুঁজে পায়নি, দেহের খণ্ডিত অংশে দৃষ্টি পাতের মত খণ্ডিত ভালোবাসাই তার মনে উপলব্ধ হয়েছে।

হৈমন্তীর সাথে টি বি স্যানিটোরিয়ামে দেখা হওয়ার পর সুধাময়ের পিপাসার্ত মন, অনিকেত সন্তা নিশ্চিত পরিপূর্ণতা ও ভালোবাসাকে খুঁজে নিতে চেয়েছে অসুস্থ, ক্লান্ত, অসহায় হৈমন্তীর মধ্যে। রাজেশ্বরীর কাছে যে ভালোবাসাকে সে সহজে স্বীকার করতে পারে নি, হৈমন্তীর সান্নিধ্যে এসে তার পরিবর্তন হয়েছে। ‘সুধাময় অনুভব করত, হৈমন্তীকে সে ভালোবাসে এই চিন্তাতেই আশ্চর্য এক আনন্দ আছে।’^{১৩৬} এই আনন্দ দেহের প্রতি সাধনা থেকে বহু দূরে ভাবকে আশ্রয় করে আবেগপ্রবণ মনের ঐকান্তিক উদারতার মধ্যে বিচ্ছুরিত। হৈমন্তীর সীমিত দেহ সৌষ্ঠব ও কর্মক্ষমতার বহু গভীরে এক পরিপূর্ণ উদার প্রেমের স্বরূপ যেন দিব্য চক্ষে দেখতে পেয়েছিল সুধাময়। ‘প্রদীপ যখন জ্বলে তখন তার শিখাটুকু চোখে পড়ে, পড়ে না তার আলোর ভুবন—অথচ এর চেয়ে সত্য আর কি! যাকে ভালোবাসি সে তো এমনই, সে তার দেহ নিয়ে যতটুকু আছে তার চারপাশে অদৃশ্য অস্তিত্ব নিয়ে যে তার ও বেশী আছে।’^{১৩৭} —এই ভাবনা সুধাময়ের প্রেম ভাবনাকে বিশিষ্টতা দিয়েছে।

ভালোবাসার ক্ষেত্রে শরীরকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিতে না চাইলেও তার আবশ্যিকতা যে কতটা প্রবল তা হৈমন্তীর মৃত্যুর পর সুধাময়ের কাছে ধরা পড়েছে। হৈমন্তী চলে যাবে, তাকে ত্যাগ করার ভাবনা অত্যন্ত তীব্র ব্যথার অনুভূতি নিয়ে সুধাময়ের বুকে বেজ্জেছে। গভীর শূন্যতা তাকে ছেয়ে ফেলেছে। এর উত্তর খুঁজতে গিয়ে বিপর্যস্ত হয়েছে সুধাময়। হৈমন্তী তার কাছে দেহবদ্ধ সত্য নয়—সে যে দেহবিহীন এক বিরাট অস্তিত্বও। “ও আমার কাছে আলোর ভুবন, আমার আনন্দের জ্বলন কাঠি”^{১৩৮} —বলেছে সুধাময়। তবুও দেহটিকে যখন মৃত্যু চুরি করে নিয়েছে তখন তার আনন্দ অসত্য বলে মনে হয় কেন। তাহলে কি একদিন যে শরীরকে উপেক্ষা করেছিল সুধাময় সেই শরীরের কাছেই আবার ফিরে এল? আধুনিক মানসিকতার এই দোলাচলতা সুধাময়ের মনে

তীর ভাবে প্রকাশিত। পরিপূর্ণ ভালোবাসা হৃদয়ের মাঝেই উপস্থিত, তা সকল নিয়মের বহির্ভূত, তাকে তত্ত্বের ও প্রশ্নের ছুরিতে ব্যবচ্ছেদ করলে তার প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধ হয় না। তাই বিপর্যস্ত সংশয়াকীর্ণ আধুনিক মানসিকতার প্রতিভূ সুধাময় স্থির পরিকল্পনাতে পৌছতে পারেনি। “রাজেশ্বরীর মধ্যে তার দেহের বাইরে আলোর ডুবন খুঁজে ছিলাম, পাই নি। হৈমন্তীর মধ্যে তার মনের আলোময় অস্তিত্ব অনুভব করে সার বস্তু পেয়েছি ভেবেছিলাম; কে জানত --তার দেহের সঙ্গে এত গভীর ভাবে সে অস্তিত্ব জড়িয়ে আছে। আমার ভালোবাসা অন্ধকারের মতন, প্রদীপের কাছে যতক্ষণ আছে ততক্ষণ আলোকিত। একে ভালোবাসা বলি না। যে আনন্দ এত চঞ্চল, ভঙ্গুর --সে আনন্দ মিথ্যা।”^{১৩৯} — সুধাময়ের এই ভালোবাসার মধ্যে দেহজ ও দেহাতীত প্রেমের দার্শনিক চিন্তার দ্বন্দ্বময়তা প্রকাশিত; যা আবার বিমল করের প্রেমভাবনার প্রকৃত সত্যানুসন্ধানে প্রকাশ করেছে।

সুধাময়ের মধ্যে নানা দিক থেকেই লক্ষিত হয়েছে মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্ব যেমন দার্শনিকভাবনা সংক্রান্ত, আনন্দ, প্রেম, সৌন্দর্য্যচিহ্নিত, তেমনি আবার মৃত্যু চেতনা — মৃত্যুযন্ত্রণা সম্পর্কিত দ্বন্দ্ব লক্ষ্য করা যায়; এছাড়াও ব্যক্তিপ্রেমের স্বরূপ সংক্রান্ত নানা প্রশ্ন তার মনকে দ্বন্দ্বসংকুল করে তুলেছে। ভোগ ও ত্যাগ উভয় দিক দিয়েই জীবনকে বিচার করতে চেয়েছে সুধাময়, চেয়েছে সঠিক পথের সন্ধান, যা তার কাছে অধরা থেকে গেছে। আসলে বিমল কর ‘সুধাময়’ গল্পে তুলে ধরেছেন মানুষের অন্তর্জগতের চিত্র — যেখানে সেই মানুষটি নিঃসঙ্গ, অসহায়, অসুস্থ। সমালোচক গোপিকানাথ রায়চৌধুরী বলেছেন — “পঞ্চাশের দশকের শেষ ও ষাটের গোড়াকার বিমল কর, যেন মনে হল এক আমূল রূপান্তরিত সত্তা। বাইরের জগতের চেয়ে অন্তরের অনাবিস্কৃত অন্ধকার বিশাল পৃথিবীর রহস্য উন্মোচনে তিনি যেন তদগত চিন্তা। মৃত্যুচেতনায় যন্ত্রণাবদ্ধ কিংবা অমোঘ বিচ্ছিন্নতা ও নিঃসঙ্গতার অনুভবে বিষন্ন অসহায় মানুষের মগ্নচেতনার ছবি আশ্চর্য রেখায় ফুটে উঠতে লাগল তাঁর এই পর্বের লেখায়। ‘সুধাময়’, ‘আপেক্ষা’, ‘শূন্য’ ইত্যাদি এদের মধ্যে প্রতিভূ স্থানীয় কয়েকটি গল্প। এইসব গল্প লেখক নিঃসঙ্গ অন্তর্মুখী ও রোমান্টিক বিষাদে মগ্ন স্বীয় সন্তার রূপক ছবিকেই যেন তুলে ধরলেন নিপুণ শিল্পিত আধারে।”^{১৪০}

‘নিষাদ’ (‘দেশ’, ১৯৫৮) গল্পটির মাধ্যমে বিমল করের মৃত্যুচেতনা বিশেষ মাত্রা পেয়েছে। মানুষের জীবনের ওপর নিয়তির প্রভাব এবং তার বিষময় ফলস্বরূপ মৃত্যুর কথা এখানে ব্যক্ত

হয়েছে। জলকু এখানে সেই চরিত্র, যার অবশ্যসম্ভাবী মৃত্যু এই গল্পের মূল সত্য। বিমল করের গল্পে মৃত্যুচেতনা লেখকের বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির সাথে বিচার্য বিষয় হয়ে উঠেছে। এই আলোচনা নিবন্ধে বেশ কিছু গল্পে, যেমন ‘অধিকানাতের মুক্তি’, ‘আত্মজ্ঞা’, ‘বুদবুদ’, ‘আঙুরলতা’, ‘অশ্বখ’, ‘সুধাময়’ প্রভৃতি গল্পে মৃত্যুভাবনা নানা অনুশঙ্গ নিয়ে এসেছে তা আলোচিত হয়েছে। মৃত্যু কখনো কঠোরভাবে ব্যক্ত হয়েছে, আবার কখনো সহজ-স্বাভাবিক দৃষ্টিভঙ্গিতে এই সব গল্পে ঘুরে ফিরে এসেছে। ‘সুধাময়’ গল্পে এসে সেই মৃত্যুচেতনা নায়কের মনে এনে দিয়েছিল মৃত্যুভয়, হতাশা ও যন্ত্রণা। ‘নিষাদ’ গল্পে এসে বিমল কর দেখালেন মৃত্যু নিয়তির মত প্রচণ্ড এবং অবশ্যসম্ভাবী, তাকে এড়ানো সম্ভব নয় -- শুধু তা সময়ের অপেক্ষা মাত্র।

‘নিষাদ’ গল্পের শুরুতে লেখক একটি লাইন ব্যবহার করলেন, যা ধুব পদের মতো বার বার গল্পে ঘুরে ফিরে এসেছে, এবং এর মাধ্যমে তার অনিবার্য পরিণতি সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হওয়ার সুযোগ ঘটেছে— “ছেলেটা মরবে; লাইনে কাটা পড়েই মরবে একদিন। হয়ত আজ... কিংবা কাল...”^{১৪১} —এই ভাবেই বার বছরের ছেলে জলকু তার ছাগলছানার হত্যাকারী ভেবে রেল লাইনের ওপর প্রতিশোধ নিতে গিয়ে অনিবার্য মৃত্যুর দিকে এগিয়ে গেছে। জলকুর ছাগলছানা মানিককে হত্যা করেনি রেলগাড়ি, হত্যা করেছে ওদেরই প্রতিবেশী হঠাৎই, অসাবধানে। উত্তম পুরুষের জবানীতে লেখা ‘নিষাদ’ গল্পে বক্তা তার ডালিয়া ফুলের চারা খেয়ে ফেলার অপরাধে মানিককে আঘাত করেছিলেন তার গ্রামফোনের দম দেওয়া ছোট হাতল দিয়ে। কিন্তু ঐ বস্তুটির আঘাতেই মানিক মারা যায়। ‘একটুকুতেই কত কি যে মরে যায়! আশ্চর্য্য!’^{১৪২} —এখানে ‘একটুকু’ শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে বিমল কর মৃত্যুত্যাগিত জীবনের অনিশ্চয়তা ও অনিবার্যতার কথাই ব্যক্ত করতে চেয়েছেন। সামান্য হাতলের আঘাতে যেমন মানিক নিঃশব্দে চলে যায়, তেমনি তারই সূত্র ধরে জলকুও তলিয়ে গেছে মৃত্যুর গহ্বরে। আধুনিক, শিক্ষিত মানুষ হিসেবে বক্তা জলকুর মানসিকতাকে আমল দেননি, জলকুর মানিকের প্রতি ভালোবাসার মূল্য দেননি। নিজের ডালিয়া চারা নষ্ট হয়ে যাওয়ায় মানিককে হত্যা করেছেন, এবং সকলের দৃষ্টির অগোচরে রেল লাইনে সেই নিখর দেহ ফেলে এসে রেলগাড়িকেই জলকুর কাছে দোষী সাব্যস্ত করেছেন অন্যায়ভাবে। তিনি আশঙ্কা করেছেন জলকু রেলগাড়িতে চাপা পড়ে মারা যেতে পারে, তবুও কর্তব্যসচেতন মানুষ হিসেবে নিজের অন্যায় স্বীকার করে এই মৃত্যুর হাত থেকে জলকুকে রক্ষা করেন নি। আধুনিক বিশ্বের এই স্বার্থান্বেষী মানুষেরা অবলীলায় অপরের মৃত্যুর কারণ হয়ে পড়ে

এবং নিজেকে লুকিয়ে রাখে অগোচরে। মানিকের ডালিয়ার চারা খেয়ে ফেলা এবং একদিন বৃষ্টির দুপুরে বক্তার ঘরে জলকুর পিসি তরুর সাথে বক্তার এক রোমান্টিক মুহূর্তে জলকুর মানিককে খুঁজতে হঠাৎই ঢুকে পড়ার পিছনে মানিককেই দোষারোপ করা হয়েছে। তাই তাকে সরিয়ে দিয়ে বক্তা হয়তো ভেবেছিলেন নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। আদুল গা, ঢলঢলে ইজের, একমাথা এলোমেলো চুল নিয়ে দিনের পর দিন রেল লাইনের পাথর তুলে রেল লাইনের প্রতি আক্রোশে ছুঁড়ে মারত জলকু। আর তাকে ধরে নিয়ে আসতেন, বোঝানোর চেষ্টা করতেন বক্তা। জলকুর বাবা পঙ্কু, মা ও পিসি কোনরকমে সংসারকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন, সেই জায়গায় আগামী দিনে তাঁরা সংসারের প্রয়োজনে জলকুকেই স্বাভাবিক ভাবে আশা করবেন। এই সকল মানসিকতার গভীরতা বক্তা বোঝেন নি, বুঝতে চান নি; অথবা বুঝেও লাভ নেই। এটাই হল মৃত্যুর ঘটনা, ঘটে যাওয়ার পর আমাদের মনে ঔচিত্য-অনৌচিত্য সম্পর্কিত নানা প্রশ্ন আসতে পারে কিন্তু ঘটনা অনিবার্য ভাবেই ঘটে যায়, এটাই হল নিয়তি। ‘নিষাদ’ গল্পে সেই নিয়তির কথাই ব্যক্ত হয়েছে।

গল্পটিতে বক্তা মানিককে হত্যা করলেও, জলকুর মৃত্যুচিন্তা তাঁর অন্তর্দ্বন্দ্বকে প্রকাশ করেছেন নানা বর্ণনার মাধ্যমে। জলকুর অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর কথা সংগোপনে তাঁর মনে ঠাঁই নিয়েছিল, তাই প্রতিদিনই জলকুকে ধরে আনতে তিনি যেতেন। কিন্তু যেদিন জলকু মারা গেল সেদিনের প্রকৃতির বিশেষ পরিবর্তন বক্তা তাঁর অনুভূতির সাথে একাত্মভাবে উপলব্ধি করতে পারলেন। তরুর জলকুকে অনুসন্ধান প্রাত্যহিক বিষয় হলেও তা সমধর্মী মনে হয় নি বক্তার কাছে। কিছুক্ষণ আগে একটি মালগাড়ি চলে যাওয়ায় ঘটনায় আতঙ্কিত, শিহরিত ভাবে বক্তা যেন তাঁর চোখের সামনে উপলব্ধি করেছেন কি ঘটে গেছে। তাই হঠাৎ মনে হয়েছে, ‘আকাশে টকটকে রক্ত গোলা রঙ, সূর্যটা লাল, অসহ্য লাল আজ। ভয়ঙ্কর উজ্জ্বল’^{১৪০} বক্তার মনের অপরাধবোধ তাকে ক্রমশই মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব ক্ষতবিক্ষত করে তুলেছে এক অপরিসীম শূন্যতার মধ্যে তলিয়ে গেছেন তিনি। আধুনিক যন্ত্রণাবিদ্ধ মানুষের মুখপাত্র হয়ে নিজের অস্তিত্ব প্রকাশের পাশাপাশি জীবনের শূন্যতাকেও এখানে তিনি ব্যক্ত করেছেন অসহায়ভাবে। “এখানে দাঁড়িয়ে আমি নিজের মন ও সন্তাকে ভাঙলাম দুভাগে। একভাগ আমি, অন্যটি জলকু। মানুষ যখন তার নাগালের কাছে শূন্যতা ছাড়া আর কিছু হাতড়ে পায় না, অথচ তার কথা থাকে, তখন বোধ হয় এই ভাবে নিজেকে ভাঙে।”^{১৪১} —এই বক্তব্যের মাধ্যমে যথার্থভাবেই মনের গভীরে থাকা বেদনা বোধ আশ্চর্য নির্লিপ্ততায় প্রকাশিত হয়েছে।

লেখক বিমল কর জলকুর পরিণতির ভয়াবহতা অত্যন্ত অল্প কথার মাধ্যমে ব্যক্ত করেছেন। যেখানে অনুক্ত কথার সূত্র ধরে আমাদের অনুভবের জগৎটা খুলে গেছে। মৃত্যুর ভয়ঙ্করতা, তার অনিবার্য আগ্রাসী ক্ষুধার সম্পর্কে আমরা নিঃসন্দেহ হতে পারি উপলব্ধির গভীরতায়। “দেখলাম টিলার তলায় অসাড় রেললাইন। এক বালক সেই আলো। হিংস্র খারালো ইম্পাতের ওপর মুঠো মাপের জায়গা টুকুতে আলোছিল। আমার চোখের সাড়া পেয়ে আঙুল দিয়ে কি যেন দেখাল তার পর উড়ে গেল।”^{১৪৫} --এই বর্ণনা একান্তই সংক্ষিপ্ত এবং হার্দিক। ছোটগল্পের ফর্মের দিক থেকে এখানেই সার্থকতা লাভ করেছে গল্পটি।

‘শীতের মাঠ’ (১৯৬০) গল্পে ফুটে উঠেছে একজন অসুস্থ, পঙ্গু পুরুষের নিজের স্ত্রীর প্রতি সন্দেহপ্রবণতা ও অসহায়তা, যার পিছনে কার্যকরী ভূমিকা নিয়েছে তার দৈহিক অসুস্থতার পাশাপাশি মানসিক অসুস্থতা। গল্পটি শুরু হয়েছে নবেন্দুর ‘সারাটা দিন মাঠ মুখে করে বসে থাকা’-র চিত্র দিয়ে। অসুস্থ, চলৎ-শক্তিহীন নবেন্দু জানালা দিয়ে মাঠটিকে দেখে, যেখান থেকে একের পর এক গাছ কাটার শব্দ ভেসে আসে। শীতের হাওয়ার দাপট থাকলেও নবেন্দু জানালা খোলা রাখতে চায়, যেন এর মধ্যেই তার অবশিষ্ট মুক্তি লুকিয়ে আছে। নবেন্দুর এই অবস্থায়, তার যুবতী স্ত্রী, অতসীকে সংসারের প্রয়োজনে স্টেশনে টিকিট কালেক্টরের চাকরি নিয়ে অর্থ রোজগারের চেষ্টা করতে হয়। সারাটা দিন তার অনুপস্থিতি, রাত্রে ফিরে এসে পাশের ঘরে একাকী অবস্থান নবেন্দুর একাকিত্ব, আলস্য, অসহায়তার মাত্রাকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে। পুরো গল্পটিই গড়ে উঠেছে নবেন্দু’র মানসিক চিন্তাধারার সূত্র ধরে। তার বিশ্বাস-অবিশ্বাস, কৌতুহল, সন্দেহ প্রবণতা, সমালোচনা--ভালোবাসার নানান বৈচিত্র্য এই গল্পে বিশেষ মাত্রা পেয়েছে। এর সাথে যুক্ত হয়েছে বিমল করের গল্পে অসুস্থতা, একাকিত্ব, যন্ত্রণার বিশেষ অনুভব-বেদ্য পরিবেশ।

নবেন্দুর মনে হয় অতসী তাকে খুব তাড়াতাড়ি ত্যাগ করে চলে যায়। মাড়খরা ধবধবে শাড়ি-ব্লাউজ, পরিমিত-পরিচ্ছন্ন-পরিপাটি প্রসাধনে সজ্জিতা তার যুবতী স্ত্রীর রূপ, নবেন্দুর চোখে খুব উগ্র মনে হয়। আধুনিক স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে তার মনে হয়, ‘সিথির সিদুর মেটে হয়ে গেছে, ছোট হয়ে গেছে। হয়ত আজকাল অতসী রোজ রোজ আর সিদুর পরে না।’^{১৪৬} --সারাটা দিন বিছানায় শুয়ে শুয়ে নবেন্দু’র মনে অসুস্থ মানসিকতার জন্ম হয়। তাই নিজের স্ত্রীর সিথির সিদুর কমে যাওয়ার পিছনে নিজেদের সম্পর্কের ভাঙনের অদৃশ্য ছায়া কল্পনা করে। অতসীর সাজ-সজ্জা মনে হয় ‘সখী সখী সাজের মতো বিরক্তিকর।’^{১৪৭} শুধু তাই নয় অতসীর কথা বার্তা, উপদেশের

মধ্য দিয়েও তার দায় সারা গোছের মানসিকতার প্রতিফলন লক্ষ্য করে। সিগারেটের জন্য বরাদ্দ করে যাওয়া টাকাটাকেও নবেন্দুর মনে হয় করুণা প্রকাশের ছল বলে। ডাক্তারের বারণগুলোর প্রতি নজর দেওয়ার চেষ্টা করে অতসী, কিন্তু ডাক্তারের পরামর্শ মানে না সে। তাই ডিম, দুধ, ফল যথেষ্ট মাত্রায় সে নবেন্দুর জন্য জোগান দেয় না। নবেন্দুর নড়া চড়া বারণ হলেও সেদিকে খুব বেশি নজর দেয় না অতসী। নবেন্দু অতসীর অনুপস্থিতিতে তার প্রতি এই ভাবে বিরূপ ধারণা পোষণ করলেও অতসীর সীমাবদ্ধতার কথা মনে ঠাই দেয় না। গৃহবধূ হয়েও সে কত কষ্ট করে অর্থ রোজগারের পথ দেখেছে, এর পিছনে তার অক্লান্ত পরিশ্রম এবং কতটা দায়বদ্ধতা প্রকাশিত হয় তা বিচার করে দেখে না। স্বার্থপর মানসিকতায় আবদ্ধ হয়ে নিজের সুখের কথাই ভাবতে চায় নবেন্দু। আসলে এর ভিতর দিয়ে নবেন্দুর অসহায়তাই প্রকাশ পায়। সে চায় অতসী তার কাছে থাকুক, তাকে সেবা করুক, কিন্তু তা ঘটার নয় জেনেও মানসিক অসুস্থতার কারণে অতসীর প্রতি সন্দেহপ্রবণ হয়ে ওঠে। অতসীর ফিরে আসতে দেরী হলেই অতসী সম্পর্কে নানা সন্দেহ তার মনে প্রবেশ করে যা সুস্থ মানসিকতার চিহ্ন নয়। সে নিজের মনে অতসীকে উদ্ধৃত করে প্রশ্ন করে তার পুরুষ সহকর্মীদের সম্পর্কে-- “তোমরা আজ রিফ্রেশমেন্ট রুমে চা খেয়েছ বুঝি? তোমায় ইনস্টিটিউশনের থিয়েটারে ওরা বুঝি নামতে চায়? পরিমল তোমায় আজ সন্ধ্যার পর আটকে রেখেছিল, না? ওর সঙ্গে স্টেশন থেকে রিকশা করে এক সঙ্গে ফিরলে--?”^{১৪} নবেন্দু’র এই সন্দেহপ্রবণ মানসিকতার পিছনে তার মানসিক অসুস্থতাই ক্রিয়াশীল তা বলা যায়। নিঃসঙ্গতা, শারীরিক অসুস্থতার শিকার হওয়ার পর থেকেই তার মনে হয়েছে সে অপরের অনুগৃহীত, দয়ার পাত্র, এবং তার সকল নিজস্ব বিষয় তার অক্ষমতার কারণে অপরের হাতে হস্তান্তরিত হতে পারে, এমন কি নিজের স্ত্রীও। এই ভাবনার দিক দিয়ে নবেন্দু চরিত্রের সংবেদনশীলতা সম্পূর্ণ ভাবে মানবিক স্পর্শপূর্ণ।

নবেন্দুর সকল চিন্তাই অতসীময়, এবং এই চিন্তার জেরে নিজের পশ্চাত্তাপ তার কাছে বড় বেদনাময় হয়ে উঠেছে, নিজের শরীর, গায়ের চামড়ার দিক সে তাকাতে চায় না, তার মনে হয়, বার্ধক্যের চিহ্ন তার শরীরে ক্রমশ সৌন্দর্যকে বিলুপ্ত করে দিচ্ছে। নবেন্দু মনে করার চেষ্টা করে, “গত শীতেও নবেন্দু রোদে তেল কুয়ার জলে প্রাণভরে স্নান করেছে। ওর বুক ছিল, পিঠ ছিল, মেরুদণ্ড ছিল ... আজ এই বুক পিঠ মেরুদণ্ড গাথা শারীরিক আকারটা মনে করা মুশকিল, তবুও নবেন্দু অনুভব করতে পারে, আকারটা বিসদৃশ ক্ষীণ অথবা জন্তুর মতন ছিল না। মানুষের,

স্বাভাবিক সুস্থ মানুষের মতন ছিল। অতসী এই বুকে মাথা রেখেছে, বিছানায় শুয়ে এই পিঠে মুখ ঘসেছে ... ।’’^{১৪৯} অপর পক্ষে স্ত্রী অতসী দিনের পর দিন বাইরের লোকের চোখে ঈপ্সিত হয়ে উঠেছে, তার শরীর শাড়ি, ব্লাউজের প্রতি লোক ক্ষুধিত চোখ নিয়ে চেয়ে থাকে। পরিমল, নন্দী, সিং-রা তাকে সন্তোষ পর্যন্ত ধরে রেখে যেন পক্ষান্তরে নবেন্দুকে বঞ্চিত করতে চায়। এইসব বিকৃত চিন্তাধারা তার মুখেও এনে দেয় কটু, বিশ্বাদের স্বাদ। খাদ্যদ্রব্যের উপকরণ দেখে তার মনে হয় অতসীও তাকে ঠকানোর চেষ্টা করছে, তার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করেছে; তাই কদর্যভাবে নবেন্দু খাবার থালায় অসমাপ্ত রাখে তার খাবার, যেন প্রতিবাদ জানাতে চায় অতসীর বিরুদ্ধে।

বিমল কর এই গল্পে মাঠ ও নবেন্দুর মনে রিক্ততার ছবি আঁকলেও তার মাধ্যমে পরিণতি দেখাননি, নবেন্দুর মনে নিজের স্ত্রী সম্পর্কে বিশ্বাসবোধ ফিরিয়ে এনেছেন। সারাদিন বিছানায় শুয়ে শুয়ে জানালা দিয়ে শূন্য মাঠটির রিক্ততা দেখে দেখে নিজের মনেই রিক্ততার জন্ম দেয় নবেন্দু। কল্পনার চোখে অতসীর প্রতি মুহূর্তের কাজগুলি যেন দেখতে পায়, সে দেখায় কমণীয়তা নেই, আছে সন্দেহপ্রবণতা। সে ভাবে অতসীর সাথে নন্দী, সিং, পরিমলের মত সহকর্মীদের হাস্যালাপ, কিংবা সুখ-সন্ধানী প্রেমের আমন্ত্রণ, অতসীকে ক্রমশ পরিবর্তিত করে দিচ্ছে। অতসী কেন ফিরতে দেরি করে তার পিছনেও সন্দেহপ্রবণতা নবেন্দুর বুকে কাঁটার মতো বিধতে থাকে। কিন্তু যখন সে অতসীর মুখে তার রোজগারে জীবনের গ্লানি ও হতাশার ছবিকে ফুটে উঠতে দেখে এবং এর পিছনে তার শুশ্রূষার কারণকে বিশ্বাস বোধের শক্ত জমিতে প্রোথিত করতে পারে তখনই অজস্র সন্দেহপ্রবণতার মধ্যেও স্ত্রীর প্রতি বিশ্বাসী হয়ে ওঠার প্রার্থনা জানায়। কল্পনা করে অতসী তার উজ্জ্বল সিঁথির সিঁদুরের চিরন্তনতায় স্বামীর প্রতি মমত্বকে চিরস্থায়ী রূপ দিয়েছে। তাই অজস্র রিক্ততা, শূন্যতার মধ্যেও নবেন্দুর অকারণ সন্দেহপ্রবণতা থেকে স্ত্রীর প্রতি বিশ্বাসবোধে পুনরাবর্তনের ছবিকে ফুটিয়ে তুলেছেন লেখক, এবং এর মাধ্যমে তাঁর জীবনবোধের শুভময় দিকেরই প্রকাশ ঘটেছে।

নবেন্দু সারাটা দিনের মাঠের ছবির মধ্যেও লক্ষ্য করে ক্ষয়িষ্ণুতা, মাঠের গাছ কাটা, তার বেদনার্ত একঘেয়ে কুড়ুলের শব্দ, পাখিদের উড়ে যাওয়া সব কিছুর পিছনেই অপ্ৰাপ্তির, ধ্বংসের বেদনা মূর্ত হয়ে ওঠে। শীতের হাওয়ায় যেমন গাছের পাতা ঝরে পড়ে নবেন্দুর মনেও শুধু ক্ষয় ও পতনের চিত্র। শীতের প্রাণহীনতা যেন তার কাছে ভাস্বর হয়ে ওঠে। এখানে শীতের মাঠ

নবেন্দুর মানসিকতার সাথে একাত্ম হয়ে তার নিঃসঙ্গতা, বেদনার্ত হৃদয়ের প্রতীতিকেই অত্যন্ত তাৎপর্য পূর্ণ ভাবে প্রকাশ করেছে।

গল্পটিতে নিম্ন মধ্যমিত্ত সংসারের বাস্তব পরিস্থিতিকে লেখক ফুটিয়ে তুলেছেন। স্বামীর অসুস্থতায় স্ত্রীর সংসারের প্রয়োজনে চাকরি করতে যাওয়া। তার কর্মস্থলে সহকর্মী ও অন্যান্য মানুষের তার প্রতি কৌতূহল ও সান্নিধ্যলাভের প্রত্যাশা, সেই সূত্র ধরে অবৈধ প্রেমের সূত্রপাত ঘটার সম্ভাবনা, চিকিৎসার খরচ বেড়ে যাওয়া, সংসার চালানোর ক্ষেত্রে অর্থের অপতুলতা, ধার করে সেই ঘটিতি মেটানোর প্রচেষ্টা সব কিছুর মধ্যেই স্বাধীনোত্তর ভাবতবর্ষের নিম্নবিত্ত সংসারের আর্থিক চিত্র প্রকাশিত। এর পাশাপাশি প্রকাশিত হয়েছে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্কের ভাঙন, মানসিক ভাবে সন্দেহপ্রবণতা, বিকারগ্রস্ত মানসিকতা, নিজের অক্ষমতার কারণে অহেতুক সন্দেহপ্রবণতায় ভালোবাসার মানুষটিকে বিকৃত, গ্লানিময় করে তোলার এই প্রবণতাও রবীন্দ্রোত্তর কথাসাহিত্যের একটি বৈশিষ্ট্য। তবুও রিক্ততা-শূন্যতা-অসহায়তার মধ্য থেকেও বিশ্বাসবোধ ও শুভবোধে ফিরে আসার বাসনা এই ছোটগল্পের মাধ্যমে বিমল করে জীবনদৃষ্টির বৈচিত্র্যকে প্রকাশ করেছে।

‘বাঘ’ (১৯৬০) গল্পটির মধ্যেও নিঃসঙ্গতার ছবি প্রকাশিত হয়েছে। এখানে অচিন্ত্য ও শচী, স্বামী-স্ত্রী উভয়ে পৃথক জগতে অবস্থান করছে, এবং সে কারণে গৃহবধু সন্তানহীনা শচী একাকিত্বের অসহ্য যন্ত্রণায় কাতর। অচিন্ত্যর মনোজগৎ বাঘ-কে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। বনভূমির পাশে কিছুটা মফস্বল এলাকায় অচিন্ত্যর চাকুরিসূত্রে তারা বাস করে। অচিন্ত্য খবর পায় একটা বাঘ তাদের এলাকায় চলে এসেছে। এই কারণে সে উত্তেজিত ভাবে অপেক্ষা করে দস্তদা বা দস্তবাবু’র। দস্তবাবু এলেই সে তার সাথে বাঘ শিকারে বেরিয়ে যাবে। অচিন্ত্য সর্বদা নিজের চিন্তাতেই আবদ্ধ। তার কাছে বাঘ মারার ইচ্ছা তই আলাদা। শচী লক্ষ্য করে অচিন্ত্যর সকল সময় সকল চিন্তাতেই বাঘের প্রসঙ্গ। অথচ ঘরে স্ত্রীর প্রতি তার এই উদাসীনতা কোন ভাবেই তার দৃষ্টি এড়ায় না। শচী তাই ভাবে, “জীবনে যেন আর কোন আকাঙ্ক্ষা নেই মানুষটার, শুধু একবার একটা বাঘ দেখতে চায়, গুলি করে মারতে চায় নিজের হাতে।”^{১৫০}

অচিন্ত্যর মনের এই জ্বিঘাংসাবৃত্তি শচীর মনে হতাশার সৃষ্টি করে। একজোড়া পায়রা প্রতিদিন শচীর হাত থেকে দানা খেত। একদিন বাজি ধরে অচিন্ত্য ও দস্তবাবু তাদের মেরে ফেলেছে। সকাল বেলা প্রতিদিন সেই স্মৃতি তার মনে শূন্যতার সৃষ্টি করে। ‘শচীর সেদিন মনে হয়েছিল, একদিন বাজি ধরে হয়ত ওরা তাকেও মেরে ফেলতে পারে।’^{১৫১} —শচীর এই চিন্তা ধারার মধ্যে

সুস্পষ্ট অচিন্ত্য ও দস্তবাবু সর্বদা শিকার করার জন্য মস্ত, সে শিকার বাঘ, পায়রা কিংবা তার মত নিঃসঙ্গ নারী-যে কেউ হতে পারে। তাই অচিন্ত্যের শরীরেও সে দেখতে পায় সেই কাঠিন্য; শক্তিশালী, তেজী এক পুরুষের চেহারা-- ‘বুকটা শাল গাছের শক্ত গুঁড়ির মতন। ঘন কালির রঙ। অজস্র লোমা। সুগঠিত সমর্থ এই বুক দেখলে শচীর মনে হয় মানুষটা এক সময় যেন বনে কাঠ কেটে বেড়াত।’^{১৫২} শচী মনে করে তার জন্য অচিন্ত্যের মন কোন কমণীয়তা ও সহানুভূতির স্থান নেই, তার শরীর যেমন শক্তপোক্ত, তেমনি মনটাও কঠিন।

‘বাঘ’ গল্পটিতে লেখক শচীর চোখ দিয়েই ঘটনাক্রমকে বিশ্লেষণ করেছেন। তাছাড়া শচীর অন্তর-জগতের চিত্রই বেশি মাত্রায় চিত্রিত করেছেন লেখক। অচিন্ত্য ও শচী পৃথক জগতের অধিবাসী, অচিন্ত্যের আকাঙ্ক্ষা ও দৃষ্টি বাহ্যঘটনা ও কর্মতৎপরতায় সীমাবদ্ধ, সে সম্পূর্ণভাবে বাইরের জগতের অধিবাসী, আবার শচী অন্তর-জগতের মধ্যেই তার চিন্তাধারাকে সীমাবদ্ধ রেখেছে। তার মন একারণেই অত্যন্ত স্পর্শকাতর হয়ে উঠেছে। অচিন্ত্যকে সে দূরে রেখেছে এবং অন্তর-জগতের নিরন্তর শূন্যতার মধ্যে থেকে নিজের ব্যর্থতাকে দৃঢ় ভাবে প্রকটিত করতে চেয়েছে। সকাল বেলায় বাস থেকে নামা দুটি যুবক যুবতীকে সে আমতলায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিল, তাদের সর্বাস্থে কল্পনা করেছিল মধুর বর্ণ, যে বর্ণ আশ্রা, বিশ্বাস, স্বপ্ন কামনায় মধুর। রাত্রিবেলায় অচিন্ত্যের সাথে উঠানে বেড়াতে বেড়াতে একবার তারও মনে হয়েছিল ওরা যুগলে তার নীচে গিয়ে দাঁড়াক। বর্তমানে জীবনের একঘেয়েমি, একাকিত্ব থেকে সরে গিয়ে জীবনটাকে আশা-আশ্বাসে ভরিয়ে তুলুক। কিন্তু অচিন্ত্যের একাদিক্রমে বাঘ-প্রসঙ্গ তাকে তার কল্পনা থেকে সরে আসতে বাধ্য করেছে। এই জীবনের যন্ত্রণা তার একান্ত ভাবে একারই। তাই তা সে কারোকেই প্রকাশ করতে পারে না। গভীর ঘুমের স্বপ্ন থেকে জেগে উঠে অনুভব করে তার সামনে বিকল্প পথ খোলা নেই। এই জীবনের চক্রাকার একঘেয়েমির মধ্যেই তাকে আবর্তিত হতে হবে নিরন্তর, নিঃসঙ্গ ভাবে। মনের গভীরে প্রাবিত হয়ে যাবে নিবিড় শূন্যতা--সে জগৎ একান্তভাবে শচীরই। ‘বনোয়ারীলালের বাসের মতন তাকে কেউ তুলে নিয়ে যাবে না। শচী তার প্রতি রোমকূপে ব্যর্থতার স্বেদ অনুভব করতে পারছিল। জীবন এত শূন্য, অর্থহীন শচী আগে কখনও বোধ করেনি, তার দুটি বশীভূত পায়রা মরে যাবার পরও নয়। বেদনা শচীকে ক্রমশ পরিত্যক্ত শিশুর মতন অসহায় করে তুলেছিল।’^{১৫৩} তার অন্তর-জগতের এই শূন্যতা থেকে পরিভ্রাণের কোন পথ দেখতে পায়নি শচী। অচিন্ত্যকে দেখে তার মনে হয়েছে, অচিন্ত্য তার বাহ্য জগৎ নিয়ে বেশ ভালো আছে, তার সারল্য,

সাবলীলতা নিয়ে সে খুব খুশি ও নিশ্চিন্ত। তার মনে হয়েছে অচিন্ত্য তার জগতে খুব কল্পনাপ্রবণ, সেই বাহ্য জগৎই তার প্রেরণাশক্তি। অন্তর-জগতের নিরন্তর এই হতাশা যা শচীর জীবনকে অর্থহীন করে তুলেছে তার স্পর্শ নেই অচিন্ত্যর কাছে। শচী কল্পনা করেছে, ‘অচিন্ত্যর হৃদয়ে কোথাও শূন্যতা নেই। তার প্রাণবায়ু পূর্ণ, গভীর। অচিন্ত্য একদিন তার জীবনকে অর্থময় করে তুলবে। সে বাঘের স্বপ্ন দেখে বেঁচে থাকবে এবং কোনদিন নিজের জীবনের বিনিময়ে এক আকাঙ্ক্ষিত আনন্দময় তার করতলগত করে দেবতার মতন হাসবে।’^{১৫৪}

শচীর মাধ্যমে লেখক আধুনিক মানুষের অন্তর্মুখী, আত্মসুখী দিকটিকে প্রকাশ করেছেন। নিজের জগতে সীমাবদ্ধ থেকে সেই মানুষ কেমন ভাবে একাকিত্বকে বরণ করে নেয়, মনের গভীরে অন্তর-জগতের নানা চিন্তার মাধ্যমে কেমন করে গভীর শূন্যতায় আবিষ্ট হয়ে যায় তারই উদাহরণ শচী। শচীর জীবনের ট্রাজেডির ক্ষেত্রে তার নিঃসঙ্গতা ও শূন্যতাই একমাত্র কারণ, এই জগৎ থেকে সে বেরোতে পারে না। আত্মপীড়নের মধ্য দিয়ে নিজেকে নিঃশেষিত করে তোলে; অসহায়ভাবে আত্মসমর্পণ করে নিজের নিয়তিত্যাগিত জীবনের কাছে। ‘শচী আজ স্থির নিশ্চয়, অচিন্ত্য তার জীবনের আবেগে এবং ধ্রুব বিশ্বাসে তার মনোমত কীর্তি অর্জন করবে। শচী কিছু করবে না। গাছের ছায়ার মতন সে বেঁচে থাকবে। নিয়তি নির্দিষ্ট সীমায় পরজীবী আলোয় কখনও হৃদয় কখনও বর্ধিত আকারে তাকে আমৃত্যু বেঁচে থাকতে হবে।’^{১৫৫}

গল্পটির শেষাংশে লেখক আধুনিক মনস্তত্ত্বের যন্ত্রণাময় উপলব্ধিকে প্রকাশ করেছেন, যেখানে চিন্তাশীল, মনস্তাত্ত্বিক ভাবনার মাধ্যমে অনুভূতিশীল স্পর্শকাতর মানুষ গভীর অসহায়তার মধ্য দিয়ে জীবনের ব্যর্থতার কাছেই আত্মবলিদানে রত হয়। অচিন্ত্য ও শচীর চরিত্র পাশাপাশি অঙ্কন করে বাহ্য জগতের উত্তেজনা, উদ্দীপনা ও অন্তর-জগতের নিঃসঙ্গতার উপলব্ধি, এই দুই জগতের প্রভেদকে আরও উজ্জ্বলভাবে প্রকাশ করেছেন লেখক, এবং সর্বোপরি ফুটে উঠেছে আধুনিক জীবনের শূন্যতা, মানসিক অসুস্থতা, নিঃসঙ্গতার রূপ।

‘ত্রিলোচন নন্দীর নামে ছড়া’ (দেশ, ১৯৬১) গল্পটির অভিনবত্ব বিমল করের গল্পকার ও গল্প-গবেষক মানসিকতার বৈচিত্র্যের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত। গল্প নিয়ে নিরন্তর পরীক্ষা-নিরীক্ষার পথে ‘ত্রিলোচন নন্দীর নামে ছড়া’ গল্পটি বিশিষ্টতা লাভ করেছে। ‘সুধাময়’ গল্পের পর থেকেই মূলত বিমল করের ‘গল্প-বিহীন’ গল্প বা ‘না-গল্প’ রচনার প্রয়াস লক্ষিত হয়, যে সব ক্ষেত্রে ভাষার উপর তিনি বিশেষ কারিগরি দেখিয়েছেন, ‘ত্রিলোচন নন্দীর নামে ছড়া’ গল্পটি সেই গোত্রের।

এছাড়াও এই গল্পে আরও একটি বিষয় চোখে পড়ে, তা হল অবৈধ প্রেম, যৌনতার যথেষ্ট সুযোগ থাকলেও বিমল কর শেষ পর্যন্ত সেই স্পর্শ থেকে গল্পকে বাঁচিয়েছেন, এই গল্পের কাহিনীর একটি বিশেষ দিক হল, একজন পুরুষ অপর পুরুষের কাছে নিজেকে সমর্পণ করে জীবনের পাপবোধ থেকে রক্ষা পাওয়ার চেষ্টা করেছে যা, একটি অভিনব দিক বলে মনে হয়েছে।

ত্রিলোচন রবিবারের হাট থেকে একজোড়া পাখি কিনে ঠকে গেছিল, কারণ সাতদিনের মধ্যেই পাখির সেই রঙ ফ্যাকাশে হয়ে সাদামাটা চডুইতে আত্মপ্রকাশ করেছিল। এই হার নিয়ে তার আপশোস খুব বেশি ছিল না, কারণ তা নিয়ে হাহাকার করতে দেখা যায় নি, এবং নিজেই সে এই কথা নরেন মাস্টারকে জানিয়েছে এবং নির্লিপ্ত ভাবে বলতে পেরেছিল “পাখিওলা রঙ পাকা করতে পারে নি, পারলে তার জিত হত।”^{১৫৬} এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ত্রিলোচন নন্দীর নামে একটি সরস ছড়া লোখমুখে হঠাৎই ছড়িয়ে পড়েছিল এবং রসিক মানুষের সৃষ্টিশীলতায় তার ব্যঙ্গনাও গভীর হয়ে উঠেছিল। ‘ছড়া শুনেই ত্রিলোচন, ত্রিলোচনের বউ এবং তাদের সংসারের স্পষ্ট ছবি দেখা যেত, বিন্দুমাত্র কষ্ট হত না। কেউ কেউ বলল, ডিমের ওপর যেমন খোলা, তেমনি এই ছড়াটা ত্রিলোচন দের ওপরকার খোলা--ভাঙলে ভেতরটা টল টল করে ফুটে বেরবো।’^{১৫৭} এখানেই লেখক ত্রিলোচনের সংসারের ভিতরকার গোপনীয়তা ও রহস্যময়তার ইঙ্গিত করেছেন। এই সূত্রে বলা যায় এই রহস্যময়তা সংসারে বহিরাগত পুরুষকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। এখানে প্রথম পুরুষের প্রসঙ্গ এসেছে নরেন মাস্টারকে কেন্দ্র করে। শুরুতেই নরেন-মাস্টার অস্ত্রপুর পর্যন্ত গলা তুলে ত্রিলোচনের ঠকে যাওয়ার ঘটনার ব্যাখ্যা করে উৎফুল্ল হয়ে বলেছিল, “দেড় টাকায় পাখি কিনতে গেলে ওই রকম হয়। পোষা জিনিসের জন্যে খরচ করতে হয়; মশাই, পয়সা।”^{১৫৮} এরপর দ্বিতীয় ঘটনাটি হল ত্রিলোচনের অনুপস্থিতিতে গৌরগোপাল নামক আরও এক পুরুষ ত্রিলোচনের বউ ফুল্লরাকে উদ্দেশ্য করে নিজের ময়ূর পোষার ইচ্ছা প্রকাশ করলে ফুল্লরা পুরুষের ভোগবাদিতার প্রতি ইঙ্গিত করে বলেছে “পুষতে, তারপর মাংস খেতে।”^{১৫৯} সমস্ত শব্দ ও বাক্যগুলিকে বিশ্লেষণ করলে উপলব্ধ হয়, ত্রিলোচনের বউ ফুল্লরাও একটি পাখির মতন, যার রঙ ও সৌন্দর্য দেখে ঘরে আনার পর ত্রিলোচনও ঠকে গেছে। নরেন মাস্টার বা গৌর গোপাল’রা তাদের ব্যবহারের মাধ্যমেই নিজেদের প্রবৃত্তিকে প্রকাশ করেছে।

ত্রিলোচন সব কিছু উপলব্ধি করেও তৃতীয় আরও এক পরপুরুষ, আমাদের গল্পের কথক মুরারি, যার সাথে ত্রিলোচনের মড়কের দিনে ভাব হয়েছিল, তাকে বর্ষার রাতে নিজের বাড়িতে

স্থান দিয়েছে। মুরারির ভেজা কাপড়ের পরিবর্তে শুকনো কাপড় এনে দিয়েছে ফুল্লরা। শুধু তাই নয় মুরারির মাথা ও শরীর মুছিয়ে শুষ্ক, তপ্ত করে তোলার চেষ্টা করেছে। মুরারিও ফুল্লরার প্রতি দুর্বলতা অনুভব করেছে, তার মনে হয়েছে, ‘সাপুড়ের বাঁশীর মতন তার ফোলা বকের ওপর আমার বিব্রত দৃষ্টিকে আমি স্থির হতে দিচ্ছিলাম না।’^{১৬০} কিংবা ‘ফুল্লরার চঞ্চল হাত আমায় স্থির থাকতে দিচ্ছিল না। এক সময় আমার মনে হল, শিরার মতো আমার দুটি চক্ষু আমার অসহায়তা লক্ষ্য করেছে, পর মুহূর্তে ধারণা হল ফুল্লরার কম্পিত মেদস্তরে আমার দুর্লভ্য বস্তুগুলি কেউ দুহাতে ছড়িয়ে দিচ্ছে।’^{১৬১} মুরারির মনে ‘কামভাব জাগলেও সে যেমন বেপরোয়া হয় না, তেমনি ত্রিলোচনের কথাতেও জানতে পারা যায় মুরারিকে ঘরে স্থান দিয়েও সে চিন্তিত নয়। ত্রিলোচন তাকে জানিয়েছে, “আমি জানি তুমি নরেন মাস্টার নও।”^{১৬২} —অর্থাৎ ত্রিলোচন নরেন মাস্টারের আগ্রাসী পরকীয়া প্রেমের মানসিকতা মুরারির মধ্যে দেখতে চায় না।

মুরারির চোখ দিয়ে গল্পকার দেখাতে চেয়েছেন এই গল্পের চরিত্র ও ঘটনাগুলিকে। ত্রিলোচন সম্পর্কে তার মনে হয়, ‘ত্রিলোচন বিশ্বাসী এবং যুক্তিবাদী। কোন কোন জিনিস সে বিশ্বাস করে, কোন কোন জিনিসে যুক্তি মানে। অধিকাংশ মানুষই এই রকম। কিন্তু এই বিশ্বাস এবং যুক্তির মধ্যে তাদের সবটুকু ডুবে নেই। বিশ্বাসও আধখাপচা, যুক্তিও তাই। ত্রিলোচনের তা নয়। তার বিশ্বাসের ক্ষেত্রে সে সম্পূর্ণ, তার যুক্তির ক্ষেত্রে সে পূর্ণ অনুগত।’^{১৬৩} তাই সে নিজে বসন্তের টিকা নেয়নি, হোমিওপ্যাথি গুলিকে বিশ্বাস করেছে, এমন কি টিকা প্রদানকারী মুরারিকেও সে অসুস্থতা থেকে ভালো করেছে। ত্রিলোচন যেমন তার বিশ্বাসের দায়ভার অন্যের উপর চাপায়নি, তেমনি অপরের স্বাধীনতায় অকারণ হস্তক্ষেপ করেনি। তাই ফুল্লরার বিশ্বাস অনুযায়ী তাকে টিকা দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়েছে, তার অবৈধ সংসর্গের পথে বলপূর্বক বাধা দান করেনি।

‘ত্রিলোচন’ এই নামটি লেখক বিশেষ উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে ব্যবহার করেছেন বলে মনে হয়; যেখানে ত্রিলোচন নির্লিপ্ত, নিঃশঙ্ক, সর্বদ্রষ্টা, সর্বজ্ঞানী রূপে প্রতিভাত। আবার অপরপক্ষে মনে হয়, এই ত্রিলোচন হল জ্ঞানচক্ষু, যা সকল মানুষের উপলব্ধির গভীরতায় প্রবিষ্ট। তাই ত্রিলোচনের কাজের সাথে অপরের মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। এমন এক বর্ষার দিনে মুরারি’র যেখানে মনে হয়েছে, “আমি ত্রিলোচন হলে আজ ফুল্লরাকে কাছে বসিয়ে রাখতাম মুরারিকে নয়।”^{১৬৪} ত্রিলোচন তা করে নি। মুরারির সাথে ফুল্লরার সান্নিধ্যে পাহারাওয়ালার মতও আচরণ করে নি। হাত দেখার বিষয়ে ত্রিলোচন মুরারিকে বলেছে, “সংসারে তোমায় কিছু কিছু বিশ্বাস করতেই হবে।”^{১৬৫} —এই

বিশ্বাস নিয়েই সব কিছুর উপর ত্রিলোচন নির্লিপ্ত থাকতে পারে, এই বিশ্বাসের জেরেই সে উদাসীন ও খুশি থাকতে পারে। এই ভাবে মুরারির জ্ঞানচক্ষুও খুলে দিতে পেরেছে ত্রিলোচন। আতস কাঁচের ভেতরে দিয়ে বিশালাকায় চোখ দেখে ভীত, আতঁ হয়ে উঠেছে মুরারি, তার অঙ্গুষ্ঠকরণ যেন উন্মুক্ত হয়ে গেছে এই দৃশ্যে। ত্রিলোচনের পশু ও পাখি চেনার জ্ঞান তার মনে বিশেষ বিশ্লেষণী শক্তি নিয়ে হাজির হয়েছে। রাত্রের অন্ধকারে ঘরের বাইরে অপেক্ষমাণ অন্ধকারকে চিনতে পেরেছে মুরারি নিজেরই প্রবৃত্তির অন্ধকার বলে। যে প্রবৃত্তি ফুল্লরার শরীরকে কেন্দ্র করে তাকে উত্তেজিত করে তুলেছিল, তার রহস্যও উন্মোচিত হয়েছে মুরারির কাছে। তার মনে হয়েছে, “ত্রিলোচনের ভগবান পাখির গায়ে পাকা রঙ দেবার আগে আমাদের ইন্দ্রিয়ে কাঁচা মাল মশলা ঢেলেছে। আমার ইন্দ্রিয় তার রসনা লালায়িত করে এই সংসারে পাখিঅলা সাজতে চেয়েছিল।”^{১৬৬} অপরকে বঞ্চিত করে অপরের সম্পত্তি ভোগ দখল করার যে প্রবৃত্তি তা এখানে উন্মুক্ত হয়েছে। নিজেকে চিনতে পারার দুঃসাহসিক ভয়ঙ্করতা যখন আবৃত করেছে মুরারিকে, তখনই সে সত্যদর্শনের একাগ্রতায় নিজেকে সমর্পণ করেছে ত্রিলোচনের কাছে। একদিন ত্রিলোচনের হোমিওপ্যাথিকে বিশ্বাস করতে হয়েছিল, আজ তার জ্যোতিষচর্চাকেও বিশ্বাস করতে হল। কারণ ত্রিলোচন সংবেদনপূর্ণ মানুষের ‘ত্রিলোচনের দৃষ্টিকে’ সজাগ করে দিয়েছে। তাই মুরারি বলেছে, “শেষ রাতে ত্রিলোচন নন্দীর আতস কাচ এই সংসারের কোনও অদৃশ্য পুরুষের বিশাল তীর চক্ষু হয়ে আমায় দেখতে লাগল। এই চক্ষু যেন ত্রিকাল দর্শক। আমি ভীত ঘর্মাক্ত তৃষিত হয়ে সেই চক্ষুকে বলেছিলাম, ‘তোমায় বিশ্বাস করি।’”^{১৬৭} এর পর মুরারি নিজেকে সমর্পণ করে দিয়েছে ত্রিলোচনের হাতে— ‘এই বীভৎস মড়কে না হলে বাঁচার উপায় ছিল না।’^{১৬৮} —এই মড়ক হল মানুষের প্রতি মানুষের প্রতারণা করার প্রবৃত্তি, নিজের ভোগ সর্বস্বতার কারণে অপরকে বঞ্চিত করার মানসিকতা, মানুষের বিশ্বাসকে খুন করে সন্দেহপ্রবণতার বীজকে অঙ্কুরিত করে তোলার অমানবিকতা। বিমল কর তাঁর জীবনদৃষ্টির স্বাতন্ত্র্যে স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষের তৎকালীন হিংসা-মদমত্ততা, স্বার্থপরতা, ভোগসর্বস্ব মানসিকতার উপরও মানুষের শুভবোধ, পরিচ্ছন্ন মানসিকতার প্রতি একাগ্রতার ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন।

ত্রিলোচন ও ফুল্লরার সম্পর্কের মধ্যেও লেখক দেখাতে চেয়েছেন তৎকালীন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রতি তাঁর সমর্থন। মুরারির মনে হয়েছে, “ফুল্লরাকে দেখে, অনেকদিন মেলামেশার পরও আমার মনে হল না, ফুল্লরা বাস্তবিক ত্রিলোচনের পোষা পাখি। ওদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একটা দূরত্ব আছে

ঠিকই, সে দূরত্ব ওই রকম হাড় মাংসের নয়, অন্যরকম।”^{১৬৯} ফুল্লরা এখানে সাধারণ মানুষের মত প্রবৃত্তির সাপেক্ষে কাজ করেছে, অপর পক্ষে ত্রিলোচন সর্বজ্ঞানীর মত সকল কালিমার স্পর্শ থেকে নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা করেছে। এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য এই গল্পে পৃথক ভাবনার প্রকাশ ঘটায়।

গল্পটির শুরু আকস্মিক ভাবে, যেখানে ত্রিলোচনের স্বপ্ন বুদ্ধি লোকের কাছে হাস্যকর ঠেকে। রবিবারের হাটে রঙ করা পাখি কেনা এবং সাতদিনের মধ্যে তার রঙ উঠে যাওয়ার মত মজার ঘটনা দিয়েছেন লেখক। বিমল করের গল্প শুরুর মধ্যে অসাধারণত্ব না থাকলেও, সাধারণ কাহিনীর মধ্যেও লেখক অনুভূতিগত কিছু বার্তা প্রকাশ করে গল্পটিকে অসাধারণ উচ্চতায় তুলে নিয়ে যান, এবং এখানেই কাহিনীর থেকেও মূল্য পেয়ে যায় গভীর তত্ত্বকথা ও ইঙ্গিতময়তা। শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রেও লেখক অত্যন্ত সচেতনতা দেখিয়েছেন। এই গল্পে ‘কাঁচা’ শব্দটি বিশেষ অর্থবহ, কারণ ত্রিলোচন পাখির রঙটা পাকা নয় বলে জানিয়েছে। মুরারির কাছেও একই কথা সে জানিয়েছিল তার কেনা পাখির রঙ যেমন কাঁচা ছিল, তেমনি নরেন মাস্টার সম্পর্কে সে জানিয়েছে তার দাবার হাত ‘কাঁচা’। দাবা খেলার উল্লেখে আমরা যে ভোগ-দখলের বিষয়টিকে বুঝতে পারি, সেক্ষেত্রে এই গল্পে নরেন মাস্টারের হাত ‘কাঁচা’ হওয়ার সাথে গভীর রহস্যময়ভাবে উপলব্ধ হয় যে, ফুল্লরা সম্পর্কেও নরেনের যে প্রবৃত্তি প্রকাশিত হয়েছিল তা ত্রিলোচনের কাছে পরিষ্কার। নরেন বা গৌরগোপাল সকলেই ত্রিলোচনের চরিত্রের সরলতার কারণে তাকে ঠকানোর চেষ্টা করলেও, তার কাছে হেরে যাওয়া সৈনিকের মতো। তারা সকলেই সেই অর্থে ত্রিলোচনের কাছে কাঁচা।

এই গল্পে চক্ষু যেমন প্রতীক, তেমনি হাতও প্রতীক হয়ে উঠেছে। ত্রিলোচনের চক্ষু মুরারির জ্ঞানচক্ষু উন্মোচিত করে দিয়েছে। আবার ত্রিলোচনের হাত দেখার প্রসঙ্গ মুরারি প্রথমে অবিশ্বাস করলেও গল্পের শেষে দেখা যায় ‘আমার হাতে আমি ধরা আছি’-- মুরারির এই আত্মদর্শন তার ব্যক্তিত্ব, তার বোধগম্যতার প্রতি তার বিশ্বাসবোধকেই প্রকাশ করেছে। আতস কাঁচের ভিতর দিয়ে হাতের অস্পষ্ট রেখাগুলির মাধ্যমে দুর্বোধ্য রুগ্ন প্রবৃত্তির যে ছায়া মুরারির অন্তঃকরণের সাথে একাত্ম হয়ে উঠেছিল, সেই রুগ্নতার উপশমের প্রতি মুরারি নিবিষ্ট হতে পেরেছে। ত্রিলোচনের কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়েই এই গল্পে ঘটেছে মুরারির আত্মদর্শন। গল্পটিতে নানা প্রতীকের মাধ্যমে লেখক মানুষের অন্তর্জগতের চিত্রকে প্রকাশ করেছেন, এবং তার মাধ্যমেই নিজের গভীর জীবনদর্শনকে মূর্ত করে তুলেছেন। গল্পটির শিল্প সার্থকতা এই সকল দিক দিয়েই প্রশ্নাতীত।

‘গগনের অসুখ’ (শারদীয় ‘আনন্দবাজার পত্রিকা’, ১৯৬২) গল্পে গগন শারীরিক অসুস্থতার কারণে দীর্ঘদিন ধরে স্যানিটোরিয়ামে ভর্তি রয়েছে। তার ছোটমামা কিছু প্রয়োজনীয় জিনিস পত্র নিয়ে তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন, সঙ্গে নিয়ে এসেছেন গগনের ছোট ভাই নয়নের বিয়ের সুখস্মৃতি নিয়ে। তার বর্ণনায় এবং গগনের কল্পনায় সমস্ত ছবিই যেন প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। সব কিছুকে ছাপিয়ে যে কথাটি তীব্র ও যন্ত্রণাদায়ক হয়ে উঠেছে তা হল গগনের প্রশ্ন, ‘আমায় কবে নিয়ে যাচ্ছ?’^{১৭০}

বিমল করের গল্পে অসুস্থতা, ক্লান্তি, অবসন্নতা, নিঃসঙ্গতা, একাকিত্ব, মৃত্যুভয়, মৃত্যুযন্ত্রণা, নানাভাবে ঘুরে ফিরে এসেছে। ‘গগনের অসুখ’ গল্পেও শারীরিক অসুস্থতা একসময় মানসিক অবসাদের সাথে একাত্ম হয়ে যায়। গল্পটি পাঠ করতে করতে অনুভূতির তীব্রতায় পাঠকের মনেও এক ব্যাখ্যাহীন অনুভূতিগম্য বেদনাবোধ সঞ্চারিত হয়ে যায়। গল্প তার গল্পাত্মকে ছাপিয়ে মানুষের মানসিকতার সাথে নিবিড় ভাবে সখ্যতা জ্ঞাপন করে। গগন দীর্ঘসময় পরে বাড়ির লোকেরদের ছবি দেখতে পোয়েছে। লতু বেশ বড় হয়ে গেছে, নয়নের চেহারাও ভালো হয়েছে, সেই ঘরটাতে ছবি তোলা হয়েছে যেখানে গগন আর নয়ন একসাথে থাকতো। এছাড়াও তার মনে হয়েছে, গগনের বউ একসময় তাকে সাইকেল শেখার সময় রাস্তায় পড়ে যেতে দেখেছিল, (নয়নের সেই চিঠির কথা)। গগনের এই সব চিন্তায় তার অতীতচরিতার প্রসঙ্গই প্রাধান্য পেয়েছে। Stream of consciousness এর মাধ্যমে হারানো সেই সুখস্মৃতিগুলো সে মনে করেছে, কিছু ছোট মামাকেও বলার চেষ্টা করেছে। সকল ঘটনার মধ্য দিয়েই গগনের মনের অবসাদ প্রকাশিত হয়েছে। মায়ের প্রতি তার বেদনাবোধ তাকে মাতৃস্নেহের প্রতি তৃষ্ণার্ত করে তুলেছে। গগনের বাড়ির লোকেরা ক্রমশ তাদের দুঃখ ও শোক ভোলায় চেষ্টা করেছে, গগনের দাদার অকাল মৃত্যু, গগনের অসুখ সব কিছুর ভিতরে যে কষ্টরোধকারী যন্ত্রণার আবিষ্টতা ছিল, নয়নের বিয়ের মাধ্যমে তা ভোলার চেষ্টা করেছে। কিন্তু গগনের একাকিত্ব-জনিত যন্ত্রণা তার একান্তই নিজস্ব। সেটা তার মনস্তাত্ত্বিক নানা চিন্তার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। ছোটমামা বলেছে, “শোক দুঃখ দুর্দৃষ্টি এ-সব তো আছেই। সংসারে জন্মাবে আর বগল বাজিয়ে দিন কাটিয়ে দেবে এ বাপু হয় না। রাজারও দুঃখ আছে। শোক দুঃখ আছে বলে সবাই মিলে গলা জড়াজড়ি করে বসে মরার মতন কাঁদব। এতে কোন লাভ হয় না, অ্যাটমস্ফেরারটাই যা বিলী হয়ে ওঠে।”^{১৭১} তবুও এই সান্ত্বনা গগনকে অসহায়তার জগৎ থেকে মুক্ত করতে পারে না। তাই গগন নয়নের তিনটি চিঠি পেয়েও একটাও

জবাব দেয় না। স্যানেটোরিয়ামের জানালা দিয়ে ক্ষুদ্রতম জগৎকে দেখেই তার নিঃসঙ্গ জীবন কাটো। শারীরিক অসুস্থতা একসময় মানসিক অসুস্থতার সাথে হাত মেলায়। ছোটমামা ফিরে যাওয়ার সময় বলেছেন, ‘আসব, তাড়াতাড়ি আসব আবার।’^{১৭২} এই কথাটা গগনের মনে মৃত্যুর ধারণার সাথে সংযুক্ত হয়ে গেছে, কারণ পাশের ঘরের ললিতবাবুর স্ত্রী তাঁর স্বামীকেও একই কথা বলে গিয়েছিলেন, আর ফিরে এসে স্বামীর মরা-মুখ দেখতে পেয়েছিলেন। তাই নিজের মনেও তার মৃত্যুভয় জেগে উঠেছে ছোটমামার মুখে একই কথা শোনার পর। ছোটমামা চলে যাওয়ার পর আবার প্রাত্যহিক জীবনের নিঃসঙ্গতা তাকে আবৃত করে তুলেছে, ‘অত্যন্ত নিকট আত্মীয়ের মতন --ওই শীত, বাতাস, ওই অন্ধকার এবং বিষণ্ণতা তার ঘরে বিছানার পাশে এসে বসে।’^{১৭৩} গগনের এই বিষণ্ণতা, একাকিত্ব, ক্লান্তি, অসুস্থতা তাকে ষাটের দশকের একজন প্রতিনিধিস্থানীয় মানুষ করে তুলেছে। আধুনিক সময়ের টানাপোড়েন, প্রতিদিনের নিরন্তর বেঁচে থাকার লড়াইতে ক্লান্ত, বিধ্বস্ত মানুষ ক্রমশ একাকিত্বই বরণ করে নিচ্ছিল। বিমল করের গল্পের প্রভাব আরও তীব্র ভাবে প্রকাশিত হয়েছে। অন্তর্জগতের ভাবের আন্দোলনে ক্ষতবিক্ষত মানুষের প্রকৃত স্বরূপ ফুটিয়ে তুলেছেন লেখক। ডাক্তারের নিরন্তর সান্ত্বনাদানের মধ্যেও গগন তার হৃদয়ের যন্ত্রণা মোচন করতে পারে না। “মাটিতে যেমন গাছ, মাটির তলায় যেমন শেকড়, গগনের মনে হল, তার বৃক্ষের তলায় সেই রকম কষ্টের বহু পদার্থ মিশ্রিত হয়ে আছে, এই বোধ একটা বৃক্ষের মতন অজস্র অদৃশ্য শিকড় দিয়ে সেই কষ্টকে শুষ্ক বর্ষিত হচ্ছে। কেন? গগন বুঝতে পারল না, কেন হৃদয়ে এত কষ্ট থাকে, এত অভাব? বেদনা কেন অধিক, সুখ কম? পৃথিবীতে জলভাগ বেশির মতন পর্যাণ্ড দুঃখ এবং অপরিয়াণ্ড সুখ ঈশ্বর কেন সৃষ্টি করেছিলেন!”^{১৭৪}

বিমল কর গগনের মধ্যে বেদনাময় অনুভূতির সাপেক্ষে তার চিন্তের অন্ধকারকে প্রকাশ করলেও, গগন চরিত্রে সেই পরিস্থিতি থেকে মুক্তির অভিলাষকেও চিহ্নিত করতে চেয়েছেন। স্বজন, পরিজনহীন নিঃসঙ্গ অবস্থায় স্যানেটোরিয়ামে অসুস্থতা জনিত কারণে দীর্ঘ দিন থাকার ফলেই তার মনের মধ্যে মানসিক অসুস্থতার সৃষ্টি হয়েছিল। তবুও বেঁচে থাকার মধ্য দিয়ে জীবনকেই সে মহনীয় করে তুলতে চেয়েছে। ‘তার দুঃখকে সে কেমন করে সহনীয় করতে পারে... প্রত্যহ গগন এই চিন্তা করেছে। প্রত্যহ।’^{১৭৫} কারণ গগন বুঝতে পেরেছে তার বাড়ির পরিজনরা থাকলে ‘তার গগন এত শূন্য হত না।’^{১৭৬} কিন্তু তা হবার নয়। স্বপ্ন, কামনা থেকে পথত্রষ্ট মানুষের মত গগন তার শূন্য-গগন নিয়েই বেঁচে থাকবে, মৃত্যুভয়ের দ্বারা বার বার তাড়িত হবে এটাই তার পরিণতি

বলে সে মনে করেছে। গল্পের শেষে এক মন খারাপ করা যন্ত্রণাময় অনুভূতির মধ্য দিয়ে গগনের মনের স্বরূপ প্রকাশিত হয়েছে, ‘গগন এ ঘরে আছে। এখানেই থাকবে গগন। শীত আসবে, শীত যাবে; আবার শীত আসবে। গগন জানে তার ছোটমামা নেই, তার ছোটমামা তাকে শীতের পর নিয়ে যেতে আসবে না।’^{১৭৭}

বিমল করের গল্পে বার বার শীতকালের প্রসঙ্গ এসেছে। ‘শীতের মাঠ’, ‘অশ্বখ’ প্রভৃতি গল্পেও শীতের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য ও তার শূন্যতা, রক্ষতা, শুষ্কতা, অবসন্নতার নানা প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যের সাথে প্রকাশিত। গগনের নিঃসঙ্গ মানসিকতা অসুস্থতা, মৃত্যুর শীতলতার আবহ এই গল্পে ওতপ্রোত ভাবে মিলিয়ে দিয়েছেন লেখক। বিমল করের ব্যক্তিজীবনের অসুস্থতা, মৃত্যুভীতি, মানসিক দুর্বলতা, পরিজনের প্রতি মোহ এখানে গগনের মাধ্যমে ফুটে উঠেছে বলেই মনে করা যেতে পারে।

‘জননী’ (শারদীয় ‘দেশ’, ১৯৬২) গল্পটি বিমল করের সাহিত্য জীবনে একটি বিশেষ সৃষ্টি। মৃত্যুচেতনা সম্পর্কিত লেখকের বহু গল্পের মধ্যে এটি একটি মাইলস্টোন। ‘জননী’ গল্পে মৃত্যু থাকলেও সেই মৃত্যু গল্পের প্রেক্ষাপটে রয়েছে। তাঁর পূর্ববর্তী গল্পগুলির মধ্যে ‘আত্মজা’, ‘অশ্বখ’, ‘সুখাময়’, ‘নিষাদ’ প্রভৃতি গল্পে যে মৃত্যুর কথা ব্যক্ত হয়েছে তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তীব্র যন্ত্রণা, অসহায়তা ও মৃত্যুভীতির মানসিকতাকে প্রকাশ করলেও, ‘জননী’ গল্পে সেই তীব্রতা নেই। ‘সুখাময়’ গল্প থেকেই তাঁর গল্পে তত্ত্ব বা আইডিয়ার প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়, ‘জননী’ গল্পেও তার বিশিষ্টতা লক্ষণীয়। মৃত্যুর পর সেই মৃত মানুষটির জন্য তার পরিবার-পরিজনদের অনেক কিছুই দেওয়ার থাকে, যার মাধ্যমে তারা তাদের প্রিয়জনের পরিপূর্ণতা কল্পনা করে; সেই বিষয়কে কেন্দ্র করেই ‘জননী’ গল্পটি রচিত। বিমল কর নিজে হীরক রায়কে জানিয়েছিলেন, “ইদানিং যেসব গল্প লিখেছি, তার মধ্যে মৃত্যু, অসহায়তা এসব থাকলেও তা বোধ হয় অতটা প্রবল ভাবে নেই। মানুষ নিজের সর্বনাশ নিজে করেছে, নিজের পাপ আর পুণ্য। ‘জননী’ গল্পে দেখবে, ছেলেমেয়েরা তাদের মার মৃত্যুর পর তার মাকে অনন্ত যাত্রার পথে পাথের হিসেবে যা দিতে চাইছে তা হল ভালোবাসার মতন মন, সাহস, আশা ভরসা, স্বাধীনতা, হৃদয়ের সম্পদ অন্তর দৃষ্টি।”^{১৭৮}

বিমল কর নিজে তাঁর সাক্ষাৎকারে জানিয়েছিলেন মৃত্যুচিন্তা তাঁকে দীর্ঘকাল অধিকার করেছিল, এবং তা নিয়ে তিনি যথেষ্ট ভাবিত ছিলেন। প্রথম দিকের রচনায় মৃত্যুর সেই বীভৎসতা,

নির্মমতার কথা তিনি নানাভাবে দেখানোর চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু ক্রমান্বয়ে মৃত্যুর অনিবার্যতা, স্বাভাবিকত্ব তাঁর মনে মৃত্যু ভীতিকে কমিয়ে দিয়েছিল। মৃত্যু সম্পর্কিত ভাবনায় ভাবতে ভাবতে তাকে অতিক্রম করতে চেয়েছেন একসময়। তিনি সাক্ষাৎকারে বলেছেন, “মৃত্যু নিয়ে, শুধু মৃত্যু কেন, যে কোন বিষয় যখন তোমাকে হন্ট করে তখন সেটা নিয়ে ভাবতে ভাবতে একসময় তুমি সেটাকে পেরিয়ে যেতে চাও। যাকে আমরা উত্তরণ বলি। আমিও একসময় মৃত্যুকে পেরোবার চেষ্টা করতে লাগলাম।”^{১১৯} ‘জননী’ গল্পটি লেখার সময়কালেই তিনি রচনা করেছিলেন তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাস ‘পূর্ণ অপূর্ণ’। এখানেও মানুষের জীবন, তার চেতনা, জীবনদর্শন সকল দিক দিয়েই নানা তত্ত্বগত প্রশ্নের সমাধান করার প্রয়াস পেয়েছিলেন। এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই মানসিক ভাবে সান্ত্বনাও পেয়েছেন লেখক।

‘জননী’ গল্পে মৃত্যুর প্রেক্ষাপট গল্পটির মধ্যে আছে ঠিকই কিন্তু সেই মৃত্যু পবিত্রতা, শুচিতা ও পূর্ণতার পথের সাথে একাত্ম হয়ে রয়েছে। জীবনের অপূর্ণতার ভাঙার পূর্ণ করে দেওয়ার আশ্বাস ও সম্মান প্রদর্শনের ঐকান্তিক সদিচ্ছা গল্পটিকে মনোরম করে তুলেছে। নৈর্ব্যক্তিক বর্ণনার মাধ্যমেই গল্পটির সূচনা হয়েছে, “আমরা ভাইবোন মিলে মা-র পাঁচটি সন্তান। বাবা বলত, মার হাতে পাঁচটি আঙুল।”^{১২০} এই পাঁচজন পুত্র-কন্যা মায়ের মৃত্যুর পর তার সমাধি বেদীর উপর বসে মাকে স্মরণ করে তাঁর জীবনের আকাঙ্ক্ষাকে পূর্ণ করে তোলার জন্য নিজেদের হার্দিক সম্মান জ্ঞাপন করেছে। পাঁচ পুত্র-কন্যা ভেবেছে তাদের মায়ের জীবনে দুঃখ ভোগ কিছু কম ঘটেনি। বড়মেয়ের বিকলাঙ্গ সন্তানের মৃত্যু, তার বরের খারাপ অসুখ এবং একদিন শ্বশুর-বাড়ি ত্যাগ করে চলে আসা; মেজ ছেলের দুর্ঘটনায় অন্ধ হয়ে যাওয়া; স্বামীর মৃত্যু; ছোট মেয়ের নিরন্তর পরিশ্রম ও রাজনীতিতে প্রবেশ করা, সেই সূত্রে কঠিন রোগের শিকার হওয়া, এতগুলি শোক তাদের মাকে যন্ত্রনায় বিদ্ধ করেছিল। মরণোত্তরকালে তারা তাদের মা’র উদ্দেশ্যে শান্তি ও স্বস্তি অকৃত্রিম সম্মান জ্ঞাপনের মাধ্যমে দিতে চেয়েছে।

‘জননী’ গল্প লেখার ক্ষেত্রে বিমল করের নিজস্ব অভিজ্ঞতাও বিশেষ ভাবে কাজ করেছিল। মৃত্যুবলয়িত এই জীবনে মানুষ সান্ত্বনা লাভ করে তার পুনর্জন্মের প্রতি বিশ্বাসবোধে। আত্মা অবিনশ্বর, দেহের মৃত্যুর পর আত্মা যাত্রা করে নব দেহকে অবলম্বন করার উদ্দেশ্যে। কিন্তু এই যাত্রাপথ সকলের কাছেই রহস্যময়। অনেকে মনে করেন সেই পথ দীর্ঘ। বিমল কর ভেরিয়ার এলুয়িনের একটি বইয়ের উল্লেখ সাপেক্ষে তাঁর এই মত প্রকাশ করেন। এছাড়াও তিনি জানিয়েছেন

“ছেলেবেলায় আমি বরাকরে থাকতাম, তখন বরাকর নদীর ধারে, দূরে গ্রামে যে সব সাঁওতাল পল্লী-টল্লি ছিল, সেখানে দেওয়ালের সাথে নানা রকম ছবি-টবি আঁকা দেখতাম। সে ধরো, একটা হনুমানের ছবি, একটা ফুল ঐকে রেখেছে, ইত্যাদি। তো, ওই যে ছবিটা, ওটা সদ্য মৃত্যু একটা বাচ্চার ছবি। মৃত্যুর পর ঘোড়ার পিঠে চড়ে বাচ্চাটা চলেছে যেন অনন্তের কোথাও। হয়তো স্বর্গে। তার এক হাতে লাঠি। মৃত্যুর পর এতটা রাস্তা সে কী করে যাবে সে কথা ভেবে তাকে চিড়ে আর গুড় দেওয়া হয়েছে পুঁটলি বেঁধে আর ঘটিতে জল, তেঁষ্টা মেটানোর জন্য! কী অসামান্য ইমাজিনেশন! ওই ছবিটা আমার মাথায় থাকল। তার পরে— আই মেড ইট। গল্পটাকে তৈরি করলাম।”^{১১১} বিমল করের নিজস্ব অভিজ্ঞতাই তিনি গল্পে মেজছেলের অভিজ্ঞতার সাথে মিলিয়ে দিয়েছেন। এই সকল গল্পের আলোচনায় দেখা যায় যে বিমল কর তাঁর জীবনের অভিজ্ঞতাকেই নানা গল্পে প্রতিফলিত করার চেষ্টা করেছেন, যেখানে গল্প শুধু গল্প হয়ে থাকেনি, তাঁর জীবনের অনুষ্ণের সাথে একাত্ম হয়ে তাঁর জীবনদৃষ্টির বৈচিত্র্যকেই প্রকাশ করেছে।

বিমল করের অভিজ্ঞতালব্ধ আদিবাসী সংস্কারের মত এই গল্পে পুত্র কন্যারাও মায়ের মরণোত্তর যাত্রাপথে মায়ের ইহজীবনের অভাব ঘোচানোর চেষ্টা করেছে। ‘এ সংসারে মা কী পারিনি, কী অভাব তার ছিল, কী পেলে মা-র সে অভাব থাকত না, আমরা এখন তাই ভাবছিলাম। মা-র এই পরবর্তী যাত্রায় আমরা বোধহয় মাকে সেই জিনিস দিতে চাইছিলাম যা এখানে দিতে পারিনি।’^{১১২} এই আলোচনার সূত্র ধরে তারা তাদের ‘মনের জিনিসগুলো’ দিতে চেয়েছে। এ প্রসঙ্গে বলে নেওয়া যায় আধুনিক জীবনধারায় মানুষের মনের উপরই অনেক বেশি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। মনের ভিন্নতার কারণেই মানুষ মানুষে জীবনজিজ্ঞাসার বৈচিত্র্য লক্ষিত হয়। প্রতিটি মানুষ তার নিজের মত করে একটি জগৎ নির্মাণ করে, যে জগৎ তার অনুভূতি, সত্যতা, দর্শন নিয়ে গড়ে ওঠে। এই জগতের সাথে অপরের ভাবনার অমিল ঘটলেই মানুষের মনে চাহিদার অপূর্ণতা তার মনে পুঞ্জীভূত করে তোলে দুঃখ, বিষাদ, হতাশা ও অবসাদ। পাঁচটি সন্তান এই গল্পে তাদের মা-কে তাঁর জীবনের সেই অপ্রাপ্তির বেদনা থেকে নিবৃত্ত করে শান্তি দেওয়ার প্রচেষ্টা করেছে। ‘জেনারেশন গ্যাপ’—এর কারণে এক পুরুষের সাথে তার উত্তরপুরুষের ভাবনার কিছু অমিল স্বাভাবিকভাবেই লক্ষিত হয়। এ গল্পেও তাই বড় ছেলের পাত্রী সম্পর্কে মতবাদ, বিবাহ-বিচ্ছিন্নতা বড় মেয়ের নতুন ঘর বাঁধার স্বপ্ন, ছোট মেয়ে ও তার বন্ধুর সাথে সম্পর্ক, মায়ের মনে ব্যথার সংস্কার করেছিল। এছাড়াও মায়ের স্বার্থান্বেষী মনোভাবের সাথে ছোট ছেলের মানসিকতার

অমিল লক্ষিত হয়েছে। কিন্তু মৃত্যুর পর তারা তাদের মায়ের সকল ভুল আশ্চর্য উপরও তাঁর চিরশাস্তি কামনায় নিজেদের মনের প্রগাঢ় সম্মান মায়ের উদ্দেশ্যে অর্পণ করেছে। গল্পের শেষে এক ভালোলাগার অনুভূতি সঞ্চারিত হয়েছে; সকল দুঃখ, যন্ত্রণা, শোকের পরও মৃত আত্মার প্রতি বিনম্রতা জগতে জীবন ও মৃত্যুর চিরপ্রবাহকে শান্তিময়, শুচিময় করে তুলেছে। সেখানে নেই রাগ, অভিমান, দ্বন্দ্ব, সন্দেহপ্রবণতা; সমস্ত কিছুর উপর যেন প্রবাহিত হয়েছে চিরশাস্তি ও পূর্ণতার প্রতি আকাঙ্ক্ষা। “সর্বগ্রাস এই দুঃখেও আমরা মা-র নিবিদ্য যাত্রা কামনা করছিলাম। আমাদের যা দেবার সাধ্যমত দিয়েছি। মা সেই অন্তহীন পথ অতিক্রম করুক।”^{১৩} —সন্তানদের এই কামনা দুই প্রজন্মকে যেন একটি সূত্রে গ্রন্থিত করেছে।

‘উদ্বোধ’ (বার্ষিক সংখ্যা ‘আনন্দবাজার পত্রিকা’, ১৯৬৩) গল্পটিও লেখক বিমল করের অন্তর্জগতের গল্প। বাইরের ঘটনা এখানে চরিত্রের মনে বিষাদ ও বিপন্নতার বোধ নিয়ে এসেছে। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র শিশির, শহরের মড়কে যথেষ্ট চিন্তাগ্রস্ত। প্রতিদিনই কিছু মানুষের অকালমৃত্যু তার মনে মৃত্যুভীতি সঞ্চারিত করেছে। তার মনের এই বেদনা ও অবসাদের সাথে প্রকৃতির বৈচিত্র্যকেও মিলিয়েছেন লেখক। সারাদিন ময়লা আকাশ থাকার পর সন্দের দিকে সামান্য বৃষ্টি হচ্ছিল। শিশির এই বৃষ্টিতে যথাসম্ভব নিজেকে ঝাঁচিয়ে তার সাইকেল নিয়ে বাড়ির দিকে যাচ্ছিল। সাইকেলটাও ব্যাঘাত ঘটচ্ছিল বার বার চেন খুলে গিয়ে। সব কিছুর ভিতর দিয়েই শিশিরের পরিস্থিতি ব্যাঘাতগ্রস্ত এবং দুশ্চিন্তাময়। কিন্তু শিশিরের এই মানসিকতার সাথে অন্য মানুষদের মানসিকতার সামিধ্য সে খুঁজে পাচ্ছিল না। রাস্তায় লোক চলাচল স্বাভাবিক। একটি শববাহী দলের ‘রাম রাম’ ধ্বনির পাশাপাশি চেয়ারম্যান রাজারাম বাবুর বাড়ি থেকে রেকর্ড বা রেডিওর প্রবল শব্দে নাচের বাজনা শুনতে পাচ্ছিল শিশির। তবুও নিজের চিন্তা-ভাবনার স্বাতন্ত্র্যে প্রতিদিনের একাধিক মানুষের মৃত্যুর ঘটনা তার মনে বিষণ্ণতা সঞ্চার করেছিল। মিউনিসিপ্যালিটির হলুদ আলো, মিষ্টি দোকানের মিষ্টির হলুদ রঙ শিশিরের চোখে অসহ্য লেগেছে। হলুদ বর্ণ শিশিরের মনে ব্যাধি, মৃত্যুর প্রতীক নিয়ে হাজির হয়েছে। “শিশিরের মনে হল, এই শহরের অদ্ভুত ব্যাধি যেন আলোগুলোকেও সংক্রামিত করেছে। বিবর্ণ ঘর্মাক্ত রক্তহীন মুখের মতন আলোগুলো হতাশ হয়ে তাকিয়ে আছে।”^{১৪} শিশিরের এই অনুভূতি একান্তভাবেই ব্যক্তিগত। বন্ধুস্থানীয় নিশীথ ও আরও কিছু মানুষের মৃত্যু তার মনে এমনভাবে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে যে, চারিদিকে মৃত্যুর অদৃশ্য আক্রমণ তাকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছে। এই মননসর্বস্বতাই বিমল করের গল্পের প্রাণ। “মানুষের

অন্তরে যে জটিলতা, অন্তর ও বাহিরে যে সূত্রসম্বন্ধ, স্বপ্নে ও চিন্তায় তার অদ্ভুত প্রকাশ, নিঃসঙ্গ অন্তর জীবনের যে বেদনা ও অসহায়তা-বোধ — এই সব বক্তব্য বিমল করে গল্পকে এমন এক স্বাভাবিক দিয়েছে...’’।^{১৫৫}

‘উদ্বেগ’ গল্পে শিশিরের মানসিক উদ্বেগ, উৎকর্ষ তার শহরের পরিস্থিতিতে ঘিরে আবর্তিত হয়েছে। নিজের ছেলে বাচ্চুর সর্দি-কাশি নিয়ে সে ভাবিত নয়, কারণ সে এই শহর থেকে দূরে হোস্টেলে থেকে পড়াশোনা করে, কিংবা গতকাল যে মেয়েটির বিয়ে হয়েছে তারা এই শহর ছেড়ে চলে গেছে সুতরাং এই শহরের স্পর্শ থেকে তারা মুক্ত। এই শহরের মড়ক সম্পর্কে ভাবনায় শিশির নিজের অথবা নিজের স্ত্রীর সম্পর্কেও দুর্ভাবনা প্রকাশ করেছে। “যে কোন লোক যে কোন সময়ে মারা যেতে পারে। মড়কটা সিঁদকাঠি হাতে করে ঘরে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। অসতর্ক হলে অবধারিত মৃত্যু।’’^{১৫৬}

এই অবধারিত মৃত্যুকেও মানুষ এড়াতে চায়। কারণ বেঁচে থাকাটাই উদ্দেশ্য। বিমল করে গল্পে জীবনের প্রতি মোহ, বেঁচে থাকার প্রতি আকাঙ্ক্ষা তার গল্পগুলিকে জীবনমুখী করে তুলেছে। যখন চারিদিকে মৃত্যুর মিছিল, জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে এত হতাশা, যন্ত্রণা, উদ্বেগ, সান্ত্বনার ভাষা যেখানে পরিহাসসূচক, প্রতি মুহূর্তে জীবন খরচ করে মৃত্যুর দিকে পদচারণা তখনও তাঁর গল্পে জীবনের স্বাদ নেওয়ার অকুণ্ঠ বাসনা প্রকাশিত হয়েছে। ‘মানুষের পক্ষে বেঁচে থাকা দরকার। শিশির ভাবছিল। জীবন যথার্থ আমাদের কি দেয়, দুঃখ, কষ্ট, যন্ত্রণা—অথবা কিছু সুখ কিছু শান্তি অথবা একান্তই কিছু দেয় কি না, নিতান্ত অভ্যাসজনক দিন যাপন ইত্যাদি প্রশ্ন ভাবা অনর্থক। কে কখন কি ভাবে কোন স্বাদ পাচ্ছে তা বলা যায় না।’’^{১৫৭} —এই জীবনবোধের তাগিদেই শিশির মড়ক সম্পর্কে তার সচেতনতা প্রকাশ করে। মানুষের নিয়তিরূপী মড়কের কাছে আত্মবিসর্জনের বিরুদ্ধে তার মনোবেদনাকে ব্যক্ত করে। একজন সামাজিক মানুষ হিসেবে সমাজের মানুষের এই মৃত্যুমিছিল তাকে ভারাক্রান্ত করে তোলে, নিজের স্ত্রীর কাছে যদিও শোনে এই ভাবনার অধিকার তার নয়। সমাজপতির এ বিষয়ে ভাববে। কিন্তু সমাজ-পতিদের কর্তব্য সামান্য রিচিং ছড়িয়ে কিংবা টেঁড়া পিটিয়েই শেষ হয়ে যায়, শিশিরের মতো সমবেদনা তাদের মনে বিরল।

আধুনিক জীবনযাত্রার প্রকৃত রূপটিকে বিমল করে এই গল্পে মূর্ত করে তুলেছেন। পুরসভার চেয়ারম্যান, হাকিম এরা সমাজ সম্পর্কে যা ভাবে মানুষের জীবনের ক্ষেত্রে তা যথেষ্ট নয়। যদি তা সর্বাঙ্গিক হত তাহলে মড়কে এত মানুষের মৃত্যু ঘটত না। শিশিরের অনুভব একান্তভাবেই দেশ-

কালের পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের মনে সচেতনতা জাগানোর বোধে আচ্ছন্ন। বিমল কর গল্পের শেষে সাধারণ মানুষের অনুভূতিকে তার অসহায়তার সাথে মিলিয়ে প্রকাশ করেছেন, “আপাতত এই শহর কেবলমাত্র যোগ্য ও অধিকারী ব্যক্তিদের উপদেশ মতন পরিচালিত হবে। রাজ্জারাম বাবু আরও দেদার ব্লিচিং পাউডার ছড়াতে হুকুম করবেন, তিনি চেয়ারম্যান। মুখার্জী সাহেব ইদুর মশা মাছি থেকে সাবধানে থাকতে বলবেন, কেন না তিনি হাকিম, শিশির কিছু বলতে পারবে না -- কেননা প্রতিটি মৃত্যুর উদ্বিগ্ন ও অস্থির বোধ করেছে। সে শুধু লজ্জিত হবে। অনুতপ্ত হবে।”^{১৮৮} উদ্বেগ গল্পে মানুষের Moral awarness -কে লেখক এমনি বিপন্নতাবোধের সাথেই উল্লেখ করেছেন। এর পাশাপাশি প্রকাশিত হয়েছে নিয়তিরূপী মৃত্যুর হাতছানি মানুষের জীবনের উপর, যা মানুষকে প্রকৃতপক্ষে হতাশ করে তুলেছে। পদাধিকারী মানুষদের স্কুল কর্তব্যবোধের সাধারণীকরণ, অপরের মৃত্যুতে সমবেদনা-হীনতা সেই মৃত্যুর পরিবেশকে আরও নিবিড় করে তুলেছে।

‘অপেক্ষা’ (শারদীয় ‘দেশ’, ১৯৬৩) গল্পটি বিমল করের মৃত্যুভাবনা সম্পর্কিত একটি বিশেষ গল্প। মৃত্যুভাবনা এখানে চরিত্রকে বাস্তব পরিস্থিতি থেকে পরাবাস্তবের রহস্যময়তায় নিয়ে গেছে। গোয়েন্দা গল্পের মত রহস্যময়তা, উৎকর্ষা গল্পের কাহিনীতে থাকলেও অবশেষে তা মনস্তাত্ত্বিকতার অতিগূঢ় আলো-আঁধারিতে পাঠকের মনকে আকৃষ্ট করে তুলেছে। মানুষের বেঁচে থাকার দুরন্ত প্রত্যাশার মধ্যেও বার বার মৃত্যুর করাল বিভীষিকা ও তার অনিবার্যতা মানুষের মনে হানা দেয়। নিয়তি-তাড়িত মানুষ এই মৃত্যুকে ফাঁকি দিতে চেষ্টাও অবশেষে হার মেনে নেয়। মৃত্যুবলয়িত জীবনে বেঁচে থাকার আনন্দ প্রতিটি মানুষের কাছেই কাম্য। তবুও মৃত্যু অনিবার্য। ‘অপেক্ষা’ গল্পে শিবতোষ অবধারিত সেই মৃত্যুর কাছে নিজের জীবনের অসহায়তা উপলব্ধি করতে পেরেছে।

‘অপেক্ষা’ গল্পের শুরুতেই লেখক বিষন্নতার পরিবেশ নির্মাণ করেছেন। ‘ধূসর অন্ধকার’, ‘ফাঁকা আকাশ’, ‘ময়লা মেঘ’, শিবতোষের চোখে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে, হঠাৎ শোনা একটি মৃত্যু-শোকের দম বন্ধ করা পরিবেশের সাথে তাল মিলিয়ে। সহকর্মী ভুবন দত্তের অপপ্রত্যাশিত মৃত্যু শিবতোষকে বিহ্বল করে দিয়েছে, এবং তারই সূত্র ধরে গল্পটিতে শিবতোষের নানামুখী আচরণ প্রকাশিত হয়েছে। একটি মৃত্যু-শোক একজন সংবেদনশীল মানুষের কাছে কতটা আঘাত নিয়ে আসে, তার ছবি এই গল্পটি। লেখক নির্লিপ্তভাবে এই মৃত্যুর কথা প্রকাশ করেছেন, ‘বাড়ের মতন পাখা ঘুরছে মাথার ওপর, গলির মোড়ে রাত থমথম করছে, মুখের সামনে বউ; ডাক্তার এল,

দেখল ভুবন মারা গেছে। আ-হা!’^{১৯৯} এই বর্ণনার মধ্য দিয়ে শুধু শিবতোষ নয়, লেখক তাঁর উপলব্ধি দিয়েও বোঝানোর চেষ্টা করলেন কত সহজে, কত অপ্রত্যাশিতভাবে মানুষের মৃত্যু ঘটে। মনের মধ্যে একটা অশান্তির রেশ, একটা বিষাদগ্রস্ততা যেন চাপ চাপ ভার নিয়ে অনড় হয়ে বসে থাকে। এরই সূত্র ধরে শিবতোষের আচরণ পরিলক্ষিত হয়। স্ত্রী-ছেলে-মেয়েদের কাছে নিজেকে সঠিকভাবে ব্যক্ত করতে পারে না। বিছানায় শুয়ে, বারান্দায় দাঁড়িয়ে কোন অবস্থাতেই অস্বস্তিকর পরিবেশ থেকে সে বেরোতে পারে না। বরং এই অস্বস্তিকর পরিবেশ অন্যদিকে মোড় নেয় একটি চিঠির সূত্র ধরে।

একটি চিঠি, যে চিঠির কথা শিবতোষ ঠিকমতো মনে করতে পারে না। চিঠির বক্তব্য বিষয় কি? চিঠিটি কে তাকে দিয়েছে? চিঠিটি কোথায় রাখা হয়েছে? সব কিছুই তার কাছে ঘোঁয়াশাচ্ছন্ন। চিঠির বিষয়টি নিয়ে বাড়িতে স্ত্রী কমলা ও অফিসের বেয়ারার প্রতি ক্রোড প্রকাশ করলেও চিঠি খুঁজে পাওয়া যায় না। আবার ভুলে যাওয়া স্মৃতির মতো চিঠির বক্তব্য বিষয়টি মনে আংশিক আলো-আঁধারির মতো ফুটে ওঠে--কোন এক আগন্তুক তারিখের সাথে বারের ডুল করে বৃহস্পতি ও শুক্র যে কোন দিনই তার দেখা করার কথা ব্যক্ত করেছে। কিন্তু দুটি দিনের মধ্যে সে দেখা না দেওয়ায় শিবতোষ হতাশ হয়ে উঠেছে। “সে আশা দিয়ে, আসতে বলে, শিবতোষকে উদ্বিগ্ন, ব্যাকুল ও উৎকণ্ঠিত করেও শেষ পর্যন্ত এল না। শিবতোষ কেমন শূন্য, ভার এবং হতাশ মন নিয়ে বাড়ি ফিরে গেল।”^{২০০}

লেখক তাঁর রচনার মধ্যে এখানেই রহস্যময়তার বাতাবরণ সৃষ্টি করেছেন, যে রহস্য শিবতোষের মনকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে। শিবতোষ সহকর্মী ভুবনের মৃত্যুর পর মানসিক দিক দিয়ে সম্পূর্ণভাবে নিঃসঙ্গ হয়ে উঠেছে। স্ত্রী-পুত্র-কন্যা-অফিসের পরিবেশ সব কিছু থেকেই সে বিচ্যুত হয়ে উঠেছে। ভুবনের স্ত্রী গৌরীর কাছে চিঠি লেখার কথা ভাবার সাথে সাথেই রহস্যময় সেই আগন্তুকের চিঠির কথা মনে হয়েছে। ভুবনের মৃত্যু সম্পর্কে তার উপলব্ধি হয়েছিল, ‘মানুষের কখন কি হয়, কখন ডাক আসে কে জানে?... বেচারি!’^{২০১} এই বোধের সাথে হারানো চিঠির নিগূঢ় এক সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যায়। এই আগন্তুক অপরিচিত, এর আসার দিন-কালের কোন নিশ্চয়তা নেই। আবার এই আগন্তুককে জানার জন্য শিবতোষের উৎকণ্ঠার শেষ নেই। এই আগন্তুকই রহস্যময় সেই মৃত্যু, যাকে ভয়ের মধ্য দিয়েও জানার আকাঙ্ক্ষা মানুষের ফুরায় না। রবীন্দ্রনাথের ‘ডাকঘর’ নাটকে শিশু অমল রাজার চিঠির জন্য অপেক্ষা করে থাকে, এই চিঠিই হল তার কাছে

পরকালের ডাক। সেই রাজা রহস্যময়, তাকে চেনা যায় না, জানা যায় না, অনুভব করার ব্যাকুলতা দিয়েও পাওয়া যায় না। কিন্তু সে অবধারিত। প্রতিটি মানুষ ও জীবকে তার নির্দেশ মানতে হয়। জগৎ সংসারের সকল মায়ার বন্ধন একদিন পরিত্যাগ করতে হয়। তাই শিবতোষের সাংসারিক বন্ধনের পরও জীবনের পূর্ণতার আকাঙ্ক্ষা মনে জেগে ওঠে। তাই তার মনে প্রতিস্থানিত হয়— ‘ওরা যদি তোমার সর্বস্ব তবে তোমার এই অভাব, এই উদাস ভাব, অন্যমনস্কতা কেন? কেন তুমি এমনি ভাবে মাঝ রাত্রে জেগে ওঠ?’^{১২২} এ কারণেই অবধারিত সেই মৃত্যুর কাছে শিবতোষ নিজেকে সমর্পণ করে। শিবতোষ প্রথমে আগন্তুককে জানার চেষ্টা করেছে কিন্তু যখনই তার সেই আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হয় নি এবং আগন্তুক তার সাথে লুকোচুরিতে মত্ত হয়েছে তখনই তার মনে ভয়জড়িত বিস্ময়ের সূত্রপাত ঘটেছে। টুলুর কথায় সেই আগন্তুক ‘অততো লম্বা—’^{১২৩} তখন সেই আগন্তুকের মহিমা ও বিশালত্ব শিবতোষের মনে উদ্বেগ সৃষ্টি করে। কমলা যতই বলুক, ‘যার আসার, দরকার থাকলে সে আবার আসবে নিজের গরজে, অত হাঁস ফাঁস করার কি আছে।’^{১২৪} তবুও গরজটা শিবতোষেরই। রহস্যময় সেই আগন্তুক তাকে অজানার প্রতি কৌতূহলী করে তুলেছে। ভুবনের শ্রাদ্ধের দিনে শর্মামশাই’র গান— ‘আঁখি তৃষিত অতি আঁখিরঞ্জন, আঁখি ভরিয়া দাও হে দেখা—।’ শিবতোষের হৃদয়ে নতুন জগতের দ্বার খুলে দিয়েছে। সেই ‘নীহারিকালোকে’র কথা ভাবার সময়ই আত্মবিস্মৃত অবস্থায় শিবতোষ ‘হঠাৎ শুনতে পেল শব্দটা।’^{১২৫}

লেখকের বর্ণনার কৌশলে শিবতোষের কাছে এই ‘শব্দটা’ গভীর অর্থবহ হয়ে উঠেছে। এই কড়া নাড়ার শব্দ স্ত্রী কমলা, কিংবা পুত্র-কন্যারা কেউ শুনতে পায় নি। শিবতোষ একাই শুনেছে। যে আগন্তুকের জন্য তার এত কৌতূহল ছিল, সেই আগন্তুকই যদি এসে থাকে তাহলে শিবতোষের ভয় লাগবে কেন? উত্তেজনা, বিহ্বলতা আসবে কেন? পা-বুক কাঁপবে কেন? নিশ্বাস প্রশ্বাসই বা দ্রুত হবে কেন?— অর্থাৎ শিবতোষ এই শব্দের সাথে মানুষের জীবনের বেঁচে থাকার অনিশ্চয়তার উপলব্ধিকে মিলিয়ে ফেলেছে। সে এত উত্তেজনার মধ্যেও অপরিচিত সেই আগন্তুককে জানতে চেয়েছে। এবং জানতে না পেরে অবসন্ন, হতসর্বস্ব চেহারা নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে তার ঘরে ফিরে এসেছে। মানুষ যেখানে মৃত্যুকে ফাঁকি দিতে চায়, মৃত্যুর প্রতি ভয়ে তার থেকে দূরে থাকতে চায়, শিবতোষ সেখানে নিভীক, জ্ঞান পিপাসু নচিকেতার মত সত্যসন্ধানী। কিন্তু নচিকেতা যমের কাছে ব্রহ্ম বিদ্যা অর্জন করেছিল, শিবতোষ সেখানেও ব্যর্থ; তার কাছে সকল বিষয়ই রহস্যময়।

এই রহস্যময়তাই তার মনে ভীতির সঞ্চার করে। অবধারিত মৃত্যুর পদধ্বনিকে নিজের মনে উপলব্ধি করতে পেরেছে শিবতোষ। “অলৌকিক কাহিনী অশরীরী মানুষের মতন ওই মানুষটি আসে যায়। ওর আসা অনুভব করা যায়, দেখা যায় না, বলা যায় না। মনের ভুল দিয়ে সে আসে কি? হয়ত আসে না।”^{১২৬}

শিবতোষের এই ভাবনার মধ্য দিয়ে জীবন ও মৃত্যুর সম্পর্কে গভীর দার্শনিকতা প্রকাশিত হয়েছে। মৃত্যুচিন্তার আবেশে শিবতোষ পৃথিবীর প্রতি, জীবনের প্রতি মায়া উপলব্ধি করেছে, আবার অবধারিত মৃত্যুর কাছে নিজের অসহায়তাও উপলব্ধি করতে পেরেছে। তাই মাঝরাতে অস্বস্তির মধ্য দিয়ে তার ঘুম ভেঙে গেছে। নিজের মনে মনেই নানা জটিল তর্ক উত্থাপিত করে তুলেছে। মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বের মাধ্যমে সম্ভার সন্ধানী শিবতোষ নিজের অস্তিত্বকেই প্রশ্নমূলকতায় আচ্ছন্ন হতে দেখেছে। “তুমি কে শিবতোষ? তুমি এই সংসারে একান্ত অন্যের ছায়া। তুমি অন্য বস্তুর গুণে একটি মিথ্যা আকার পেয়েছ, যেমন কি না আলো এবং বস্তু বিনা ছায়া হয় না, অতএব তুমি নিঃশূন্য এবং আলো ও বস্তুটিই প্রকৃত গুণ।”^{১২৭} --এই সত্য শিবতোষের মনে বর্তমান জীবনের মূল্যহীনতাকেই প্রকাশ করেছে। কোন এক অদৃশ্য সুতোয় তার এই জীবন বাঁধা রয়েছে। প্রবল শক্তিমান সম্ভার কাছে সে ক্রীড়নক তুল্য। তার চিঠির কথাই তাই বার বার শিবতোষের মনে ঘুরে ফিরে এসেছে। এই চিঠিটাই তার কাছে অদৃশ্য লোকের চাবি। স্বপ্নে দেখা মনোরম মন্দিরের দিকে যেমন সে সহজে পৌঁছাতে পারে না, তেমনিভাবে সেই অদৃশ্যলোকে জীবিতাবস্থায় মানুষ পৌঁছাতে পারে না। তাই মধ্যস্থতা করেছে এখানে শিবতোষের ভাবলোকের চিঠি। যেখানে লেখা আছে ‘আমি আসব। আমার অপেক্ষা করো।’^{১২৮} মানুষ তাঁর অপেক্ষা করতে বাধ্য, কেন না তিনি অনিবার্য। “শিবতোষ অনুভব করতে পারল, কোনদিন সে আসবে, অতি অবশ্যই সে আসবে। কিন্তু সে কেমন, কতদিন অপেক্ষা করতে হবে, শিবতোষ বুঝতে পারল না।”^{১২৯}

‘অপেক্ষা’ গল্পটিতে যেমন বিমল কর এই ভাবে তাঁর মৃত্যুভাবনাকে প্রকাশ করেছেন শিবতোষ চরিত্রের উপলব্ধির মাধ্যমে। মৃত্যুবলয়িত জীবনে মানুষের সামনে এই ভাবে মৃত্যুদর্শন ব্যাখ্যাত হয়। তার জীবনের অনিশ্চয়তা মৃত্যুর শক্তিকেই প্রকাশ করে। রহস্যময় এই মৃত্যু সম্পর্কে যতই কথকতা থাকুক না কেন বাহ্যিক মৃত্যুর ঘটনা মানুষের মনে মৃত্যুর বোধকে সংক্রামিত করে, যার উদাহরণ শিবতোষ। লেখকের বর্ণনামূল্যের গুণে গল্পটি আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। শিবতোষের মনে বার বার ছায়া ফেলেছে চিঠির বিষয়টি, এবং চিঠির সূত্র ধরেই বাস্তব

থেকে পরাবাস্তবের অধিবাসী হয়ে উঠেছে সে। বোধের গভীরে চিঠির বিষয়বস্তুর ইঙ্গিতময়তা তার জীবনের সাথে বাস্তব জগতের তারটিকে ছিন্ন করে দিয়েছে, তাই বাস্তব জগতের প্রতি সে বিরক্ত অসন্তুষ্ট।

সারা গল্পের মধ্যে প্রকৃতির চিত্রকল্পের মাধ্যমে লেখক শিবতোষের মনের অবস্থাকে ও পরিস্থিতির ক্রমাগতসরমানতাকে প্রকাশ করেছেন। প্রথমে ময়লা মেঘ, ধূসর অন্ধকার, চৈত্রের অস্থির হাওয়ার মধ্য দিয়ে শিবতোষের মনের বিহ্বলতা ও অস্থিরতাকে মিলিয়ে ছিলেন, তার পর শিবতোষ ঘরে ফিরে কোন কাজে মন বসাতে না পেরে মনে মনে অস্থির হয়ে উঠেছে। লেখক বর্ণনা করলেন, ‘তারপর আরও রাত হল। ন’টা বেজে গেল কখন। সদর থেকে হাওয়া এসে এই গলিতে সাড়া দিচ্ছিল যে।’^{২০০} এই ‘সাড়া দেওয়া’র ইঙ্গিতের পর পরই সেই রহস্যময় চিঠির কথা শিবতোষের স্মৃতিপটে লেখক উদ্ভাসিত করে তুলেছেন। ভুবনের শ্রাদ্ধের দিন বিকেলে কালবৈশাখী-ঝড়ের ছবি ঝেঁকেছেন লেখক-- ‘একপাল ঝড়ো মেঘ হা-হা করে ছুটে আসছে।’^{২০১} হা-হা করে ছুটে আসা ঝড় ও বৃষ্টির মধ্যেই শিবতোষ শুনতে পেয়েছে--শব্দ--কড়া নাড়ার শব্দ-- তার বুকের মধ্যে শুরু হয়েছে উত্তেজনা। অবশেষে স্বপ্নের মধ্যে শিলাবৃষ্টিতে আহত ও সিক্ত হয়েছে শিবতোষ। এই শিলাবৃষ্টি হল জীবন যন্ত্রণা, যেখান থেকে মনোরম মন্দির স্বরূপ পরলোকের কল্পনা থাকলেও তা অমরা থেকে যায়। এই স্বপ্নের পরই শিবতোষ উপলব্ধি করেছে জীবনের অনেক পথ তার অতিক্রান্ত হয়েছে, ‘দেখতে দেখতে অনেকটা পিছু ফেলে আসা গেল--এবার--এবার একদিন...’^{২০২} এই বর্ণনার গুণে ‘অপেক্ষা’ গল্পটি পাঠকের কাছে অপরূপভাবে অনুভববেদ্য হয়ে ওঠে। গল্পের গভীরে প্রবাহিত হওয়া যন্ত্রণা ও অসহায়তার সূত্র ধরে লেখকের দার্শনিক ভাবনার সাথে ওতপ্রোত ভাবে সংযুক্ত হয়ে উঠেছে এ গল্পের ভাষাশৈলী। প্রতিটি শব্দই যেন গভীর তাৎপর্যবাহী হয়ে গল্পের অন্তর্নিহিত ভাবকে মেলে ধরেছে। সমালোচকের কথায় বলতে হয়, “তঁার গল্পে বয়নের চারুকৃতির চেয়ে অন্তর্বয়নের চারুকৃতি অনেক মূল্যবান। তঁার মধুর এবং অনিবার্য গল্পভাষা সেই চারুকৃতিকে ধারণ করে থাকে যত্নে।”^{২০৩}

‘সোপান’ (শারদীয় ‘দেশ’, ১৯৬৫) গল্পে মধ্যবিস্তৃত ও উচ্চবিস্তৃত মানসিকতার ভিত্তিতে মানুষের জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষার স্বরূপ লেখকের দার্শনিক ভাবনার সাথে একাত্ম হয়ে উঠেছে। এই গল্পে প্রতীকের ব্যবহারও লেখকের ভাবনার অনুসারী হয়ে গভীর মাত্রা পেয়েছে। সুরেশ্বর মজুমদার, তাঁর স্ত্রী, দুই কন্যা, এক জামাতা ও পুত্র, মোট ছয়জন শীতের দুপুরে একটি মিনারের

উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিলেন। এই মিনার সম্পর্কে দুটি গল্প প্রচারিত ছিল। একটিতে একজন রাজা যে মহাদেও পর্বতের পূজো না করে পর্বতে উঠতে চেয়েছিল, তাই দুর্ঘটনায় তার হাত-পা ভেঙে যায়। এই সময় রাজা রামজি'র শরণাপন্ন হলে রামজি এই মিনার বা 'মনদির' নির্মাণ করে স্বর্গে যাওয়ার পথ করে দেন, যে মিনারে রাজা ঢোকান পর আর ফিরে আসেন নি। দ্বিতীয় কাহিনীতে ইতিহাসের সামান্য ছোঁয়া ছিল। শাজাহানের সময়কালে একজন হিন্দু রাজা সঙ্গীক মহাদেব পর্বতের পূজো দিতে এসেছিলেন। এই স্থান রানির পছন্দ হওয়ায় রাজা নিজ হাতে একটি মিনার তৈরী করতে শুরু করেন রানির সম্মানে। প্রতিশ্রুতি মত রানির সন্তোষ বিধান না করা পর্যন্ত এই মিনারের গঠন কার্য চলতে থাকবে। কিন্তু যতই নির্মাণ করে তিনি উচ্চতা বাড়ান না কেন রানি সন্তুষ্ট হন না। এইভাবে দীর্ঘদিন নির্মাণের পরও অসন্তুষ্ট বিগতযৌবনা রানিকে নিয়ে একদিন বৃদ্ধ রাজা মন্দিরে প্রবেশ করে উভয়েই আর ফিরলেন না। হয়তো অতৃপ্ত এই রানিকে রাজা হত্যা করেছিলেন, কিন্তু সেই রাজাও ফিরে না আসায় রহস্য থেকেই গেছে।

মজুমদার ফ্যামিলির ছয় সদস্য এই মিনারের অঙ্ককার সিঁড়ি, ধুলো, মাটি, পাখির গায়ের বাসি গন্ধ, জীর্ণতার ঘ্রাণ-যুক্ত পথে উপরে ওঠার যাত্রা শুরু করেছিল। বেশ কিছু পথ যাওয়ার পর গল্প কথকের বাবা-মা অর্থাৎ সুরেশ্বর মজুমদার ও তার স্ত্রী থেমে গেলেন। অবশিষ্ট পথ বাকি চারজন অতিক্রম করার বাসনা নিয়ে এগিয়ে গিয়ে অঙ্ককার গোলক ধাঁধায় পথ হারিয়ে ফেলেছে। রহস্যময় সেই পথে সকলেই সকলের কণ্ঠস্বর শুনতে পেলোও কাছাকাছি আসতে পারেনি। এর মধ্যে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিশ্বাসযোগ্যতার পতন, সন্দেহপ্রবণতার সূত্রপাত ঘটেছে। অবৈধ সংসর্গের ক্ষেত্রেও সাফল্য আসেনি, প্রত্যেকেই বিচ্ছিন্ন জগতে নিজেদের সুখ ও জীবনের দাবিতে উচ্চকণ্ঠ হয়ে উঠেছে। নিবিড় রহস্যময়তায় ও অসংখ্য প্রশ্নের ইন্ধন জুগিয়ে গল্পটি আকস্মিকভাবে শেষ হয়েছে। প্রকাশিত হয়েছে ব্যক্তি মানবের পৃথক ভাবনা চিন্তা, সুখ ভোগের পৃথক রসায়ন, জীবনের আকাঙ্ক্ষা ও প্রাপ্তির মধ্যে সীমাবদ্ধতা, বেঁচে থাকার মৌল দার্শনিক ভিত্তি।

মিনারের ভিতরে প্রবেশ করে নিবিড় অঙ্ককারে আচ্ছন্ন হয়ে সকলেই অন্যের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। এই অঙ্ককার হল আগামী ভবিষ্যতের ধোঁয়াশাচ্ছন্ন পরিস্থিতি। পথ চলার মধ্য দিয়ে সেই ভবিষ্যৎ ক্রমশ চেনা জগতের সাথে মিলে যেতে পারে, তাই ক্রমশ সেই অঙ্ককার চোখে সয়ে আসে। বক্তা সেই অঙ্ককারের সামনে দাঁড়িয়ে তৎকালীন পরিপ্রেক্ষিতকে বিচার করেছে নিজের অভিজ্ঞানের মাধ্যমে। “আমার এবং হেমদার, হেমদা এবং দিদির, বাবা মা পুশ-আমাদের

সকলের মধ্যে কেমন একটি ব্যবধান রচিত হয়ে গেছে, আমরা প্রত্যেকেই পৃথক। অদ্ভুত কোন অন্ধকার যেন আমাদের মধ্যে দিয়ে পরস্পরকে বিচ্ছিন্ন করে নদীর স্রোতের মতন বয়ে যাচ্ছে।”^{২০৪} প্রতিটি মানুষই এ জগতে বিচ্ছিন্ন, নিঃসঙ্গ নিজের চেতনার কাছে, বোধের কাছে। জীবনানন্দের ‘বোধ’ কবিতায় নিঃসঙ্গ সেই মানুষের স্বরূপ উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে--

“সকল লোকের মাঝে ব’সে

আমার নিজের মুদ্রাদোষে

আমি একা হতেছি আলাদা?

আমার চোখেই শুধু ধাঁ ধাঁ?

আমার পথেই শুধু বাধা?” (‘বোধ’—জীবনানন্দ দাশ)

এই গল্পেও প্রতিটি চরিত্র তাদের নিজস্ব ভাবনার মধ্য দিয়ে পৃথক জগৎ সৃষ্টি করেছে। সুরেশ্বর মজুমদার তাঁর ব্যক্তিগত উন্নতি ও সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন, তাঁকে কেন্দ্র করে নির্ভরশীলতা দেখা গেছে তাঁর স্ত্রীর মধ্যে। বাবা এবং মায়ের সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে পুত্র কন্যারা এবং জামাই আরও উচুতে ওঠার চেষ্টা করেছে। কারণ নিজেদের ব্যক্তিত্বের স্বাভাবিক প্রকাশ করার জন্য এই অগ্রগতি প্রয়োজনীয় ছিল। বঙ্ক-অন্তু যথার্থই বলতে চেয়েছে, “বাবা আমাদের অনেকগুলো শক্ত সিঁড়ি তুলে দিয়েছেন;”^{২০৫} সিঁড়িতে তুলে দেওয়ার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে জীবনের পথে অনেকটা পথ এগিয়ে দেওয়ার পূর্বপুরুষোচিত কর্তব্যবোধ। সুরেশ্বর মজুমদার অত্যন্ত দরিদ্র অবস্থা থেকে ক্রমশ জীবনের সিঁড়িতে উঠতে উঠতে বর্তমানে উচ্চবিত্ত মানুষে পরিণত হয়েছেন। তার কাছে মিনারের সোপান ধরে ওঠা এবং জীবনযুদ্ধে জয়ী হয়ে আর্থিক ও সামাজিক প্রতিপত্তি লাভ সম্ভব। আবার হেম বা জামাইর চোখে এই যাত্রা মহাপ্রস্থানের পথের সাথে তুলনীয়। মহাপ্রস্থানের পথে পঞ্চপান্ডব ও দ্রৌপদী যাত্রার পর আর ফিরে আসেননি। এই গল্পেও ছয়টি চরিত্র তাদের ফিরে আসার প্রত্যাশা নিয়ে এগিয়ে গিয়েছিল ঠিকই, কিন্তু দুজন মাঝপথে থেকে গেছে এবং অপর চারজন পথ হারিয়ে অন্ধকারের মধ্যে নিঃসঙ্গ হয়ে গেছে। একদিকে শীতের জমাট বাঁধা শৈত্য-প্রবাহ, যা মৃত্যুর শীতলতার সাথে তুলনীয়, জীবনের অগ্রগতি যেখানে স্তব্ধ হয়ে যায়, অন্যদিকে নিরোট অন্ধকার; যে অন্ধকারে পথচারী মানুষ পথ হারিয়ে ফেলে। অন্ধকার এখানে বহুমাত্রিক, চরিত্রের অনুভবের বৈচিত্র্য। অন্তুর মনে হয়েছে, “অন্ধকারের মধ্যে আমি একটি নাগরদোলায় চড়ে আছি যেন, নাগর দোলাটি ঘুরছে, কখনো আমায় ওপরে তুলছে,

কখনো আবার নিচে ফেলে দিচ্ছে। অবশেষে আমার মনে হলো, আমি যেন একটি ঘুমন্ত খোপকাটা জালি ঘরের মধ্যে একটি খোপে বন্দী, সমস্ত কক্ষটি--প্রতিটি খোপ ঘুরছে ক্রমাগত এবং আমি পাশের খোপে যেতে গিয়েও পারছি না, কখনো দিদি আমার কাছে এসে পড়ছে, তাকে হাতে ধরে টেনে নেবার আগেই সে চলে যাচ্ছে; কখনো হেমদা, কখনো পুষ্পকে আমি ছুঁতে গিয়েও ছুঁতে পারছি না।”^{২০৬}

এই বর্ণনার মধ্য দিয়ে লেখক প্রতিটি মানুষের পৃথক বোধের স্বাতন্ত্র্যকে প্রকাশ করেছেন। প্রতিটি মানুষ প্রাত্যহিক আবর্তনের মধ্য দিয়ে তার পরিচিত জগতে পরিচিত মানুষের সান্নিধ্য লাভ করে, কিন্তু কেউই অপরের বোধের গভীরতাকে উপলব্ধি করতে পারে না। ছুঁতে পারে না হৃদয়ের উষ্ণ-চূড়া। তাই দিদি তার যৌবনের স্মৃতিকে ভুলে স্বামীকে পেতে চাইলেও সক্ষম হয় না। হেমও তার শ্যালিকার সাথে হৃদয়-সম্বন্ধ স্থাপন করতে গিয়েও ব্যর্থ, পুষ্প পথ হারিয়ে শঙ্কিত হয়ে ওঠে; বক্তা অন্তঃসকলকে পিছনে ফেলে সাফল্যের চূড়ায় উঠতে চেয়েও গভীর অন্ধকারে পথ হারিয়ে থাকে। গল্পের রানি যেমন তৃপ্ত হতে পারে নি, তেমনি জীবনের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে যাদের জ্ঞান পরিমিত, তারাও অতৃপ্ত হতে হতে অবশেষে নিজেকে অসহায় ভাবে নিয়তির হাতে সমর্পণ করে। আসলে মিনারের চূড়ায় যেমন ভাবে কেউই পৌঁছাতে পারে নি, তেমনি জীবনের সর্বোচ্চ সাফল্যের দিশা কেউই নির্ধারণ করতে পারে না। সাফল্যের ইদুর-দৌড়ে অংশগ্রহণ করে অবশেষে এরা চূড়ান্ত ভাবে ব্যর্থ হয়। এদের এই পথ চলার থেকে অনেক বেশি শিল্পসম্মত পথ পরিক্রমা লক্ষ্য করা যায় সুরেশ্বর মজুমদারের মধ্যে। তিনি বলেছেন, “...তোমার মা জানেন আমি কতটা ঘুরে কোথায় উঠেছি।... তা সে যাই হোক, আমি এতেই সন্তুষ্ট।”^{২০৭} জীবনের ক্রমাগত পথ চলায় অভিজ্ঞ মানুষেরা তাদের গতির মাঝে সচেতন ভাবে রাশ টেনে ধরেন এবং সে কারণেই তাঁরা সুখী ও শান্তিময় জীবনের স্বাদ পান। এই গল্পে সুরেশ্বর মজুমদার এবং তাঁর স্ত্রীর সম্পর্কে তাই প্রতিভাত হয়। কিন্তু আধুনিক মননের অধিকারী হেম ও তার স্ত্রীর মধ্যে সেই নির্ভরযোগ্যতা প্রদর্শিত হয়নি। আধুনিক জীবনের চোরা পথে তাই চার সদস্য পথ হারিয়ে ফেলেছে। সোপানের মধ্য দিয়ে প্রতীকমুখ্যতাই এখানে প্রদর্শিত, তবু বলতে হয় লেখকের জীবনদৃষ্টির গভীর দার্শনিকতায় গল্পটি সর্বাঙ্গ সুন্দর। ছোটগল্পের ফর্মের দিক দিয়েও আকস্মিক সমাপ্তিসূচক পরিণতি গল্পটিকে সার্থকতা দিয়েছে।

বিমল কর তাঁর বহু গল্পে প্রতীকের ব্যবহার করেছেন। প্রথম দিকে ‘ইদুর’, ‘পলাশ’ প্রভৃতি গল্পে প্রতীকের ব্যবহার চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিকতার সাথে ওতপ্রোতভাবে মিলিয়ে ছিলেন; কিন্তু ষাটের দশকে এসে প্রতীকের ব্যবহার ভিন্ন মাত্রা পেয়েছে। এখানে প্রতীক জীবনসমস্যার বিশেষ দিক ফুটিয়ে তুলেছে। মানব জীবনের দার্শনিক দৃষ্টির সাথে এই প্রতীক একাত্ম। ‘সোপান’ গল্পে লেখকের সেই দৃষ্টিভঙ্গি তাকে যেমন ক্রমশ পরিণত করে তুলেছে, তেমনি তাঁর স্বাতন্ত্র্যের দিকটিও উদ্ভাসিত হয়েছে।

‘আমরা তিনপ্রেমিক ও ভুবন’ (শারদীয় ‘আনন্দবাজার পত্রিকা’, ১৯৬৬) গল্পটিতে প্রেমচেতনা সম্পৃক্ত একটি দার্শনিক ভাবনা প্রকট হয়ে উঠেছে— প্রেমে দেহ এবং মন কার গুরুত্ব বেশি এবং ভোগের মধ্য দিয়ে বা দেহ মগ্ননের মধ্য দিয়ে নারীকে কি নিঃস্ব করে ফেলা সম্ভব, এই প্রশ্ন এখানে প্রকাশ পেয়েছে। ‘আধুনিক নিরীক্ষাপ্রবণ, অন্বেষণকাতর বিমল করকে উপলব্ধি করা যায় এই গল্পে। এই গল্প আমাদের আধুনিক সত্তার খণ্ডীভবনের এক বিপন্ন মাত্রাকে ধরে রেখেছে। দেহই পরম প্রাপ্তি কিনা, দেহ নিঃড়ে সব সুখ হরণ করার পরেও আর কিছু বাকি থাকে কি না সেই জিজ্ঞাসা এই গল্পে ঘুরে ফিরে আসে।’^{২০৮}

‘সুধাময়’ গল্পে সুধাময় দৈহিক ভালোবাসা থেকে পরিত্রাণ পেতে চেয়েছিল, দেহের বাইরে ভালোবাসাকে খুঁজতে গিয়ে আবার দেহের অনিবার্যতায় আবদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। ‘আমরা তিনপ্রেমিক ও ভুবন’ গল্পটিতে কমলেন্দু, শিশির ও অনাদির মধ্যে একটি প্রশ্ন তাদের অযুত বিস্ময়ের সাথে উদ্ভূত হয়েছে, তা হল তারা প্রত্যেকেই নানাভাবে শিবানীকে ভোগ করে প্রত্যাখ্যান করার পরও ‘আর কি অবশিষ্ট শিবানীর, যা ভুবন পেয়েছে! কি পেয়েছে ভুবন যার জন্যে এত ব্যথা।’^{২০৯}

এই গল্পে মৃত্যু প্রেক্ষাপটে রয়েছে। ‘জননী’ গল্পে যেমনভাবে মৃত্যুর ঘটনা প্রেক্ষাপটে ছিল, এবং তার সূত্র ধরে পুত্র কন্যারা তাদের মায়ের উদ্দেশ্যে তাদের মানসিক মূল্যবোধ প্রেরণ করতে চেয়েছিল; আলোচ্য গল্পেও শিবানীর মৃত্যুর পর তার তিন প্রাক্তন প্রেমিক নিজেদের দোষ-ত্রুটি স্বীকার করে মার্জনা চেয়েছে এবং তার পাশাপাশি শিবানীর স্বামী ভুবনের শোক-বিহ্বল আচরণে তার প্রতি উপহাস ও সন্দেহপ্রবণতার মানসিকতা প্রদর্শন করেছে। শিবানীর মৃত্যুর পর তার বিগতযৌবন প্রাক্তন প্রেমিকরা আত্মসমীক্ষায় বসেছে এবং প্রত্যেকেরই দাবি, ‘আমার চেয়ে বেশি সে আর কাউকে কখনো ভালোবাসেনি।’^{২১০} —এই মতবাদকে অপর দুই বন্ধু খণ্ডন করার চেষ্টা করেছে। তিন প্রেমিক শিবানীর মৃত্যুতে শোক জ্ঞাপনের পাশাপাশি নিজেদের ভোগ দখলের ঘটনার

বর্ণনায় নিজেদের সাফল্যকে সূচিত করতে চেয়েছে। কৈশোর ও প্রথম যৌবনের প্রেমিক কমলেন্দু মনে করে শিবানীর সাথে তার দৈহিক মিলনে সে শিবানীর সর্বস্ব পেয়েছিল, আবার শিশির মনে করে উত্তপ্ত যৌবনের শিবানীকে আত্মদান করেই সে সম্পূর্ণ ভাবে শিবানীকে পেয়েছিল, তারপর আর কিছু অবশিষ্ট থাকতে পারে না, আবার অনাদি, শিবানীর দুর্বল মানসিকতাকে অবলম্বন করে আর্থিক নিরাপত্তা লাভ করে ভালোবাসার চূড়ান্ত ঐশ্বর্যকে ছিনিয়ে নিতে পেরেছিল। তাই প্রত্যেকেই দাবি করেছে শিবানী তাকেই ভালোবেসেছে সর্বাংশে এবং তারাও শিবানীর যথাসর্বস্ব লুণ্ঠ করে নিতে পেরেছে। চতুর্থ পুরুষ ভুবন সব কিছু জেনেও শিবানীকে স্ত্রীর মর্যাদা দিয়েছিল। তিনটি পুরুষের কাছে হাত বদল হওয়া, কুমারীত্ব মোচিত হওয়া শিবানীকে বিবাহ করা পূর্ব প্রেমিকদের কাছে বোকামির চূড়ান্ত নিদর্শন, এর থেকেও বড় অস্বস্তিকর ভুবনের শোক বিহ্বলতা। শিশিরের মনে হয়েছে, “ভুবনের বোকামির শেষ নেই। তুমি যে কাকে এত শোক দেখাচ্ছ, ভুবন, তবু যদি শিবানীর ভালোবাসা পেতে! শিবানী তোমায় ভালোবাসেনি, যদিও শেষ পর্যন্ত তোমায় বিয়ে করেছিল। তুমি স্বামী হয়েছিলে বলেই যা পাবার পেয়ে গেছ, তা ভেব না।”^{২১১}

বিমল কর এই গল্পে আধুনিক মনস্তত্ত্বের ভোগবাদিতা ও স্বার্থপর মানসিকতাকে প্রেমিক চরিত্রগুলির মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। দেহের বিশুদ্ধতাকেই তারা নারীকে বিচারের মানদণ্ড বলে মনে করেছে। তাই ভুবনের প্রতি উপহাস ছুঁড়ে দিয়েছে। কিন্তু একবারও ভেবে দেখেনি কমলেন্দু শিবানীকে প্রথম ভোগ করার পরও শিশির শিবানীর কাছে যা পেয়েছে তাই তার মনে হয়েছে সম্পূর্ণ। আবার একই ভাবে ভেবেছে অনাদিও, সুতরাং ভুবনের ক্ষেত্রে ভিন্নধর্মী মত কেন। মধ্যবিত্ত হিন্দু মানসিকতার অধিকারীরা বিবাহের ক্ষেত্রেই নারীর সতীত্বকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়, কিন্তু প্রেমের ক্ষেত্রে, বা সামাজিক দায় গ্রহণের বহির্ভূত ক্ষেত্রে, নিজেদের যৌনতা পরিত্যক্তির ক্ষেত্রে সেই সতীত্ববোধ তেমন প্রয়োজনীয় বোধ হয় না। তাই শিশির কিংবা অনাদি নিজেদের স্বার্থ খোঁজার প্রয়াসে শিবানীর সাথে সম্পর্ক নির্মাণ করেছে, প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, আবার তার পর প্রত্যাখ্যান করে চলে গেছে। কিন্তু একটি নারীর মানসিক নির্ভরতাকে প্রতিশ্রুতির রঙে রাঙিয়েও ভোগতৃপ্ত অবস্থায় সেই নারীর দেহের নানা ঋণের কারণে তাকে পরিত্যাগ করার অপৌরুষোচিত —অমানবিক মানসিকতা ভুবনকে আচ্ছন্ন করে নি। ত্রিশোর্থ, বহুভোগ্যা, সহায় সম্বলহীনা একটি নারীর পাশে দাঁড়িয়ে এবং তাকে সামাজিক স্বীকৃতি দিয়ে ভুবন প্রকৃতপক্ষে সংবেদনশীল, মানবিক চরিত্র হয়ে উঠেছে। তিন প্রেমিকের কাছে দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করে ঈর্ষার পাত্রও হয়ে উঠেছে। শিবানীর

মৃত্যুর সংবাদ তাদের কাছে সেই পৌছে দিয়েছে। এর মাধ্যমেও সে মৃদুভাবে তিন বন্ধুর প্রতি উপহাস জানিয়েছে নিরুচ্চার বাক্যপ্রয়োগে। শিবানীকে বিয়ে করে প্রকৃত সুখের সন্ধান সেই পেয়েছে, তাই তিন বন্ধুর মতো তাকে ক্ষমাপ্রার্থী হতে হয়নি। নিশাপ, দায়িত্ববোধপূর্ণ একজন মানব হিসেবে ভুবন এই গল্পে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

‘আমরা তিন প্রেমিক ও ভুবন’ গল্পে লেখক তিন প্রেমিক চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বকে সুন্দর ভাবে প্রকাশ করেছেন। মৃত আত্মার প্রতি তাদের কোন অভিযোগ নেই, নিজেরাই তাদের পূর্বকৃত পাপ ও প্রতারণার জন্য হৃদয়ের দ্বন্দ্ব ক্ষতবিক্ষত হয়েছে। অপর পক্ষে ভুবন এই গল্পের উজ্জ্বল চরিত্র, যে মৌনব্রত পালন করেও চরিত্রের বলিষ্ঠতার কারণে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছে। শিবানী এই গল্পে মৃত চরিত্র হলেও তিন প্রেমিকের Stream of Consciousness এর মাধ্যমে জীবন্ত হয়ে উঠেছে, এবং তাকে অবলম্বন করেই তিন প্রেমিকের আত্মিক প্রায়শ্চিত্তের প্রবণতা লক্ষিত হয়েছে।

লেখক বিমল কর এই গল্পে মানব জীবনের ও দেহের অক্ষয় ঐশ্বর্যের কথা ব্যক্ত করেছেন। শিবানীর একাধিক পুরুষের প্রতি নিবিষ্টতা ও প্রেমাকাঙ্ক্ষা একটি নারীর জীবনের প্রতি মমত্ববোধ ও বহুযন্ত্রণার পরও বেঁচে থাকার অনাবিল প্রয়াসকে ফুটিয়ে তুলেছেন। মানবের প্রেমাকাঙ্ক্ষা ও বেঁচে থাকার উৎসাহ যে, কোন প্রতারণার লোভ ক্ষুধার দ্বারা সমাপ্তি বিন্দুতে পৌঁছাতে পারে না, সহৃদয় মানুষ তাকে অবলম্বন করেই জীবনের সারাৎসারকে ঝুঁজে নিতে পারে, তা মূর্ত হয়ে উঠেছে এই গল্পে। তাই প্রেমবিলাসী প্রেমিকের চর্ম-চক্ষে দেখা ভুবনের মত মানুষও প্রেমনিষ্ঠ অসাধারণ মানুষে পরিণত হয়ে উঠেছে। শিশিরের চোখে তাই, ‘চাঁদের আলোয় ভুবনকে কেমন যেন দেখাচ্ছিল। তার চারপাশে নিবিড় ও নীলাভ, শুষ্ক, মগ্ন যে চরাচর তা ক্রমশই যেন ব্যাপ্ত ও বিস্তৃত হয়ে এক অলৌকিক বিষণ্ণ ভুবন সৃষ্টি করছিল। এয়েন আমাদের ভুবন নয়। অথচ আমাদেরই ভুবন।’^{২১২} এই সত্যদর্শনই এই গল্পের সারাৎসার।

‘মোহনা’ (‘দেশ’, ১৯৬৯) গল্পে জীবন ও যৌবনের সীমাবদ্ধতাকেই মূর্ত করে তুলেছেন লেখক। ‘আমরা তিন প্রেমিক ও ভুবন’ গল্পে বহুভোগ্যা হয়েও শিবানীর দেহ ও মনের ভালোবাসার মধ্যে সীমারেখা টানা হয় নি, কারণ এখানে ভালোবাসা বা ভোগবাসনা সকল দিক দিয়েই অন্তর্গতভাবে বা মানসিক দিক দিয়ে তার অফুরান ঐশ্বর্যের কথা ব্যক্ত হয়েছিল। শিবানী সেখানে মৃত, এবং তাকে কেন্দ্র করে অপর তিন প্রেমিকের আত্মবিশ্লেষণ সেখানে প্রকাশ পেয়েছে, শিবানীর আত্মিক সীমাবদ্ধতা জানা যায় নি। কিন্তু ‘মোহনা’ গল্পে মোহনা নিজের সীমাবদ্ধতাকে

আত্মনিগ্রহের উপলব্ধির মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছে। অমিতচারী পরিণামবোধহীন ভোগাকাঙ্ক্ষা, বেপরোয়া মানসিকতা এবং তার সূত্র ধরে নিঃসঙ্গতা, অসহায়তার বোধ এবং জীবন ও যৌবনের সীমাবদ্ধতার উপলব্ধি মোহনা চরিত্রের মাধ্যমে দ্যোতিত হয়েছে। মানুষের সংক্ষিপ্ত আয়ুবদ্ধ জীবনে যৌবনের অবস্থানও ক্ষণস্থায়ী। মানুষ পরম্পরা অনুযায়ী এবং জীবনের পর্যায় অনুযায়ী সেই সংক্ষিপ্ত যৌবনকেই মোহময় করে তোলে, তার মধ্য দিয়ে তুলে আনে জীবনের সাফল্যের পরশপাথর। মোহনার উদ্দীপ্ত ভোগাকাঙ্ক্ষা, অপরিণামদর্শিতা তার ত্রিশোধ নিঃসঙ্গ জীবনে অসহায়তা নিয়ে এসেছে। কিন্তু মোহনার চরিত্রের এই পরিণতির পিছনে যা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, তা হল তার চারিত্রিক স্বাতন্ত্র্য।

মোহনা তার কৈশোর ও যৌবনে শারীরিক সৌন্দর্য ও উত্তাপ দিয়ে বহু প্রণয়াকাঙ্ক্ষীকে তৃপ্ত করেছিল, এবং কিছুজনকে চরম উপেক্ষা করে তাদের ঘৃণা অর্জন করেছিল। কিন্তু এর পিছনে তার বেপরোয়া মানসিকতার প্রভাব প্রতিফলিত হয়েছে। মোহনাকে লাভ করার প্রত্যাশা করেও যারা ব্যর্থ হয়েছিল, তারা তার প্রতি তাদের ঘৃণা প্রদর্শন করেছে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজের সম্মান বা ঘৃণা প্রদর্শনের পিছনে তাদের যে দমন ও পীড়ন নীতি প্রকাশিত হয় তার কাছে আত্মাহুতি দেয়নি মোহনা। একারণে প্রেমাস্পদের মৃত্যুতেও মোহনার আত্মধিকার অনুভূত হয় নি। মোহনা স্পষ্টবাদিনী, আত্মবলিষ্ঠ, নারীত্বে উজ্জ্বল একটি মানবিক চরিত্র। নিজের স্বতন্ত্র ভাবনার আলোকে সে নিজেকে পরিচালিত করেছে, তার মতে, “জীবনটা আমার। আমার নয়? এই শরীর বল মন বল সবই তো আমার। আমার নিজের যদি শরীর নিয়ে মনে না হয় যে, আমি চোর তবে আমি কেন তাকে নিয়ে কোথায় রাখি, কোথায় ধরি করে ভয়ে মরব। আমি কি চুরি করে আমার দেহটা এনেছি? এ আমার জন্ম থেকেই।”^{২৩০} জন্মলব্ধ এই শরীরটাকে অহংকারের একটা উপাদান হিসেবে মোহনা মনে করেছে। বংশ মর্যাদা, বিত্ত, সংস্কৃতিমনস্কতা, সাফল্য সব কিছুই কদর পায়, ‘শুধু তোর যদি এমন একটা শরীর থাকে যা ভাল যার জন্যে-কি বলব, সেই পদ্যটা--পরিমল লোভে অলি সকলি জুটল--তবেই শুধু ছি ছি।’^{২৩৪} --এই ভাবনা মোহনার জীবনদর্শনকে স্বাতন্ত্র্য দিয়েছে। হিন্দু-সামাজিক পরিকাঠামোয় নারীর সতীত্ব নিয়ে যে বন্ধনকে নিবিড় করার প্রয়াস রয়েছে, মোহনা তাকে ছিড়ে নিজের মানসমুক্তি চেয়েছে। প্রচলিত ভাববিলাসের প্রতি তার নিবিষ্টতা নেই। পাঁচজনের শেখানো কথায় তার রুচি নেই, আকাঙ্ক্ষাও নেই। নিজের ইচ্ছাশক্তির উপর ভরসা করেই সে এই জীবনের পথে নেমেছে। তার কথায়, “আমার সুখ যতটুকুতে ততটুকু আমি

নিয়েছি। আমার কোনদিন আপসোস হয়নি, বুক ধক ধক করে নি।”^{১১৫} --তার কারণ নিজের বিবেকের কাছে, নিজের সত্য দর্শনের কাছে মোহনা নিষ্পাপ। সমাজের প্রদর্শিত মত ও পথের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েও সে নির্বিকার, সাবলীল, উন্নত মস্তক। এই সকল দিক দিয়ে বিমল করের গল্পে আধুনিক নারীর চরিত্র রূপে মোহনা অবশ্যই স্বাতন্ত্র্যের অধিকারিনী।

বেপরোয়া, ব্যক্তিত্বে উজ্জ্বল এই নারী প্রায়-অতিক্রান্ত যৌবনে এসে আত্মবিশ্লেষণে ব্রতী হয়েছে। সে নিজের অনাগত ভবিষ্যতের চিন্তায় কিছুটা ভাবিত। আধুনিক সামাজিক পরিকাঠামোয় নিঃসঙ্গ একটি নারীর জীবন সত্য সুখের নয়। কিন্তু নিজ চিন্তাধারার স্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাসী মোহনা বহু সুযোগ পেলেও কারো কষ্টলগ্না হয়ে জীবনটাকে সঁপে দেয়নি। নারীস্বাতন্ত্র্যে বলিষ্ঠ ভাবনা প্রকাশ করে নিজেকেই নিজের ধারক বাহক করে তুলতে চেয়েছিল। কিন্তু যৌবন-সাম্রাজ্যে এসে তার মনে প্রশ্ন উঠেছে, তার স্বনির্বাচিত পথ কি সুখের, নিশ্চিন্ততার, নজির সৃষ্টিকারী। যদি তা হয় তাহলে মনের ভিতরের মানুষটার এত জিজ্ঞাসা কেন। নিঃসঙ্গতার মাঝে একটা মানুষের ভিতরে আরও একটা মানুষ জেগে ওঠে, যে স্বভাবত মানুষকে পরিচালিত করে, এই বোধরূপী অন্তরসত্তার মুখোমুখি দাঁড়াতে হয় মোহনাকে। কিন্তু সেই ভিতরের মানুষটা যোগ্য জবাব দিতে পারে না মোহনার প্রশ্নের। অর্থাৎ মোহনার জীবনদর্শনের মধ্যে কোথাও মেকিত্ব নেই। নিজের ইচ্ছাশক্তির প্রাবল্যে সে এগিয়ে গেছে জীবনে, যার পিছনে নিয়ন্তাশক্তি ছিল তার ভিতরের মানুষ। মোহনাকে আত্মসুখী, হৃদয়হীন যাই বলা হোক না কেন মোহনা তাতে নিরুত্তাপ, কারণ পৃথিবীটাকে সে নিজের উপলব্ধি দিয়ে বিচার করেছে। মোহনার মতে নারীর কাছে বৈবাহিক জীবন, তার সত্তার প্রতি অবিচার; গহনার বাক্স’র মতো অপরের সম্পত্তি হয়ে নিজেকে আত্মাহুতি দেওয়ার সামাজিক রীতি। তাই এতদিন ধরে মোহনার মধ্যে এই স্বতন্ত্র চিন্তা, যা তাকে আলোকিত করেছিল নারীত্বে, গল্পের শুরুতেই আবার তার সেই অপছন্দের বিধিবদ্ধ জীবনে ফিরে আসার আকাঙ্ক্ষা কেন দ্যোতিত হল এর উত্তরও মোহনার মাধ্যমেই প্রকাশ করলেন লেখক। বিমল কর এই গল্পের মাধ্যমে মানব জীবনের সংক্ষিপ্ততা, সংকীর্ণ-তাকে প্রকাশ করেছেন। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল হয়ে বেঁচে থাকা যায় ঠিকই, কিন্তু প্রচলিত বিধি ব্যবস্থাকে পুরোপুরি অস্বীকার করে থাকা কঠিন, কারণ জগতের নিয়মের গতানুগতিকতায় অধিকাংশ মানুষই আবর্তিত হয়, তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে নিঃসঙ্গ জীবন-বিলাসী হওয়া সত্যই কষ্টকর। মোহনার যৌবনবিলাসী মানসিকতা, যৌন-অমিতচার সারাজীবনের জন্য নয়। জীবনের এই সীমাবদ্ধ পরিপ্রেক্ষিত সমস্ত জীবনধারাকে প্রভাবিত, ও

চালিত করতে পারে না, তাই মোহনাকে ফিরে আসতে হয়েছে প্রচলিত জীবনের অনুষ্ণে। তবুও মোহনার স্বাভাবিক, জীবন-দর্শনে বাস্তবতার দিকটি অভিনন্দন যোগ্য। বিমল কর তাঁর জীবনে ও সাহিত্যে মানব মানবীর ভোগাকাজ্জ্বল অতিরেককে সমর্থন করেননি। হিন্দু সামাজিক পরিকাঠামোয়, সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিকেই মূর্ত করে তুলেছেন তাঁর নানা সাহিত্যে, মোহনার মধ্য দিয়েও সেই ভাবনা প্রতিফলিত হয়ে উঠেছে।

‘সংশয়’ (‘দেশ’, ১৯৬৮) গল্পটির মাধ্যমে বিমল করের মৃত্যুভাবনার বিশেষ দিক প্রতিফলিত হয়েছে। ‘জননী’ গল্পে মায়ের মৃত্যুর পর সন্তানেরা তাদের মায়ের পরলোকের যাত্রাপথের পাথেয় স্বরূপ দিতে চায়েছে সেই সকল গুণ বা ভাব, যা তাদের মায়ের কাছে অপূরণীয় ছিল ইহজগতে। ‘সংশয়’ গল্পে প্রধান চরিত্র সুধাকান্তের মাধ্যমে উক্ত হয়েছে বিশেষ আকাঙ্ক্ষা, ‘আমার বড় জানতে ইচ্ছে করছে সুনু সেই ফেয়ারওয়েলটায় কে কি দেয়।’^{২২৬} সেই ‘ফেয়ারওয়েল’ কথাটির মধ্য দিয়ে মানবের পরলোক-প্রাপ্তির কথা বলা হয়েছে, যা সুধাকান্তের মনকে ক্রমশ পীড়িত করে তুলেছে। কর্মজীবন থেকে অবসর নিয়ে ঘরে ফিরে আসার পর উপহারসামগ্রী দেখে স্ত্রী সুনয়নী ব্যক্ত করেছিলেন তাঁর স্বামীর প্রতি সকলের খাতির, ভালোবাসার কথা। কিন্তু সুধাকান্তের সন্দেহপ্রবণ ভাবধারায় তার সর্বাত্মক স্বীকৃতি ছিল না। “কি জানি। অনেক দিন চাকরি করলাম, সব সেকশানেই ছিলাম, হয়তো তাই জানাশোনা হয়েছিল সকলের সঙ্গে...”^{২২৭} --এই সন্দেহ-প্রবণতা তাঁর বিবেকবোধ থেকে নিঃসৃত সত্য ভাষণ। কাজের সুবাদে তাঁকে অনেক ধূর্ততা, কাঠিন্য, পেশাদারিত্ব, ছলনার আশ্রয় নিতে হয়েছিল। কাজে তৎপরতার কারণে চাকরিতে উন্নতির সুবাদে সকলের কাছে তিনি ভালোবাসার পাত্র ছিলেন না, কিছুটা ঈর্ষার পাত্রও হয়েছিলেন। তাই এই ফেয়ারওয়েলে সকলের ভালোবাসা হয়তো তাঁর প্রতি বর্ষিত হয় নি।

সুধাকান্তের মনে নিঃসঙ্গতা বোধ তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সাথে একাত্ম হয়ে উঠেছে। অফিসের কাজের সুবাদে পেশাদারিত্ব তার কাছে প্রাধান্য পেয়েছে, সেই কারণে সাময়িক ভাবে অন্য সকলের থেকে মানসিকভাবে বিচ্ছিন্নতা স্বাভাবিক। কিন্তু কর্মজীবন থেকে অবসর নেবার পর তাঁর মন শূন্যতাবোধে আক্রান্ত হয়েছে। বিশেষ করে একমাত্র অবলম্বন নিজের স্ত্রী যখন বলে ওঠেন, “তোমায় সবাই ভালবেসে কত দিয়েছে, আমি যখন যাব, তখন তুমি কিছু দিও।”^{২২৮} এখান থেকেই সুধাকান্তের মনে মৃত্যুভাবনার প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। মানুষের মৃত্যুকে নিয়ন্ত্রণ করার শক্তি মানুষের নেই, নিয়তি তাড়িত জীবনে কখন যে কার ডাক আসে, মানুষ তার হৃদয় পায় না।

সুধাকান্তের মনে হয়েছে এই ইহলোক প্রথমে ত্যাগ করার সম্ভাবনা তারই প্রবল, কারণ তিনি প্রায় দশ বছরের বড়, সুনয়নীর চেয়ে। তাই শেষের ফেয়ারওয়েলটা দেখার সম্ভাবনার কথা সুনয়নীর প্রতি তিনিই ব্যক্ত করেন। রাত্রে বিছানায় শুয়ে শববাহক দলের হরিশ্বনি শোনার পর মৃত্যুভাবনার পটভূমিটি আরও আবেশঘন হয়ে ওঠে। তাঁর মনে হয় জীবনের শেষ প্রান্তে তাঁরা এসে পড়েছেন। কিন্তু এই জীবনে তিনি কী পেলেন, আজকের বিদায় সম্বর্ধনা সভায় যে উপহার সামগ্রী পেলেন সেটাই কি সব; যে ফুলের মালা, স্তোক বাক্য, প্রশংসা সূচক বক্তৃতা তাঁর সম্পর্কে শুনলেন, সেটাই কি সঠিক মূল্যায়ন, এই প্রশ্ন তাঁর মনে অন্তর্দ্বন্দ্বের সূচনা করেছে। এই আত্মবিশ্লেষণের মাধ্যমে সুধাকান্ত চরিত্রটি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। বিবেকের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আত্মসমীক্ষার মাধ্যমে তিনি নিজের প্রকৃত চরিত্রটিকে নিজের সমালোচনার মাধ্যমে প্রকাশ করার চেষ্টা করেছেন। সুধাকান্তের মনে দ্বিধা ও সংশয় উপস্থিত হয়েছে বিদায় সম্বর্ধনাকে কেন্দ্র করে। কর্মজীবনের বিদায় সম্বর্ধনায় তিনি উপলব্ধি করেছেন প্রীতি, ভালোবাসা, সম্মানের চেয়েও আচারসর্বস্বতার প্রাধান্য রয়েছে। ফেয়ারওয়েল একটি রীতি, এবং স্বাভাবিক ভাবেই তাঁকে ফেয়ারওয়েল দেওয়া হয়েছে। তাই ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে তিনি দেখেন তাঁর বক্তৃতা শোনার জন্য কেউই অবশিষ্ট নেই, তাঁর প্রতি সহানুভূতি জানানোর জন্য কেউ উপস্থিত নেই। কিন্তু ইহলোকের অবসানে যে ফেয়ারওয়েল উপস্থিত হবে সেখানেও কি রীতি প্রদর্শনের ভয়াবহ স্বাভাবিকত্ব থাকবে, না কি আন্তরিকতা সেখানে মুখ্য তা ভাবার চেষ্টা করেছেন সুধাকান্ত। অফিসের লোকেরা তাঁকে যেমন ভাবে ফেয়ারওয়েলে সম্বর্ধিত করেছেন, সেই একই সম্বর্ধনা কি স্ত্রী সুনয়নীর কাছ থেকেও তিনি পাবেন। চাকরির উন্নতির জন্য বহু আপোষ-নীতি, পেশাদারিত্ব প্রয়োগ করে তাঁকে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে হয়েছে, কিন্তু জীবনের সংজ্ঞাও কি তাই, না কি অন্য কিছু, এখানে ছিলনা, প্রতারণা, শীর্ষে ওঠার মহত্ব সব কিছু থেকেও মূল্যবান হয়ে ওঠে নির্ভরশীলতা, ভালোবাসা, শ্রদ্ধা, সম্মান, স্নেহবোধ। জীবনের থেকে অবসর নেওয়ার ক্ষেত্রেও কি ফেয়ারওয়েলটা ভিন্নধর্মী হয়, না কি অভ্যাস-সূচক, রীতি-নির্ভর, স্বাভাবিকত্বে আচ্ছন্ন।

বিমল কর তাঁর জীবনে বেশ কিছু বিখ্যাত মানুষের মৃত্যুর ঘটনা প্রকাশ করেছেন তাঁর ‘উড়োখই’ গ্রন্থে, যেমন রবীন্দ্রনাথ, মহাত্মাগান্ধী, কিংবা ‘দেশ’ পত্রিকার সম্পাদক সাগরময় ঘোষের কথা। বৃহৎ ব্যক্তিত্বের এই সকল মানুষদের মৃত্যুসংবাদে পর সহানুভূতিশীল, সমব্যাপী, সহৃদয় ব্যক্তিবর্গের উপচে পড়া ভিড় তিনি দেখেছিলেন, তাদের সম্মান জানানোর আকুলতাকেও

উপলব্ধি করেছিলেন, ঠিক তেমনি সাধারণ মানুষ যারা তাদের পরিবারকে আশ্রয় করে বাঁচতে চায়, তাদের মৃত্যুর পরও কি যথার্থ ভাবে সেই সম্মানটুকু তারা পেতে পারে, এই জিজ্ঞাসা তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন। সুধাকান্ত আত্মবিশ্লেষণের মাধ্যমে পৃথক জগতের বাসিন্দা হয়ে উঠেছে। আধুনিক মানসিকতার এই মানুষটি হৃদয়ের মধ্যে অবস্থিত পৃথক সুধাকান্তকে উপস্থিত করে তার ফেয়ারওয়েলের কল্পনা করেছে, যেখানে কোন মেকিও নেই, যেখানে সত্যবাদীতা আছে; সুধাকান্ত'র সেই সত্যদর্শনই প্রকৃতপক্ষে তার জীবন দর্শনের সাথে একাত্ম হয়ে উঠেছে, এবং সে সেই সত্যবাদীতার সাথে সঙ্গতি স্থাপনের চেষ্টা করেছে অন্তরজগতের ঐশ্বর্যের মাপকাঠিতে।

স্বাধীন ভারতবর্ষের ষাটের দশক থেকেই নিম্নমধ্যবিত্ত, মধ্যবিত্ত, কৃষক-শ্রমিক, বুদ্ধিজীবী মানুষদের মনে দেশ-কাল-সমাজ সম্পর্কে বিশেষ চিন্তাধারার বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। ষাটের দশকের শুরু পর্যন্তও স্বাধীনতা লাভকারী ভারতীয়রা সব দিক থেকেই সুন্দর সাবলীল সাফল্যমণ্ডিত স্বদেশের স্বপ্ন দেখেছিল, কিন্তু দেশের ক্রমঘটমান নানা জটিল পরিস্থিতি তাদের মনে এনে দিয়েছিল বিষাদ ও হতাশাবোধ। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (১৯৫৬-১৯৬০) শিল্পায়নের দিকে সরকার জোর দিয়েছিল; ফলশ্রুতিতে খাদ্য সংকট দেখা যায়। এর পাশাপাশি, চীনের (১৯৬২) ও পাকিস্তানের (১৯৬৫) বিরুদ্ধে যুদ্ধে বিপুল অর্থসংকট দেখা দেয়, যার ফলে খাদ্য-সংকট আরও তীব্র হয়ে ওঠে। ১৯৬৬ সালে খাদ্য আন্দোলনের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের তীব্র অসন্তোষ রূপ পায়। অন্য দিকে আবার শিল্পায়নের ফলে চাকুরিজীবী মানুষেরা আর্থিক সুবিধের মুখ দেখেন, অবহেলিত হয় সাধারণ মানুষেরা। তাই ক্ষমতালোভী মানুষেরা সমাজে উচ্চাসন লাভ করে সাধারণ মানুষের উপরে কর্তৃত্ব করতে থাকে। ১৯৬৪ সালে কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিধাবিভক্তি সাধারণ মানুষের অবস্থানকে আরও নড়বড়ে করে তুলেছে। একদিকে সমাজতন্ত্রবাদে বিশ্বাসী মানুষের হতাশা অপর দিকে ক্রমবর্ধমান শিক্ষিত যুবক-যুবতীর বেকারত্ব মানুষের সামনে প্রকৃত যাত্রাপথটিকেও ধোঁয়াশাচ্ছন্ন করে তোলে।

পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক পরিস্থিতিও এই সময় বেশ টালমাটাল অবস্থায় ছিল। ১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দে 'বাংলা কংগ্রেস' গঠনের মধ্য দিয়ে কংগ্রেসের ভাঙন স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আবার কমিউনিস্ট দলেও ফাটল দেখা দেয়; এক্ষেত্রে প্রভাব ফেলেছিল নকশালবাদী আন্দোলন। ১৯৬৭-তে বামপন্থী দল পশ্চিমবঙ্গের ক্ষমতায় এলেও শাসনভার নেয় তাদের গড়া যুক্তফ্রন্ট। এই সরকার বরখাস্ত হওয়ার পর ১৯৬৯-তে নির্বাচনে সেই যুক্তফ্রন্টই আবার ক্ষমতায় আসে। ১৯৭১-এ কংগ্রেস

মন্ত্রীসভা পদত্যাগ করে এবং আবার শাসনভার গ্রহণ করে। ১৯৭৫-এর ২৬ শে জুন থেকে ১৯৭৭-এর জানুয়ারী পর্যন্ত চলে জরুরী অবস্থা। এর পর নির্বাচনে কংগ্রেসের পরাজয় ও বামফ্রন্টের ক্ষমতায় পুনরাবির্ভাব লক্ষিত হয়। কংগ্রেসের প্রশাসনিক দুর্বলতা, যুক্ত-ফ্রন্টের মাধ্যমে মানুষের আশা পোষণ, আবার নকশালবাদী আন্দোলনের মাধ্যমে কমিউনিস্টদের বিভক্তি, রাষ্ট্রপতি শাসন ও তার প্রত্যাহার, পুলিশি নির্যাতন, বামফ্রন্টের পুনঃপ্রতিষ্ঠা সমস্ত দিক দিয়ে ষাট ও সত্তর দশক ঘটনাবহুল ছিল এবং এর মাধ্যমে বার বার প্রকাশিত হয়েছিল মানুষের নির্দিষ্ট পথ অন্বেষণের ব্যাকুল প্রয়াস।

ষাটের দশকের শেষার্ধ্বে আলোড়ন ফেলে নকশালবাদী আন্দোলনের মত রাজনৈতিক আন্দোলন। কৃষকদের নিয়ে এই আন্দোলন গড়ে উঠলেও, কিংবা উত্তরবঙ্গের বিশেষ অঞ্চলে এর সূত্রপাত হলেও খুব তাড়াতাড়ি এর প্রভাব সারাদেশে ছড়িয়ে পড়ে। শ্রমিক, নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত, উচ্চবিত্ত, লেখক, শিল্পী, বুদ্ধিজীবী সকলেই এর দ্বারা প্রভাবিত হন। “১৯৬৭ থেকে ১৯৬৯-এই আন্দোলনের প্রসারের কাল, ১৯৭০ থেকে ১৯৭২-এই আন্দোলন ভেঙে যাবার কাল। এই সময়টিতে এই আন্দোলন দমনে প্রশাসনিক সর্বশক্তি প্রয়োগও একটি মনে রাখার মতো ঘটনা। সত্তরের দশকের প্রথম দু বছরের পর রাজনৈতিক দিক থেকে নকশালবাড়ি আন্দোলন অবসানমুখী হলেও বাংলা কবিতা ও কথাসাহিত্যে তার ফল লক্ষ্য করা যেতে লাগল তখন থেকেই।”^{২১৯} এই আন্দোলন চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিল, স্বাধীনতার বিশ বছর পরেও সমাজে সামাজিক, অর্থনৈতিক ইত্যাদি ক্ষেত্রে অসাম্য কতটা প্রকট। মানুষ বুঝতে পেরেছিল কেন্দ্রীয় রাজনীতি দরিদ্র সমাজের পরিবর্তন আনতে ব্যর্থ। এছাড়াও বিদেশী ঋণের বোঝা অতিকায় রূপ ধারণ করেছিল এবং তার প্রভাব সাধারণ মানুষের উপর পড়েছিল। নকশাল আন্দোলনের মধ্য দিয়ে এই আন্দোলন শুরু হওয়ার সাথে সাথে তীব্র অসন্তোষ ও হাহাকার জন-মানসে প্রতিফলিত হয়। পুঁজিবাদী পেটিবুর্জোয়া মানুষদের ক্ষমতার আশ্ফালন, অপর দিকে আন্দোলনকারীদের নতুন পথ অন্বেষণের প্রয়াস দেশ-কালের পরিস্থিতিতে জটিল করে তুলেছিল। এর সাথে যুক্ত হয়েছিল অস্থির রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে আন্দোলনকারীদের উপর বর্বর, নৃশংস ভাবে পুলিশি আক্রমণ। রক্তপাত, স্বজন-হারানোর যজ্ঞা, হাহাকার, মানুষের প্রতি মানুষের সন্দেহ প্রবণতা চারিদিকে ব্যাপ্ত হয়ে গিয়েছিল। তৎকালীন শিল্পী ও সাহিত্যিকরা এই সময়কালের চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন তাদের ক্যানভাসে ও সাহিত্যে।

বিমল করের গল্পে রাজনৈতিক বিষয় কিছুটা উপেক্ষিত বলা যায়। কিন্তু তার উল্লেখ একদম নেই একথা বলা যায় না। লেখক নিজে বলেছেন, “আমাদের সময়ে রাজনীতির লেখা খুব চলত। একেবারে প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতিতে তেমন না মাতলেও তার ছোঁয়া আমার গায়ে ছিল। কিন্তু আমরা যে ধরনের রাজনীতিতে বিশ্বাস করতাম— তাতে ব্যক্তি মানুষের স্থান ছিল প্রধান; দলের রাজনীতি, কিংবা লেখাকে রাজনীতির অংশ করা আমাদের রুচির বাইরে ছিল, তা হয়তো উদ্ভেজক বক্তব্য নয়। তবু আমার সাধ্যমত আমি কখনও মানুষের চিন্তের দীনতা, মনের বিকার, কখনো তার সহানুভূতিশীল হৃদয়কে প্রকাশ করার চেষ্টা করেছি।”^{২২০} বিমল কর একসময় র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিস্টদের দলে যুক্ত হলেও রাজনীতি তাঁর খুব প্রিয় বিষয় ছিল না। তবুও তাঁর সাহিত্যে ফুটে উঠেছে ষাট-সত্তর দশকের দিগ্ভ্রান্ত যুবকদের কথা; বিশেষ মতবাদের প্রতি আগ্রহী হয়ে নিজের জীবন ও ভবিষ্যৎকে অগ্রাহ্য করে রাজনীতিতে ঝাঁপিয়ে পড়ার চিত্র। আবার প্রচলিত ব্যবস্থার প্রতি অসন্তোষে ক্ষুব্ধ, বিষাদ-স্তব্ধ মানুষের চিত্রও তাঁর সাহিত্যে লক্ষিত। বিমল কর মূলত অন্তর্মনের কথাকার। তাই বাইরের বাস্তবায়ন পরিবেশের থেকে তাঁর সাহিত্যে প্রকাশিত হয়েছে মানুষের অন্তর্মনের পরিচয়। তবুও এই সময়ের কয়েকটি লেখার মধ্য দিয়ে তিনি বাইরের ও মনের বাস্তবায়ন পরিবেশকে ফুটিয়ে তুলেছেন। তবুও বলা যায় বাইরের পরিবেশ এখানে শুধুমাত্র পটভূমি নির্মাণ করেছে, আসল দ্বন্দ্ব প্রকাশিত হয়েছে অন্তরের গভীর গহ্বরে। সামাজিক পরিস্থিতি বা রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিত যখন ব্যক্তি মানবের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে নিয়ে ছেলেখেলা শুরু করেছে, তার স্বপ্নকে বলি দিয়েছে নিজেদের বুর্জোয়া মানসিকতার ক্রমবর্ধমান লোভের কাছে, তখনই ব্যক্তি মানব বিদ্রোহে ফেটে পড়তে চেয়েছে, নতুবা আত্মবিক্ষণের মাধ্যমে মেনে নিয়েছে হীনম্মন্যতার অন্ধকার শিবিরের মৃত্যু-শীতলতা। বিমল কর একদিকে যেমন আন্দোলনকারীদের ব্যাপক ধ্বংসাত্মক ক্রিয়াকর্মকে মেনে নিতে পারেন নি, তেমনভাবে বুর্জোয়া মানুষদের প্রতি প্রকাশ করেছেন ঘৃণার আক্রোশ। লেখক দেখেছিলেন— “নকশাল আন্দোলনের যখন চূড়ান্ত পর্ব, প্রত্যহই একটা না একটা ঘটনা ঘটে যাচ্ছে, শহর কলকাতায় শুধু নয় পশ্চিমবঙ্গের অনেক জায়গাতেই খুনোখুনি লেগেই আছে, পোড়ানো হচ্ছে বই পত্র, মাথা ভাঙা হচ্ছে মূর্তির, স্কুল-কলেজের ছেলে মেয়েরা এক বিশৃঙ্খল অবস্থার মধ্যে দিন কাটাচ্ছে—তখন সুনলাম এ হল ‘কালচারাল রেভলিউশান’, এমনটাই নাকি হবে, হওয়া উচিত।”^{২২১}

বিমল করের এই অসন্তোষের পিছনে তাঁর ব্যক্তিজীবনের অভিজ্ঞতাও কার্যকরী। তাঁর মায়ের অসুস্থতা, হাসপাতাল থেকে বাড়িতে নিয়ে এসে সেবা শুশ্রূষার মধ্যেও মনের ভারাক্রান্ত অবস্থা তো ছিলই; এর সাথে যুক্ত হয়েছিল চাকরি করতে যাওয়ার পথে পথে বিপদের আবহাওয়া; সিঁথিতে থাকাকালীন স্কুল বাস পোড়ানোর ঘটনা তাঁকে আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে মত জানতে বাধ্য করেছিল। আবার তিনি এই আন্দোলনকারীদের পিছনে বুর্জোয়া রাজনীতি ও ক্ষমতালোভী মানুষদের অবস্থানকে উপলব্ধি করেছিলেন, আর লক্ষ্য করেছিলেন পুলিশি নির্যাতন। এরই প্রভাব পড়েছে তাঁর ‘সে’, ‘ওরা’ ও ‘নিগ্রহ’ গল্পে।

‘সে’ (‘দেশ’, ১৯৭১) গল্পটির প্রেক্ষাপটে রয়েছে নকশাল আন্দোলন-বিশৃঙ্খল কলকাতা শহরের ছবি এবং এর সাথে যুক্ত হয়েছে উচ্চপদস্থ উচ্চমধ্যবিত্ত সমাজের মানুষের নিরাপত্তাহীনতার উপলব্ধিতে ভীতিবোধ। সত্তর দশকের বিদ্রোহী দিগ্ভ্রান্ত যুবকের ক্রোধ, বিদ্রোহ ও ঘৃণা এই গল্পে বিশেষ ভাবে প্রকাশিত। গল্পের কথক এখানে বুর্জোয়া প্রশাসনের সহচর হয়ে নিজের প্রতিষ্ঠাকে শক্ত জমিতে স্থাপিত করলেও, মনের মধ্যে সুখান্বেষী মনোভাবকে পোষণ করলেও একটি যুবকের দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার ঘটনায় মনের মধ্যে অনুভব করেছে ভীতিবোধ এবং এই মানসিক অবস্থার মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয়েছে তার বর্তমান পরিস্থিতির পাপ-পঙ্কিলরূপ। আত্মসুখী, স্বার্থপর মানসিকতার অধিকারী এই মানুষের, নিজের প্রকৃত অবস্থার প্রকাশে নিজেই ক্রমশ লজ্জা পেয়েছে, এবং এর মাধ্যমেই লেখক আক্রান্ত ও আক্রমণকারী দুই প্রকৃতির মানুষের হৃদয়ের ময়নাতদন্ত করেছেন।

গল্পের শুরু থেকেই গল্পের কথক পালিত সাহেব কিছুটা মানসিক বিকারগ্রস্ত। গত রাতের ঘটনার পর তিনি নিজের সামগ্রিক দৈহিক সুস্থতা কল্পনা করতে পারছেন না। তাঁর মনে হয়েছে, ‘কাল একটা ঘটনা ঘটে যাবার কথা। তা হলে কী সেটা ঘটে নি?’^{২২২} কথক তাঁর ক্ষতবিক্ষত হাতটিকে লেপের বাইরে আনতে গিয়ে চমকে ওঠেন; দেখেন হাতটাতে কোন আঘাতের চিহ্ন নেই। নিজের স্ত্রীকে দেখিয়ে এই সন্দেহ তিনি দূর করতে চান। অর্থাৎ স্বপ্ন ও বাস্তবের অদ্ভুত সংযোগ এই গল্পে উত্থাপিত করেছেন লেখক। পালিত সাহেব নিজের উন্নতির পিছনে তাঁর পাপ পঙ্কিলতার ছায়া দেখেছেন। প্রশাসনের সাথে সমঝোতা করে নিজের আখের গুছিয়ে নেবার স্বার্থান্বেষী মনোভাব পোষণ করেছেন। নিজেদের সুখ-সমৃদ্ধি, আয়-উপায়ের জন্য চোরা-পথ অবলম্বন করার ক্ষেত্রেও দ্বিধাহীন। তাঁর পারিবারিক দিক থেকেও এ ব্যাপারে সহমত রয়েছে। গোপনে সোনা

কেনার ঘটনায় তা উল্লিখিত। এছাড়াও অফিসের দপ্তরগুণ তাঁর কাছে খাম পৌঁছে দেয়, যে খামের ভেতরে অদৃশ্য বস্তুটির সাথে ঘুষখোর, সুবিধালোভী মানুষদের গোপনে যোগাযোগ আছে। পালিত সাহেব অভ্যাসবশত সকল কাজ করলেও মনের গভীর স্তরে এই অন্যায়েব জন্য ভীতিবোধ করেন। শিক্ষিত সমাজের শ্রেণী-শত্রু হিসেবে পালিত সাহেব মনে মনে অনুভব করেন নিরাপত্তাহীনতা। বাস্তবে নিজের অন্যায়ে ও আপোষমী কাজে একাগ্রতা দেখালেও অবচেতনে তার বিষময় ফল কল্পনা করেন। এই অবচেতন মন বিবেকের মুখোমুখি তাঁকে দাঁড় করায়, স্বপ্নের মধ্য দিয়ে বর্তমান পরিস্থিতির ভবিষ্যৎ বিষয়কে চোখের সামনে তুলে ধরে। এর ফলেই তাঁর মধ্যে শুরু হয় অস্বাভাবিকতা। মনের মধ্যে ঘোরাফেরা করে ‘সে’ —একটি যুবক, যার নাম তাঁর মনে পড়ে না কর্মময় দিনে, অথচ তাকে আবার ফিরে পান শীতের রাতে একাকী বিছানায় শুয়ে আত্মঅন্বেষণ-মুখী গভীর চিন্তার মধ্য দিয়ে, তার নাম আদিত্য, —সত্যর বন্ধু।

আদিত্য’র আবির্ভাব ঘটে গল্পের প্রায় মাঝামাঝি সময়ে; সে কিছুটা দুর্বল, অন্যমনস্ক, চিন্তাগ্রস্ত, কিছুটা নিষ্প্রাণ। বর্তমান সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত, শিক্ষা জগতের পরিস্থিতি, চাকরির দুনিয়া সবক্ষেত্রেই আদিত্যর মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে চাপা অসন্তোষ। সুবিধাবাদী, অতীতমগ্ন, বর্তমানের প্রতি উপেক্ষণীয় মনোভাবের অধিকারী, সমকালীন অস্থির পরিস্থিতির জন্য যুব সম্প্রদায়ের উপর দায় অর্পণকারী পালিত সাহেবের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে এই আদিত্য। পকেট থেকে লম্বা ছোরা বার করে অনভ্যস্ত হাতে আক্রমণ করেছে সে পালিত সাহেবের উপর। অর্থাৎ পালিত সাহেব এই সকল যুব সম্প্রদায়ের কাছে শ্রেণীশত্রু। এরা ক্ষমতা লাভ করে বুর্জোয়া প্রশাসনের সাথে হাত মিলিয়ে নিজেদের সুখ শান্তির ব্যবস্থা করে। বিদ্রোহী যুব সম্প্রদায়ের আন্দোলনকে কুরুচির প্রকাশ বলে মনে করে। ঘুষ নিয়ে, চোরাপথে সোনা কিনেও এই ক্ষমতালোভী মানুষেরা সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করে গণ্যমান্য মানুষ হিসেবে। নকশাল আন্দোলনের মাধ্যমে শিক্ষিত, সংবেদনশীল যুবকেরা সমাজের খোল-নলচে বদলে এই সকল অপদার্থ, অন্যায়েকারী মানুষদের মুখোশ খুলে দিতে চেয়েছিল। তাদের এই উদ্দেশ্য পালিত সাহেবের মত মানুষেরাও জানেন। তাই অবচেতনে নিজের প্রকৃত সত্তাকে আক্রান্ত হতে দেখেন। বর্তমানের অস্থির পরিস্থিতি যে আজকের যুবকেরা শুধু তৈরি করে নি, তার দায় যে প্রতিষ্ঠিত, অহংকারী, ভোগসর্বস্ব, পেটিবুর্জোয়া মানুষদের উপরও বর্তায়, পালিত সাহেব সেই সমাজের মানুষ হিসেবে তা উপলব্ধি করেছেন। তাই বিদ্রোহী যুব সম্প্রদায়ের হাতে ছুরি থেকেও তাদের উৎসারিত ঘৃণা যে আরও তীব্র, আক্রমণাত্মক তা বুঝতে পেরেছেন।

“সেই মুহূর্তে আদিত্যর চোখের দিকে আমার নজর পড়ল। ঘৃণায় দুটি চোখ জ্বলে যাচ্ছে। এমন ঘৃণা আমি আর কখনো দেখি নি। অকৃত্রিম পৈশাচিক ঘৃণা। এই ঘৃণার যেন শেষ নেই। কত কাল ধরে জন্মে জন্মে যেন পাথরের মতন কঠিন হয়ে গিয়েছে। তার ঘাড় এবং কাঁধ কী শক্ত বেয়াড়া ঘোড়ার ঔদ্ধত্যের মতন দেখাচ্ছিল। আদিত্যর ঠোঁট খুলে দাঁত বেরিয়ে এসেছে ভীষণ নির্মম নিষ্ঠুর দেখাচ্ছে। তার চোখ থেকে আমি দৃষ্টি সরিয়ে ওর হাতের ছোরার দিকে তাকালাম। ভগবান জানেন, এই রকম এক বিপজ্জনক মুহূর্তেও আমার কেন যেন মনে হল, আদিত্যর চোখ ওর হাতের ছোরার চেয়েও অনেক বেশি ভয়ংকর ধারালো। ওর ঘৃণায় কোন দ্বিধা নেই, দুর্বলতা নেই, যেন আজন্মকাল নিজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মতন ওটা ওর রয়েছে এবং দিন দিন বেড়ে উঠেছে।”^{২২৩}

গল্পের কথক পালিত সাহেব নিঃসঙ্গ বিছানায় শুয়ে শুয়ে আদিত্যর ঘৃণার দায় নিজের উপর টেনে নিয়েছেন। কারণ তিনি জানেন আদিত্যদের ঘৃণার পিছনে যৌক্তিকতা আছে। পালিত, মুখার্জী, দত্ত গুপ্তর মত সুবিখ্যেলোভী, ঘুষখোর মানুষেরাই এই সমাজের মধ্যে ঘৃণা জীব। পালিত সাহেব তাই মনের টেনশন দূর করার জন্য, অপমান, লাঞ্ছনায় মাথা ব্যথার কারণে স্যারিডন খান। মাথা, বুকের মধ্যে অনুভব করেন ছুঁচ ফোটানোর মত অস্বস্তিকর যন্ত্রণা। নিজের বিবেকের কাছে নিজেকে উন্মুক্ত করে পাপস্থালনের চেষ্টা করেন। উচ্চমধ্যবিত্ত চাকুরিজীবী পরিবারের সুযোগসন্ধানী মানসিকতাকে এখানে দেখানোর চেষ্টা করেছেন লেখক। পালিতের স্ত্রীর গোপনে চোরাই সোনা কেনা, পালিতের মেয়ে মিনুর প্রেম করার ক্ষেত্রে উচ্চশ্রেণীতে প্রতিষ্ঠিত ছেলেকে বেছে নেওয়ার মানসিকতার মধ্য দিয়েও মধ্যবিত্ত মানসিকতার চাতুর্য ধরা পড়েছে। পালিতের হৃদয় উন্মোচনের মাধ্যমে এই গল্পটি বিশেষভাবে অন্তর্জগতের গল্প হয়ে উঠেছে। ঘুষ নেওয়া, নিজের ছেলে-মেয়েকে প্রতিষ্ঠিত করে দেওয়ার উদ্যোগ, অফিসের মিসেস বাগচীর প্রতি শারীরিক মুগ্ধতা ও গোপন সম্পর্ক, কিন্তু বাইরের জগতে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত, ব্যক্তিবান, গণ্যমান্য মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার প্রবণতা তাঁর চরিত্রকে দ্বন্দ্বময় করে তুলেছে। পালিত সাহেব উপলব্ধি করেছেন আদিত্যর মত যুবকদের এই আক্রমণের মধ্য দিয়ে তারা সার্বিক ভাবে সাফল্য পাবে না। কারণ এই সামাজিক অসুস্থতা সমাজের রক্তে রক্তে ঢুকে গেছে। মানুষের স্বার্থপর, জটিল মানসিকতার গভীর প্রত্যস্ত অঞ্চলে সেই অসুস্থতা আশ্রয় নিয়েছে। আত্মসমীক্ষার মাধ্যমেই পালিত সাহেব তা উপলব্ধি করতে পেরেছেন। নিজেকে জানার মধ্য দিয়েই তাঁর মনে লজ্জার বোধ জন্মেছে। “আমি ঠিক জানি না, কেন যেন এক বিশাল কান্না আজ আমার ছাপান বছর বয়সে এসে আমার সমস্ত

বুক ভেঙে দিল। হ্যাঁ আমি ছেলেমানুষের মতন কাঁদছিলাম।”^{২২৪} বিমল কর ‘সে’ গল্পের মধ্য দিয়ে সত্তরের উত্তাল সময়ের পরিস্থিতিগত পর্যালোচনা করেছেন এইভাবে।

‘ওরা’ (শারদীয়, ‘আনন্দবাজার পত্রিকা’, ১৯৭৩) গল্পে বিমল কর দেখিয়েছেন মাফিয়ারাজ সৃষ্টিকারী ক্ষমতালোভী, বর্বর, অমানুষ কিছু মানুষের ভীতিবোধ। গল্পের কথক প্রমথ ছাড়াও গোপীমোহন, ফুলেশ্বর, কেঁষ্টগুপ্ত— মোট চারজন মানুষ অপরাধ জগতের চারটি দলের শীর্ষ নেতা। এরা ক্ষমতা-লোভের জন্য সমাজ-বিরোধীর জন্ম দেয়। নিজেদের ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করার জন্য তাদের সাথে আপোষ করে, পুলিশের সাথে সমঝোতা করে নিজেদের জীবনকে কিছুটা নিরাপদ করার চেষ্টা করে। আবার কার্য-সিদ্ধির পর সকলকে ছোট্ট ফেলতে সময় নেয় না। এই ধরনের চার ব্যক্তি একজন সমাজ বিরোধীর খুনের পর নিজেদের নিরাপত্তা ঝুঁজতে গিয়ে প্রলোভনে পা দিয়ে বিরোধী দলের লোকেদের দ্বারা একটি অচেনা বাড়িতে বন্দী হয়ে পড়ে। আচমকা এই বন্দীদশায় দিশেহারা হয়ে প্রত্যেকে প্রত্যেককে সন্দেহ ও দোষারোপ করে। তাদের তর্ক-বিতর্ক, বাগড়া-অসন্তোষের মধ্য দিয়ে তাদের নিজেদের স্বরূপটি ক্রমশ প্রকাশিত হয়ে পড়ে। যারা অন্যের জীবনের দাম দেয় না, ক্ষমতা লাভের জন্য নির্বিকারে মানুষকে হত্যা করে, সম্পত্তি বিনষ্ট করে, তারাই সমাজ-বিরোধী পান্নার মৃত্যুর পর নিজেদের আচমকা এই বন্দীদশায় বিপন্নতা অনুভব করেছে। তাদের মৃত্যু-ভয়ে আক্রান্ত হওয়ার বিষয়টিকে অপূর্বভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন লেখক।

পান্নার মত সমাজবিরোধীরা এই অসুস্থ সমাজেরই ফসল। ‘সে’ গল্পে আদিত্য এই সমাজের সন্তান হয়ে এই সমাজের অন্যায়কারী মানুষের প্রতি ঘৃণা উদ্গিরণ করেছে। ‘ওরা’ গল্পে পান্নার মত যুবকেরা জীবনে প্রতিষ্ঠা বা সাফল্যের স্বপ্ন দেখেও বাস্তবের তীব্র অনিশ্চয়তায় ডুবে গেছে। তাদের সুকোমল মানসিকতা বিধ্বস্ত হয়ে যায় প্রমথদের মত মাফিয়া ডনদের স্বপ্ন দেখানোর অঙ্কুরাতে। স্বপ্ন—কামনাময় ভবিষ্যৎ জীবনের অপমৃত্যুতে পান্নারা ঝুঁজে নেয় অন্ধকার জগৎ। ওরা জীবন বাঁচানোর তাগিদে প্রমথদের মতো মুখোশধারী মাফিয়াদের হাতে নিজেদের সঁপে দেয়, ব্যবহৃত হয় তাদের দ্বারা। ঠিক এই পথে চলতে চলতে একদিন নিজেরাই মাফিয়াদের সৃষ্টি করে পরিচিত হয় মস্তান হিসেবে। তাই পান্নার মৃত্যুর পর তার দলের ছেলেদের দ্বারা বন্দী হয়ে নিজেদের পূর্বকৃত অন্যায়ের দায় স্বীকার করেছে ফুলেশ্বর, “মজাটা কি জানো, জামা পাঁটালে লাল হলুদ বোঝা যায়, কিন্তু গায়ের চামড়া যে একই রকম থাকে। পান্নাটা যে মর্গে পড়ে আছে, তার গায়ের কালো চামড়া দিয়ে বোঝানো যাবে না সে কবে তোমার ছিল, কবে কেঁষ্টদের, আবার

কবে প্রমথদের।”^{২২৫} তাই পান্নার মৃত্যুর পর নিজেদের বাঁচানোর জন্য পান্নার ছেলেদের কাছে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার প্রতিযোগিতায় নামলেও, নিজেদের নির্দোষ হিসেবে প্রতিপন্ন করতে চাইলেও পান্নার ছেলেদের দ্বারা বন্দী হওয়ার পর ফোনে অজ্ঞাত পরিচয় মানুষের কঠিন পরিস্থিতিতে তারা নিজেরাও চিন্তিত হয়ে পড়ে, “এরপর কী? হোয়াট নেক্সট?”^{২২৬} গল্পের কথক প্রমথ কিংবা অপর তিনজন কেউই এর উত্তর দিতে পারে নি। তাদেরই সৃষ্টি করা বিকল্প প্রশাসন এই সমাজ বিরোধীদের জন্য দিয়েছে এবং খুন করেছে, সমাজকে চূড়ান্ত অস্থিরতা, পঙ্কিলতায় টেনে নিয়ে যাওয়ার পর আর কি পদক্ষেপ নিতে পারে এই সকল মাফিয়ারা --সেই প্রশ্নই ভেসে উঠছে ফোনের অপর পাশে রহস্যময় ব্যক্তির কণ্ঠ। বন্দী দশায় আবদ্ধ হয়ে যখন প্রমথরা আতর্জনাদ করে বলে উঠছে তাদের এখানে কেন আনা হয়েছে, তখনই তাদের চমকে দিয়ে উত্তর ভেসে এসেছে বিদূষাভাষী গলায়, “কে কাকে এনেছো?”^{২২৭} এই কথার মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে প্রতিবাদমুখর অসহায় মানুষের তীব্র বিদ্বেষ ও ঘৃণা। পান্নার মত মস্তানদের যারা নিজেদের আখের গোছানোর জন্য জন্ম দিয়েছে, তারাই আজ ন্যায়ের মানদণ্ডে অদৃশ্য কাঠগড়ায় দাঁড়িয়েছে উপেক্ষিত যন্ত্রণাবিক্ষুব্ধ যুবসমাজের প্রশ্নের উত্তর দিতে। ক্রমশ যখন স্পষ্ট হয়ে উঠছে প্রমথদের ক্ষমতালোভী শাসনতন্ত্র, যতই প্রশ্নের বিরুদ্ধে মূর্ত হয়ে উঠছে নির্বাক বিহ্বলতা, আত্ম অনুশোচনার প্রক্রিয়া, ততই তাদের মধ্যে লক্ষ্য করা গেছে বৈচিত্র্য ধারক দুর্বলতা -- মৃত্যুভীতি। তারা অনুমান করেছে রণবাদের ভয়ংকরতা নিয়ে ক্রমশ এগিয়ে আসছে বিরোধীপক্ষ বিচারের মানদণ্ড নিয়ে। এই বিরোধীপক্ষ গোপীমোহন, ফুলেশ্বর, কেঁটগুপ্ত কেউই নয়, সত্ত্বের অশাস্ত, সত্যদ্রষ্টা যুবকেরা। “মনে হচ্ছিল, কোন এক অন্ধকার থেকে, দূরত্ব থেকে কারা যেন রণবাদ্য বাজাতে বাজাতে এগিয়ে আসছে। আমরা চারটি সন্ত্রাস্ত, শঙ্কিত, ভীত, মৃতপ্রায় লুপ্ত প্রবীণ এই ভয়ংকর ফাঁদে আটকে পড়ে প্রাণপণ চেষ্টা করছি শ্বাসপ্রশ্বাস নেবার। আমাদের পরমাণু ভিষ্কার কী আকৃতি!”^{২২৮}

বিমল কর তাঁর একটি সাক্ষাৎকারে ‘ওরা’ গল্প সম্পর্কে জানিয়েছিলেন, “এ-লেখার মধ্যে যদি কোনও মতবাদ আমার থেকে থাকে, তা হল মানবিক মতবাদ।”^{২২৯} সুস্থ সংস্কৃতি ও প্রাণের অপমৃত্যুতে যন্ত্রণাবিক্ষুব্ধ হয়েছিলেন লেখক। নকশাল আন্দোলনে সশস্ত্র সংগ্রাম, মানুষের মৃত্যু, সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি এবং এর সমানুপাতে চলা বিভিন্ন সময়ে যে অস্থির পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল এর পিছনে দৃশ্য ও অদৃশ্য যে কালো হাত রয়েছে মানবিক প্রয়োজনে লেখক তার রূপরেখা এই

গল্পের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছেন, এবং দেখিয়েছেন জীবনের দাবি ও প্রয়োজনীয়তা সকল মানুষের ক্ষেত্রেই সমান।

‘নিগ্রহ’ (‘দেশ’, ১৯৮১) গল্পটিতেও মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। পুলিশি নির্ধাতনের বর্বরতা এবং তার বিরুদ্ধে আকস্মিক প্রত্যাঘাত এই গল্পে প্রকাশ পেয়েছে। শাসক ও শোষিত সম্প্রদায় সমাজে একই শ্রেণীতে অবস্থান করে এবং তাদের অনুভবের জগৎটাও পৃথক নয়। তাই অপরাধী যুবক সুবোধ হালদার যেমন তদন্তকারী অফিসারের সামনে নিরুপায় হয়ে তার অতীত ও বর্তমান জীবনের কথা ব্যক্ত করে, তেমনি অফিসারও টেনশন সোয়েটিংয়ের জন্য সল্ট ট্যাবলেট খায়। আবার গল্পের শেষে সুবোধের আকস্মিক লাথি খাওয়ার পর তারও মনে হয় সুবোধের কাটা কড়ে আঙুলের ব্যথার মত গোপন ব্যথায় সেও জর্জরিত। তবুও গল্পটির মধ্যে ফুটে উঠেছে অপরাধী যুবকের প্রতি পুলিশি তদন্তের নগ্ন-রূপ, যা সময়ের দিক থেকে সত্তর দশকে চিহ্নিত করে দেয়।

‘সে’ গল্পের আদিত্য উচ্চপদাধিকারী ঘৃণ্য মানুষের প্রতি আক্রমণ প্রদর্শন করেছিল; স্বপ্ন-বাস্তবে মেশামেশি এই কাহিনীতে আদিত্যের ব্যক্তিগত জীবন ও আকাঙ্ক্ষা রূপ পেয়েছে। ‘নিগ্রহ’ গল্পে উন্মুক্ত হয়েছে নিম্নবিত্ত সমাজ-পরিবারের নগ্ন রূপ, হতাশা, যন্ত্রণা, বিপন্নতাবোধে আক্রান্ত একটি যুবকের আত্মচরিত। সুবোধের বক্তব্য পরিবেশনে ফুটে উঠেছে তার পারিবারিক বিপন্ন জীবনের কথা। আর্থিক সংকটে মানুষের মূল্যবোধ কেমন করে ক্ষয়িষ্ণু হয়ে ওঠে, পাপ-পঙ্খিলতার পথে তাদের কেমনভাবে টেনে নিয়ে যায়, তা সুবোধ ব্যক্ত করেছে। ছয় জনের সংসারে বাবা মা একঘরে থাকত, অপর ঘরে বিধবা পিসি, ভাই, বোন ও সুবোধকে থাকতে হত। সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত ঝগড়া হত মা ও বাবার, তার পর বাবা কাজে বেরিয়ে যেত। রাতে ফিরত দেশি মদ খেয়ে, এবং আবার শুরু হত বর্বরতা। ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে তার বাবা প্রস্রাব করত। বাবা-মায়ের মধ্যে শুরু হত মারামারি, এই নগ্ন অসুস্থতা তাদের পরিবারের নিত্যসঙ্গী ছিল। “জন্তু-জানোয়ার, রাস্তার কুকুর, ফুটপাথের বাচ্চাকাচ্চাও বড় হয়। তারা কি খেয়ে বড় হয়, কেমন করে বড় হয়—সে সব আপনারা ভেবে দেখবেন। আমরাও বড় হয়ে উঠছি গাদাগাদি করে, মাটিতে শুয়ে, উকুনভরা ছেঁড়া তোষকের ওপর ঘুমিয়ে।”^{২০০} —সুবোধের এই জীবনকাহিনীর মধ্য দিয়ে উন্মুক্ত হয়েছে নিম্নবিত্ত মানুষের বেঁচে থাকার যান্ত্রিকতা, সমাজের কদর্য অসাম্যের রূপ। তবুও সুবোধের মত যুবকেরা সুস্থ জীবনের অন্বেষণ করেছিল। স্কুলের শেষ ক্লাস পর্যন্ত পড়াশোনা করে, গায়ে

গতরে পরিশ্রম করে বাঁচতে চেয়েছিল। কিন্তু বেকারত্ব, কাজের যথেষ্ট সুযোগ না থাকা, ব্যবসার পুঁজি গুণ্ডাদের দ্বারা লুণ্ঠ হওয়ায় অবশেষে প্রাণের তাগিদেই অন্যায়-পথ অবলম্বন করেছিল সে। সুবোধের পিসি গোকুল ডাক্তারের বাড়িতে রান্নার কাজ করতে গিয়ে সেখানেই থেকে গিয়েছিল। নিজের নিরাপত্তার জন্য বৈধব্যের পরও নতুন সংসারে আবদ্ধ হয়েছিল। বোন বেলা মায়ের সাথে ঝগড়া মারামারি করে নিজের পছন্দ-অপছন্দকে ব্যক্ত করতে চেয়েছিল, নিজের জীবনীশক্তিকে প্রকাশ করতে চেয়েছিল। একদিন সে গোপনে একটি ছেলেকে বিয়ে করেছিল, কিন্তু কয়েকদিন পর চুরির দায়ে সেই ছেলোটিকে মার খেয়ে হাসপাতালে মারা গেল। বেলা ধূপ-আচার প্রভৃতি ফেরি করে নিজের অস্তিত্বকে বাঁচাতে চেয়েছিল। সুযোগ সন্ধানী হয়ে অপর ছেলের সাথে অবৈধ সংসর্গে লিপ্ত হওয়ার মাধ্যমে। এ সমস্ত সহ্য করতে পারেনি সুবোধ, অল্প তুলে নিয়েছিল এর প্রতিকার করার জন্য। ব্যবসার টাকা লুণ্ঠ হওয়ার পর সে বুঝতে পেরেছিল ‘শয়তানদের সঙ্গে লড়াই হলে শয়তান হতে হয়।’^{২৩১} আত্মপীড়নের মধ্য দিয়ে এই পথ অবলম্বন করলেও সে জানে সে এই পথের শিকার। এই পথে আসার জন্য দায়ী এই সমাজ। কিন্তু সমাজের মুখোশধারী সেই নিয়ন্ত্রক শক্তির প্রতিভূরা তা স্বীকার করে না। নিজেদের প্রয়োজন নিজেরাই গড়ে তোলে তাদের পছন্দের সমাজ এবং পিছিয়ে পড়া মানুষদের প্রতি ঝুঁড়ে দেয় ঘৃণার আক্রোশ। সমাজের উচ্চশ্রেণীর মানুষের অবহেলা, শ্রেণীশত্রুদের মুহূর্মুহু বিপদের মুখে ঠেলে দেওয়ার প্রবণতার মধ্য থেকে প্রতিবাদ গর্জিত হয় উপেক্ষিত এই যুবসম্প্রদায়ের দ্বারা, তারা অনেক সময় হঠকারী সিদ্ধান্ত নিয়ে আকস্মিকভাবে আক্রমণ করে ফেলে। “ঘটনা যখন ঘটে যায় তখনই সেটা সকলে জানতে পারে। কিন্তু এর পেছনে কত কষ্ট, কত যন্ত্রণা কত অশ্রু লুকিয়ে থাকে তখন সেটা জানা যায় না... আর সেই অশ্রু বেদনার ইতিহাসই হল সাতের দশকের ইতিহাসের মৌলিক উপাদান।”^{২৩২} ‘ওরা’ গল্পে মস্তান সৃষ্টিকারী চার মাফিয়াকে বন্দী করেছিল তাদেরই সৃষ্ট মস্তানরাজ। কিন্তু নিগ্রহ গল্পে সুবোধ বিদ্রূপ করেছে এই সমাজের তথাকথিত ভদ্রলোকদের। “এক হাতে তালি বাজে না স্যার জানি। আমাদের দোষ আছে। কুকুরের দোষ। আর আপনাদের শুধু গুণ ...।”^{২৩৩} --এই বক্তব্যের পরই সজোরে লাথি মারে সে তদন্তকারী অফিসারকে। পিছোতে পিছোতে যখন দেওয়ালে তার পিঠ ঠেকে গেছে। পুলিশি নিগ্রহকে যখন সে আর এড়াতে পারেনি তখনই তার মধ্য থেকে এইভাবে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে। সুবোধ লক্ষ্য করেছে তার যা বক্তব্য সব কিছুই পুলিশের কাছে ফাইল বন্দী হয়ে আগে থেকেই রক্ষিত আছে। তাদের সকল নথি সমাজের এই প্রশাসক মহল যে আগে থেকে

সংগ্রহ করে রাখে, রাজনৈতিক বন্দীর অভিযায় আখ্যায়িত করে গোপনে তাদের উপরে অত্যাচার চালায়, আসলে তারই দলিল ‘নিগ্রহ’ গল্পটি।

এই গল্পের তদন্তকারী অফিসার সুবোধের প্রতি সমবেদনা জানালেও তার কর্তব্য-কর্মের কারণে নিরুপায়ভাবে তদন্ত করেছে। সুবোধের মুখ থেকে সত্য ঘটনা জানার জন্য ডিটেক্টার, ইলেকট্রনিক্যালি অপারেটেড এক রকম টর্চ যা থেকে ইনফ্রারেড রে বেরোয় তা সঙ্গে করে রেখেছে। সার্কাসে শ্বাপদ-জন্তুদের সাথে খেলা দেখানোর সময় যেমন রিংমাস্টার ইলেকট্রিক চাবুক হাতে করে রাখে, এখানেও তেমনি অফিসার ডিটেক্টার হাতে করে রেখেছে। শুধু তাই নয় চায়ের সাথে অম্ল মিশিয়ে তাকে অবসন্ন করার চেষ্টা করেছে, কিন্তু এগুলি সবই অভ্যাসবশত ও নিয়ম-মাফিক। সুবোধের সঙ্গে গল্প করার ছলে নিজের পোশাককেও বিদূষ করার চেষ্টা করেছে অফিসার। নিজের মেয়ের জন্য আই. পি. এস পাত্রকেও সে বাতিল করেছে, কারণ, “হাজার ভাল হোক, অনেক হোক – পুলিশ পুলিশ, দেয়ার ইজ সাম্ ডার্ট অন্ দেম ইউ ক্যান নেভার ওয়াইপ আউট।”^{২৩৪} এই বক্তব্যের মাধ্যমে তদন্তকারী অফিসারের মুখ দিয়েও তৎকালীন সাধারণ মানুষের মনে পুলিশের প্রতি মনোভাবকে পরিবেশন করেছেন। নকশাল আন্দোলনের জেরে পুলিশি নির্যাতনের শিকার হয় হাজার হাজার যুবক যুবতী, তাদের মৃত্যুর কাহিনীকে গোপন করার চেষ্টা করে প্রশাসন বহু সময়ই। জয়া মিত্রের ‘হন্যমান’ গ্রন্থটি এই সময়ের দলিল। তিনিও তৎকালীন পুলিশি বর্বরতাকে প্রকাশ করেছিলেন। যাই হোক নিগ্রহ গল্পের তদন্তকারী অফিসার তার কর্তব্যের কারণে রূঢ়তা দেখালেও অনুভব করেছে সুবোধের জীবন যন্ত্রণাকে। তাই সুবোধের আকস্মিক লাথির পরমুহূর্তে আক্রমণ শানায়নি। সে বলতে চেয়েছে, “রুমাল বার করে নাক-মুখ চাপতে চাপতে আমি মাথা নাড়লাম। আন্তো! বলতে চাইলাম, জানি; আমারও হয়। সুবোধ বুঝল কিনা কে জানে।”^{২৩৫} --এই মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে লেখক গল্পটিকে শেষ করেছেন। গল্পটিতে মুখ্য হয়ে উঠেছে পুলিশি নিগ্রহের পাশাপাশি সুবোধ ও তদন্তকারী অফিসার দুজনেরই আত্মনিগ্রহের অব্যক্ত কথা। সিস্টেমের কাছে দাসত্ব স্বীকারকারী সমাজের সকল শ্রেণীর সংবেদনশীল মানুষই তার পরিস্থিতি থেকে সুস্থ-স্বাভাবিক-মহত্তর জীবনের দিকে এগিয়ে যেতে চেয়েছে, কিন্তু সেই পথে ব্যর্থতা আসায় বেছে নিয়েছে নিগ্রহের পথ। এই দিক থেকে গল্পটি বহুমাত্রিক।

‘মাছি’ (শারদীয় ‘দেশ’, ১৯৭২) গল্পটিতে প্রতিফলিত হয়েছে রোগ ও মৃত্যু সম্পর্কে ভয় এবং সেই সূত্রে চিত্তবিকারের ছবি। স্বপ্ন ও বাস্তবে মেশা গল্পটির কাহিনীতে গল্পের কথক বাহ্যিক পারিবেশে মৃত্যুর ভয়াবহতায় আক্রান্ত হয়েছে। ‘উদ্বেগ’ গল্পে দেখা গিয়েছিল শহরে নতুন ধরনের রোগের প্রভাব, যার পেছনে ছিল জীবাণু সংক্রমণের কারণ। ‘মাছি’ গল্পে রোগের কারণ মাছি—নতুন ধরনের মাছি। এই মাছির কামড়ে শহরে প্রায় মড়ক লাগার মত অবস্থা। গল্পের কথক এই মাছি থেকে দূরে থাকতে চেয়েছে। কিন্তু ঘুমের ওষুধের প্রভাবে এবং মনের অবচেতনে মাছি সংক্রান্ত ভয়ের কারণে সেই মাছি স্বপ্নের জগৎকেও গ্রাস করেছে। শুধু তাই নয়, মাছি সংক্রান্ত ম্যানিয়ায় ঘুমের মধ্যেও মুখের সামনে মাছির অস্তিত্ব কল্পনা করে ইতস্তত হাত নাড়তে দেখা গেছে গল্পের কথককে।

বিমল করের গল্পে অসুস্থতা ও মৃত্যু সংক্রান্ত ভয় বার বার নানাভাবে ঘুরে ফিরে এসেছে। ‘মাছি’ গল্পে কথকের আচরণ কিছু কিছু ক্ষেত্রে হাস্যকর মনে হলেও, কিংবা তার মানসিক বিকার বাড়াবাড়ি রকমের অস্বস্তিকর মনে হলেও, রোগ ও মৃত্যুর বিরুদ্ধে মানুষের একক লড়াইয়ের প্রবণতা বিশেষ মাত্রা পেয়ে যায়। জাগতিক জীবনের স্বাদ আহ্লাদ রোগ ও মৃত্যুর কারণে হঠাৎই স্তব্ধ হয়ে যায়। তাই বেঁচে থাকার অদ্যম প্রচেষ্টায় জীবন যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েও মৃত্যুভয়ে কাতরতা দেখা যায় এই সকল সাধারণ মানুষের মধ্যে। অনুমান করা যায় ঘুমের অষুধের মাত্রাতিরিক্ত প্রয়োগে নানা রকম শারীরিক অস্বস্তি এসেছে গল্পের কথকের। গা গোলালো, বমি হওয়া তারই উপসর্গ। কিন্তু শহরের মাছি-বাহিত রোগের সংক্রমণের প্রতি ভয় অবচেতন মনে বৈকল্য সৃষ্টি করেছে। তন্দ্রাজড়িত অবস্থায় স্বপ্নের মধ্যে তাই মাছির বিরুদ্ধে নিজেকে সংগ্রামরত দেখে গল্পের কথক। তার এই সংগ্রামে সে একাকী, নিঃসঙ্গ। নিজের স্ত্রী দেবকীকেও সে পাশে পায় না। আবার সে কল্পনা করে তার অসুস্থতার সময় তার ডাক্তার বন্ধু মানিক ও স্ত্রী দেবকীর চোখে তার প্রতি চক্রান্তের অব্যক্ত সমর্থন।

একদিকে মৃত্যুভয় অপর দিকে দাম্পত্য সম্পর্কের স্থলন এই দ্বিমুখী টানাপোড়েনে অস্থির হয়েছে গল্পের কথক চরিত্রটি। স্ত্রীর শরীরের প্রতি আগ্রহ ও উন্মাদনা চরিত্রটির মধ্যে দেখা গেছে স্বাভাবিকভাবে কিন্তু স্বপ্নের মধ্যেও নিজের স্ত্রী ও বন্ধু মানিকের মধ্যে চোখাচুখি দেখে মনের সংগোপনে সে পোষণ করেছে সন্দেহপ্রবণতা। এখান থেকেই তার মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে মানসিক দুর্বলতা ও অসুস্থতার লক্ষণ। আধুনিক জীবনের ছবি আঁকতে গিয়ে লেখক চরিত্রের মধ্যে এই

সন্দেহ প্রবণতার বীজ ছড়িয়েছেন, --যা সম্পূর্ণ বাস্তবতা বর্জিত নয়। অবৈধ প্রেম, দাম্পত্য সম্পর্কের পতন আধুনিক সাহিত্যে বহুল প্রচলিত। তবুও এর সংস্পর্শ থেকে নিজের সাহিত্যকে প্রায়শই বাঁচানোর চেষ্টা করেছেন লেখক। ‘শীতের মাঠ’ গল্পে নবেন্দুর মনেও এই সন্দেহ দানা বেঁধেছিল, কিন্তু শেষকালে সে বিশ্বাসের ভিত্তিভূমিতে ফিরে এসেছিল। ‘মাছি’ গল্পেও গল্পের কথক বেঁচে ওঠার প্রত্যাশা করেছে, “চোখ বুজে অনুভব করার চেষ্টা করছিলাম, আমার শরীরের রক্তে অযুধটা কাজ করতে শুরু করেছে কি না।”^{২৩৩}

এই গল্পে মাছি একটি উপলক্ষ মাত্র, এর পিছনে রয়েছে অসহায় মানুষের মৃত্যুভয় ও নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দেহপ্রবণতা। আধুনিক মনের দ্বন্দ্বমূলকতাও বিশেষ রূপ পেয়েছে এই গল্পে। নিজের অসুস্থতায় নিজের স্ত্রী সম্পর্কে সন্দেহপ্রবণতা চরিত্রটির চিন্তকে ভারাক্রান্ত ও অসহায় করে তুলেছে। এই কারণেই সামান্য মাছির পিছনেই তাকে অনেক বেশি আক্রমণাত্মক হয়ে উঠতে দেখা গেছে। আধুনিক সমাজ ও পারিবারিক জীবনে জটিল পরিস্থিতিতে মানুষ নিরন্তর যুদ্ধ করতে করতে হাঁপিয়ে উঠেছে। সে সর্বদা কামনা করে নিজের সুস্থতা ও স্বাচ্ছন্দ্য। অপরকে সন্দেহ ও হিংসা করেও যখন সে নিজের মনোমত পথের অন্তিম বার্থ হয়, তখন পরিবর্তিত পরিস্থিতির কাছে নিজেকে সঁপে দিয়ে মানসিকভাবে চায় সুস্থজীবনে ফিরে আসতে। এই গল্পের চরিত্রটির মধ্যেও সেই প্রবণতা দেখা গেছে।

‘সুখ’ (‘দেশ’, ১৯৭৫) গল্পে বিমল কর দাম্পত্য জীবনের ছবিকে স্বচ্ছভাবে ফুটিয়ে তুললেন দুই অসমবয়সী দম্পতির ভূমিকার তুলনামূলক উপস্থাপনার মধ্য দিয়ে। বরদাকান্ত ও সুবর্ণ বৃদ্ধ-দম্পতি এবং শুভেন-মীনা অল্প বয়সী দম্পতি। শুভেন ও মীনা নিম্নমধ্যবিত্ত জীবনে অভ্যস্ত। চাকরির ঝামেলা কাটিয়ে, কলকাতার দমবন্ধ করা প্রায় বস্তি পরিবেশের একচিলতে নোংরা আবাস থেকে বেরিয়ে বিহারের এক মালভূমি অঞ্চলে কয়েক দিনের জন্য বউ মীনাকে বেড়াতে নিয়ে এসেছে শুভেন। সে ভেবেছিল প্রকৃতির অপার সান্নিধ্যে জমে উঠবে তাদের ‘পারসোন্যাল অ্যান্ড প্রাইভেট লাইফ’। কিন্তু দ্বিতীয় দিনই ওরা আবিষ্কার করেছিল তাদের বাথলোয় আর এক বৃদ্ধ দম্পতি রয়েছেন। শুভেন ক্ষুব্ধ হয়ে সতর্ক ভাবে তাদের উপেক্ষা দেখাতে গিয়েও পারেনি। নিজের ব্যবহারে লজ্জিত হয়ে মীনাকে নিয়েই আলাপ জমাতে গিয়েছিল বরদাকান্ত ও সুবর্ণের ঘরে। বৃদ্ধ মানুষ সম্পর্কে শুভেনের যে একপ্রকার বিরক্তি ও উপেক্ষার মনোভাব ছিল, বরদাকান্তের সান্নিধ্যে এসে তা ক্রমশ ঘুচে যেতে লাগল। প্রায় দৃষ্টি শক্তিহীন, অসুস্থ বৃদ্ধা স্ত্রীর প্রতি

বরদাকান্ত'র সময়ানুযায়ী যত্নশীল কর্তব্যের ধারাবাহিকতা দেখে এবং তার মাধ্যমে আত্মতৃপ্ত মানসিকতা লক্ষ্য করে শুভেন আশ্চর্য হয়ে গেল। মীনা ও মুন্স হয়ে গেল স্বামীর প্রতি সুবর্ণর অপারিসীম ভালবাসা লক্ষ্য করে। যে ভালবাসার মধ্য দিয়ে দৃষ্টিশক্তির পরোয়া না করে সুবর্ণ তার স্বামীর জন্য অপারিসীম সোহাগে উলের টুপি বানিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছে। অনিবার্য মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত বৃদ্ধ দম্পতির পারস্পরিক নির্ভরতা ও অনাবিল ভালোবাসার একনিষ্ঠতা উপলব্ধি করে শুভেন ও মীনার বুকের গভীরে বিষাদ ও অব্যক্ত বেদনা পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছিল। ঘরে ফিরেও এই নব-দম্পতি প্রতিদিনের মত প্রেমে ও কামনায় একাগ্রতা দেখাতে পারল না। সুর কেটে যাওয়া শারীরিক মিলনের মধ্যে মীনার একটি প্রশ্ন শুভেনকে আলোড়িত, বিধ্বস্ত করে তুলল, “একদিন--আমি যখন বুড়ি হয়ে যাব... তখনও তুমি আমায় অমন করে ভালোবাসবে?”^{২৩৭} শুভেন এর ইতিবাচক উত্তর দিতে চেয়েও দিতে পারে নি। ‘স্ত্রীর পাশে গড়িয়ে নেমে পড়ল শুভেন। বালিশে মুখ গুঁজল। সারা জীবন ধরে এত ভালবাসা বয়ে নিয়ে যাবার সাধ্য কি তার আছে?’^{২৩৮}

লেখক বিমল কর, শুভেনের চিন্তার শেষে প্রশ্নচিহ্ন উত্থাপিত করেছেন। এই প্রশ্নই আধুনিক প্রেম-সম্পর্কের প্রকৃত দিকচিহ্নকে নির্দিষ্ট করেছে। লেখক শুভেন ও মীনার যে চরিত্র গল্পের প্রথমে অঙ্কন করেছিলেন সমাপ্তিতে এসে তাদের মধ্যে ভাবনাগত, উপলব্ধিগত কিছু পরিবর্তন এসেছে। এই পরিবর্তনের পিছনে রয়েছে বরদাকান্ত ও সুবর্ণর দাম্পত্য প্রেম। স্ত্রী মীনার প্রতি শুভেনের প্রাথমিক আকর্ষণ শারীরিক, যৌবনের কামনার সাপেক্ষে, তাই পারিবারিক জীবন থেকে দূরে একান্তে মীনাকে পাওয়ার জন্য সে তাকে বেড়াতে নিয়ে এসেছে। লেখক তাদের আচরণের মধ্যে সেই কামনার উত্তাপকে ফুটিয়ে তুলেছেন। কিন্তু বরদাকান্তর আচরণ লক্ষ্য করার পর শুভেনের মনে হয়েছে দৈহিক ভালোবাসাটাই শেষ কথা নয়। কর্তব্যবোধের অঙ্গীকারে এই দাম্পত্য সম্পর্ক নিগূঢ়ভাবে বাঁধা। শারীরিক উত্তাপ ছাড়াও সেই ব্রত পালন করা দুর্বল চরিত্রের পক্ষে সম্ভব নয়। বরদাকান্ত যেমনভাবে তার অচল মানুষটির উপস্থিতিতে নিজেকে সচল রেখেছিলেন, সেই একই গতানুগতিকতায় শুভেনও কল্পনা করতে পারত এগিয়ে যাবো। কিন্তু লেখক এখানেই শুভেনের মধ্য দিয়ে নিঃসঙ্গ, অসুস্থ, মানসিক শক্তিহীন, শাস্ত্রত প্রেম সম্পর্কে আত্মহীন মানুষের ছবিকে প্রকট করে তুললেন। যার বর্তমান ভালোবাসার আকাঙ্ক্ষা জড়িয়ে রয়েছে স্ত্রীর যৌবনদীপ্ত শরীরকে ঘিরে। শারীরিক ভালোবাসার পরও যে দাম্পত্য প্রেমকে বার্ষিক্য পর্যন্ত প্রবাহিত করা যায়

বিশ্বাস ও সত্যতার সাবলীলতায় সেই রসদ মানুষ পেতে পারে প্রেমে একাগ্রতা, সাহায্যের নিষ্ঠায়, হৃদয়ের মাধুর্যে। আধুনিক দম্পতি শুভেন আত্মসুখের প্রাবল্যে সেই ধ্রুব সত্যের প্রতি তার দূরদৃষ্টিকে পৌঁছে দিতে পারেনি। পাশাপাশি মীনারও মনে হয়েছে বরদাকান্তের প্রতি সুবর্ণের যে ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও ভালোবাসা রয়েছে তার কোন তুলনা হয় না। তার কথায়, “এত ভালোবাসা—আমি আর দেখিনি। একজন যদি আগে যায়—অন্যজনের কী হবে বলতে পার?”^{২৩৯} —এর পরই শুভেন মনশ্চক্ষে সুবর্ণের শেষ যাত্রা দেখেছে— বরদাকান্ত খাটের দিকে তাকিয়ে একা একা চলেছেন। এই একাকিত্বকে ভয় পেয়েছে শুভেন। দীর্ঘ দিনের এই ভালোবাসা মৃত্যুর মাধ্যমে বিছিন্ন হয়ে গেছে— তবুও আন্তরিকতা থেকে গেছে— সেই চিরন্তন ভালোবাসার মত ধ্যানস্থ মহিমা ও একাগ্রতা সঞ্চারী দৃঢ় ব্যক্তিত্ব শুভেনের নেই।

বিমল কর এই গল্পে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে যে দৈহিক মিলনের সম্বন্ধসূত্র অঙ্কন করেছেন তা অস্বাভাবিকভাবে মনকে পীড়িত করেনি। শারীরিক মিলনের ছবির মধ্য দিয়েই তিনি শরীরকে অতিক্রম করে গেছেন। বর্ণনার পুঙ্খানুপুঙ্খতা আছে বলেই দেহ অতিক্রমী ভালোবাসার বর্ণনা এত বেশি বাস্তব ও মর্মস্পর্শী হতে পেরেছে। গল্পটির মধ্য দিয়ে বিমল কর দাম্পত্য প্রেমের প্রতি তাঁর নিষ্ঠা ও অনুরাগ দেখিয়েছেন। শাস্বত প্রেমের প্রতি তাঁর মানসিক দুর্বলতা বরদাকান্ত ও সুবর্ণের ছবির মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। লেখকের প্রেমচেতনায় এই গল্পটির যথার্থ গুরুত্ব আছে।

‘আয়োজন’ (শারদীয় ‘আনন্দবাজার পত্রিকা’, ১৯৭৫) গল্পটি দাম্পত্য সম্পর্কের গল্প। প্রৌঢ়ত্বে আসীন পশুপতির ও মনোবীণার মধ্যে নিবিড় ভালোবাসা ও সহযোগিতার সম্পর্ক দেখিয়েছেন লেখক। গল্পটির কাহিনীতে মনোবীণার উদ্যোগে শারীরিক মিলনের আয়োজন চলেছে। দীর্ঘ এই আয়োজনের প্রায় শেষ লগ্নে পৌঁছে আকস্মিকভাবে স্বামীর দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত মনোবীণার হৃদয়ে মাতৃত্বের প্রতি আকাঙ্ক্ষা ও তার মর্মান্তিক বিষাদ উপলব্ধ হয়েছে। কাহিনীর শেষাংশে স্বামীর মাধ্যমে তীর্থক অচরিতার্থ বাৎসল্যের স্বাদ তার মানসিকতায় সান্ত্বনার প্রতিশ্রুতি নিয়ে এসেছে।

‘আয়োজন’ গল্পটিতে লেখক যে শরীরী বর্ণনা দিয়েছেন, কিংবা শারীরিক মিলনের যে আগ্রহোদ্দীপক বর্ণনা দিয়েছেন তা তাঁর সাহিত্যে সাধারণত পাওয়া যায়নি। শরীরী বর্ণনা থেকে তিনি মূলত কিছুটা দূরে অবস্থান করেছিলেন। এই গল্পে সেই আয়োজনের পিছনে বাণিজ্যিক পত্রিকার দাবি থাকতে পারে বলে মনে হয় না। কারণ গল্পটির কাহিনীতে লক্ষ্য করা যায়

মনোবীণা স্বজন-পরিজনহীন সংসারের গৃহবধূ। স্বামী ছাড়া তার এই সংসারে আর কেউ নেই। এই একাকিত্ব তার কাছে খুবই যন্ত্রণাদায়ক। এছাড়া সন্তানের জন্মদান নারীর জীবনে পরম প্রাপ্তি বলে মনে হলেও মনোবীণা সেখানেও বঞ্চিত। বিয়ের তিন বছরে সে একবার সন্তান সম্ভবা হয়েছিল, কিন্তু সিঁড়িতে পড়ে গিয়ে তা নষ্ট হয়ে যায়। তার পর থেকে অনেক ডাক্তার-কবিরাজ মাদুলি-কবচ করেও আর সাধ মেটেনি। তবু এই পৌঁছতে পৌঁছেও মাঝে মাঝে তার স্বতুচ্ছের অনিয়মে সে কল্পনা করে সেই আকাঙ্ক্ষিত সম্ভাবনার, কিন্তু কয়েকদিন পরই তার অশ্রু ও বেদনার মাধ্যমে সকল আকাঙ্ক্ষার পরিসমাপ্তি ঘটে। ‘আয়োজন’ গল্পে মনোবীণা তার স্বামীকে উত্তেজিত করতে চেয়েছে মদ ও মাংস খাইয়ে। পশুপতির সামনে কাপড় ছাড়ার অছিলা করে শরীর প্রদর্শনের মাধ্যমে ও উগ্র সাজসজ্জা করে তার মনে কামনার সঞ্চার করেছে। কিন্তু সমস্ত আয়োজন তার নষ্ট হয়ে যায়, সন্তান কামনায় কোমরে বাঁধা ঔষধি-টা শারীরিক মিলনের সময় দেখতে পেয়ে ক্ষোভে বিরক্তিতে উগ্র হয়ে উঠেছে পশুপতি। ঠেলা দিয়ে, লাথি মেরে বিছানা থেকে দূর করে দিয়েছে স্ত্রী মনোবীণাকে। বৃষ্টির ছাঁটের মধ্যে বারান্দায় দাঁড়িয়ে সিঁড়ির সেই ধাপগুলোর দিকে তাকিয়ে নিজের নষ্ট হয়ে যাওয়া, অপূর্ণাঙ্গ ভূণটির প্রতি মায়া ও বাৎসল্য অনুভব করেছে সে। তার মনে হয়েছে, ‘পশুপতি তার মধ্যকার মানুষ নয়, সে তার সৃষ্টি নয়, পশুপতিকে সে বাইরে থেকে পেয়েছিল। এমন করে গোপনে অন্ধকারে প্রতি মুহূর্তে সৃষ্টি করার জন্যে কাতর হয় নি।’^{২৪০} সন্তানকামী এক নারীর আকাঙ্ক্ষার তীব্রতা এখানেই দীর্ঘ শারীরিক মিলনের আয়োজনের কৃত্রিমতাকে ছাপিয়ে যায়। শরীরী বর্ণনার উত্তেজনা কিংবা শীল-অশীল সংক্রান্ত প্রশ্ন এখানে গুরুত্বহীন হয়ে যায়। নিষ্ঠুর, বিষাদগ্রস্ত অনুভূতি মনোবীণাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। পশুপতি সন্তানের অভাব তার স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসার মাধ্যমে ঘুচিয়ে দিতে পারে। তার কথায়, “আমি ভাই স্পষ্ট বলছি, আমি বউ হারাতে রাজি নই, ছেলেপুলে শালা চুলোয় যাক, আই ডেন্ট কেয়ার।”^{২৪১} --কিন্তু মনোবীণা একজন নারী। তার একাকিত্ব শুধুমাত্র স্বামীর সাহচর্যে ঘুচে যায় না। সে জানে এই বয়সে সন্তান-সম্ভাবনা অস্বাভাবিক। কিন্তু তা তার কাছে আকাঙ্ক্ষিত, এবং তাই সন্ন্যাসী প্রদত্ত শিকড় কোমরে বেঁধে সঠিক লগ্নে স্বামী-সহবাস কামনা করেছে। খিয়েটারের নগ্ন নাচে পশুপতির আগ্রহ সে দেখেছে, নারী হিসেবে সে মনে করেছে স্বামীকে সঠিকভাবে সংসারের প্রতি মনযোগী করার উপাদান চাই; সেই উপাদান তার কাছে একটি শিশু। পশুপতির কথায়, “আমরা খুব হ্যাপি। আজকাল স্বামী-স্ত্রীরা খুব কম হ্যাপি হয়। শুনি তো বন্ধু বান্ধবের কাছে। সব সময় গজগজ

করছে। আমরা কিন্তু সুখী। কল্যাণরা বলে, পশুপতিদা তুমি স্ত্রৈণ। আমি বলি, ইডিয়েট, তোরা তো বউকে শুধু ইউটাইলাইজ করিস ভালবাসিস না। আমি ভালবাসি। বউ ছাড়া আমার কেউ নেই।”^{২৪২} শেষোক্ত বাক্যে সেই শূন্যতার ইঙ্গিত রয়েছে। আবার পশুপতি মনোবীণার সন্তান আকাঙ্ক্ষার অস্বাভাবিকত্বে বিরক্তিবোধ করেছে। সে অপমানিত বোধ করেছে তাকে লুকিয়ে মনোবীণার এই সন্তান প্রত্যাশার কারণে। তার মনে হয়েছে মনোবীণার মনে তার প্রতি দুর্বলতা নেই, ভালোবাসা নেই, আছে ছলনা, প্রতারণা। সে বুঝতে চায়নি মনোবীণার নিঃসঙ্গতার গভীরতা। দেহগত কামনার চূড়ান্ত প্রাপ্তিতে সে সুখী হলেও, মনোবীণা হতে পারে না।

ঘুম ভাঙার পর মনোবীণা তার বুকের তলায় নিদ্রিত স্বামীর মুখে শিশুর সরলতা উপলব্ধি করে তার অচরিতার্থ বাৎসল্যে উন্মুখ হয়ে ওঠে। তার নারীমনের সুপ্ত সন্তানবাসনা ও অনুরাগে কোন পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয় না।

বিমল কর পশুপতি ও মনোবীণার যে দাম্পত্যের ছবি গল্পের শুরুতে দিয়েছিলেন তা পরিবর্তিত হয়ে গেছে তাদের অনুভব ও অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্যে। তাই গল্পের শেষে ভিন্ন মানসিকতার অধিকারী হয়ে উঠতে দেখা যায় চরিত্রগুলিকে। দাম্পত্য প্রেমের নিবিড়তা নষ্ট না হয়ে গেলেও চরিত্রের খানিক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় চরিত্রগুলির সময় ও অভিজ্ঞতার পরিবর্তনের মাধ্যমে।

‘হেমাঙ্গের ঘরবাড়ি’ (শারদীয় ‘আনন্দবাজার পত্রিকা’, ১৯৭৭) গল্পটিতে রোগগ্রস্ত হেমাঙ্গের নিঃসঙ্গতা, অসহায়তা, মানসিক অস্থিরতা এবং অবশেষে তার আত্মহত্যার ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন লেখক। বিমল করের গল্পে অসুস্থতার প্রসঙ্গ, রোগাক্রান্ত হওয়ার ঘটনা নতুন বিষয় নয়। কিন্তু সে সব ক্ষেত্রে রোগাক্রান্ত মানুষকে পরিত্যাগ করার প্রসঙ্গ আসেনি। কিন্তু হেমাঙ্গ শ্রেণী রোগে আক্রান্ত হওয়ার পর নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ল। নিজের স্ত্রী চিকিৎসার জন্য তাকে কলকাতায় পাঠিয়ে অপর পুরুষের সাথে গৃহত্যাগিনী হল। যে অফিসে সে চাকরি করত সেখান থেকে তাকে বদলি করে দেওয়া হল দূরে খুব ছোট একটি অফিসে। পাড়া-প্রতিবেশীরাও তার সংস্পর্শ থেকে দূরে থাকতে চাইল; আর হেমাঙ্গও নিজেকে হতাশায়, যন্ত্রণায় ক্রমশ বাড়ি ও অফিসের সীমাবদ্ধতায় গুটিয়ে ফেলল। নিঃসঙ্গ জীবনে তার সঙ্গী ছিল একটি খোঁড়া কাজের মেয়ে— বিমলি, আর একটি দেশি কুকুর— নেড়ি। সারা সপ্তাহের অফিস ও বাইরের টুকিটাকি কাজকর্মের পর রবিবারটা সম্পূর্ণভাবে বাড়ির কাজে হাত দিত হেমাঙ্গ। ঘর দোর ঝাড় ঝোড় করা, সাইকেল মোছা, কাচাকাচি, নেড়িকে

স্মান করানো, বিকেলে দেশি মদ কিনে এনে সন্ধ্যায় ঘরে গ্রামোফোন বাজাত বা এস্রাজ বাজাত আর মদ্যপান করত আকর্ষণ। নিঃসঙ্গ এই জীবনে প্রথম দিকে খুব কষ্ট হলেও ক্রমে সে সব সয়ে নিয়েছিল।

এমনি একটি রবিবারে ফিরে এল হেমাস্দের দশবছর আগে তাকে পরিত্যাগ করে চলে যাওয়া স্ত্রী--পায়রা। সঙ্গে একটি নয়-দশ বছরের মেয়ে। হেমাস্দের তাদের স্থান দিল, খেতে দিল, নতুন বিছানায় শোয়ার ব্যবস্থা করে দিল। কিন্তু তার ব্যক্তিজীবনের রুটিনে পরিবর্তন হল না। সন্ধ্যায় মদ খেল, রাতে ভাত খেল। পরিত্যক্ত স্ত্রী পায়রা যখন গভীর রাতে তার কাছে ফিরে এল, তার বিছানায় একসাথে শুতে চাইল, তা মেনে নিল না হেমাস্দের। ঘর থেকে তাকে তার নতুন কেনা বিছানায় মেয়ের কাছে পাঠিয়ে দিল। সকাল বেলা হেমাস্দের ঘরে একটা চিরকুট ঝঞ্জে পেল পায়রা এবং তার পর কোণের নিভৃত ঘরে যেখানে গতরাতে মদ পান করেছিল হেমাস্দের, সেখানে তার মৃতদেহ আবিষ্কার করল-- ভাঙা কাঁচে নিজের গলার নলি কেটে আত্মহত্যা করেছে হেমাস্দের।

গল্পের এই কাহিনীর মধ্যে হেমাস্দের মগ্ন চৈতন্যে পুঞ্জীভূত বেদনাকে তার কাজের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন লেখক। আর পাঁচটা মানুষের মতো হেমাস্দেরও সংসারী হতে চেয়েছিল; সুখের স্বাদে পরিপূর্ণ জীবন ভোগের স্বপ্ন দেখেছিল। কিন্তু মানুষের দুর্ভাগ্য এই যে, তাকে নিয়তির কাছে পরাস্ত হতে হয়। নিজের মুখে সাদা সাদা দাগ লক্ষ্য করে স্ত্রী পায়রাকে সে একদিন দেখতে বলেছিল। পায়রা অবজ্ঞা করে ‘কিছু না’ বলে চলে গেলেও যখন সারা গায়ে শ্বেতী প্রকট হয়ে উঠল তখন আর অবজ্ঞা করতে পারল না, ডাক্তার দেখাতে বলল। ‘গাছের ওপরকার ছাল ছাড়িয়ে ফেললে যেমন দেখায় অনেকটা সেই রকম।’^{২৪০} যখন হেমাস্দের শরীর প্রায় সাদা হয়ে গেল তখন ব্যাভিচারিণী স্ত্রী পায়রা সুখের ঝঞ্জে অন্যত্র চলে গেল। মর্মান্তিক ভাবে নিজের রুচিবোধকে জানিয়ে গেল ছোট চিঠিতে-- ‘তোমার সঙ্গে আমি আর থাকতে পারি না। শুতে পারিনা তোমার পাশে। তাকাতে পারি না। আমার গা ঘিন ঘিন করে। বমি আসে।’^{২৪১} দশ বছর পরে ফিরে এসে সেই পায়রা স্থান নিতে চেয়েছে হেমাস্দের বিছানায়। হেমাস্দের তাকে নিষ্পৃহ, নিরাসক্ত ভঙ্গিতে সরিয়ে দিয়েছে। পায়রা তাকে জানিয়েছে, “তোমার কাছে ফিরে আসার মুখ ছিল না, তবু এলাম। কপাল ঠুকে। আমার কোন উপায় ছিল না।”^{২৪২} হেমাস্দের পায়রার অতীত কাহিনী শুনতে চায় নি। বহুভোগ্য, ব্যাভিচারিণী স্ত্রীকে সে আশ্রয় দিয়েছে মানবিকতার স্বার্থে। অদ্ভুত দার্শনিকতার ভঙ্গিতে জানিয়েছে, “যারা আমায় দু চার ঘণ্টা চোখেও সহ্য করতে পারে না তারা

বাইরের লোক। তুমি বউ হয়ে আমায় চক্ষিণ ঘন্টা বারো মাস কেমন করে সহ্য করতে? পারতে না।”^{২৪৬} --এই বক্তব্যের মাধ্যমে পায়রা ও বাইরের লোকের মধ্যে কোন প্রভেদ দেখায়নি হেমাঙ্গ। বহু সাধ করে একদিন সংসার পেতেছিল। সুস্থ, কর্মঠ অথচ বাইরে সাদা হয়ে যাওয়ায় তাকে যে নারী ত্যাগ করে চলে গিয়েছিল, আজ তার প্রতি সহানুভূতি দেখায় হেমাঙ্গ। তাকে ক্ষমা করে আসলে তাকে উপেক্ষাই করতে চেয়েছে। আঘাত, অসহায়তা, একাকিত্বের যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে জগৎটাকে প্রকৃতভাবে জানতে পেরেছে হেমাঙ্গ। পায়রার জীবনকাহিনী তাই তার কাছে স্বচ্ছ। অন্ধকার ঘরে পায়রার সাথে কথা বলতে গিয়ে সে স্বস্তি পেয়েছে। কারণ অন্ধকার তাদের মধ্যে দৃষ্টি বিনিময়ের সুযোগ রাখেনি। হেমাঙ্গ পায়রার সামনে একদিন বিবমিষার কারণ হয়েছিল, আজ এই জগৎ ও জীবনের অভিজ্ঞতা হেমাঙ্গের চোখে যে ঘৃণার পরিবেশ সৃষ্টি করেছে উজ্জ্বল আলোয় তা হয়তো পায়রার কাছে ধরা পড়ে যেত। তাই পায়রা কিংবা তার মেয়ের কাছ থেকে হেমাঙ্গ কিছুটা ব্যবধান খুঁজেছে। পায়রা আত্মবিশ্লেষণের মাধ্যমে আবার পুরোনো জীবনে ফিরে আসতে চাইলেও হেমাঙ্গ সেই সুযোগ দেয়নি। যে ঘর-বাড়ির প্রতি এতদিন ধরে মায়া দেখিয়ে এসেছিল, সকল মায়া ছিন্ন করে সে নিষ্ঠুরভাবে আত্মহত্যার পথ বেছে নিল।

হেমাঙ্গ এই গল্পে নিরপরাধ, চরিত্রবান একজন মানুষ। পায়রা রোগগ্রস্ত স্বামীকে ত্যাগ করে ব্যভিচারের পথ বেছে নিলেও হেমাঙ্গ সে পথ নেয়নি। ঝিমলির সাথে তার কোন অবৈধ সংসর্গ ঘটেনি। বাইরের লোক তাকে দূরে রাখলেও এই ঘর বাড়ির ভিতরে ঝিমলির সাথে সে সম্পর্ক গড়তেই পারত। তা করেনি। ঘর বাড়ি টিকিয়ে রেখেছিল সে তার মায়া দিয়ে। পায়রা চলে যাওয়ার পর অসহ্য দুঃখের মধ্যে সে আত্মহত্যা করতে পারত, তাও করেনি। জীবনকে ক্রমশ নিস্তরঙ্গ করে তুলেছিল। জীবনবোধে উত্তীর্ণ হয়ে উঠেছিল হেমাঙ্গ তার জীবনকে ভালবেসে। কিন্তু পায়রা যখনই তার সাথে এক বিছানায় থাকতে চাইল তখনই তার যাবতীয় প্রতিবাদ ধ্বনিত হল। ঘর বাড়ি সব কিছু তাদের জন্য রেখে দিয়ে নিজেকে সরিয়ে নিল হেমাঙ্গ।

হেমাঙ্গের আত্মহত্যা তার আত্মবঞ্চনার একটি দিক। জগতের রূঢ়তাকে সে উপলব্ধি করেছিল। সামান্য শারীরিক বিকৃতিতে নিজের কাছের মানুষটির সুখের খোঁজে চলে যাওয়া তার কাছে যন্ত্রণাদায়ক মনে হয়েছিল। কিন্তু স্বার্থ ফুরোনোর পর সাত ঘাটের জল খেয়ে আবার যখন সেই মানুষ, পায়রা, তার কাছে ফিরে এল, হেমাঙ্গ বুঝতে পারল এই ফিরে আসার পিছনে ভালোবাসা নেই, আছে নিরাপত্তার বন্দোবস্তকে সুদৃঢ় করার বাসনা। তাই গৃহহীন পায়রাকে গৃহের

আশ্বাস দিয়ে নিজেকে সরিয়ে নিল হেমাঙ্গ। কারণ একদিন হেমাঙ্গ তার স্ত্রীকে ভালবাসত নিবিড়ভাবে। আজও দুর্বলতা রয়ে গেছে কিন্তু নিজেকে সেই দুর্বলতার কাছে সে বিকিয়ে দিতে পারে না। হারানো দিনের মত ধরা দিতে পারে না পায়রার কাছে। দুজনের মধ্যেই আজ বিরাট পরিবর্তন এসেছে। পায়রাকে একদিন বিশ্বাস করে সে ঠকেছিল। তার শরীরটাকে জানলেও ‘পায়রার কোথায় কী ছিল হেমাঙ্গ কি সত্যিই জানত? না আজও জানতে পেরেছে?’^{২৪৭} মানুষকে এত সহজে জানা যায় না। তার মনে নিভূতে যে স্বকীয়তা আছে, যে অন্ধকার প্রকোষ্ঠ আছে তা তো অন্যের কাছে অজানা থাকেই। হেমাঙ্গকে তাই জানা যায়নি। তার মনের ভিতরেও যে যন্ত্রণাময় কালো অন্ধকার ছিল তার শুধু ইঙ্গিত ছিল তার নিজের মনের রহস্যময় গোপনীয়তার প্রসঙ্গে— ‘সব জিনিসই গায়ের চামড়া নয়। দেখা যায় না, দেখা যায় না। হেমাঙ্গকেই কি দেখা যায়?’^{২৪৮} হেমাঙ্গের মনের সেই রহস্যময়তার অবসান ঘটল, তার আকস্মিক, নিষ্ঠুর আত্মহত্যার মাধ্যমে।

বিমল কর এই গল্পে স্বার্থান্বেষী মানুষের জীবনভোগের ক্লেদাক্ত দিকটিকে প্রকাশ করেছেন। সামান্য রোগের কারণে কর্মক্ষম স্বামীকেও কেমন ভাবে তার স্ত্রী পরিত্যাগ করে যায়, ভেঙে দেয় সংসারের সৌখ, ছিড়ে দেয় বিশ্বাসের বন্ধন তার চিত্র রয়েছে। দাম্পত্য সম্পর্কে ফাটল, পারস্পরিক সহযোগিতা, সহমর্মিতার অপমৃত্যুর দৃষ্টান্ত এখানে পাঞ্জলভাবে ফুটে উঠেছে।

লেখক চরিত্রের নামকরণের মধ্য দিয়েও চরিত্রের ধর্ম ও উদ্দিষ্ট বক্তব্যকে ফুটিয়ে তুলেছেন। হেমাঙ্গ নামের সাথে তার দেহের বর্ণের মিল ঘটিয়েছেন লেখক। এই গল্পে বার বার সাদা ও কালো এই দুটি রঙের প্রসঙ্গ এসেছে। হেমাঙ্গ, পায়রা কথা বলতে স্বচ্ছন্দ বোধ করছে অন্ধকারের কালিমায়। আবার হেমাঙ্গের সাদা রঙের শরীরের মধ্যেও কালো রঙের অস্তিত্ব ছিল, যা বিষাদগ্রস্ততা, নিঃসঙ্গতা, বেদনাदीর্ণ হওয়ার প্রবণতাকে বাড়িয়ে দিয়েছে, এগিয়ে নিয়ে গেছে আত্মহত্যার জটিলতায়। পায়রা নামকরণটিও উদ্দেশ্য-প্রণোদিত। সুখ-সন্ধানী পায়রা সেই ঘরেই থাকতে চায় যেখানে বাসা বাঁধা ও খাদ্য সংগ্রহের অভাব নেই। তাই তাকে ‘সুখের পায়রা’ বলা হয়। এই গল্পে পায়রার যখন বাইরের সঙ্গতি ফুরালো তখনই সে আবার ফিরে এসেছে হেমাঙ্গের কাছে সুখের খোঁজে। আত্মসুখসন্ধানী, স্বার্থান্বেষী চরিত্ররূপে এখানে পায়রা নামটি যথার্থ। সব দিক থেকে বিচার করে বলা যেতে পারে এই গল্পে লেখক, মানুষের জীবনের অবসাদ, নিঃসঙ্গতা, ব্যভিচার, যন্ত্রণা ও নৈরাশ্যকেই বিশেষ মাত্রা দিয়েছেন তবু এর ভেতর থেকে যেটি প্রকট হয়ে

উঠেছে তা হল হেমাস্থের চরিত্রে সদর্থক জীবনকে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা, যেখানে কলিমা নেই, পাপ নেই, বিশ্বাসবোধ, সহর্মিতা, সহযোগিতা ও ভালবাসায় উত্তীর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

‘গুণেন একা’ (‘দেশ’, ১৯৭৯) গল্পের মধ্যেও মানুষের মনের অন্ধকারে লুকিয়ে থাকা গোপন বাসনার চালচিত্র প্রকাশিত হয়েছে। বিশেষ ক্ষেত্রে চেনা মানুষও হয়ে ওঠে অচেনা। প্রবৃত্তির কাছে নিজেকে সমর্পণ করে, অবশেষে ফিরে আসা দুষ্কর হয়ে ওঠে। বিবেকের ভূত তাড়না করে ভোগ ও প্রদানের হিসেব মেলানোর তাগিদে। ‘গুণেন একা’ গল্পটিতে মানুষের অন্তর্জগতের কথাই বড় হয়ে উঠেছে।

গুণেন চাকরির খোঁজে এসে তার সম্পর্কের এক পিসতুতো দাদা কেদারের বাড়িতে উপস্থিত হয়েছিল। কোলিয়ারির চাকরিও পেয়েছিল, আর পেয়েছিল কেদারের স্ত্রী ঈশানীর আতিথ্য ও ভালবাসা। তাদের বাড়িতে থেকে চাকরি করার সময়ই হঠাৎ পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হয়ে কেদার একদিন বিছানা নিল। কেদারের অনুরোধে, তিরস্কারে, ভৎসনায় চাকরি ছেড়ে অবশেষে কেদারের আয়ুর্বেদ ওষুধের দোকানে বসতে বাধ্য হয়েছিল গুণেন। এর পিছনে অবশ্য প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত ও ভরসা ছিল ঈশানীর। ঈশানীর সাথে প্রাথমিক ঠাট্টা-তামাশা রূপ নিল ভালবাসায়। কেদার যখন রোগাক্রান্ত হল তখন এই ভালবাসা আরও গভীর এবং দেহকেন্দ্রিক হয়ে গিয়েছিল। গুণেন যখন জানতে পারল ঈশানী কেদারের বিবাহিতা স্ত্রী নয়, তখন মনের পাপবোধ ক্ষীণ হয়ে এসেছিল। ঈশানীকে ছেড়ে চাকরি আঁকড়ে চলে যেতে পারেনি গুণেন। কেদারের গালি-গালাজ, নিন্দা-মন্দ, ঈশানী-গুণেনকে নিয়ে কদর্য ইঙ্গিত হজম করেছিল গুণেন নিজে। কারণ সে ভেবেছিল কেদার তার নামে দোকান লিখে দেবে, আর ঈশানী তো একপ্রকার তারই। কিন্তু কেদার দোকানটা গুণেনের নামে লিখে দেয়নি। আর ঈশানী রহস্যময়ী। সে ঠাকুরের কাছে মানত করে কেদারের মৃত্যু — গুণেন একথা শুনে চমকে ওঠে। মানুষের চাহিদা, মানসিকতা, প্রবৃত্তির স্বরূপ চিনতে পারে না। একসময় ভাবে রহস্যময়ী এই নারী ও কুরুচিকর কেদারের সংস্পর্শ ত্যাগ করে সে দূরে চলে যাবে। কোলিয়ারি কিংবা কোথাও চাকরি নেবে। যামিনীবাবুর মেয়ে, আশুনে সামান্য ঝলসে যাওয়া শেফালীকে বিয়ে করবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই স্বপ্নেরও পরিণতি আসে না।

গল্পের শুরুতে পাগলা কুকুরের প্রসঙ্গ এসেছে। সে যে কোথায় লুকিয়ে থাকে কেউ জানে না। কিন্তু হঠাৎই এসে আক্রমণ করে। গুণেন ভয় পেয়েছে। রাত গভীর হওয়ার আগে দোকান বন্ধ করে ঘরে ফিরে আসে সে। এই কুকুরকে মারতে পারলে পঁচিশ টাকা বকশিসের কথা

মিউনিসিপ্যালিটি ঘোষণা করেছে, তাও গুণেন জানে। সে সাবধান হয়ে চলা ফেরা করে। কিন্তু গল্পের শেষে এসে এই কুকুরের প্রসঙ্গ আর বাইরের পাগলা কুকুর হয়ে থেমে থাকে না। গুণেনের জীবন ও মনে গভীর বোধ ও প্রত্যয়ের সাথে তার ইঙ্গিত যুক্ত হয়ে যায়। এই কুকুর গুণেনের পাশ দিয়ে অন্ধকারে ছুটে চলে যায়। তার ছুটে আসার শব্দে গলিটা আরও থমথমে হয়ে গেছে। বুনো কুকুরটার তাড়া খেয়ে পথ হারিয়ে ফেলে গুণেন। ভিন্ন পথে এসে দেখে সামনে পথ রুদ্ধ। হাতে যে দোকানের চাবির গোছা রেখেছিল; যে চাবি সে কেদারের মুখে ছুঁড়ে দিয়ে বলতে চেয়েছিল, “তুমি নুলো সবচেয়ে শয়তান। দুই দিকে দুই পাল্লা ঝুলিয়ে রেখেছিল, একদিকে দোকান, অন্যদিকে ঈশানী। ভেবেছিলে গুণেনের সাধ্য নেই, সরে দাঁড়ায়”^{২৪০} --সেই চাবি সে হারিয়ে ফেলেছে। অর্থাৎ গুণেন চেয়েছিল কেদার তার নামে দোকান লিখে দেবে, তা ঘটেনি। আবার ঈশানী, যার সাথে তার অবৈধ দৈহিক সম্পর্ক ও ভালোবাসা, সেই নারীও রহস্যময়ী হয়ে ওঠে। গুণেনকে রূঢ়ভাবে কথা বলে অপমানিত করে। গুণেন সব পেয়েও স্থায়ী মালিকানা পায়নি কোন কিছুরই, সে শুধু তত্ত্বাবধায়কই থেকে গেছে। এই জীবন থেকে সে বেরিয়ে আসতে চেয়েছে। তার মনে হয়েছে এই দোকানের থেকে চাকরি ভাল, এবং ঈশানীর চেয়ে যামিনীবাবুর কুড়ি বছরের ডাগর মেয়ে, শেফালী ভাল। কারণ দুটো দিক থেকেই তার জীবনে নিজস্বতা আসবে। অপরের জিনিস ভোগদখল করার যন্ত্রণা থেকে তার মুক্তি ঘটবে। কিন্তু সেই পথ গুণেনের কাছে সহজপ্রাপ্য হয়না। সংসারের গোলকর্ধাধায় পথ হারিয়ে ফেলেছে সে। মুহুলিয়ার সর্বেশ্বরীর মন্দিরের মেলায় মড়ক হলে, সেই মড়ক থেকে ঈশানীকে উদ্ধার করে নিয়ে আসে গুণেন। এর সূত্র ধরে সম্পর্ক আরও নিবিড় হয়ে ওঠে। কেদারের প্রতি কৃতজ্ঞতা এতদিন পরে সে না দেখাতে চাইলেও জীবনের সাফল্যের স্বাদ ও মাধুর্য গুণেন তার বাড়িতে থেকেই লাভ করেছে। সুতরাং বিবেকবোধে তাকে আক্রান্ত হতে হয়েছে। কেদারের সম্পর্ক ত্যাগের বাসনা তার মধ্যে যত প্রবল হয়েছে বন্ধনও ততই নিবিড় হয়ে উঠেছে। মানবিকতার সেই বন্ধন ছিন্ন করা যায় না। বিবেকের কাছে অপরাধী হতে হয়। সর্বোপরি নিয়তির কাছে তাকে পরাস্ত হতে হয়। তাই সমূহ পরিকল্পনা তার নষ্ট হয়ে যায়। বিবেক-রূপী বুনো কুকুর নিয়তির মতো তাড়া করে ফেরে গুণেনকে। দায়বদ্ধতা বেড়ে যায়। দোকানের চাবি হারিয়ে দিয়ে সে পালাতে পারে না। কারণ সামনে ও পিছনের পথ বন্ধ। “উপায় নেই। গুণেনকে এখানে থামতেই হবে। আর সে এগুতে পারবে না, পিছতেও নয়। চারদিক দিয়ে সে কোনঠাসা।”^{২৪১} --লেখকের এই বর্ণনা ইঙ্গিতবাহী। পিছনের পথ বন্ধ, অর্থাৎ

মানুষ পিছন দিকে ফিরে যেতে পারে না। ভুল ভ্রান্তি যা কিছু হয়েছে সব নিয়ে এই জগতে শুধু এগোতে হয়। গুণেনের এগোনোর পথ বন্ধ হয়ে গেছে, অর্থাৎ গুণেনের মনে যে স্বার্থান্বেষী মনোভাব প্রবিষ্ট হয়েছিল সেই পথে সে যেতে পারে না। এতদিনের সম্পর্কে কেদারদা ও তার স্ত্রীর কাছে সে যে পরিমাণ ঋণী তা না মিটিয়ে চলে যেতে পারে না। কারণ মনের গভীরে বুনো কুকুররূপী বিবেকের তাড়না শুরু হয়েছে। সুতরাং থামতে হবে গুণেনকে।

গল্পটির মধ্য দিয়ে লেখক সদর্থক জীবনবোধে উত্তীর্ণ হওয়ার পথ দেখিয়েছেন গুণেন চরিত্রের মাধ্যমে। মানুষের প্রতি মানুষের মানবিকতা ও দায় গ্রহণ ও প্রত্যর্পণের আবশ্যিকতা কতটুকু তা গল্পটিতে প্রকাশিত। গুণেন নিয়তিত্যাগিত মানুষের প্রতিনিধি। একদিন লোভের বশে যে সম্পত্তি ও নারী দখল করেছিল সে, সেই বন্ধন থেকে বেরোতে পারে না। এই গল্পে মানবিকতার পাশাপাশি মানুষের সম্পর্ক ও মনের জটিলতা উপলব্ধ বিষয়রূপে প্রতিভাত হয়েছে।

‘তুচ্ছ’ (‘দেশ’, ১৯৮১) গল্পটি দাম্পত্য প্রেমের গল্প। সাংসারিক জীবনে পুত্র-কন্যা, পরিজনের কাছ থেকে পাওয়া দুঃখ, বেদনা, সুখস্মৃতি, অভাব-অভিযোগের থেকেও বড় হয়ে উঠেছে বৃদ্ধ দাম্পত্যের পারস্পরিক, সহযোগিতা, সহমর্মিতা, অনুরাগ ও অবলম্বন। পুরো গল্পটিই বৃদ্ধ দাম্পত্যের অন্তর্লোকের ভাবনা ও টানাপোড়েনে সম্বদ্ধ হয়ে উঠেছে। বিগত দিনের স্মৃতির সূত্রে বৃদ্ধ দাম্পত্যি বরদা ও কানন সন্তান-সন্ততির দ্বারা নিজেদের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শনকারী নানা ঘটনার তত্ত্বালোচনা করেছেন, এবং অবশেষে উপলব্ধি করেছেন নিজেদের নিখাদ ভালোবাসার মাধুর্য।

অবসর জীবনের প্রায় পাঁচ বছর অতিক্রান্ত হল বরদার। তাঁর একান্ত ইচ্ছার সূত্র ধরেই তার দুই পুত্র ও কন্যা-জামাতা সপরিবারে মিলিত হয়েছিল বরদা ও কাননের কাছে। উদ্দেশ্য ছিল ছোট ছেলে গগা’র বিবাহের কথাবার্তা চূড়ান্ত করে ফেলা। কর্মসূত্রে বরদা ও কাননের দুই পুত্র ও জামাতারা দূরে অবস্থান করায় সচরাচর একসাথে মিলিত হতে পারে না। এবারে সেটা সম্ভব হওয়ায় বৃদ্ধ দাম্পত্যি খুব খুশি হয়েছিলেন। তাই সকলের চলে যাওয়ার পর প্রায় নিশ্চর, ফাঁকা বাড়িতে মন খারাপ করা পরিবেশে বরদার মন হয়ে উঠেছিল স্মৃতিচরী, মানসিক ভারাক্রান্ত। কিন্তু স্ত্রী কানন বরদার ভাবনার সাথে নিজেকে মেলাতে পারেননি। তাঁর মন কিছুটা ভারগ্রস্ত হলেও তিনি তা আমল দেননি। বরং প্রায় মাসখানেক চলা নানা অব্যবস্থা ও অনিয়ম থেকে পরিত্রাণ পেয়েছেন বলে মনে করেছেন, এবং স্বামীর প্রতি হয়ে উঠেছেন সেবাপরায়ণা। নিজের নিয়মে সঠিক সেবার মধ্য দিয়ে বরদাকান্তকে সুখে রাখার চেষ্টা করেছিলেন কানন। বরদাকান্তের প্রতিটি পছন্দ-

অপছন্দ, প্রয়োজন-অপ্রয়োজনের প্রতি তাঁর সচেতন নজর ছিল, কিন্তু বাড়িতে এতজন মানুষ আসার ফলে সেই যত্নের ব্যাঘাত ঘটে। কানন এর জন্যে দায়ী করেন তাঁর দুই কন্যা ও পুত্রবধূকে। তাঁর মনে হয় তারা তাদের স্বামীর কিংবা সন্তানের প্রতি যথেষ্ট যত্নশীল হলেও বরদাকান্তের প্রতি উদাসীনতা দেখিয়েছে। ওদের যাবতীয় ভালবাসা এবং অন্তরঙ্গতার পিছনে স্বার্থসিদ্ধির নগ্নতাকে উপলব্ধি করেছেন। শুধু তাই নয় নাতিদের দাপট তাঁর কাছে অস্বস্তিকর মনে হয়েছে। নাতিদের পোষাক-আসাক, চাল-চলন তাঁর কাছে ভাল লাগেনি। স্বামীর প্রতি যত্নশীলতার ঘাটতি দেখে তাঁর মন প্রতিবাদী হয়েছে, যা খানিকটা পক্ষপাত দোষে দুষ্ট হলেও দাম্পত্য সম্পর্কে তাঁর মমতাবোধকে উপেক্ষা করা যায় না।

অপর পক্ষে বরদা সামান্য অনিয়ম, অস্বস্তি, অসুস্থতা নিয়ে মাথা ঘামাতে চাননি। অবসর জীবনের ক্লাস্তি মেটাতে চেয়েছেন প্রিয়জনদের সান্নিধ্যে থেকে। কম বয়সী মেয়ে-বউর তার প্রতি অযত্নকে তিনি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখেছেন। নাতি নাতিদের দাপট তাঁর কাছে জীবনের উদ্দামতা, উচ্ছলতাকেই স্মরণ করিয়েছে। তাই সকলের চলে যাওয়ার পর তার মন ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছে। জীবনের সূর্য অস্তাচলের দিকে চলে পড়ার জন্য মনের কোনে স্মৃতিমেদুরতা, হারানোর যন্ত্রণা তার কাছে প্রবল হয়ে উঠেছে। তাই শীতের সকালে নিজের শরীরকে উপেক্ষা করেও তিনি স্টেশনে গিয়েছিলেন ছোট মেয়ে-জামাই এবং নাতিদের ট্রেনে তুলে দেওয়ার জন্য। প্রিয়জনকে আঁকড়ে রাখার প্রবণতার মধ্য দিয়ে তাঁর এই জীবনের শেষ বেলায় জীবনের মাধুর্যকে ধরে রাখার ইচ্ছাকেই বোঝা যায়। ‘বরদার মাঝে মাঝে ভয় হয়, তিনি যাবার সময় হয়ত ছেলেমেয়েদের কাউকেই কাছে পাবেন না, কারও গলা শোনা হবে না, মুখ দেখা ঘটে উঠবে না। হতে পারে এবার যা দেখলেন— এই শেষ।’^{২৫১} তাই ব্যক্তিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি তিনি অনুরাগী নন। কাননের তাঁর প্রতি ভালবাসা ও যত্নশীলতার একাগ্রতাকে তিনি উপলব্ধি করেন, তিনি সুখী হন, কিন্তু তিনি এটাও জানেন কাননের বিকল্প কখনোই কেউ হতে পারে না। কানন যেমনভাবে তাঁর প্রতি নজর দেন, সেই একইভাবে তাঁর কন্যারা এবং পুত্রবধূ তাদের স্বামীর প্রতি নজর দেবে, সন্তানের দেখভাল করবে; উপেক্ষিত হবে বাবা-মা, শশুর-শাশুড়ি —এটাই স্বাভাবিক। তাঁর মনে হয়েছে কানন ওদের কাছে বেশি প্রত্যাশা করেছে, “ছেলে মেয়ে বউ নাতি-নাতি ওদের কাছে আশা করার একটা সীমা আছে। তুমি যদি ভেবে থাকো, যেমনটি করে তুমি আমায় রাখছ, দেখছ

—তেমন করে ছেলের বউ মেয়ে দেখবে—তবে সেটা ভুল করছ। তাদেরও নিজের সংসার আছে।
নিজেদের টান আছে...।’’^{২৫২}

এ জগৎ মায়াময়। মানুষ স্বার্থের দাস—আত্মসুখ তার কাছে উদ্দিষ্ট বিষয়। তাই নিজের সংসারের প্রতি, নিজেদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি মেয়ে, বউ, ছেলেরা নজর দিয়েছে বলে বরদা মনে করেন। কানন সহজভাবে এই জগৎ-সংসারকে বিচার করতে চান। তাই তাঁর মনে হয় নিজের বাবা কিংবা শ্বশুরের প্রতি মেয়ে বউয়ের যত্নশীল হওয়া উচিত। তাই নানা তুচ্ছ বিষয়ের প্রতিও কাননের দৃষ্টি এড়ায় না। একারণেই গল্পে দাম্পত্য প্রেমের নিবিড়তা এতটা মাধুর্যময় রূপ ধারণ করেছে। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কই এখানে পরম নির্ভরযোগ্য সম্পর্ক হয়ে উঠেছে। অভিমানক্ষুধা কাননের মানসিকতা ঘিরে রেখেছে তার স্বামীর সামগ্রিক অস্তিত্বকে। ‘সুখ’ গল্পেও বরদাকান্ত ও সুবর্ণের দাম্পত্য জীবন নিষ্কলুষ এবং নির্ভরযোগ্য রূপে প্রতিভাত হয়েছিল, ফুটে উঠেছিল জীবনের মাধুর্যময় অস্তিত্ব। ‘তুচ্ছ’ গল্পেও সেই বিশ্বাসময়তা, সৌন্দর্য, শান্তির বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছে। অভিন্নহৃদয় দুই নর-নারী জীবনের প্রাপ্ত লগ্নে এসেও অনুভব করেন একের প্রতি অন্যের নিবিড় মমত্ব, ভালোবাসা, বিশ্বাস ও নির্ভরতা। তাই জাগতিক সকল বিষয় তুচ্ছ হয়ে যায় এই মানবিক সম্পর্কের জাদুতে। মুগ্ধ চোখে একই মানসিক সহাবস্থান এনে বরদা কাননকে দেখেন, “এ রকম হয় সংসারে, হয়; আপন জনের মধ্যেও একজন কেমন করে যেন আরও আপন হয়ে ওঠে, নিজের হৃদয়ের সবটুকু জায়গা জুড়ে নেয়, মিশে যায় সর্বদেহে। কখনও কখনও মনে হয়, অন্য মানুষটির নিঃশ্বাস নিজের বুকের মধ্যে থেকে উঠে এল।’’^{২৫৩}

বিমল কর এই পর্বে মানবিক সম্পর্কের টানাপোড়েনের নানা ছবি তাঁর ছোটগল্পের মাধ্যমে ফোটানোর চেষ্টা করেছেন। ব্যক্তিগত জীবনের নানা সুখস্মৃতি ও সম্পর্কের বন্ধন তাঁর ছোটগল্প-গুলিকে মাধুর্যমণ্ডিত করে তুলেছে। আধুনিক সাহিত্যে দাম্পত্য সম্পর্কের ভাঙন যেখানে নানাভাবে প্রকাশিত হচ্ছিল, বিমল কর সেই পটভূমিতে দাঁড়িয়ে দাম্পত্য সম্পর্কের মাধুর্যময় দিককে ফুটিয়ে তুললেন। তুলনামূলক দাম্পত্যের আলোচনার মাধ্যমে দেখালেন প্রৌঢ়ত্বের শেষ সীমায় পৌঁছেও দাম্পতিরা জাগতিক বন্ধন অনুভব করেছেন তাঁদের ভালোবাসার মানুষটির মুখ চেয়ে। পরম নির্ভরতায় তৃপ্ত, সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে তাদের জীবন, আত্মতৃষ্টি ফুটে উঠেছে সুখের বলি রেখা ছাপিয়ে।

‘এরা ওরা’ (শারদীয় ‘আনন্দবাজার পত্রিকা’, ১৯৮১) গল্পে দুই প্রজন্মের দাম্পত্যজীবন, পারিবারিক ও সামাজিক কাঠামো, ভাবধারা, চালচলন এমনকি মানসিক চাহিদারও তুলনামূলক আলোচনা করেছেন বিমল কর। হেমদাকান্ত ও সুশীলা বৃদ্ধ দম্পতি, তাঁরা তাঁদের পরবর্তী প্রজন্মের ভাবধারা, আদব, কায়দা, জীবন উপভোগের সাথে নিজেদের জীবনের তুলনামূলক পর্যালোচনা করেছেন। এই পরবর্তী প্রজন্মে রয়েছে তাঁদের ছেলে নিত্যপ্রিয় ও বউমা এবং তাঁদের বাড়ির সামনে রাস্তার ওপারে ভাড়া আসা নতুন এক কমবয়সী দম্পতি। অবসরের দিনগুলিতে হেমদাকান্ত কিংবা সুশীলার সময় অনেক দীর্ঘ হয়ে গেছে। পুরোনো দিনের প্রতি স্মৃতিমেদুরতার পাশাপাশি রয়েছে নিজের ছেলে ও বউমা কিংবা তাদের সন্তান সন্ততি কিংবা মেয়ে-জামাই নিয়ে নানা আলোচনা। এর সাথে যুক্ত হয়েছে নতুন ভাড়া আসা দম্পতির সম্পর্কে কৌতূহল। ‘তুচ্ছ’ গল্পের মত এখানেও বৃদ্ধ দম্পতি পরিজনহীন অবস্থায় নিঃসঙ্গতার বেদনা অনুভব করে। কিন্তু মনের বাসনা থাকলেও ছেলে কিংবা তার পরিবার তাঁদের কাছে দীর্ঘদিন থাকে না। কয়েকদিন থাকার পরই অস্বস্তি অনুভব করে। বউমা’ই বেশিমাত্রায় অসন্তোষ প্রকাশ করে। নিজের ঘর-সংসার সম্পর্কে, নিজেদের চালচলন সম্পর্কে তারা অনেক বেশি আত্মকেন্দ্রিক বলে হেমদাকান্ত ও সুশীলা মনে করেন। ‘নিতুর বউ শাস্তিডিকে, হয়ত শ্বশুরকেও তেমন পছন্দ করতে পারছিল না। কেন পারছিল না সে নিজেই জানে। আজকাল মেয়েরা নিজেদের অধিকারটা বেশি বোঝে, ষোল আনা খাটাতে চায়।’^{২৫৪} আর ছেলেরা বিয়ের পর তার শ্বশুরেরই হয়ে যায়, মা বাবার নয় --বলে মনে করেন হেমদাকান্ত। তাঁর মেয়ে যেমন তাঁদের প্রতি খবরা খবর নেয়, তেমনি বউমাও হয়তো তার বাবার সান্নিধ্যে থাকবে বলে দিল্লীর চাকরি নিতে নিতু বা নিত্যপ্রিয়কে বাধ্য করেছিল। বৃদ্ধ দম্পতি ও তাদের পরবর্তী প্রজন্ম সকলেই তাদের প্রজন্মের প্রতি বিশ্বাসী এবং পরবর্তী বা পূর্ববর্তী প্রজন্মকে সন্দেহের চোখে দেখেছে। দুই প্রজন্মের মধ্যে সূক্ষ্ম ব্যক্তিত্বের সংঘাত লক্ষ্য করা যায়। তারা সকলেই নিজের স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। এই তারতম্যের কারণ প্রজন্মের ব্যবধান এবং সময়ের পরিবর্তন বলেই মনে হয়। এই সকল বেদনাতুর ভাবনার মধ্যে এসে যায় নতুন ভাড়াটে দম্পতি। তাদের চালচলন খুশি ভরা প্রাণচঞ্চল রূপ হেমদাকান্ত কিংবা সুশীলার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সারাদিনে নানাভাবে তাঁরা নতুন দম্পতির আচার আচরণ লক্ষ্য করেন। তাদের পোষাক-আসাক আধুনিক জীবনের প্রতি আগ্রহ দেখে নিজের ছেলে বউয়ের জীবনেও তার মিল খুঁজে পান। আবার এর ভিতর দিয়ে হেমদাকান্ত’রা নিজেদের জীবনের সাথে আধুনিক এই ছেলে বউদের তুলনা

করতে চান। হেমদাকান্ত নাতির কাছ থেকে খবর পান তাঁর বউমা স্কুটার চালাতে জানে, কিংবা আধুনিক পোষাক কিনে তা নিয়ে যায় দিল্লীতে, সামনের বাড়ির বউটি চাকরি করতে যায়, উচ্চশব্দে গান শোনে, মদ্যপান করে এমন কি বউটি তার স্বামীর মুখ থেকে জ্বলন্ত সিগারেট তুলে নিয়ে নিজের ঠোটে ছোঁয়ায়। সুশীলার মনে হয় এই আধুনিকতার দিকগুলো জীবনের ক্ষেত্রে খুব প্রয়োজনীয় নয়। মেয়েদের আধুনিক পোষাক পরা কিংবা চাকরি করতে যাওয়া ঠিক নয়। কিন্তু সময় বদলেছে। পুরুষ ও নারীর সমানাধিকারের দাবি আজ স্বীকৃত। মেয়েরা ছেলেদের সাথে সব ক্ষেত্রেই কাজ করার জন্য উদ্যমী হয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা, চাকরি কিংবা ব্যবসার যোগ্যতা তাদের কাছে কম নেই, হেমদা কিংবা সুশীলার জীবনের সাথে আজকের অনেক পরিবর্তন ঘটে গেছে। একটি প্রজন্মের ব্যবধানের (Generation Gap) জন্য মূল্যবোধ, জীবনাচরণের বিরাট পার্থক্য ঘটে যায়। সুশীলা কিংবা হেমদা তাই এই প্রজন্মের চাহিদার সঙ্গে নিজেদের মেলাতে পারে না। সুশীলার মনে হয় তাঁদের যৌবনের দিনগুলি অনেক সুন্দর ছিল। রেল চাকরি করতেন হেমদাকান্ত, গৃহবধূ রূপে স্বর্ণময় সেই দিনগুলি খুব সুখে, আল্লাদে তিনি পার করে চলে এসেছেন। সেই মাধুর্যময় দিন হয়তো আজকের প্রজন্ম পায় না। এদের জীবন যান্ত্রিক, পেশাভিত্তিক। হেমদা তাই বলেছেন, “তোমাদের আমাদের সময় তো আর নেই সুশীলা। আমরা যাতে সুখী হতাম—এরা তাতে হবে কেন? আমরা বোধহয় খানিকটা হাত গুটিয়ে থাকতাম। এরা যতটা পারে হাত বাড়ায়।”^{২৫৫}

আধুনিক প্রজন্ম জীবনটাকে অর্থের আকাঙ্ক্ষার সাথে যুক্ত করে ফেলেছে। ভোগসর্বস্বতার সংজ্ঞা তাদের অর্থ উপার্জনের দ্বারা সীমাবদ্ধ, এরা বাজে খরচেও বহু পয়সা নষ্ট করে। প্রয়োজনাতিরিক্ত আসবাব কিংবা বাহ্যিক সৌন্দর্য দিয়ে নিজেদের কেতাদুরস্ত জীবনকে প্রকাশ করে। আয়াস বিলাসের মধ্য দিয়ে জীবনকে প্রবাহিত করতে করতে জীবনের মাধুর্যের ভাবনাকেও করে দেয় পরিবর্তিত। হেমদাকান্ত বা সুশীলা এই নতুন দম্পতিকে দেখে সুখী হয়েছিলেন প্রাথমিক পর্যায়ে। তাদের চালচলন, আনন্দ প্রকাশ, খুনসুটি, হাসি-মশকরা দেখে নিজেদের হারিয়ে যাওয়া যৌবনের স্মৃতিকে মনে ফিরিয়ে এনেছিলেন। নতুন দম্পতির সাথে নিজেদের সুখী জীবনকে মিলিয়ে ফেলে মনে করেছিলেন আজকের প্রজন্মও সুখী হতে জানে। “সুখই বলো, আর সুখীই বলো”,... আজকাল কত কম দেখা যায়। রেয়ার। মানুষ কেমন দুঃখী হয়ে গিয়েছে। তাই না।”^{২৫৬} কিন্তু সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে হেমদাকান্ত এই দম্পতির সাথে নিজেদের জীবনাচরণের বিস্তর

প্রভেদ খুঁজে পেয়েছেন। কেতাদুরস্ত, কৃত্রিম, ভোগসর্বস্ব সেই জীবন থেকে তাঁদের জীবনের স্বাভাবিকতা, সাবলীলতা অনেক বেশী মাধুর্যময় বলে তাঁর মনে হয়েছিল। বিলিতি গান, মদ্যপান, কিংবা ইনভার্টারের আলো দিয়ে সাজানো নতুন প্রজন্মের জীবন থেকে তাঁদের এই বৃদ্ধ বয়সের দাম্পত্য সম্পর্কও অনেক মধুর। সুখ, শান্তি, বিষণ্ণতা সব কিছু দিয়ে স্বাভাবিক স্রোতে প্রবাহিত এই জীবন তাঁদের মনে এনে দিয়েছিল পরম নির্ভরতা, বিশ্বাসযোগ্যতা, শান্তি ও মাধুর্য। হেমদাকান্ত ও সুশীলা তাই আজও সুখী।

বিমল কর তাঁর গল্পে মানবিক, পারিবারিক বা সামাজিক সম্পর্কের সাবলীলতা, স্বাভাবিকতার প্রতিই আস্থা পোষণ করেছেন। কৃত্রিমতায় আচ্ছাদিত আধুনিক জীবনের ভোগসর্বস্বতা তাঁকে উদ্ধত করেনি। প্রৌঢ় কিংবা বৃদ্ধ দাম্পত্য প্রেমের ছবিগুলিতে তাই মাধুর্যময়তা পরিলক্ষিত হয়। অন্যায়, পাপ, বঞ্চনা, ক্রুরতা থেকে তাঁর গল্পে জীবনের সহজ বিশ্বাসবোধ, নির্ভরযোগ্যতার প্রতি ফিরে আসার আহ্বান রয়েছে।

‘হেমন্তের সাপ’ (‘দেশ’, ১৯৮৬) গল্পে দুই পুরুষ ও নারীর অবৈধ সম্পর্কের জেরে বিদায় সমাগত যৌবনে তাদের মনে যৌনতার আমন্ত্রণ রয়েছে। হেমন্তের সাপ এখানে প্রতীক হয়ে উঠেছে যার পিছনে রয়েছে গগন ও তার বন্ধুপত্নী ডালিমের অবৈধ সম্পর্ক। কিন্তু এই সম্পর্কের গভীরে যৌবনের সেই উত্তেজনা, উল্লাস নেই, এই দৈহিক সম্পর্কের ভিতরে বিষণ্ণতার স্পর্শ রয়েছে, নিঃশেষ কামনা রয়েছে। বিদায় সমাগত যৌবনে আসীন গগন কিংবা ডালিম আর হারানো জীবনে ফিরে যেতে পারবে না। সামনের পথে বহু যন্ত্রণা, হতাশা, ব্যর্থতার বোঝা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে এই ভাবনা তাদের ভারাক্রান্ত করেছে। গগনের স্ত্রী শোভা তাকে পরিত্যাগ করে চলে গেছে। এখন ও জীবিত না মৃত তা গগনের কাছে রহস্যময়। বিবাহিত জীবন গগনের কাছে সুখের হয়নি। শোভা নিজের থেকে দূরত্ব সৃষ্টি করেছিল। গগনের দাম্পত্য জীবনের চাহিদার কাছে শোভা ধরা দেয়নি। আবার ডালিম, আদিত্যর স্ত্রী, তার কাছেও দাম্পত্য জীবন সুখের নয়। আদিত্যর মেয়ের সাথে আদিত্যর সম্পর্ক ভাল নয়। এমনকি অসুস্থ কন্যার প্রতি সে সহানুভূতি দেখায় না। এই সূত্র ধরেই তাদের দাম্পত্য জীবনেও অশান্তির ছায়া উপলব্ধি করা যায়। আলো কম, ব্রেক বিকল, আনাড়ি লোকের হাতে বউ কে ছেড়ে দিয়ে হয়তো সে ডালিমকে হত্যা করার চেষ্টা করে বলে ডালিম মনে করে। গগনকে সে বলে, ‘তুমি আদিত্যকে যতটা চেন তার চেয়ে বেশী চিনি, —এমন তো হতে পারে গাড়িটা তোমায় দিয়ে গেছে ওলটাবার জন্যেই।’^{২৫৭}

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্কের অবনতি অপর পুরুষকে নিয়ে স্বপ্ন দেখার কথা এ গল্পে প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু গগন এবং ডালিমের মধ্যে সম্পর্কে যৌবনের সেই দাহ লক্ষিত হয় না। স্বপ্নের মধ্যেও পশুত্বের কিংবা আঘাত পাওয়ার চিত্রই ফুটে ওঠে। তাদের ‘এই বয়সে স্বপ্নগুলো খুলোয় ভরা গাছের পাতার মতন’^{২৫৮} — বলে গগন মনে করলেও ডালিম প্রত্যাশা করেছে সেই খুলো খুলে যাবে, ফিরে আসবে আকাঙ্ক্ষা ও তাকে চরিতার্থ করার উদ্যম। ডালিম এবং গগন খারাপ হয়ে যাওয়া গাড়িতে অন্ধকারে বসে থাকে। দূর থেকে লঠন নিয়ে এসে পৌঁছায় নিশীথ নামে একজন লোক, যে সাবধান করে দিয়ে যায় হেমন্তের সাপের কথা বলে, “শেষ বেলার সাপ বিষহরিকেও ডরায় না। নিদ্রা যাবার আগে ফনী বিষে জরজর থাকে। ধরণীর ভিতরে বিষ রাখা যায় না গো, উপরে ফেলে দিয়ে যেতে হয়।”^{২৫৯} যে সাপের খলিতে বিষ আছে সেই কামড়ায়, কিন্তু হেমন্তের যে সাপের খলি বিষশূন্য সে কিভাবে দংশন করবে। কিন্তু বিগত-প্রায় যৌবন গগন ও ডালিমের মধ্যে বিষ রয়েছে। যৌবন পুরোপুরি বিদায় নেওয়ার আগে প্রদীপের শিখার মতো জ্বলে উঠতে চায়। সেই জ্বলনের কারণে গাড়ির অন্ধকারে ডালিম গগনের হাত টেনে নিয়ে যৌনতার আমন্ত্রণ জানায়। কিন্তু গগন উপলব্ধি করে এই অন্ধকারের মধ্যেও তাদের সম্পর্ক চাপা থাকে না। অন্তত পক্ষে নিজে বিবেকের কাছে অপরাধী হতে হয়। গগনের সেই বিবেকই বোধের অতলে গিয়ে নতুন চিন্তার ধারা মেলে দেয়, “লোকটার নাম নিশীথ। দিবা হলেও হতে পারতো। এই দিন, এই রাত্রি, এই যে ষড়ঋতু এদের কাছ থেকে তুমি আমি আমরা যে কিছুই লুকোতে পারি না।”^{২৬০} গল্পের শেষে এসে ডালিম ও গগনের আবেশ সম্পর্কের থেকেও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে গগনের এই ভাবনা। জগতের প্রতিটি ক্রিয়ারই বহুমুখী প্রতিক্রিয়ার মতো তাদের এই সম্পর্ক গোপন আবার একাধারে প্রকাশ্য, নিভৃত আবার সম্প্রসারিত, আবেগমুখী কিন্তু বিষাদবোধে আক্রান্ত।

বিমল কর চারের দশকের শুরু থেকে প্রায় নয়ের দশকের শেষ পর্যন্ত অন্ততপক্ষে পঞ্চাশ বছর ধরে দ্বিশতাধিক নানা ধরনের গল্প লিখেছেন। কিন্তু লক্ষণীয় আটের দশকে তাঁর বেশ কিছু উপন্যাসোপম বড় গল্প পাওয়া যায়। ‘সুনীতিমালার উপাখ্যান’, ‘ইন্দ্রিয়’ প্রভৃতি। আবার নয়ের দশকে বেশ কিছু হাসির গল্প বা সরস গল্প তিনি লেখেন। হাসির গল্প লেখার বা খানিকটা লঘু শ্রেণীর গল্প লেখার প্রবণতা যদিও ছয়ের দশক থেকেই দেখা যায় ‘চারতাস’, ‘বালিকাবধূ’, ‘বসন্তবিলাপ’ প্রভৃতি গল্পকে কেন্দ্র করে, তবুও বলা যায় বাণিজ্যিক পত্রিকার চাহিদা মেটানোর অভিলাষে নয়ের দশকে কিছু সরস গল্প তাঁকে রচনা করতে হয়। কেননা সিরিয়াস গল্প লেখা

তিনি শেষ করেছেন তাঁর ‘উপাখ্যান মালা’ গ্রন্থের পাঁচটি গল্পের মাধ্যমে—এমন মত লেখক প্রকাশ করেছিলেন। ‘উপাখ্যান মালা’ গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছিলেন, ‘এই গল্পগুলি দিয়েই আমি আমার ছোটগল্প লেখার পালা শেষ করলাম।’^{২৬১} ‘উপাখ্যান মালা’র শেষ গল্প ‘নদীর জলে ধরা ছোঁয়ার খেলা’ ‘দেশ’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ২৭শে এপ্রিল ১৯৯১। এর পর তিনি বেশ কিছু হালকা ধরনের গল্প ও উপন্যাস লিখলেও সিরিয়াস গল্প লেখেনি। এ সম্পর্কে তিনি তাঁর পরিচ্ছন্ন মানসিকতা জানিয়েছিলেন, ‘একসময় যত বলার কথা দীর্ঘকাল ধরে নিজের মধ্যে জমেছিল, কখনও সচেতন ভাবে, কখনও ভেতরে-ভেতরে, সে সব তো একে-একে বলা শেষ হয়ে গেল। শুধু গল্পের জন্য গল্প তো আমি লিখতে চাই না। যদি তেমন কোন কথা আমার নতুন ভাবে না জোটে, অকারণ মামুলি গল্প লিখে কী লাভ।’^{২৬২} — সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে তিনি এই সততা রক্ষা করেছিলেন। মনের তাগিদে, আন্তরিক দর্শন ও ভাবনাকে প্রকাশ করার মানসিকতাতেই তিনি গল্প লেখার প্রেরণা লাভ করেছিলেন। তাই কষ্টকল্পিতভাবে গল্প রচনা করতে চাননি।

‘উপাখ্যান মালা’র পাঁচটি গল্পে মানুষের অন্তর জগতের প্রবৃত্তি, আকাঙ্ক্ষা, রিপুতাড়িত জীবনে কামনা বা লালসা, পাপ-পুণ্যের বোধ, জীবনানুরাগ ও মৃত্যুচেতনাকে রূপক-ধর্মিতার মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। আমাদের ভারতীয় সাহিত্যে অনেক প্রকারের প্রতীক ও রূপকধর্মী কাহিনী দেখা যায়। এর মাধ্যমে মানুষের মনে নীতিবোধ জাগ্রত করারও প্রচেষ্টা লক্ষিত হয়, যেমন, ‘পঞ্চতন্ত্র’, ‘হিতোপদেশ’, ‘কথাসরিৎসাগর’, ‘বৌদ্ধজাতক’ প্রভৃতি, আবার বিদেশী সাহিত্যে ‘ঈশপের গল্প’, ‘পিলগ্রিমস প্রোগ্রেস’, কিছু Folk tales এবং Fables প্রভৃতিতেও গল্পের মাধ্যমে মানুষের মনে নৈতিকতা, সত্যদর্শনের প্রতি অনুরাগ ফোটানোর চেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। বিমল কর দীর্ঘদিন ধরে মনের মধ্যে আকাঙ্ক্ষার জন্ম দিয়েছিলেন এই রকমের কিছু আধুনিক গল্প রচনা করবেন বলে, ‘অনেক কাল ধরেই আমার ইচ্ছে ছিল, কয়েকটি অ্যালিগরিক্যাল বা প্রতীকধর্মী গল্প লিখব। ইচ্ছে থাকলেও লেখা হয়ে উঠত না। আজ জীবনের শেষ বেলায় এসে গল্পগুলি যে লিখতে পারলাম— তাতেই আমি খুশী।’^{২৬৩} বিমল করের জীবনদৃষ্টিতে লক্ষ্য করা যায় তাঁর মনে ভালো-মন্দ, উচিত-অনুচিত, নৈতিকতা-অনৈতিকতা, সত্য-মিথ্যা, আকাঙ্ক্ষা-নিবৃত্তি প্রভৃতি বিষয়ে নানা প্রশ্ন তাঁকে আলোড়িত করেছিল। তাঁর গল্পগুলির মধ্যে সেগুলি বার বার ফুটে উঠেছে। ‘উপাখ্যান মালা’য় এসেও তিনি সেই ভাবনায় আন্দোলিত হয়েছেন। তবে এই গল্পগুলি তাঁর বিশেষ ভাবনা বা

মানসিকতাকে প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে লিখিত হয়েছে, এর সাথে সংযুক্ত থেকেছে মানুষের মনের নানা ভাবনার বৈচিত্র্য, আকাঙ্ক্ষার রূপরেখা। মনের তলদেশ থেকে যে বোধের জন্ম হয়েছে জীবন উপভোগের মাধ্যমে এবং জীবনচর্যায় তাই তাদের কাছে প্রজ্ঞা-স্বরূপে ধরা দিয়েছে। এই পাঁচটি গল্প কাহিনীধর্মী এবং সুখপাঠ্য। একমুখীনতা মাধ্যমে এগিয়ে গিয়ে গল্পগুলি অন্তিম পর্যায়ে এসে জ্ঞানচক্ষু উন্মোচিত করে দিয়েছে বিভিন্ন চরিত্রের মনোলোকে। সৃষ্টি হয়েছে অন্তর-জগতে আলোড়ন। জগৎ ও জীবনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে চরিত্রগুলি উপলব্ধি করেছে জীবনের মৌলিক, ধ্রুব বৈশিষ্ট্য এবং জগৎ ও জীবনের সারাৎসার।

সত্যদাস ('দেশ', ১৯৯০) গল্পে রঘুনাথ মুদি ও তার স্ত্রী যমুনার জীবনে এসেছে ধর্মপুর থেকে আসা সত্যদাস নামক চরিত্রটি। সত্যদাস গল্পে দুবার উল্লিখিত হলেও তার অনুপস্থিতিতেও তার প্রভাব থেকে গেছে। রঘুনাথ ও যমুনার জীবনে দারিদ্র্যই ছিল নিত্য সঙ্গী। গ্রামের হলধর বাবুদের দোকানের সাথে তার দোকানের কোন তুলনাই চলে না। কিন্তু দারিদ্র্যের মধ্যে থাকলেও রঘুনাথ ছিল সৎ, নির্লোভ, সে খারাপ জিনিস বিক্রি করত না। ওজনেও কম দিত না। কিন্তু এই রঘুনাথের জীবনে পরিবর্তন এল সত্যদাসের ফেলে যাওয়া মোহরের থলিকে কেন্দ্র করে। পৌষের বুষ্টির রাতে সত্যদাসকে দোকানে আশ্রয় দিয়েছিল রঘুনাথ। তার খাওয়া-থাকার বিনিময়ে কোন পয়সা সে নেয়নি। আন্তরিকতা ও আতিথেয়তার নিদর্শন দেখিয়ে সত্যদাসকে বিদায় জানানোর পর মোহরের থলি সে খুঁজে পায় দোকানঘরে, যে থলিটা আগেরদিন রাতে সে সত্যদাসের কাছে দেখেছিল। আশা-আকাঙ্ক্ষার দোলাচলতায় বেশ কয়েকমাস অপেক্ষা করার পর স্ত্রী যমুনার পরোচনায় একটি একটি করে মোহর বিক্রি করতে করতে সে বাড়িয়ে ফেলল তার দোকান, ঘর, গৃহস্থালি। সে একরকম প্রায় নিশ্চিন্ত হয়ে গিয়েছিল সত্যদাস মারা গেছে, কিংবা ভেবেছিল সত্যদাস মনে করতে পারেনি যে তার দোকানেই সে মোহরের থলি ফেলে গেছে। থলিতে ছিল ছ'টা মোহর এবং দুটো আংটি —সাদা ও কালো পাথরের। সত্যদাসের জীবনে পরিবর্তন এল যেমন আর্থিকভাবে, তেমনি মানসিকতার দিক দিয়েও। আগেকার দরিদ্র জীবনে যে সুর ছিল, যে সরলতা ছিল, রামায়ন পাঠে যে অনুরাগ ছিল, তা যেন সেই মাত্রা পেল না। মানসিক অবসাদ, দুশ্চিন্তা, অপরাধবোধ তাকে যেন গ্রাস করছিল ক্রমশ। এমনভাবে একবছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর রঘুনাথের মন যখন আর্থিক দিক দিয়ে সুখী ও তৃপ্ত তখনই এক পৌষের সন্ধ্যায় পুনরাবির্ভাব ঘটল সত্যদাসের।

এই পর্বে এসে সত্যদাসের প্রতি সেই আন্তরিকতা দেখাতে পারল না রঘুনাথ, যা আগের বছর দেখিয়েছিল। বুকের মাঝে উত্তেজনার পারদ ক্রমশ উচ্চে উঠতে শুরু করেছিল, যদি সত্যদাস সেই মোহর ও আংটির কথা জিজ্ঞাসা করে, এই ভয়ে। প্রতি মুহূর্তে সত্যদাসের পুনরাগমন তাকে নানা সন্দেহাকুলতায় বিদ্ধ করে তুলেছিল— ‘লোকটা কেন এল? কী দরকার ছিল তার আসার। চিতা থেকে মরা মানুষ উঠে আসে না, কিন্তু সত্যদাস যেন সেই ভাবেই এসে পড়েছে।’^{২৬৪} রঘুনাথ বার বার যমুনার সাথে আলোচনা করেছিল কী করা উচিত তাই ভেবে। স্ত্রীর বিষয়বুদ্ধিজাত যুক্তিতে নিজের থেকে মোহরের কথা উত্থাপন করার ক্ষেত্রে প্রশ্ন ছিল না। যমুনার লোভ লালসা চরিতার্থতার ক্ষেত্রে সত্যদাস যেন বিপজ্জনকভাবে তাদের জীবনে বাধা সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে চলে এসেছে বলে যমুনার মনে হয়েছে। সত্যদাস সম্পর্কে সে বলেছে— “বিষ খাইয়ে মেরে ফেলতে ইচ্ছে করে। পাজি, নচ্ছার। কেন এসেছিস তুই? কে আসতে বলেছে। আসবি যদি আগে এলেই পারতিস। শয়তান, হাড়-হারামজাদা।’^{২৬৫} -- যার আর্থিক সহযোগিতায় যমুনা সুখের মুখ দেখেছিল তারই মৃত্যু কামনা করেছে। মানুষের আত্মস্বার্থলোভী মানসিকতার চূড়ান্ত নিদর্শন যমুনা চরিত্রটি। রঘুনাথও সত্যদাসের উপস্থিতি সহ্য করতে পারছিল না সত্যদাসকে তাড়াতাড়ি বিদায় জানানোর জন্য ভোরবেলাতেই সে তার ঘুম ভাঙায়। চা খাওয়ার কথা বললেও তাতে আন্তরিকতার উদ্ভাপ থাকে না। সত্যদাস রঘুনাথের এই আর্থিক স্বচ্ছলতার কথা প্রকাশ করে শুভেচ্ছা জানালেও অর্থ প্রাপ্তির উৎসের সন্ধান জানাতে চায়নি। রঘুনাথ বার বার উৎকর্ষার সাথে প্রত্যাশা করেছে সত্যদাস তার মোহর কিংবা আংটির কথা জানতে চাইবে। নতুবা তার স্বচ্ছলতার কারণ জিজ্ঞাসা করবে। কিন্তু সত্যদাস যেন সচেতনভাবেই এড়িয়ে গেছে সেই প্রশ্ন। নৈতিকতার চাপে বিপর্যস্ত, উৎকর্ষার ঝড়ে আক্রান্ত, স্বীকারোক্তির চেষ্টায় রুদ্ধবাক রঘুনাথ অবশেষে সত্যদাসের বিদায় মুহূর্তে জানতে চেয়েছে সে কিছু ফেলে গিয়েছিল কিনা। সত্যদাস এর উত্তরে আরও উত্তেজনা ফুটিয়ে, নৈতিকতার ঝড় বইয়ে ঈশ্বরের কথা প্রকাশ করেছিল; জীবনের সাদা, কালো, দিন রাতের প্রসঙ্গ তুলে সর্বজ্ঞ ঈশ্বরের কথা প্রকাশ করেছিল। ‘ওই দিন আর রাতটি অনন্তকাল ধরে মিথুন করেছে। আর আমাদের ধরনীটিকে ঘিরে ধরে নৃত্য করে চলেছে ছ’টি ঋতু।’^{২৬৬} —এই ছয়টি ঋতু যেন ষড় রিপূর সাথে তুলনীয়। আমাদের আবুবদ্ধ জীবনে এদের প্রভাব চলতেই থাকে। এদের প্রভাব এড়ানো যেমন কষ্টকর, তেমনি এদের কাছে নিজেদের গোপন করাও সম্ভব নয়। সত্যদাস বলেছে, “দিনরাত আর ঋতুর অগোচরে কিছু থাকে না মশাই। পাপ নয়, লোভ নয়, অন্যায় অর্ধম—

কোনোটিই নয়। এরা সবই দেখে, এদের চক্ষুটির কথা আমরা যেন ভুলে থাকি বাবু। আমাদের সকল দুষ্কর্মই এঁরা দেখেন।’^{২৬৭}

সত্যদাস যেন রঘুনাথের কাছে তার জ্ঞানচক্ষুকে উন্মোচিত করে দিয়ে গেছে। বুঝিয়ে দিয়েছে সত্যদাস যেন ঈশ্বরের মতই সর্বজ্ঞ, তার চোখে এড়ায় না কোন কিছুই। কিন্তু অর্থের লোভ, স্বচ্ছলতার প্রতি অনুরাগ জাগতিক বন্ধন স্বরূপ। যে বন্ধন থেকে মুক্তি পায় না সাধারণ মানুষ। কারণ তারা সত্যদ্রষ্টা নয়। মোহজ্ঞান মাখানো চোখ দিয়ে এই জগৎকে তারা দেখে, ভুল পথে পরিচালিত হয়, প্রবৃত্তির কাছে দাসত্ব করতে করতে ভাবে জীবনের সাফল্য এসে গেছে। কিন্তু অন্তরের মাঝে যে মানুষটি বসে থাকে সে বুঝতে পারে উচিত এবং অনুচিত কোনটা। এই বিবেকের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে স্বীকারোক্তির মাধ্যমে মানুষ চায় পাপস্খলন করতে। তার এই মহতী উদ্দেশ্যের প্রতি ইচ্ছন যুগিয়ে দেয় সত্যদ্রষ্টা ধর্মপুরের সত্যদাসের মত মানুষেরা। রঘুনাথ এখানে প্রবৃত্তির শৃঙ্খলে আবদ্ধ জীব, তাই ধর্মপুর কোথায় সে জানে না। সত্যদাস নামের অর্থও বুঝতে পারে না। তাই সত্যদাসের কাছে সত্য গোপন করার ছেলেমানুষী দেখায়। সত্যদাস শুধু সান্ত্বনা দিয়ে যায়, ‘আপনার দুঃখটি আমি বুঝলাম। আসি মশাই!’^{২৬৮} --সত্যদাস রঘুনাথের দুঃখ বুঝতে পারে, যে দুঃখ তার একান্ত মনোগত, তা হল তার মনে জেগে ওঠা পাপবোধ। মানুষ যখন অসহায়, তখন ঈশ্বর তাকে কৃপা করেন। কিন্তু লোভের বশবর্তী হয়ে যখন সে ভোগসর্বস্বতার পথ বেছে নেয়, তখনই শুরু হয় আত্মিক ক্ষয়। মানুষের জীবনের এই প্রাপ্তি ও অপ্রাপ্তির দার্শনিক ভাবনাও এই গল্পে প্রকাশ পেয়েছে। ব্যঙ্গনাথমী সংলাপ রচনার মাধ্যমে লেখক গল্পটিকে অসাধারণ মমতায় গড়ে তুলেছেন।

‘কাম ও কামিনী’ (‘দেশ’, ১৯৯১) গল্পে মানুষের কামনা চরিতার্থ করার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পেয়েছে। ‘মনসা পাহাড়’ এর শীর্ষে অবস্থিত কামদেবের কাছে প্রার্থনা জানানোর প্রয়াসে। এর পাশাপাশি রয়েছে শিবপদ ও বিজলির ‘তারাময়ী ভাতের হোটেলে’র দারিদ্র্যের ছবি। দুটি চিত্রকে মিলিয়েছেন লেখক কুঞ্জলাল মুখুজেজ নামক একজন অন্ধ মানুষের প্রবৃত্তির সূত্রে। চিনেমাটির খাদে কাজ করা গুদামবাবু-- শিবপদ, তুঁতে পাড়াতে তার পিসির আশ্রয়ে এসে শুরু করেছিল একটি খাওয়ার দোকান। সঙ্গে এসেছিল বিজলি ও তার মেয়ে ফুল্লরা। শিবপদ’র বিবাহিতা স্ত্রী বিজলি নয়, এমনকি ফুল্লরা তার মেয়েও নয়। কিন্তু একদিন বহুভোগ্যা বিজলি জীবনস্রোতে প্রবাহিত হতে হতে শিবপদের উদার মানবিক আশ্রয়ে এসে পৌঁচেছিল। সেই কৃতজ্ঞতার কারণে সে ফুল্লরাকে বাধ্য

করত শিবপদকে পিতৃসম্বোধন করতে। শিবপদ এবং বিজলির উদ্যোগে ছোট দোকানটিকে তারা রূপান্তরিত করেছিল হোটেলো। দুটি ঘর নির্মাণ করেছিল বহিরাগত মানুষদের ভাড়া দেওয়ার জন্য। পিসির কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া এই ঘর বাড়ির মাধ্যমে তাদের সতত প্রচেষ্টা ছিল সুখের মুখ দেখার। তাদের এই দোকান সংলগ্ন স্থানে বৈশাখের একটি মেলা হলেও আসল রোজগারের আশা থাকত কার্তিক পূর্ণিমায় কাম-কামিনীর মেলাকে কেন্দ্র করে।

এমনভাবে কাম-কামিনীর মেলার দু-দিন আগে শিবপদ নিয়ে এল দুজন মানুষকে তাদের ভাড়া দেওয়ার ঘরে। অতিরিক্ত পয়সা উপার্জনের লোভে যে দুজন মানুষ এসে পৌঁছেছিল তারা হল কুঞ্জলাল মুখুজেত্র এবং তার সহকারী সহদেব। সুদর্শন, অভিজাত কুঞ্জলাল মুখুজেত্র তার দৃষ্টি ফিরে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষায় কাম-কামিনীর মেলায় এসেছে। যে মেলায় সৃষ্টি হয় কামের মহোৎসব। এই কাম শুধু মাত্র যৌনতা নয়, কারণ মনসা পাহাড়ের ওপরে যে কামদেব আছেন তিনি মানুষের প্রার্থনা পূরণ করেন। তাঁর কাছে পৌঁছতে চারটি পথের সাহায্য নেওয়া যায় —উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম। দুটি পথে কামার্ত পুরুষেরা বেশ্যা সঙ্গিনীকে নিয়ে তাদের কাম চরিতার্থ করে, অপর দুটি পথের একটি সন্তান কামী নারী পুরুষের জন্য, আর একটি অন্ধ মানুষদের দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাওয়ার কামনা জানানোর জন্য। এই পথ দিয়ে তাদের পাহাড়ের চূড়ায় উঠতে হয় কোন এক নারী সঙ্গিনীর হাত ধরে, যার হাতে থাকে মশাল। ‘উচু কেলাসের’ কুঞ্জবাবু শিবপদের কাছে আর্জি জানায় ফুল্লরাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য। এর বিনিময়ে সে একহাজার টাকা ও সোনার হার দেওয়ারও লোভ দেখায়। এই কথা শোনার পর স্থবির হয়ে যায় বিজলি, সে চিনতে পারে তার জীবনের পাপের কারণ ওই কুঞ্জবাবুকে, পাপের ফল ফুল্লরা। যৌবনের অপরিচিত পথে বিজলিকে পথভ্রষ্ট করেছিল একদিন সে, তার অর্থ, অভিজাত্য, মেকি বিশ্বাসবোধের কাছে নিজেকে সঁপে দিয়ে সর্বস্ব হারিয়েছিল মনোহর পুরের মাঠবাগানের বাগানবাবু ইন্দর রায়ের মেয়ে বিজলি। তার পর বহু পথ পরিক্রমার পর শিবপদের কল্যাণস্পর্শ লাভ করেছিল।

কাম-কামিনীর মেলায় কুঞ্জবাবুর সাথে মনসাপাহাড়ে যাত্রাসঙ্গিনী হয়েছিল বিজলি। সে ফুল্লরাকে একাজে পাঠাতে পারে নি। কারণ ফুল্লরাকে সে নিজের ব্যর্থ জীবনের স্বাদ দিতে চায় না। অবনীর সাথে তার মেয়ের সুখী সম্পর্ককে সে বিশ্বাস করে, ভরসা দেয়। অন্ধ পুরুষ কুঞ্জবাবু আসলে কামান্দ পুরুষ। তাই নিজের সন্তানকেও সে পশুদের মতো চিনতে পারে না। তার অন্তঃচক্ষুকে দৃষ্টিময় করে তোলার জন্য বিজলি গোপনে তার সঙ্গী হয়েছে। জনসমুদ্র থেকে বিচ্ছিন্ন করে

পাহাড়ের বেশ খানিকটা উপরে কুঞ্জবাবুকে তুলে এনে বিজলি প্রতিহিংসা জানানোর চেষ্টা করেছে। নিজের ও ফুল্লরার পরিচয় দিয়ে তার পাপের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। মশালের আগুনে পুড়িয়ে মারতে গিয়েও শেষ মুহূর্তে কামান্দ পশুবৎ মানুষটিকে উপেক্ষা করে ক্ষমা করেছে। কামদেবের কাছে প্রার্থনা জানাতে নিয়ে না গিয়ে পাহাড়ের নীচে নামিয়ে এনেছে। কারণ কুঞ্জবাবুর প্রার্থনার কোন প্রয়োজন নেই, তার কামান্দ চক্ষুকে উন্মোচিত করে দিয়েছে বিজলি নিজেই। সহদেবের মুখ থেকে তাই শোনা গেছে, “আধারটিতো অল্প ছিল না... কতকাল থেকে জমে জমে আপনাকে অন্ধ করে রেখেছিল। সেটি কেটে গেল। এই সহচরটি আপনার সুখ সম্পদের বিলাস বৈভবের দিনটিতেও আপনাকে দেখেছে। আপনি তাকে দেখেন নি। জীবনের ভোগসুখের বেলাটি আপনি আপনার অর্ধেকটি ছিলেন। সুখটুকু নিয়ে জীবন তো নয় বাবু, দুঃখটুকুও তার অংশ। দিনে রাতে দিবস পূর্ণ হয়। জীবন পূর্ণ হয় শোকে তাপে ব্যথায়। আপনি বাবু নিশিকালের নয়নটি আজ লাভ করেছেন।”^{২৬৯} -- এই সহচর হল মানুষের হৃদয়ে বিবেকবোধ। সুখের আতিশয্যে, ভোগের আকাঙ্ক্ষায় তাকে উপেক্ষা করলেও সেই বিবেকই মানুষকে ফিরিয়ে আনে তার জ্ঞানের কাছে। সহচর সেই প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত ছিল। আর বিজলি এখানে কুঞ্জবাবুর অন্তঃকরণে পুঞ্জীভূত পাপ ও কামনার অন্ধ প্রবৃত্তিকে মুক্ত করে ফুটিয়ে তুলেছে জ্ঞানচক্ষু। যে চোখ অন্ধকারেও দৃষ্টি পাবে; সেই দৃষ্টি নিজেকে জানার দৃষ্টি। ক্রন্দনরতা বিজলিকে তাই সান্ত্বনা দেয় শিবপদ। অতীতের দুঃখ থেকেও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি, যার কেন্দ্রে আছে বিজলি। ‘ওই অন্ধ মানুষটি তোমার হাত ধরে দেবতাটির দয়া পেল আজ। তুমি ওই দেবতাটির কামিনী গো!’

কাম ও কামিনী গল্পে রূপকের এই ভাবনা বেশ তীব্রভাবে প্রকাশিত হয়েছে। শিবপদ, বিজলি কিংবা সহদেব এখানে মানুষের নৈতিকতাকে দৃঢ়ভাবে প্রকাশ করেছে, প্রকাশ করেছে মানবিকতার শ্রেষ্ঠত্ব। বিজলি তাই এখানে কুঞ্জবাবুর নয়, দেবতারই কামিনী হয়ে উঠেছে। নাটকীয়তা সমৃদ্ধ এই গল্পটিতে সংলাপের ব্যবহারের মুন্সিয়ানাও যথার্থভাবে ফুটে উঠেছে।

‘ফুটেছে কমলকলি’ (‘দেশ’, ১৯৯১) গল্পটিতে নীলমণি ও কনকের হৃদয়ের গভীর কিন্তু অব্যক্ত ভালোবাসা রূপ পেয়েছে। হৃদয় মন্থন জাত এই ভালোবাসার পিছনে দুঃখ-কষ্ট-যন্ত্রণা-হতাশা যাই থাকুক না কেন তার মধ্য দিয়েই পরম প্রাপ্তিকে খুঁজে পাওয়া যায়, উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে প্রেমের অরূপ রতন। নীলমণি ও কনক ভাইবোন হলেও দুজনে একই মা অথবা বাবার সন্তান নয়। নীলমণির বাবা বিধবা ইন্দুমতীকে যখন বিয়ে করে এনেছিল তখন কনকের বয়স দশ।

নীলমণির সৎমা সম্পর্কে প্রাথমিক দূরত্ব থাকলেও পরে তা কমে আসে। মারা যাওয়ার আগে ইন্দুমতী নীলমণিকে জানিয়েছিল সে কনককে ইচ্ছে করলে বিয়ে করতে পারে। নীলমণি একথার গুরুত্ব দেয়নি তখন। পিতৃবাস পরিত্যাগ করে বাসুদেবগড়ে গড়ে তোলে তার নতুন আত্মনা। সঙ্গে নিয়ে আসে সুন্দরী, যুবতী ভগ্নী-প্রতিম কনককে। আয়ুর্বেদিক ওষুধ তৈরির মাধ্যমে একটি আখড়া গড়ে তোলে তারা -- লোকে বলে নীলু ঠাকুরের আখড়া। প্রতি বছর দোল উৎসবকে কেন্দ্র করে পুরোনো বন্ধু বান্ধবদের সাহচর্যে নীলমণি ও কনকের নিঃসঙ্গতা কাটলেও বছরের আর সব দিন অনুজ্জ্বল, স্বাভাবিক থাকে। এমনই একবছর দোলের কয়েকদিন আগে স্টেশনের মাস্টারবাবুর হাত ঘুরে একটি চৌকোনো ব্যাগ এসে পৌঁছায়, যার ছোট তালিটি খোলা। নীলমণি ভাবে কেউ রসিকতা করে এটিকে পাঠিয়েছে, জিনিসগুলিকে সে চিনতে পারে না। নীলমণি ও কনকের মাঝে এসে পৌঁছায় তাদের পুরোনো বন্ধু ইন্দ্র। ইন্দ্রের মাধ্যমে ধীরে ধীরে প্রকাশিত হয় নীলমণি ও কনকের অব্যক্ত ভালবাসা। ইন্দ্র চরিত্রটি এখানে সূত্রধরের মতো, যার সান্নিধ্যে নীলমণি ও কনকের হৃদয় গত বাসনা রূপ পেয়েছে। কর্মক্ষেত্রে দূরে থাকা নীলমণি তার হারিয়ে যাওয়া ভালবাসার কথা স্মরণ করতে পারে না, ভালবাসার সম্পর্কে উৎসাহ দেখায় না। কিন্তু ইন্দ্রের সাহচর্যে এসে তার মনের গোপন মানসিকতা নতুন রূপ পায়। ইন্দ্রের আবির্ভাবেই একটি গান ইন্দ্রের কণ্ঠে ব্যঞ্জিত হয়ে ওঠে— ‘যারে যে ভালবাসে সে যায় তার পাশে। জেনো লো প্রেম যেখানে, সেখানে ঢলাঢলি...’^{২৭০} ইন্দ্র যেন নীলমণি ও কনকের নিস্তরঙ্গ জীবনে সমুদ্র হিল্লোল, ঝড়ের উদ্দামতা; যে অস্থিরতার মাধ্যমে উচ্চারিত হয় নীলমণির বিগত সময়ের রূপরেখা। ইন্দ্রের গাওয়া ‘অনুগত জনে কেন তুমি এত করো প্রবঞ্চনা’ —গানটি শুনে নীলমণির অন্তঃকরণ থেকে প্রশ্ন উচ্চারিত হয়েছে এ গানটি কিসের ভালোবাসা না দেহতত্ত্বের। উত্তরে ইন্দ্র জানিয়েছে যে প্রেমতত্ত্ব, সেখানে দেহ এবং আত্মার মধ্যে রচিত হয়েছে সংযোগ সূত্র। কিন্তু দেহ থেকে উদ্গত এই ভালোবাসা দেহকে অতিক্রম করে যায়। ‘ভালবাসাটি যখন দেহ ভিন্ন আর কিছু দেখে না—তখন সেটি কাঁচা ভালবাসা। যেমন সোনাটি। ওটি তুমি দেহে রাখো, দেখাবে ভাল। কনককে তাই বলছিলাম সোনাটি রূপোটি দেহের বাইরে থাকে। এটি শোভা। অন্তরে প্রাণে কি স্যাকরার সোনা রাখা যায় গো! সেখানে অন্য সোনা।’^{২৭১} —ইন্দ্রের এই বক্তব্য মনের গভীরে লুকিয়ে থাকা অনুচ্চারিত ভালোবাসার কথা ব্যক্ত হয়েছে।

বিমল করের প্রেম চেতনার বিশেষ দিক এই গল্পে প্রকাশিত হয়েছে। মানুষের অব্যক্ত আকাঙ্ক্ষা তার হৃদয়ে কুরে কুরে খায়--তা প্রকাশের পথ চায়, তবু সেই মানসিক জ্বরের অভাবে তা প্রকাশিত হতে পারে না। নীলমণি ও কনক রক্তের সম্পর্কে ভাই বোন নয়, তবু সম্পর্কের কথা স্মরণ করে নীলমণি তার ভালবাসার কথা প্রকাশ করতে পারে নি। বেওয়ারিশ যে ব্যাগ নীলমণির কাছে এসেছিল সেই ব্যাগেই ছিল নীলমণির ফেলে আসা দিনের স্মৃতি, যা নীলমণি চিনতে পারে নি। যে ঘষা কাঁচের চশমা ছিল, তাই হল নীলমণির দৃষ্টি। সে সঠিক প্রেমভাবনা ও প্রেমাস্পদকে চিনতে পারে না। ইন্দ্রই এখানে সূত্রধর, তার বিগত ভালবাসার কথা প্রকাশ করে উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক প্রতিস্থাপনের চেষ্টা করেছে। বিমল কর জানিয়েছেন সমাজ দেহের পাপ-পুণ্যের বোধই শেষ কথা নয়। ভালবাসা একান্তই মানবিক, সেখানে দেহের পাপ বা শুচিতার বিতর্ক চলে না। “মানুষের দেহটির তলায় পাপ না থাকলে সেটি জীবন হয় না। শিশু বয়সের দেহে আর মৃত মানুষের দেহটিতেই শুধু পাপ থাকে না। কেননা তাতে তার নিজের জীবনটি নেই। ভগবানের এইটেই লীলা।”^{২৭২}

ইন্দ্র সোনালী হাঁসের রূপকথার গল্প শুনিye নীলমণির হৃদয়ের ভালবাসার তত্ত্বটিকে দার্শনিক ভিত্তির ওপর প্রোথিত করেছে। ইন্দুমাসিও একদিন নীলমণির কাছে ভালবাসার তিনটি ঘরের কথা উল্লেখ করেছিল। ইন্দ্রও সেই ভালবাসার তত্ত্বটিকে প্রকাশ করেছে। “দেহ আর রূপ যদি ভালবাসার প্রথম ঘরটি হয় তবে তার অন্য দুটি ঘর হল—মন আর হৃদয়। প্রথমটি দৃশ্য, অন্য দুটি দেখা যায় না।”^{২৭৩} —একারণেই ভালবাসার পূর্ণতা আসে দেহ ও মনের অপূর্ব সহাবস্থানে। নীলমণি আত্মপ্রবঞ্চনার মাধ্যমে তার অন্তরের ভালবাসাকে রুদ্ধ করে রেখেছিল, কনক এবং সে দুজনেই দুঃখ ভোগ করেছিল, কিন্তু সমুদ্র মগ্ননের মতো হৃদয় মগ্ননের মাধ্যমে দুঃখ-যন্ত্রণার পর লাভ করেছিল পূর্ণ ভালবাসা।

‘যুধিষ্ঠিরের আয়না’ (‘দেশ’, ১৯৯১) গল্পে যুধিষ্ঠিরের মাধ্যমে সত্যদর্শন ঘটেছে গগনচন্দ্র ও তার পরিবারের সদস্যদের। বড়দিনে ফুটি করতে গিয়ে শহর থেকে ফেরার সময় মোটর সাইকেল দুর্ঘটনায় আহত হয় গগনচন্দ্র। চালচুলোহীন, সহজ, সরল, নির্বিকার যুধিষ্ঠির তাকে উদ্ধার করে বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে আসে। কাঠের কাজ জানার সুবাদে যুধিষ্ঠির কিছুদিন তার বাড়িতে থেকে যায়। অনেক আসবাব, দরজা-জানালায় কাজের পাশাপাশি একটা পুরোনো আয়না সারিয়ে দিয়ে গগনচন্দ্রকে বলেছিল ওটি যত্ন করে ঘরে রেখে দিতে। গগনচন্দ্রের যুধিষ্ঠিরকে ভাল লাগলেও তার

স্ত্রী রোহিণী কিংবা কমলাদিদি তাকে সন্দেহের চোখে দেখত। কমলাদিদির হার হারিয়ে যাওয়ায়, কিংবা ময়নাদাসীর প্রয়োজনে তাকে টাকা দেওয়ার পিছনে যুধিষ্ঠির সম্পর্কে কুরুচিকর মন্তব্য করেছিল রোহিণী ও কমলাদিদি। যুধিষ্ঠির কখনোই তাদের বিরুদ্ধে কথা না বলে হাসিমুখে বিদায় নিয়েছিল। এরপর একদিন সেই আয়নায় মুখ দেখতে গিয়ে রোহিণী আতঙ্কে চিৎকার করে উঠেছিল, কমলাদিদির হাত ভাঙা আয়নার কাঁচে কেটে গেছিল, আহত হয়েছিল গগনচন্দ্রও। ঘটনা পরস্পরায় একদিন যুধিষ্ঠিরের সাথে গগনচন্দ্রের দেখা হওয়ার পর যুধিষ্ঠিরের বলা রূপকথার গল্পের মাধ্যমে সত্যদর্শন ঘটল গগনচন্দ্রের। যুধিষ্ঠির যেন তার গল্পে বলা মানস সরোবর থেকে উড়ে আসা হাঁস। কাকেদের ঠোঁকর খেয়েও সে কাকেদেরকেই উদ্ধার করেছে; সত্যদর্শন ঘটিয়েছে গগনচন্দ্রের মতো আধুনিক মানুষদের, যাদের মধ্যে ওই দোষটি থাকে, ‘তারা দস্ত করে, অকথা কুকথা বলে, অন্যকে বিনি দোষে ঠোঁকরায়। কেউ নিজেরটিকেই বড় বলে ভাবে, কেউ অন্যকে ছোট করে আনন্দ পায়।’^{২৭৪}

যুধিষ্ঠির এই সকল মানুষদের চরিত্রের পরিবর্তন ঘটাতে চায়। মানবিক ভাবনায় উদ্বুদ্ধ করে তুলতে চায়। তার সারানো আয়না তারই প্রতীক। এই আয়নার মাধ্যমে মানুষ নিজের স্বরূপটিকে প্রকৃতভাবে উপলব্ধি করতে পারে। এই আয়নায় প্রতিবিম্বিত হয় তার লোভ-লালসা-ঈর্ষা-অন্যায় মানসিকতার স্বরূপ। মানুষের দেহের ভিতরেও যে আর একটি দেহ আছে, যা অপর মানুষদের দৃষ্টির অগম্য, তাই দেখতে পায় ওই দেহ ধারণকারী ব্যক্তি মানুষটি। রোহিণী তার বাহ্যিক অলঙ্কৃত মুখটিকে আয়নায় দেখতে গিয়েছিল, তার বদলে ফুটে উঠেছিল তার অন্তরাআর বীভৎস স্বরূপ— তার প্রকৃত রূপ; যে রূপ বিনা কারণে দোষারোপ করেছে, সন্দেহ করেছে যুধিষ্ঠিরকে। কমলাদিদির হাত ক্ষতবিক্ষত হয়েছে সেই পাপে। অপেক্ষাকৃত কম আঘাত লেগেছে গগনচন্দ্রের কারণ তার পাপও কম। যুধিষ্ঠিরের আয়না মানুষের কাছে সত্যদর্শনের চাবিকাঠি। গগনচন্দ্রের পূর্বপুরুষ সেই আয়নায় মুখ দেখে নিজের পরিবর্তিত করে তুলতো। এই পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষাও মানবিক —যারা চায় পরিবর্তিত হতে তারা ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার মাধ্যমে তা সম্ভব করতে পারে। যুধিষ্ঠির বলেছে, “নিজের মুখটি সেই আরসিতেই দেখতে হয় মাঝে মাঝে। দেখলে বোঝা যায়, কার মুখটি কেমন! ওটি তো আপনার অন্তরে আছে! নাই, বলুন!”^{২৭৫} গগনচন্দ্র উপলব্ধি করতে পেরেছে কমলা দিদির সাথে তার সম্পর্ক, রোহিণীর ঈর্ষান্বিত মানসিকতা, সন্দেহপ্রবণতা সবকিছুই যেন যুধিষ্ঠিরের কাছে পরিষ্কার। ‘গগনচন্দ্রের মনে হল, যুধিষ্ঠির যেন

নিজেই সেই গল্পের হাঁস, এসেছিল হঠাৎ, তাদের বড় জ্বদ করে চলে গেল। না, জ্বদ করে নয়, বোধ হয় ডুবন্ত কাকের মতন তাকেও পিঠে করে তুলে এনে আবার বাঁচিয়ে দিয়ে গেল।^{২৭৬} ‘সত্যদাস’ গল্পের সত্যদাসের মতো যুষ্টিষ্ঠিরও যেন এই গল্পে মানব চরিত্রের গোপন অঙ্ককারগুলিকে উন্মুক্ত করেছে সত্যদর্শনের মাধ্যমে, নৈতিকতার পথে মানুষকে এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা দিয়েছে।

‘নদীর জলে ধরা ছোঁয়ার খেলা’ (‘দেশ’, ১৯৯১) গল্পে বিমল করের মৃত্যুচেতনা বিশেষ স্বরূপে প্রকাশিত হয়েছে। মানব-জীবনের প্রতি অনুরাগ তাকে মৃত্যুর পথ থেকে সরে আসার আমন্ত্রণ জানায়। সংক্ষিপ্ত আয়ুবদ্ধ জীবনে কখন যে মৃত্যু হানা দেয় তার কোন খবর মানুষের কাছে থাকে না। অসহায় নিয়তিভাঙিত এই জীবনে মৃত্যুর মাধ্যমে ঘটে পরিসমাপ্তি। তবুও মৃত্যুকে ঠেকানোর চেষ্টা মানুষের মধ্যে দেখা দেয়, যেমনভাবে এই গল্পে নন্দকিশোরের মধ্যে দেখা গিয়েছিল। বিমল করের বহু গল্পে মৃত্যুভাবনা বিশেষ বিষয় হয়ে উঠেছে। ‘অম্বিকানাথের মুক্তি’ দিয়ে যে পথ চলার শুরু হয়েছিল, ‘আত্মজা’, ‘শূন্য’, ‘সুখাময়’, ‘জননী’, ‘অপেক্ষা’, ‘আমরা তিন প্রেমিক ও ভুবন’, ‘সংশয়’ প্রভৃতি পর্যায় অতিক্রম করে গল্পকার জীবনের প্রায় শেষ পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। কোথাও বা মৃত্যুকে ঘিরে ভয় দেখা গেছে, কখনো সেই মৃত্যু দার্শনিকতা নিয়ে এসেছে। কোথাও আত্মহত্যার মাধ্যমে পরিচ্ছন্ন জীবন ভাবনার প্রত্যাশা প্রকাশিত, কোথাও আবার মৃত্যুর পর শান্তি ও স্বস্তি কামনায় মৃত আত্মার প্রতি নিবিষ্ট হতে দেখা গেছে। ‘নদীর জলে ধরা ছোঁয়ার খেলা’য় অবথারিত মৃত্যুর সাথে মানবিক উদ্বেজনা তাকে দূরে ঠেলে দেওয়ার বা তাকে পরাজিত করার প্রবৃত্তি প্রকাশিত হয়েছে। ‘মহারাজ’ --মৃত্যুর সাথে একান্ত আলাপচারিতার মাধ্যমে গড়ে উঠেছে গল্পটি।

নন্দকিশোর চুয়ান বছর বয়সে তার বুদ্ধি, উদ্যম, সাহসিকতার মাধ্যমে তার এলাকার একজন সফল, অভিজাত, গণ্যমান্য মানুষরূপে প্রতিভাত। তার কথায় এটা মৃত্যুর বয়স নয়। সে মহারাজকে চলে যেতে বলেছে প্রাথমিকভাবে; তাতে সফল না হওয়ায় তার মনে হয়েছে মহারাজের সাথে একটা চুক্তিতে আসা যাক-- সে সাতার কাটবে, যদি সে সাতার কাটতে কাটতে মহারাজের অলক্ষ্যে পাড় ছুঁতে পারে তাহলে সেই মুহূর্তে তাকে জীবন ফিরিয়ে দিতে হবে। নন্দকিশোরের ঈশ্বরভক্তি তেমন নেই। তাই স্ত্রী মণিমালা নদীর ধারে মন্দিরে তার সুস্থতার কারণে সন্ন্যাসী বাবার কাছে এসে মন্দির নির্মাণের আর্জি জানাতে চাইলেও, সে মন্দিরে যেতে চায়নি।

নদীর পাড়ে বসে থেকেছে। সে কারণেই যমরাজের মত দেবতাকেও সে সামান্য বলেই মনে করেছে। দেবতা সর্বজ্ঞ, তাঁর কাছে মানব ক্রীড়নক মাত্র, একথা তার মনে প্রশ্নই পায়নি। তাই অবধারিত মৃত্যুর দেবতার সাথে সে চুক্তি করে বাঁচতে চেয়েছে। বার বার পাড়ের দিকে আসতে চেয়েছে সাঁতার কাটতে কাটতে, কিন্তু তখনই আত্মপ্রকাশ করেছেন মহারাজ। নন্দকিশোরের মাধ্যমে বিমল কর মানুষের বেঁচে থাকার প্রবৃত্তিকে অপূর্ব ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। নন্দকিশোরের মনে হয়েছে এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা যুদ্ধের মতন— ‘যদি আমি পিছিয়ে যাই আমি হেরে যাব। যদি পালিয়ে যাই— আমার যশ ও কীর্তি নষ্ট হবে। যদি জিততে পারি আমি বিজয়ী হব।’^{২৭৭} নিজের ব্যক্তিত্বকে এখানে মূল্যবান মনে করেছে নন্দকিশোর। মনসা-মঙ্গলের চাঁদ সদাগর তাঁর প্রবল ব্যক্তিত্বের জোরে দেবী মনসার বিরুদ্ধাচরণ করেছিলেন। মধ্যযুগের সাহিত্যে চাঁদ সদাগর একমাত্র কঠোর ও প্রবল ব্যক্তিত্বের অধিকারী, যার কোন দোসর নেই। এই গল্পের নন্দকিশোরও মানবিক ভাবনায় সমৃদ্ধ হয়ে পরম শক্তিমান সর্বজ্ঞ ঈশ্বরের মুখোমুখি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছে। নন্দকিশোর হেরে গেছে ঠিকই, কিন্তু তার এই অকুতোভয় মানসিকতা, নিজ ব্যক্তিত্বের প্রতি শ্রদ্ধা তাকে অসাধারণ মানব-চরিত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে।

নন্দকিশোরও জানে, ‘কোন জীবই মৃত্যুকে ফাঁকি দিতে পারে না... কিন্তু এমন তো হয়— মৃত্যু এসেও ফিরে যায় অনেক সময়, তখনকার মতন, হয়ত কম সময়ের জন্যে, হয়ত বেশি সময়ের জন্যে, তারপর সে আবার আসে। রোগ, শোক, আঘাতে কতবার বুঝি মৃত্যু আসে মানুষের কাছাকাছি, এসেও শেষ পর্যন্ত জীবনের শিখাটি নেভাতে পারে না, ফিরে যায়, অপেক্ষা করে অন্য কোন সুযোগের।’^{২৭৮} নন্দকিশোর এখানে যেমন সমাগত মৃত্যুর কাছ থেকে আরও কয়েকটি মুহূর্ত, দিন, মাস কিংবা বছর ছিনিয়ে নিতে চেয়েছে, তেমনি তার কথায় মৃত্যু যেন অভিসন্ধিসু সুযোগ প্রত্যাশী, হীন চরিত্রের অধিকারী একজন মানুষ হয়ে উঠেছে। কিন্তু এই মৃত্যুই অবধারিত। রোগাক্রান্ত নন্দকিশোরের কাছে এসে তাকে এই জীবন থেকে মুক্ত করবেন তিনি। তাঁর স্বরূপ ব্যাখ্যাত হয়েছে এই গল্পে। স্বপ্নে ও আশায় উদ্ভুদ্ধ জীবনে মানুষ এই মৃত্যুকে ভুলে যেতে চায়! “আমাকে মনে রাখলে বাঁচা যায় না, আমাকে ভুলে গিয়েও কি বাঁচা যায়!” মহারাজের এই উদ্ধৃতিতেই ধরা আছে জীবনের সারসত্য। মৃত্যু চিন্তায় বিকল মানুষ জীবনের সংজ্ঞা ভুলে যায়। অহেতুক মনের মাঝে পোষণ করে মৃত্যুভয়, গ্লানি, অবসাদ। আবার এই জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে মৃত্যুর মাধ্যমেই। নন্দকিশোর যতবার তার সুখের অনুভূতির আতিশয্যে

ডুব সাঁতার দিয়ে পাড়ের কাছাকাছি আসতে চেয়েছে ততবারই ব্যর্থ হয়েছে, মৃত্যু আরও কাছে এসেছে। নদীর পাড়, জীবনের লোমহর্ষ এখানে মায়া। মায়াবদ্ধ জীব ধীরে ধীরে চলে আসে মৃত্যুর কাছে। তার জীর্ণ শরীর থেকে মৃত্যুর পর মুক্ত হয় তার আত্মা—

‘বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহতি নরো’ পরাগি।

‘তথা শরীরানি বিহায় জীর্ণা ন্যান্যানি সংযাতি নবানি দেহী ॥’

(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২২নং শ্লোক, গীতা প্রেস, পৃষ্ঠা-৪৪)

এই স্বাভাবিকতাই জড়িয়ে আছে মানুষের জীবন ও মৃত্যুর দর্শনে। তবুও বেঁচে থাকার অকুণ্ঠ স্বাদ লাভ করতে চায় মানুষ, জীবনের সমস্ত আকাঙ্ক্ষিত কাজ পরিসমাপ্ত করতে চায়। এর পিছনে লুকিয়ে থাকে তার জীবনের প্রতি অনুরাগ। রহস্যময় মৃত্যুর কাছে তাই সহজে সে নিজেকে সঁপে দিতে পারে না। নন্দকিশোরও পারেনি। তার পরাজয়ের মাধ্যমে সেই আকাঙ্ক্ষা আরো তীব্রভাবে প্রকাশিত হয়েছে। বিমল করের মৃত্যুভাবনার দিক থেকে এই গল্পটি তাই বিশিষ্ট।

অর্ধশতাব্দীর বেশি সময় ধরে লেখা গল্পগুলির মধ্যে সূক্ষ্ম একটি পালাবদল লক্ষ্য করা যায়। লেখক যে পর্ববিভাগ করেছিলেন তার সাথে কিছুটা সামঞ্জস্য এখানে লক্ষিত হয়। তবুও বলতে হয় নিজস্ব অনুভূতি, দর্শন কিংবা চরিত্রের মনোবিশ্লেষণের রীতি রূপ বদল করলেও সহজাত স্বভাব-সিদ্ধতা প্রথমাবধিই লেখকের মধ্যে ছিল।

‘মানবপুত্র’ পর্যন্ত লেখা গল্পগুলিতে কাহিনীধর্মিতা লক্ষণীয়, কাহিনী বর্ণনার সাথে চরিত্রগুলি কিংবা গল্পের কাঠামো প্রচলিত রীতিকে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছিল। এর পর থেকে মনস্তাত্ত্বিক রচনার প্রতি লেখকের কিছুটা দুর্বলতা লক্ষিত হয়। ‘কাচঘর’, ‘জোনাকি’, ‘বকুলগন্ধ’ থেকে শুরু করে ‘যযাতি’, ‘পলাশ’ প্রভৃতি গল্পে মানুষের মনোগহনে গূঢ়চারী ইচ্ছা অনিচ্ছার নিরিখে তার মনোবিশ্লেষণ বিশেষ রূপ পেয়েছে। ‘সুখাময়’ থেকে বিমল করের গল্পে মানুষের জীবনের সাথে নানা তত্ত্বগত বিষয়ের সম্পর্ক দ্যোতিত হয়েছে। জীবনের চাওয়া-পাওয়া, স্নেহ, প্রেম-দুর্বলতা, দেহ-দেহাতীত সৌন্দর্য, মানসিক দৃঢ়তা ও সংশয়, জীবনের অস্তিত্ব ও মৃত্যুভাবনা সমস্ত কিছু দার্শনিক ভাবনার সাথে জীবনের প্রকৃত রূপের পর্যালোচনা এই পর্বে লক্ষিত হয়। এই পর্বে গল্পের কাহিনী বা ঘটনাংশ অনেকটাই কম এবং সে জায়গায় চরিত্রের মনোবিশ্লেষণ বিশেষ রূপ পেয়েছে। মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্কের বন্ধন ও বন্ধনমুক্তি এই গল্পগুলির বিশেষ দিক। ‘শীতের মাঠ’, ‘ত্রিলোচন নন্দীর নামে ছড়া’, ‘জননী’, ‘উদ্বেগ’, ‘অপেক্ষা’, ‘সোপান’, ‘আমরা তিন প্রেমিক ও

ভুবন', 'মোহনা' প্রভৃতি গল্পে মানব মনের রহস্যময়তার পাশাপাশি মৃত্যুভাবনা, অস্তিত্বের সংকট, প্রেমচেতনা, দার্শনিকতা, অতীতচরিতা মুখ্য বিষয় হয়ে উঠেছে। প্রতীকের মাধ্যমে মানুষের জীবনের বিশেষ ভাবনাকেও এখানে প্রকাশ করেছেন লেখক। 'সুখ' গল্প থেকে লক্ষ্য করা গেছে লেখক শান্ত ও স্তিমিত হয়ে নানা তত্ত্বগত ভাবনা গল্পের মধ্যে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। আবেগ ও জীবনবোধের গভীরতা এখানে থাকলেও তার মধ্যে উচ্ছ্বাস নেই। দাম্পত্য-সম্পর্ক বা মানবিক সম্পর্কের মধ্যেও জীবনের দর্শন বা গভীর কোন উপলব্ধি চরিত্রের মধ্যে বিশ্লেষণী ক্ষমতার প্রকাশ ঘটিয়েছে। 'আয়োজন', 'হেমঙ্গের ঘরবাড়ি', 'এরা ওরা', 'হেমন্তের সাপ' প্রভৃতি গল্পে সমকালীন পরিস্থিতির সাথে জীবনের প্রবৃত্তি ও প্রত্যাশার গভীর সূত্র খোঁজার প্রয়াস রয়েছে। এই সমস্ত গল্পের মধ্যে অত্যন্ত গভীরভাবে বিমল কর তাঁর জীবন ও জগৎ সম্পর্কে তাঁর নিজের হৃদয়-লালিত প্রত্যাশাকে প্রকাশ করেছেন, যার সাথে সনাতন প্রেম, মানবিক সম্পর্ক, অধ্যাত্ম ভাবনা, চরিত্রের মনস্তত্ত্ব বিশেষ রূপ পেয়েছে। এর পরবর্তীকালে লেখা 'উপাখ্যান মালার' গল্পগুলিতে রূপকের মাধ্যমে লেখক তাঁর জগৎ ও জীবনের সৌন্দর্যবোধক নিজস্ব চিন্তা ভাবনাকে যথার্থভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। লেখকের জীবনদৃষ্টির বৈচিত্র্যের সাথে এই গল্পগুলির ভাবনার ওতপ্রোত সম্বন্ধ রয়েছে।

উৎস পরিচয়

১. ‘গল্পসংগ্রহ’— বিমল কর, প্রকাশক ব্রজকিশোর মন্ডল, মহালয়া-১৩৮৭, পৃষ্ঠা-১৪

২. ‘উড়োখই’(প্রথম পর্ব)—বিমল কর, আনন্দ পাব. প্রাঃ লিঃ, সেপ্টেম্বর-২০০১, পৃষ্ঠা-১৮৪

৩. প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়ের নেওয়া বিমল করের সাক্ষাৎকার, ‘বিভাব’ পত্রিকা,

বইমেলা সংখ্যা-১৪১০, পৃষ্ঠা-৪৮

৪. ‘অস্বিকানাথের মুক্তি’—বিমল কর, ‘বিভাব’ পত্রিকা, বইমেলা সংখ্যা-১৪১০, পৃষ্ঠা-৭১

৫. তদেব পৃষ্ঠা-৭৭

৬. তদেব পৃষ্ঠা-৭৪

৭. ‘অন্তরে’—বিমল কর, তীর কুঠার, বইমেলা-২০০৩, পৃষ্ঠা-২

৮. তদেব, পৃষ্ঠা-৬

৯. তদেব, পৃষ্ঠা-৭

১০. ‘পিয়ারীলাল বার্জ’, ‘গল্পসংগ্রহ’— বিমল কর, প্রকাশক ব্রজকিশোর মন্ডল, মহালয়া-১৩৮৭, পৃষ্ঠা-৪৩

১১. তদেব, পৃষ্ঠা- ৪৬

১২. তদেব, পৃষ্ঠা- ৪৭

১৩. ‘ভয়’, ‘গল্পসংগ্রহ’— বিমল কর, প্রকাশক ব্রজকিশোর মন্ডল, মহালয়া-১৩৮৭, পৃষ্ঠা-১৪১

১৪. তদেব, পৃষ্ঠা-১৪৬

১৫. তদেব, পৃষ্ঠা-১৪৭

১৬. তদেব, পৃষ্ঠা-১৪৮

১৭. তদেব, পৃষ্ঠা-১৪৬

১৮. প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়ের নেওয়া বিমল করের সাক্ষাৎকার, ‘বিভাব’ পত্রিকা,

বইমেলা সংখ্যা-১৪১০, পৃষ্ঠা-৪৯

১৯. ‘ইদুর’—‘বিমল করের পঞ্চাশটি গল্প’—বিমল কর, আনন্দ পাব. প্রাঃ লিঃ, ২০০১, পৃষ্ঠা-১৬

২০. তদেব, পৃষ্ঠা-২৩

২১. তদেব, পৃষ্ঠা-২৯

২২. তদেব, পৃষ্ঠা-২৯

২৩. তদেব, পৃষ্ঠা-২১

২৪. তদেব, পৃষ্ঠা-২৭

২৫. তদেব, পৃষ্ঠা-২৪

২৬. তদেব, পৃষ্ঠা-২৭

২৭. প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়ের নেওয়া 'বিমল করে'র সাক্ষাৎকার, 'বিভাব' পত্রিকা, বইমেলা-১৪১০, পৃষ্ঠা-৪৯

২৮. 'বরফ সাহেবের মেয়ে'—'বিমল করে'র পঞ্চাশটি গল্প'—বিমল কর,

আনন্দ পাব প্রাঃ লিঃ, ২০০১, পৃষ্ঠা-৩৩

২৯. তদেব, পৃষ্ঠা-৩৫

৩০. তদেব, পৃষ্ঠা-৩৬

৩১. তদেব, পৃষ্ঠা-৩৫

৩২. তদেব, পৃষ্ঠা-৪২

৩৩. তদেব, পৃষ্ঠা-৪৫

৩৪. 'মানবপুত্র'—'বিমল করে'র পঞ্চাশটি গল্প'—বিমল কর, আনন্দ পাব প্রাঃ লিঃ, ২০০১, পৃষ্ঠা-৫০

৩৫. তদেব, পৃষ্ঠা-৫১

৩৬. তদেব, পৃষ্ঠা-৫৩

৩৭. তদেব, পৃষ্ঠা-৫৪

৩৮. তদেব, পৃষ্ঠা-৫০

৩৯. তদেব, পৃষ্ঠা-৪৮

৪০. 'উড়েখই' (প্রথম পর্ব)—বিমল কর, আনন্দ পাব প্রাঃ লিঃ, সেপ্টেম্বর-২০০১, পৃষ্ঠা-১২৮

৪১. 'মানবপুত্র'—'বিমল করে'র পঞ্চাশটি গল্প'—বিমল কর, আনন্দ পাব প্রাঃ লিঃ, ২০০১, পৃষ্ঠা-৫১

৪২. তদেব, পৃষ্ঠা-৬৬

৪৩. তদেব, পৃষ্ঠা-৬০

৪৪. 'কাচঘর' 'বিমল করে'র বাছাই গল্প', মডল বুক হাউস, মার্চ-১৪০৭, পৃষ্ঠা-৭৯

৪৫. তদেব, পৃষ্ঠা-৮০

৪৬. তদেব, পৃষ্ঠা-৮২

৪৭. তদেব, পৃষ্ঠা-৮৩

৪৮. তদেব, পৃষ্ঠা-৮৭

৪৯. 'জোনাকি' 'বিমল করে'র বাছাই গল্প', মডল বুক হাউস, মার্চ-১৪০৭, পৃষ্ঠা-৯১

৫০. তদেব, পৃষ্ঠা-৯৫

৫১. তদেব, পৃষ্ঠা- ১০১

৫২. 'বকুলগন্ধ'—'বিমল করে'র পঞ্চাশটি গল্প'—বিমল কর, আনন্দ পাব প্রাঃ লিঃ, ২০০১, পৃষ্ঠা-৭০

৫৩. তদেব, পৃষ্ঠা-৭৬

৫৪. 'পার্ক রোডের সেই বাড়ি'—'বিমল করে'র পঞ্চাশটি গল্প'—বিমল কর,

আনন্দ পাব প্রাঃ লিঃ, ২০০১, পৃষ্ঠা-৮১

৫৫. তদেব, পৃষ্ঠা-৭৮
৫৬. তদেব, পৃষ্ঠা-৮৬
৫৭. তদেব, পৃষ্ঠা-৮৭
৫৮. তদেব, পৃষ্ঠা-৮৬
৫৯. তদেব, পৃষ্ঠা-৮৬-৮৭
৬০. 'দুই বোন'--'বিমল করের পঞ্চাশটি গল্প'--বিমল কর, আনন্দ পাব প্রাঃ লিঃ, ২০০১, পৃষ্ঠা-৯০
৬১. তদেব, পৃষ্ঠা-৯৪
৬২. 'আমার লেখা', 'গল্পসংগ্রহ'-- বিমল কর, প্রকাশক ব্রজকিশোর মন্ডল, মহালয়া-১৩৮৭, পৃষ্ঠা-২০
৬৩. প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়ের নেওয়া বিমল করের সাক্ষাৎকার, 'বিভাব' পত্রিকা, বইমেলা-১৪১০, পৃষ্ঠা-৫২
৬৪. তদেব, পৃষ্ঠা-৫২-৫৩
৬৫. 'আত্মজা'--'বিমল করের পঞ্চাশটি গল্প'--বিমল কর, আনন্দ পাব প্রাঃ লিঃ, ২০০১, পৃষ্ঠা-১০৬
৬৬. তদেব, পৃষ্ঠা-১০৭
৬৭. তদেব, পৃষ্ঠা-১০৮
৬৮. তদেব, পৃষ্ঠা-১১০
৬৯. 'উদ্ভিদ'--'বিমল করের পঞ্চাশটি গল্প'--বিমল কর, আনন্দ পাব প্রাঃ লিঃ, ২০০১, পৃষ্ঠা-১২০
৭০. প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়ের নেওয়া বিমল করের সাক্ষাৎকার, 'বিভাব' পত্রিকা, বইমেলা-১৪১০, পৃষ্ঠা-৫১
৭১. 'উদ্ভিদ'--'বিমল করের পঞ্চাশটি গল্প'--বিমল কর, আনন্দ পাব প্রাঃ লিঃ, ২০০১, পৃষ্ঠা-১১২
৭২. তদেব, পৃষ্ঠা-১১৩
৭৩. তদেব, পৃষ্ঠা-১২০
৭৪. তদেব, পৃষ্ঠা-১২০
৭৫. 'বুদবুদ', 'জোনাকি'-বিমল কর, বাসন্তী বুক স্টল, জন্মাষ্টমী-১৩৬২, পৃষ্ঠা-৫৬
৭৬. তদেব, পৃষ্ঠা-৫৭
৭৭. তদেব, পৃষ্ঠা-৬৭
৭৮. প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়ের নেওয়া বিমল করের সাক্ষাৎকার, 'বিভাব' পত্রিকা, বইমেলা-১৪১০, পৃষ্ঠা-৫১
৭৯. 'পিসিলার প্রেম'--'বিমল করের পঞ্চাশটি গল্প'--বিমল কর, আনন্দ পাব প্রাঃ লিঃ, ২০০১, পৃষ্ঠা-১৪১
৮০. তদেব, পৃষ্ঠা-১৪০
৮১. তদেব, পৃষ্ঠা-১৪৯
৮২. তদেব, পৃষ্ঠা-১৪৯
৮৩. 'পালকের পা'--'বিমল করের পঞ্চাশটি গল্প'--বিমল কর, আনন্দ পাব প্রাঃ লিঃ, ২০০১, পৃষ্ঠা-১২৫
৮৪. তদেব, পৃষ্ঠা-১২৭

৮৫. তদেব, পৃষ্ঠা-১২৭
৮৬. তদেব, পৃষ্ঠা-১২৭
৮৭. তদেব, পৃষ্ঠা-১৩০
৮৮. ‘শূন্য’—‘বিমল করে পঞ্চাশটি গল্প’—বিমল কর, আনন্দ পাব. প্রাঃ লিঃ, ২০০১, পৃষ্ঠা-১৬৫
৮৯. ‘উড়োখই’ (দ্বিতীয় পর্ব)—বিমল কর, আনন্দ পাব. প্রাঃ লিঃ, জুলাই-১৯৯৭, পৃষ্ঠা-৪৬
৯০. ‘শূন্য’—‘বিমল করে পঞ্চাশটি গল্প’—বিমল কর, আনন্দ পাব. প্রাঃ লিঃ, ২০০১, পৃষ্ঠা-১৬৬
৯১. তদেব, পৃষ্ঠা-১৬৬ ;
৯২. তদেব, পৃষ্ঠা- ১৭১
৯৩. তদেব, পৃষ্ঠা- ১৭২
৯৪. ‘জানোয়ার’—‘বিমল করে পঞ্চাশটি গল্প’—বিমল কর, আনন্দ পাব. প্রাঃ লিঃ, ২০০১, পৃষ্ঠা-১৫৬
৯৫. তদেব, পৃষ্ঠা-১৫৫
৯৬. তদেব, পৃষ্ঠা-১৫৯
৯৭. তদেব, পৃষ্ঠা-১৬০
৯৮. ‘অশুখ’—‘বিমল করে পঞ্চাশটি গল্প’—বিমল কর, আনন্দ পাব. প্রাঃ লিঃ, ২০০১, পৃষ্ঠা-২০০
৯৯. তদেব, পৃষ্ঠা-২০৬
১০০. তদেব, পৃষ্ঠা-২০৬
১০১. তদেব, পৃষ্ঠা-২০৬
১০২. তদেব, পৃষ্ঠা-২০৯
১০৩. তদেব, পৃষ্ঠা-২১১
১০৪. তদেব, পৃষ্ঠা-২১৩
১০৫. ‘বিমল করে গল্প : দ্রোহ ও জীবন জিজ্ঞাসার স্বাক্ষর’—সিদ্ধার্থ সেন,
‘তীর কুঠার’ (বিমল কর বিশেষ সংখ্যা), বইমেলা-২০০৩, পৃষ্ঠা-২৯২
১০৬. ‘প্রস্তাবনা’—হীরক রায়কে লেখা অংশ, ‘নির্বাচিত গল্প’—বিমল কর, ১৯৭৩, পৃষ্ঠা-৪
১০৭. ‘আঙুরলতা’—‘বিমল করে পঞ্চাশটি গল্প’—বিমল কর, আনন্দ পাব. প্রাঃ লিঃ, ২০০১, পৃষ্ঠা-২১৩
১০৮. তদেব, পৃষ্ঠা-২১৭
১০৯. তদেব, পৃষ্ঠা-২২৮
১১০. তদেব, পৃষ্ঠা-২২৯
১১১. তদেব, পৃষ্ঠা-২২৯
১১২. তদেব, পৃষ্ঠা-২১৭
১১৩. তদেব, পৃষ্ঠা-২১৫

১১৪. তদেব, পৃষ্ঠা-২২৬
১১৫. তদেব, পৃষ্ঠা-২২৬
১১৬. তদেব, পৃষ্ঠা-২২৯
১১৭. তদেব, পৃষ্ঠা-২২৯
১১৮. ‘পলাশ’—‘বিমল করের পঞ্চাশটি গল্প’—বিমল কর, আনন্দ পাব প্রাঃ লিঃ, ২০০১, পৃষ্ঠা-১৮০
১১৯. তদেব, পৃষ্ঠা-১৮৩
১২০. তদেব, পৃষ্ঠা-১৮৪
১২১. তদেব, পৃষ্ঠা-১৮৪
১২২. তদেব, পৃষ্ঠা-১৮৪
১২৩. তদেব, পৃষ্ঠা-১৭৪
১২৪. তদেব, পৃষ্ঠা-১৮৫
১২৫. তদেব, পৃষ্ঠা-১৮২
১২৬. তদেব, পৃষ্ঠা-১৮২
১২৭. প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়ের নেওয়া বিমল করের সাক্ষাৎকার, ‘বিভাব’ পত্রিকা, বইমেলা-১৪১০, পৃষ্ঠা-৫৭
১২৮. তদেব, পৃষ্ঠা-৫৬
১২৯. ‘উড়োখই’ (দ্বিতীয় পর্ব)—বিমল কর, আনন্দ পাব প্রাঃ লিঃ, জুলাই-১৯৯৭, পৃষ্ঠা-৭৩
১৩০. ‘সুধাময়’—‘বিমল করের পঞ্চাশটি গল্প’—বিমল কর, আনন্দ পাব প্রাঃ লিঃ, ২০০১, পৃষ্ঠা-২৫৪
১৩১. তদেব, পৃষ্ঠা-২৫৫
১৩২. তদেব, পৃষ্ঠা-২৫৫
১৩৩. তদেব, পৃষ্ঠা-২৫৮
১৩৪. তদেব, পৃষ্ঠা-২৬৬
১৩৫. তদেব, পৃষ্ঠা-২৬৩
১৩৬. তদেব, পৃষ্ঠা-২৬৬
১৩৭. তদেব, পৃষ্ঠা-২৬৭
১৩৮. তদেব, পৃষ্ঠা-২৬৮
১৩৯. তদেব, পৃষ্ঠা-২৬৮-২৬৯
১৪০. ‘বাংলা কথাসাহিত্য প্রকরণ ও প্রবণতা’—গোপিকানাথ রায়চৌধুরী, শুল্কক বিপণি,
নভেম্বর-১৯৯১, পৃষ্ঠা-১৬১
১৪১. ‘নিষাদ’—‘বিমল করের পঞ্চাশটি গল্প’—বিমল কর, আনন্দ পাব প্রাঃ লিঃ, ২০০১, পৃষ্ঠা-২৮০
১৪২. তদেব, পৃষ্ঠা-২৯০

১৪৩. তদেব, পৃষ্ঠা-২৮৭
১৪৪. তদেব, পৃষ্ঠা-২৯০
১৪৫. তদেব, পৃষ্ঠা-২৮৮
১৪৬. ‘শীতের মাঠ’--‘বিমল করের পঞ্চাশটি গল্প’--বিমল কর, আনন্দ পাব. প্রাঃ লিঃ, ২০০১, পৃষ্ঠা-১৮৬
১৪৭. তদেব, পৃষ্ঠা-১৮৭
১৪৮. তদেব, পৃষ্ঠা-১৯৬
১৪৯. তদেব, পৃষ্ঠা-১৮৯
১৫০. ‘বাঘ’--‘বিমল করের পঞ্চাশটি গল্প’--বিমল কর, আনন্দ পাব. প্রাঃ লিঃ, ২০০১, পৃষ্ঠা-২৪৩
১৫১. তদেব, পৃষ্ঠা-২৪৩
১৫২. তদেব, পৃষ্ঠা-২৪২
১৫৩. তদেব, পৃষ্ঠা-২৫০
১৫৪. তদেব, পৃষ্ঠা-২৫০
১৫৫. তদেব, পৃষ্ঠা-২৫০
১৫৬. ‘ত্রিলোচন নন্দীর নামে ছড়া’--‘বিমল করের পঞ্চাশটি গল্প’--বিমল কর,
আনন্দ পাব. প্রাঃ লিঃ, ২০০১, পৃষ্ঠা-২৭৯
১৫৭. তদেব, পৃষ্ঠা-২৭০
১৫৮. তদেব, পৃষ্ঠা-২৬৯
১৫৯. তদেব, পৃষ্ঠা-২৭০
১৬০. তদেব, পৃষ্ঠা-২৭৪
১৬১. তদেব, পৃষ্ঠা-২৭৪
১৬২. তদেব, পৃষ্ঠা-২৭৫
১৬৩. তদেব, পৃষ্ঠা-২৭১
১৬৪. তদেব, পৃষ্ঠা-২৭৬
১৬৫. তদেব, পৃষ্ঠা-২৭৮
১৬৬. তদেব, পৃষ্ঠা-২৭৯
১৬৭. তদেব, পৃষ্ঠা-২৮০
১৬৮. তদেব, পৃষ্ঠা-২৮০
১৬৯. তদেব, পৃষ্ঠা-২৭২
১৭০. ‘গগনের অসুখ’--‘বিমল করের পঞ্চাশটি গল্প’--বিমল কর, আনন্দ পাব. প্রাঃ লিঃ, ২০০১, পৃষ্ঠা-২৯১
১৭১. তদেব, পৃষ্ঠা-২৯৩-২৯৪

১৭২. তদেব, পৃষ্ঠা-২৯৮

১৭৩. তদেব, পৃষ্ঠা-২৯৯

১৭৪. তদেব, পৃষ্ঠা-২৯৯

১৭৫. তদেব, পৃষ্ঠা-৩০০

১৭৬. তদেব, পৃষ্ঠা-৩০০

১৭৭. তদেব, পৃষ্ঠা-৩০০

১৭৮. ‘প্রস্তাবনা’--হীরক রায়কে লেখা অংশ, ‘নির্বাচিত গল্প’--বিমল কর, ১৯৭৩, পৃষ্ঠা-৬

১৭৯. প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়ের নেওয়া বিমল করের সাক্ষাৎকার, ‘বিভাব’ পত্রিকা, বইমেলা-১৪১০, পৃষ্ঠা-৫৬

১৮০. ‘জননী’--‘বিমল করের পঞ্চাশটি গল্প’--বিমল কর, আনন্দ পাব প্রাঃ লিঃ, ২০০১, পৃষ্ঠা-৩০০

১৮১. প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়ের নেওয়া বিমল করের সাক্ষাৎকার, ‘বিভাব’ পত্রিকা, বইমেলা-১৪১০, পৃষ্ঠা-৫৭

১৮২. ‘জননী’--‘বিমল করের পঞ্চাশটি গল্প’--বিমল কর, আনন্দ পাব প্রাঃ লিঃ, ২০০১, পৃষ্ঠা-৩০৫

১৮৩. তদেব, পৃষ্ঠা-৩১০

১৮৪. ‘উদ্বেগ’--‘বিমল করের পঞ্চাশটি গল্প’--বিমল কর, আনন্দ পাব প্রাঃ লিঃ, ২০০১, পৃষ্ঠা-৩১২

১৮৫. ‘বিমল কর, ছোটগল্প ও বড়গল্প’--অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়,

‘কোরক’-বিমল কর বিশেষ সংখ্যা, পৃষ্ঠা-৬৯

১৮৬. ‘উদ্বেগ’--‘বিমল করের পঞ্চাশটি গল্প’--বিমল কর, আনন্দ পাব প্রাঃ লিঃ, ২০০১, পৃষ্ঠা-৩১৫

১৮৭. তদেব, পৃষ্ঠা-৩১৪

১৮৮. তদেব, পৃষ্ঠা-৩২০

১৮৯. ‘অপেক্ষা’--‘বিমল করের পঞ্চাশটি গল্প’--বিমল কর, আনন্দ পাব প্রাঃ লিঃ, ২০০১, পৃষ্ঠা-৩২০

১৯০. তদেব, পৃষ্ঠা-৩৩১

১৯১. তদেব, পৃষ্ঠা-৩২২

১৯২. তদেব, পৃষ্ঠা-৩৩৭

১৯৩. তদেব, পৃষ্ঠা-৩৩২

১৯৪. তদেব, পৃষ্ঠা-৩৩৩

১৯৫. তদেব, পৃষ্ঠা-৩৩৫

১৯৬. তদেব, পৃষ্ঠা-৩৩৬

১৯৭. তদেব, পৃষ্ঠা-৩৩৭

১৯৮. তদেব, পৃষ্ঠা-৩৩৭

১৯৯. তদেব, পৃষ্ঠা-৩৩৭

২০০. তদেব, পৃষ্ঠা-৩২২

২০১ তদেব, পৃষ্ঠা-৩৩৪

২০২. তদেব, পৃষ্ঠা-৩৩৬

২০৩. ‘অপেক্ষা-মৃত্যুর নিঃশব্দ নির্মাণ’—বীরেন শাসমল,

‘তীব্র কুঠার’ (বিমল কর বিশেষ সংখ্যা), বইমেলা-২০০৩, পৃষ্ঠা-৩৭৬

২০৪. ‘সোপান’—‘বিমল করের পঞ্চাশটি গল্প’—বিমল কর, আনন্দ পাব প্রাঃ লিঃ, ২০০১, পৃষ্ঠা-৩৪২

২০৫. তদেব, পৃষ্ঠা-৩৪৮

২০৬. তদেব, পৃষ্ঠা-৩৫২

২০৭. তদেব, পৃষ্ঠা-৩৪৭

২০৮. ‘সোনায়ে পান্নায় আলোয় ছায়ায় গাথা’—তরুণকান্তিরায়,

‘তীব্র কুঠার’ (বিমল কর বিশেষ সংখ্যা), বইমেলা-২০০৩, পৃষ্ঠা-২২৮

২০৯. ‘আমরা তিন প্রেমিক ও ভুবন’—‘বিমল করের পঞ্চাশটি গল্প’—বিমল কর,

আনন্দ পাব প্রাঃ লিঃ, ২০০১, পৃষ্ঠা-৩৮৯

২১০. তদেব, পৃষ্ঠা-৩৮১

২১১. তদেব, পৃষ্ঠা-৩৮০

২১২. তদেব, পৃষ্ঠা-৩৮৯

২১৩. ‘মোহনা’—‘বিমল করের পঞ্চাশটি গল্প’—বিমল কর, আনন্দ পাব প্রাঃ লিঃ, ২০০১, পৃষ্ঠা-৪৭৬

২১৪. তদেব, পৃষ্ঠা-৪৭৬

২১৫. তদেব, পৃষ্ঠা-৪৭৬

২১৬. ‘সংশয়’—‘বিমল করের পঞ্চাশটি গল্প’—বিমল কর, আনন্দ পাব প্রাঃ লিঃ, ২০০১, পৃষ্ঠা-৩৭০

২১৭. তদেব, পৃষ্ঠা-৩৫৬

২১৮. তদেব, পৃষ্ঠা-৩৬০

২১৯. ‘ছোটগল্প : সম্ভব-আশির দশক, ছোটগল্পের বিষয় আশয়—সুমিতা চক্রবর্তী,

পুস্তক বিপণি, জুন-২০০৪, পৃষ্ঠা-৭৭

২২০. ‘লেখকের কৈফিয়ত’—হীরক রায়কে লেখা অংশ, ‘নির্বাচিত গল্প’—বিমল কর, ১৯৭৩, পৃষ্ঠা-৫

২২১. ‘উড়োখই’ (দ্বিতীয় পর্ব)—বিমল কর, আনন্দ পাব প্রাঃ লিঃ, জুলাই-১৯৯৭, পৃষ্ঠা-১৫৫

২২২. ‘সে’—‘বিমল করের পঞ্চাশটি গল্প’—বিমল কর, আনন্দ পাব প্রাঃ লিঃ, ২০০১, পৃষ্ঠা-৫১১

২২৩. তদেব, পৃষ্ঠা-৫২৬-৫২৭

২২৪. তদেব, পৃষ্ঠা-৫২৯

২২৫. ‘ওরা’—‘বিমল করের পঞ্চাশটি গল্প’—বিমল কর, আনন্দ পাব প্রাঃ লিঃ, ২০০১, পৃষ্ঠা-৫৩০

২২৬. তদেব, পৃষ্ঠা-৫৪৬

২২৭. তদেব, পৃষ্ঠা-৫৪৭

২২৮. তদেব, পৃষ্ঠা-৫৪৭

২২৯. প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়ের নেওয়া বিমল করের সাক্ষাৎকার, 'বিভাব' পত্রিকা, বইমেলা-১৪১০, পৃষ্ঠা-৬৪

২৩০. 'নিগ্রহ'--'বিমল করের পঞ্চাশটি গল্প'--বিমল কর, আনন্দ পাব. প্রাঃ লিঃ, ২০০১, পৃষ্ঠা-৫৯১

২৩১. তদেব, পৃষ্ঠা-৫৯৩

২৩২. 'নকশাল বাড়ি ৩০ বছর আগে ও পরে'--আজিজুল হক, দে'জ পাব,

দ্বিতীয় সংস্করণ-২০০২, পৃষ্ঠা-১৭৯

২৩৩. 'নিগ্রহ'--'বিমল করের পঞ্চাশটি গল্প'--বিমল কর, আনন্দ পাব. প্রাঃ লিঃ, ২০০১, পৃষ্ঠা-৫৯৩

২৩৪. তদেব, পৃষ্ঠা-৫৮৫

২৩৫. তদেব, পৃষ্ঠা-৫৯৪

২৩৬. 'মাছি'--'নির্বাচিত গল্প'--বিমল কর, অনন্য প্রকাশন, ১৩৮০, পৃষ্ঠা-৩৭৯

২৩৭. 'সুখ'--'বিমল করের পঞ্চাশটি গল্প'--বিমল কর, আনন্দ পাব. প্রাঃ লিঃ, ২০০১, পৃষ্ঠা-৫৬৬

২৩৮. তদেব, পৃষ্ঠা-৫৬৬

২৩৯. তদেব, পৃষ্ঠা-৫৬৬

২৪০. 'আয়োজন'--'বিমল করের পঞ্চাশটি গল্প'--বিমল কর, আনন্দ পাব. প্রাঃ লিঃ, ২০০১, পৃষ্ঠা-৫০৯

২৪১. তদেব, পৃষ্ঠা-৪৯৫

২৪২. তদেব, পৃষ্ঠা-৫০৫

২৪৩. 'হেমাস্নের ঘরবাড়ি'--'বিমল করের পঞ্চাশটি গল্প'--বিমল কর,

আনন্দ পাব. প্রাঃ লিঃ, ২০০১, পৃষ্ঠা-৬৩৯

২৪৪. তদেব, পৃষ্ঠা-৬৪০

২৪৫. তদেব, পৃষ্ঠা-৬৪৬

২৪৬. তদেব, পৃষ্ঠা-৬৪৭

২৪৭. তদেব, পৃষ্ঠা-৬৪৮

২৪৮. তদেব, পৃষ্ঠা-৬৪৮

২৪৯. 'গুণেন একা'--'বিমল করের পঞ্চাশটি গল্প'--বিমল কর, আনন্দ পাব. প্রাঃ লিঃ, ২০০১, পৃষ্ঠা-৬৩৬

২৫০. তদেব, পৃষ্ঠা-৬৩৭

২৫১. 'তুচ্ছ'--'বিমল করের পঞ্চাশটি গল্প'--বিমল কর, আনন্দ পাব. প্রাঃ লিঃ, ২০০১, পৃষ্ঠা-৫৭৩

২৫২. তদেব, পৃষ্ঠা-৫৭৯

২৫৩. তদেব, পৃষ্ঠা-৫৮০

২৫৪. 'এরা ওরা'--'বিমল করের পঞ্চাশটি গল্প'--বিমল কর, আনন্দ পাব. প্রাঃ লিঃ, ২০০১, পৃষ্ঠা-৬০৫

২৫৫. তদেব, পৃষ্ঠা-৬১০
২৫৬. তদেব, পৃষ্ঠা-৬১৬
২৫৭. 'হেমন্তের সাপ'—'বিমল করের পঞ্চাশটি গল্প'—বিমল কর, আনন্দ পাব প্রাঃ লিঃ, ২০০১, পৃষ্ঠা-৬৬০
২৫৮. তদেব, পৃষ্ঠা-৬৫৮
২৫৯. তদেব, পৃষ্ঠা-৬৬৪
২৬০. তদেব, পৃষ্ঠা-৬৬৬
২৬১. 'ভূমিকা'—'উপাখ্যান মালা'—বিমল কর, আনন্দ পাব প্রাঃ লিঃ, সেপ্টেম্বর-১৯৯৫
২৬২. প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়ের নেওয়া বিমল করের সাক্ষাৎকার, 'বিভাব' পত্রিকা, বইমেলা-১৪১০, পৃষ্ঠা-৬৪
২৬৩. 'ভূমিকা'—'উপাখ্যান মালা'—বিমল কর, আনন্দ পাব প্রাঃ লিঃ, সেপ্টেম্বর-১৯৯৫
২৬৪. 'সত্যদাস'—'উপাখ্যান মালা'—বিমল কর, আনন্দ পাব প্রাঃ লিঃ, সেপ্টেম্বর-১৯৯৫ পৃষ্ঠা-৩৭
২৬৫. তদেব, পৃষ্ঠা-৪০
২৬৬. তদেব, পৃষ্ঠা-৪৩
২৬৭. তদেব, পৃষ্ঠা-৪৩
২৬৮. তদেব, পৃষ্ঠা-৪৩
২৬৯. 'কাম ও কামিনী'—'উপাখ্যান মালা'—বিমল কর, আনন্দ পাব প্রাঃ লিঃ, সেপ্টেম্বর-১৯৯৫ পৃষ্ঠা-৭৯
২৭০. 'ফুটেছে কমলকলি'—'উপাখ্যান মালা'—বিমল কর, আনন্দ পাব প্রাঃ লিঃ, সেপ্টেম্বর-১৯৯৫ পৃষ্ঠা-৯৭
২৭১. তদেব, পৃষ্ঠা-১১০-১১১
২৭২. তদেব, পৃষ্ঠা-১০২-১০৩
২৭৩. তদেব, পৃষ্ঠা-১১৮
২৭৪. 'যুধিষ্ঠিরের আয়না'—'উপাখ্যান মালা'—বিমল কর, আনন্দ পাব প্রাঃ লিঃ,
সেপ্টেম্বর-১৯৯৫, পৃষ্ঠা-১৫১-১৫২.
২৭৫. তদেব, পৃষ্ঠা-১৫২
২৭৬. তদেব, পৃষ্ঠা-১৫২
২৭৭. 'নদীর জলে ধরা ছোঁয়ার বেলা'—'উপাখ্যান মালা'—বিমল কর,
আনন্দ পাব প্রাঃ লিঃ, সেপ্টেম্বর-১৯৯৫ পৃষ্ঠা-১৬৩
২৭৮. তদেব, পৃষ্ঠা-১৬৪

-----o-----

বিমল করের উপন্যাসে জীবনদৃষ্টির বৈচিত্র্য

সাহিত্যিকের প্রতিভা সর্বদাই কোন বিশেষ সাহিত্যধারাকে অবলম্বন করে স্থির হয়ে থাকে না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা হয়ে ওঠে বহুমুখী। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা সাহিত্যের যে ধারাকে স্পর্শ করেছে সেখানেই ফলেছে সোনা। ঠিক তেমনি আধুনিক যুগের বহু সাহিত্যিক সাহিত্যের একাধিক ধারাকে অবলম্বন করে তাঁদের জীবনদৃষ্টিকে ফুটিয়ে তুলেছেন। বুদ্ধদেব বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ বহু সাহিত্যিক সাহিত্যের একাধিক ধারায় তাঁদের প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন।

সাহিত্যিক বিমল করের প্রতিভা প্রাথমিকভাবে ছোটগল্প রচনার মাধ্যমে বিকশিত হলেও, সাহিত্যিক রূপে খ্যাতি পাওয়ার লগ্ন থেকেই তিনি উপন্যাস লেখার ক্ষেত্রেও উদ্যোগী হয়ে ওঠেন। আনন্দবাজার পত্রিকা প্রকাশনীতে চাকরি পাওয়ার আগে দু-একটি উপন্যাস রচনা করেছিলেন বাণিজ্যিক স্বার্থসিদ্ধির জন্য। কিন্তু পরবর্তীকালে সাহিত্য রচনার প্রয়াসে তিনি অধিকাংশ উপন্যাস রচনা করেছেন, যেখানে তাঁর জীবন ও জগৎ সম্পর্কে বিশেষ মানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ পেয়েছে। মানব জীবনের সামগ্রিক রূপ বিস্তৃত পরিসরে প্রকাশ করার স্বার্থে যেমন তিনি উপন্যাস রচনা করেছেন, তেমনি তাঁর জীবনদর্শন প্রকাশের জন্য উপন্যাসে পেয়েছেন বিস্তৃত ক্যানভাস। ছোটগল্পে স্বল্প পরিসরে এবং উপন্যাসে দীর্ঘ পরিসরে তিনি তাঁর বক্তব্য পরিবেশন করেছেন একথা বললেই তাঁর প্রতি সঠিক মূল্যায়ন করা হবে না। কারণ সাহিত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন ভাবে বহুবিধ বিষয় উপস্থাপিত হয়। বিমল করও তাঁর স্বকীয় ভাবনা ছোটগল্প ও উপন্যাস দুটো ক্ষেত্রে বৈচিত্র্যমণ্ডিতভাবে প্রকাশ করেছেন। একারণেই তাঁর জীবনদৃষ্টির আলোচনায় ছোটগল্পের পাশাপাশি কয়েকটি উপন্যাসকে বেছে নেওয়ার প্রয়োজনবোধ করেছি। এর মাধ্যমে তাঁর জীবনদৃষ্টির বৈচিত্র্যকে খুঁজে পাওয়া যাবে। তাঁর প্রথম উপন্যাস ‘হৃদ’—এর মাধ্যমে লেখকের মনস্তাত্ত্বিক ভাবনা প্রকাশিত হয়েছে। পরবর্তীকালে এই উপন্যাসের চলচ্চিত্রায়ণও ঘটে। এছাড়াও তিনি ‘ঝড় ও শিশির’ নামে একটি উপন্যাস রচনা করেছিলেন যা ‘নতুন জীবন’ পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হতে শুরু করেছিল। সেই মুহূর্তে দু-তিন কিস্তি রচনার পর অসমাপ্ত থাকা উপন্যাসটি পরবর্তীকালে সংশোধিত রূপে ‘বনভূমি’ নামে প্রকাশিত হয়।

স্থায়ী চাকুরি লাভ করার আগে বিমল কর বেনারস, আসানসোল কিংবা কলকাতায় অস্থির জীবনাচরণ করেছিলেন। অসহ্য অভাব ও দারিদ্র্যের সাথে লড়াই করতে করতেও সাহিত্যের প্রতি তাঁর অনুরাগ কিছু মাত্রায় কমেনি। ছোটগল্প রচনার পাশাপাশি তাই উপন্যাসও লেখা শুরু করেছিলেন পাঁচের দশকে এসে। সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ, সাহিত্য পাঠের অনুরাগ, মানুষের জীবন ও মনের প্রতি অদম্য কৌতূহল, মানুষের সাথে মেলা-মেশার প্রবণতা তাঁর সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে বিশেষ মাত্রা যোগ করেছিল। মানুষের মনের নানা দ্বন্দ্বমূলকতা ও মনস্তাত্ত্বিকতার নানা নিদর্শন যেমনভাবে তাঁর উপন্যাসের বিষয় হয়ে উঠেছে, তেমনি তার পাশাপাশি লক্ষ্য করা যায় সমকালীন দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি, মানব জীবনের নানান বৈচিত্র্য, দার্শনিকভাবনা, প্রেমচেতনা, মৃত্যুচেতনা, মানবমনের জটিল গভীর অসুস্থতা, ব্রাত্যভাবনা, প্রকৃতিচেতনা, নৈতিকতা, মানবিকতা প্রভৃতি নানা বিষয়। ছোটগল্পের মতো বিমল করের উপন্যাসেও চেতনা প্রবাহ রীতির মাধ্যমে চরিত্রের কিছু মনোভাবনা প্রকাশ পেয়েছে, যা তাদের অন্তর্জগতের সাথে বাস্তব পরিস্থিতির সম্বন্ধ স্থাপনে কার্যকরী ভূমিকা নিয়েছে। হেনরি জেমস -এর উপন্যাসের ('The turn of the Screw') জীবনদৃষ্টি প্রসঙ্গে যে বক্তব্য তুলে ধরেছেন সমালোচক, বিমল করের উপন্যাসে প্রতিফলিত জীবনদৃষ্টির মূল বক্তব্যের সঙ্গে তার মিল খুঁজে পাওয়া যায়-- "The Point of View is at the center of the Novel. And it must be at the center of any study of the stream of consciousness is the novel; for once we are within a given mind. In studying the problems of his fixed and varying centers of consciousness ...to record the action of the mind itself." (The psychological Novel, By Leon Edel, J.B.Lippincott Company, New York, Page-57) এই কারণে বিমল করের লেখা উপন্যাসে চেতনা প্রবাহ রীতির মাধ্যমে মনস্তত্ত্বের প্রসঙ্গ এসে পড়েছে।

বিমল কর তাঁর সাহিত্যে তাঁর ব্যক্তিগত অনুভূতি ও ভাবনাকেই প্রকাশ করতে চেয়েছেন। অহেতুক কল্পনাবিলাস তাঁর মধ্যে পরিলক্ষিত হয়নি। একারণে তাঁর রচনায় পল্লীগ্রামের চিত্র তিনি বিশেষ আঁকেননি। সাহিত্যিক হিসেবে তিনি সৎ থাকতে চেয়েছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, "গ্রামে কখনও থাকা হয়নি। এ জীবন আমাকে নাড়া দেয় ঠিক, কিন্তু অভিজ্ঞতার বাইরে গিয়ে তা নিয়ে লেখার কথা ভাবিনি।" তেমনি তাঁর অভিজ্ঞতার জগৎকে এবং তাঁর জীবনে উপলব্ধ নানা দার্শনিকতাকে তিনি তাঁর উপন্যাসের মাধ্যমে রূপ দিতে চেয়েছেন। একারণে তাঁর উপন্যাসগুলি

যেমনভাবে সময়ের যথার্থ দলিল, তেমনি এর মধ্য দিয়ে তাঁর মানসিকতার যথার্থ স্বরূপ প্রকাশ পায়।

‘দেওয়াল’ উপন্যাসটি তিনটি পর্বে বিন্যস্ত, ‘ছোটঘর’(১৯৫৬), ‘ছোটমন’(১৯৫৭) ও ‘খোলা জানলা’ (১৯৬২)। এই উপন্যাসটিতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমকালীন প্রায় ১৯৪১ এর মাঝামাঝি থেকে ১৯৪৫ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত সময়কালের সামাজিক, রাজনৈতিক ও ব্যক্তিজীবনের নানা পরিস্থিতি ও তার মূল্যায়ন প্রকাশ পেয়েছে। এই সময়কালের অস্থির রাজনৈতিক পরিস্থিতি, যুদ্ধের প্রভাব, মানুষের অভাব, দারিদ্র্য, মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয়, মন্বন্তরের চিত্র সব কিছুই মধ্য দিয়ে লেখক তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করেছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমকালীন বেশ কিছুদিন কলকাতায় অবস্থান করার সুবাদে ও এআরপি—তে কর্মরত অবস্থায় মানুষের প্রকৃত অবস্থা বিমল করের দৃষ্টি এড়ায়নি। এর প্রভাব যেমনভাবে এই উপন্যাসে প্রকাশ পেয়েছে, তেমনি লেখক এই উপন্যাস লেখার পিছনে আরও একটি উপন্যাস পাঠের প্রসঙ্গ উপস্থাপন করেছেন। বেনারসে থাকাকালীন একটি জার্মান উপন্যাসের অনুবাদ পড়েছিলেন, বইটির নাম ‘দি ওয়াল’ কিংবা ‘এ রুম ইন বার্লিন’ এই উপন্যাসে গ্রামের ছিন্নমূল একটি পরিবার বার্লিনে এসে ভাগ্য পরিবর্তনের চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সময় পরিবর্তনের সাথে সাথে গৃহকর্তার উপলব্ধি হল সকলের বয়স, দেহ, ক্ষুধা, স্বপ্ন, চাহিদা বাড়লেও চারিদিকের দেওয়ালের পরিধি বাড়েনি, বরং কমে গেছে। ধূস হুচ্ছে মূল্যবোধ, মানবিকতা। এই উপন্যাসটির প্রভাব বিমল করের মনে ছিল। তিনি বলেছেন—

“... ওই উপন্যাসটির থিমটি আমাকে খুব স্পর্শ করেছিল। ভাবতাম লেখালেখির চেষ্টা যদি করি কখনো এই রকম একটি উপন্যাস লিখব। বলে রাখা ভাল, তখন আমার কাছে লেখক হবার কোন সুযোগ ছিল না, সাধও নয়, নিতান্তই রেল অফিসের কেরানীগিরি করে দিন কাটত। মনে মনে শুধু ফ্লোভই জন্মাত, নিজের ব্যর্থতায়।

পরে যখন সত্যি সত্যি কাগজ কলমের কারবারি হলাম—তখন থেকেই আমার মাথায় এই লেখাটির কথা আসত।”^২

ডি. এম. লাইব্রেরীর প্রকাশক গোপাল দাস মজুমদারের ভরসায় বিমল কর তাঁর ‘দেওয়াল’ উপন্যাস রচনায় হাত দিলেন বিস্তৃত প্রচ্ছদ নিয়ে। ‘ছোটঘর’— এই পর্বে উপন্যাসে চিত্রিত সময়কাল ১৯৪১ এর মাঝামাঝি থেকে ১৯৪২ এর জুলাই পর্যন্ত। এই পর্বে অঙ্কন করলেন স্বচ্ছলতার অভিপ্রায়ে গ্রাম থেকে কলকাতায় চলে আসা চন্দ্রকান্ত ও তার স্ত্রী রত্নময়ী ও দুই কন্যা

ও এক পুত্রের সংসার। চন্দ্রকান্ত পণ্ডিত মানুষ, অধ্যয়নই তাঁর একমাত্র ব্রত। এই মানুষটি নিতান্ত অনিচ্ছায় প্রতিবেশী ভ্রাতৃপ্রতিম মোহিতের ভরসায় কলকাতায় চলে এসেছিলেন। মোহিতের বই ব্যবসা ছিল, এবং সে বলেছিল চন্দ্রকান্তের মতো পণ্ডিত মানুষ কলকাতায় এলে যথার্থভাবে সমাদৃত হবেন। কিন্তু কলকাতার ক্রমশ বাস্তবায়িত পরিস্থিতি সমস্ত স্বপ্ন ও কামনাকে যেন শুষ্ক নিলা হঠাৎই মারা গেলেন চন্দ্রকান্ত। সংসার যখন অচল হয়ে এল তখনই এই সংসার যুদ্ধে নামতে হল বড় মেয়ে সুধাকে। কারণ তার ভাই বাসু সংসারের বিষয়ে উদাসীন, আড্ডাবাজ এবং পাড়ার বখাটে ছেলের মতো। ঘরে মা, বাসু এবং আরতির প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে সুধাকে চাকরি নিতে হল। আরতি রত্নময়ীর গর্ভস্থ কন্যা নয়, তার মা পার্বতী রত্নময়ীর দূর সম্পর্কের বোন। স্বামীর ঘর থেকে বিতাড়িত হয়ে তিনি রত্নময়ীর বাড়িতে আশ্রয় নেন। তিনি উন্মাদ হয়ে মারা যাওয়ার পর তার মেয়ে আরতি এই সংসারেই সন্তান স্নেহে মানুষ হয়েছিল। সুধার চাকরি করা মা রত্নময়ীর মূল্যবোধে আঘাত করলেও সংসারের প্রয়োজনে সুধাকে পথে নামতে হয়। তার কাছে একান্ত ভরসা ও সান্ত্বনা দিয়েছে অমলা ও সুচারুর মতো সহকর্মীরা। সুচারুর সাথে সুধার ভালবাসার সম্পর্কের সূত্রপাত হলেও তার মধ্যে আসে ব্যাঘাত। সুচারু বিদ্রোহী হয়ে ওঠে তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে; যুদ্ধের প্রারম্ভেই বহু মানুষ কলকাতা ছেড়ে গ্রামে ফিরে যাচ্ছে। জীবনের নিরাপত্তা, খাদ্যের নিরাপত্তা, স্বাস্থ্যের নিরাপত্তা আজ তাদের কাছে নেই। মানুষ স্বার্থপরতার মতো নিজের জীবন বাঁচানোর তাগিদে কলকাতা পরিত্যাগ করে যাচ্ছে। অপর দিকে শুরু হয়ে গেছে মুনাফালোভী, সুযোগ সন্ধানী মানুষদের আগ্রাসী মনোভাব। যুদ্ধকে কেন্দ্র করে মানুষের মধ্যে প্রকাশিত হচ্ছে আত্ম-সচেতনতা। সুচারু মত প্রকাশ করে, সে যুদ্ধে যাবে। যুদ্ধের মধ্য দিয়ে নতুন দিন, নতুন চেতনা প্রকাশ পাবে বলে তার বিশ্বাস। সুধার অন্তর্নিহিত ভালবাসার চেতনা এই প্রসঙ্গে যেন দুমড়ে মুচড়ে গেছে, তবুও সে বাধা দেয়নি সুচারুকে। তার ফিরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করার প্রতিশ্রুতি জানিয়েছে।

ইতিমধ্যে বাসু সিভিক গার্ড --এ যোগ দিয়েছে, যা সুধার পছন্দ হয়নি। রত্নময়ী বাসুকে নিয়ে মোহিতের শরণাপন্ন হয়েছেন, তাকে কাজের সুযোগ দেওয়ার জন্য। বাসুর সাথে পরিচয় হয়েছে মোহিতের বিধবা কন্যা মীনাঙ্কীর। বাসু মীনাঙ্কীর প্রতি মুগ্ধ হয়েছে -- একথা জানতে পেরে বাসুকে অপমানিত করেছে মোহিত, এবং এর সূত্র ধরে মীনাঙ্কীর হৃদয়-উৎসারিত যন্ত্রণা, তিক্ততা ও

অসুখী মানসিকতা ব্যক্ত হয়েছে। মীনাক্ষীরা যুদ্ধের কারণে কলকাতা পরিত্যাগ করার পর বাসুর জীবনেও নেমে এসেছে হতাশা ও অস্থিরতা।

‘ছোটমন’ -- ‘দেওয়াল’ উপন্যাসের দ্বিতীয় পর্ব। এই পর্বের কাহিনীর সময়কাল ১৯৪২ এর জুলাই থেকে ১৯৪৩ এর শেষ পর্যন্ত প্রায় দেড় বছর। এই পর্বে আরও একটি নতুন পরিবার এসেছে। এই পরিবারে গিরিজাপতি, যিনি ‘নিজের কথা’ নামের একটি রচনায় হাত দিয়েছেন। এছাড়া তাঁর ভাইপো নিখিল ও ভাইঝি উমা এই পর্বে উপন্যাসে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। সুখাদের ভাড়াবাড়িতেই তাঁরা ভাড়া আসায় সুখাদের পারিবারিক অসন্তোষ প্রকাশ্যে এসেছে। এই উপন্যাসের পটভূমিতে রয়েছে তৎকালীন ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অস্থিরতার চিত্র, বিশ্বযুদ্ধের করাল গ্রাস, ভারতছাড়ো আন্দোলন, ১৯৪২ এর সামুদ্রিক ঝড় ও বন্যা, এবং ১৯৪৩ এর ভয়াবহ মনুষ্যের চিত্র। গান্ধীবাদী ভাবনার কিছু সমালোচনা গিরিজাপতির রচনায় ও ভাবনায় প্রকাশিত হয়েছে। এই সকল কারণে ‘ছোটমন’ পর্বটি এই উপন্যাসের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ পর্ব। এই পর্বে সুখার মানসিক তিক্ততা ও অবসাদ যেমন প্রকাশিত হয়েছে, তেমনি উমার শারীরিক বিকৃতি ও তার প্রতি মানুষের উপহাসে তার হাহাকার ও বেদনাময় অনুভূতিতে করুণ পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। এই পর্বে বাসুর ব্যবহার আরও কদর্য রূপ ধারণ করেছে। চাকরি ছেড়ে দিয়ে অর্থিক সমস্যায় পড়ে সে চুরি করা শুরু করেছে। পণ্ডিত ব্যক্তির ছেলে হয়েও তার মূল্যবোধের এই অবনয় তাকে চিন্তিত করেনি। অত্যন্ত বেপরোয়াভাবে সে অপরকে আক্রমণ শুরু করেছে। নৈতিকতাবর্জিত, মূল্যবোধহীন একটি চরিত্র রূপে বাসু এখানে প্রতিভাত।

সুখা চরিত্রটি এই পর্বে ক্রমশ একাকিত্বের যন্ত্রণা উপলব্ধি করতে শুরু করে। তার চাকরির জন্য মায়ের প্রথমিক বিরোধিতা থাকলেও এখন পরিবারের সকলেই যেন শুধুমাত্র আকাঙ্ক্ষা নিয়ে বসে থাকে। প্রতি মুহূর্তে যেন শোষণ করতে থাকে সুখাকে। সুচার ফিরে আসেনি, যে অন্ততপক্ষে সুখার মানসিক দুঃখ বুঝতে পারতো। আর বাড়ির অপর তিনজন, রত্নময়ী, বাসু ও আরতি তিনটি নিঃসঙ্গ প্রাণীর মতো। প্রত্যেকেই আত্মসচেতন ও স্বার্থপর হয়ে উঠেছে। সুখার মধ্যে দেখা দেয় নস্টালজিয়া। তার বাবা বেঁচে থাকার সময় যে সুখের স্পর্শ ছিল তা তখন আর অবশিষ্ট ছিল না। দিনের প্রবাহের সাথে সাথে সকলের মানসিকতাও যেন জ্বর, বক্র হয়ে উঠেছে। সে উপলব্ধি করতে পেরেছে অশান্তি এই মুহূর্তে তার সংসারের একমাত্র সুর। প্রত্যেকেই অন্যের কাছ থেকে নিজেকে

গোপন করার চেষ্টা করেছে এবং একা একাই যন্ত্রণা উপভোগ করেছে। অপরের কাছে নিজেকে উন্মুক্ত করে অপরাধ ও গ্লানি প্রকাশ করে সহজ স্বাভাবিক হতে চাইছে না।

এর পাশাপাশি গিরিজাপতির ভাবনাও প্রকাশিত হয়েছে। গিরিজাপতি তাঁর ‘নিজের লেখা’য় স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রকৃত স্বরূপ বিশ্লেষণ করেছেন। গান্ধীবাদের মধ্যে বৈপরীত্য তাঁর মনে ধোঁয়াশার সৃষ্টি করেছে। গান্ধী বিশ্বাস করেছিলেন সংগ্রাম ব্যতিরেকে ইংরেজরাই ভারতের মানুষের হাতে স্বাধীনতা তুলে দেবে, আবার পরবর্তীকালে তাঁর মুখেই শোনা যায় স্বাধীনতা লাভের জন্য সংগ্রামের কথা। এই বিপরীতচারিতা গিরিজাপতির মনে যেমন গান্ধী সম্পর্কে বীতশ্রদ্ধ মানসিকতার জন্ম দিয়েছে, তেমনি কংগ্রেসের অহিংস আন্দোলনেরও তিনি সার্থকতা দেখেন না, কেননা আন্দোলন অহিংসভাবে পরিচালনা করা সম্ভব নয়। মানুষের মধ্যে জন্ম নেবেই হিংসার বীজ। এছাড়াও তাঁর বিপ্লবী বন্ধু সতীশের বক্তব্য তাঁকে প্রভাবিত করেছে। তমলুকে স্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠার ভাবনা তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেছে। সতীশের চোখে একাধারে যন্ত্রণা প্রকাশিত হলেও অন্যদিকে উদ্যমের মধ্য দিয়ে ঈপ্সিত স্বাধীনতা লাভের প্রতিশ্রুতি তাঁর মধ্যে দেখা দিয়েছে। সতীশ বলেছে--

“গিরিজা তুমি গান্ধী ছাড়া কি কিছু জানো না? কংগ্রেস গান্ধীর জমিদারী নয়। কংগ্রেস তাঁর একার নয়। আমাদের -- আমাদের সকলের। সকলের দেশে যা হচ্ছে-- যা করছি আমরা -- ভাল বুঝেই করছি। গান্ধীতে কি আসে যায়। আমাদের নিজের ভাববার করবার অধিকার কেউ নিতে পারেনা।”^৩

--এই বক্তব্যের মাধ্যমে একনায়কতন্ত্র বা নেতৃত্বকে বরণ করার চেয়ে গণতন্ত্রের সামগ্রিক উদ্যোগকে রূপ দেওয়ার মানসিকতা প্রকাশ পেয়েছে। এর সাথে যুক্ত হয়েছে মানুষের স্বপ্ন, সাধ, স্বাধীন দেশের আকাঙ্ক্ষায় সংগ্রামের প্রতিশ্রুতি।

লেখক এই পর্বে যুদ্ধ, ঝড়, মন্বন্তরের প্রেক্ষাপটে মানুষের উদ্ভাস্ত পরিস্থিতিকে চিত্রিত করেছেন। প্রথম পর্বে যে মানুষদের কলকাতা পরিত্যাগের চিত্র অঙ্কিত হয়েছিল সেই মানুষেরা আবার ফিরে এসেছে। চারিদিকে বেকারত্ব, অর্থাভাব, খাদ্যাভাব, আন্দোলনকারীদের সংগ্রাম গৃহচ্যুত মানুষদের শাস্তি-স্বস্তি দেয়নি। সারা পশ্চিমবঙ্গ তো বটেই বোম্বাই, মাদ্রাজ, আমেদাবাদ, এলাহাবাদ, নাগপুর সর্বত্রই আগষ্ট আন্দোলন, ভারতছাড়ো আন্দোলনের ব্যাপকতা দেখা দিয়েছে। হিংসা-প্রতিহিংসায় মানুষের প্রাণ হয়ে উঠেছে ওষ্ঠাগত। কিন্তু এই সময়কালে জাপানের আক্রমণ, বিধ্বংসী বোমার আশ্রয়লন কলকাতা শহরকে ভয়ংকর করে তুলেছে। তাই শহরের মানুষ নিরাপদ

আশ্রয়ের অভিলাষে আবার শহর পরিত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। মানুষের ভিড়ে ভরে গেছে রেলের কামরা, ছাদ সর্বত্র। প্রাণ বাঁচাতে গিয়ে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে সর্বহারা মানুষ। পাঁচদিনের বোমার আক্রমণে কলকাতা শহরের বিপর্যস্ত অবস্থা লেখক অঙ্কন করেছেন।

এর মধ্যে ঘটে গেছে প্রকৃতির পরিহাস-- ভয়ংকর সামুদ্রিক সাইক্লোন। অগণিত মানুষ ও গবাদি পশুর মৃত্যু ঘটলেও সরকার সেই ঘটনার প্রকৃত তথ্য গোপন করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু লোকমুখে ছড়িয়ে পড়ে তার বিধ্বংসী ও ভয়াল রূপের কথা। গৃহহারা মানুষ গৃহের খোঁজে আত্ননাদ করে ওঠে। সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসে সৃষ্ট বন্যায় ফসল নষ্ট হওয়ায় সৃষ্টি হয় মন্বন্তরের। মুনাফাবাজ, মজুতদার, সুযোগসন্ধানী মানুষেরা ফসল গোপনে রেখে এই মন্বন্তরের মাত্রাকে আরও বাড়িয়ে তোলে। কলকাতা শহরে ভরে ওঠে উদ্ভ্রান্ত, ক্ষুধার্ত, গৃহহারা গ্রামের মানুষ। নারী পুরুষ, শিশুর আত্ননাদে শহরের রাস্তাও ভরে ওঠে।

“রাস্তার দুপাশ ভরে এই যাযাবর ভিক্ষুকের বিচিত্র উপনিবেশ। কোথাও কাঠ জ্বালিয়ে হাঁড়িতে খুদ ফুটাচ্ছে কেউ, কোথাও কলেরা হওয়া মনুষ্যটা খাবি খেয়ে খেয়ে মরে পড়ে আছে, মাংসের দোকান থেকে কুকুরের সঙ্গে লড়ে খানিকটা ছাল চর্বি হাড় এনে সৈঁকছে কেউ বা ছেঁড়া কাগজ সরু সরু কাঠির আগুনো।”^৪

এই মিছিলে যেমন রয়েছে হরিমতী, হারাণ, নারান, গণি, করিমুদ্দিন, রাবেয়া, জোবেদা তেমনি যশোদার মতো বিধবা মেয়েরা। যাদের স্বপ্নে অপমৃত্যু ঘটে গেছে। নিজের মূল্যবোধ, নারীত্ব, সতীত্বকে অক্ষত রাখবার প্রচেষ্টা করেও ক্ষুধার জ্বালায় সেই চরিত্র নষ্ট হয়ে যায়। এইভাবে শেষ হয়ে যায় পুটি, বেরা, হরির বউ, মোক্ষদামণি, বামুনদিদি, তরঙ্গ, আলতা, ছানুরমা, বিস্তির মতো সাধারণ ভদ্র ঘরের মেয়েরা।

সুখা এই সময় চন্দ্রসাহেবের নতুন অফিসে চাকরি করে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পোষাকের আড়ালে সে তার অসুস্থ বিবর্ণ রূপকে চাপা দেওয়ার চেষ্টা করেছে। উমার মনেও গ্লানি, হতাশার উদ্ভব হয়েছে। তার শারীরিক বিকৃতি বাসুর কাছেও বিদূষ লাভ করেছে। সংসারের প্রতি উদাসীন বাসুর বিরুদ্ধে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করলে বাসু তার উত্তরে উমাকে কদর্যভাবে আক্রমণ করেছে। তার বিকৃত শরীরের প্রতি উপহাস করেছে। রত্নমীর মানসিক যন্ত্রণাও অসহনীয় হয়ে উঠেছে এই সময়। আরতির বাবা মারা যাওয়ার পর তার পারলৌকিক কাজের দায়িত্ব আরতিকে গ্রহণ করার জন্য গ্রামের বাড়ি থেকে খবর এসেছে। রত্নমী এই খবর গোপনের চেষ্টা করলেও সুখা শেষ পর্যন্ত

সত্য ঘটনা সম্পর্কে আরতিকে ওয়াকিবহাল করার সপক্ষে মত দিয়েছে। কারণ আরতি এই সংসারে পালিতা, সে যীদের মা কিংবা বাবা জেনে এসে ছিল, তাঁরা কেউ আপন নয়। এই খবর জানতে পেরে আরতি নিজেকে বিচ্ছিন্ন মানবসত্তা রূপে নিজেকে উপলব্ধি করেছে। বাসু ও আরতি গঙ্গামান করে ফিরে আসার সময় আরতির অশ্রুমোচনে বাসুর বিরক্তি দেখা দিয়েছে। তার কথায় প্রকাশিত হয়েছে দুজনের ভিন্ন পারিবারিক অস্তিত্বের প্রসঙ্গ। আরতিও বুঝতে পারে তার এতদিনের চেনা পরিজনেরা কেমনভাবে পর হয়ে গেছে।

‘খোলা জানলা’— ‘দেওয়াল’ উপন্যাসের তৃতীয় পর্ব, যার ঘটনাসমূহের সময়কাল ১৯৪৪ এর শুরু থেকে ১৯৪৫ এর জুন মাস পর্যন্ত। এই পর্বে তৎকালীন অস্থির রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতির পাশাপাশি চরিত্রগুলির মানসিক ও শারীরিক বেদনাদীর্ঘ অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। এর পাশাপাশি লক্ষিত হয়েছে সকল যন্ত্রণা ও অপূর্ণতা নিয়েও ভবিষ্যতের পথে এগিয়ে যাওয়ার প্রত্যাশা।

আরতির হৃদয়ে অব্যক্ত যন্ত্রণা দিয়ে দ্বিতীয় পর্ব শেষ হয়েছিল, এখানেও সেই ভাবনার রেশ রয়েছে। মা এবং বাবার সত্য পরিচয় যখন সে জেনেছে তখন তার কাছে তাঁরা হয়ে উঠেছেন প্রয়োজনহীন, আবার তার এতদিনের চেনা পালিকা-মা রক্তময়ী মানসিকভাবে দূরে চলে গেছে। এর পাশাপাশি উমা চরিত্রটির করুণ আর্তি প্রকাশ করেছে কলকাতা শহরের অশুভসারশূন্যতাকে। তার মনে হয়েছে তার শারীরিক ত্রুটি ছোটবেলার হেতমপুরের মানুষের কাছে উপহাসের বিষয় ছিল না। মানসিক ও সামাজিক সৌহার্দ সেখানে তাকে তৃপ্ত করেছিল, কিন্তু কলকাতা শহরে তার এই বিকৃতি মানুষের কাছে যেন ব্যঙ্গের বস্তু। কলকাতা শহর মানুষের মনের সব সুকুমার প্রবৃত্তিগুলোকে নষ্ট করে দিয়েছে, জীবনের মাধুর্যকে শুষ্ক নিয়েছে। এই হৃদয়হীন, যন্ত্রণাদায়ক কলকাতার প্রতি তার ঘৃণা বর্ষিত হয়েছে।

এই মানসিক যন্ত্রণা ব্যক্ত হয়েছে গিরিজাপতির প্রেসে কাজ করা অবনীর মধ্যেও। তার বাবার আত্মহত্যা, মায়ের উন্মাদ দশা পারিবারিক স্থিতিবস্থাকে সম্পূর্ণ নষ্ট করে দিয়েছিল। এর পরও সে জীবন সংগ্রামে ব্রতী হয়েছে শুধু বেঁচে থাকার জন্যই। সুখার শারীরিক পরিস্থিতি এই পর্বে ভালো নেই সে যক্ষা আক্রান্ত। ডাক্তার বদল করে যেন কোন রকমে ভালো থাকার অক্ষম প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সে জানে শারীরিক অসুস্থতা ও মুখের সৌন্দর্যহীনতার কারণে তাকে হয়তো চাকরি হারাতে হবে। অফিসের কাজে সকলের সাথে হাসি বিনিময় করলেও, মনের মধ্যে পুঞ্জীভূত কান্না তার মনে

জীবনের অন্তঃসারশূন্যতার উপলব্ধি জাগায়। অমলা সুধাকে সান্ত্বনা দিয়েছে, জীবনযুদ্ধে এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা জুগিয়েছে। সে যেন নিজের ব্যর্থ জীবনের সমস্ত অভিজ্ঞতা দিয়ে সুধার জীবনের সাফল্য দেখে তৃপ্তি লাভ করতে চেয়েছে। গিরিজাপতি মনের মধ্যে ধ্রুব, সনাতন, শুভবোধকে আঁকড়ে ধরে থাকার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু সুচারু কিংবা অবনীৰ প্রতিক্রিয়া তাঁকে নাড়া দিয়েছে। তিনি বিগত দিনের কৃতকার্যের জন্য মানসিক পাপবোধ থেকে উদ্ধারের প্রচেষ্টায় সচেতনভাবে শুভবোধ ও সেবা পরায়ণতার আদর্শ গ্রহণ করেছেন। একদিন তিনি সম্ভ্রাসবাদী কাজে নিযুক্ত থেকে তাঁর অগ্রজকে হত্যা করেছিলেন। হত্যার পর তাঁর সেই অগ্রজের সমাজ ও দেশের জন্য আত্মত্যাগ ও আত্মবীক্ষাকে উপলব্ধি করে প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য তার স্ত্রী ও দুই পুত্র-কন্যার দায়িত্ব নিজের হাতে তুলে নিয়েছিলেন। ‘নিজের লেখা’য় তিনি আশাবাদী মানসিকতার প্রতিফলন ঘটানোর পাশাপাশি সমকালীন মূল্যবোধের ক্ষয়িষ্ণুতা, অবসাদ, অবিশ্বাসের প্রতিও নজর রেখেছেন।

এই সময় কলকাতার পরিস্থিতির খানিকটা পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে। বোমারু বিমানের ভয়ংকর নির্যোষ নেই, দেখা দিয়েছে কর্মসংস্থানের সুযোগ। নতুন অফিস কারখানা সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, মাল সাপ্লাই, কন্ট্রোল, ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনিট এমনকি মিলিটারিতে কাজের সুযোগ দেখা দিয়েছে। গ্রামের ছিন্নমূল, স্ত্রী-পুত্র হারা অসহায় কিছু কৃষিজীবী মানুষ, যারা কলকাতায় চলে এসেছিল তারা আর গ্রামে ফিরে যায় নি। কারণ জমি বিলিফটনের নিয়মে জমি ফিরে পেলেও জোতদার, জমিদারের পাওনা মোটাতেই সব শেষ হয়ে যাবে। এই ভাবে কৃষিজীবী মানুষের শ্রমিক হয়ে যাওয়ার ছবি রয়েছে। এদের পাশাপাশি কলকাতায় ভিড় করেছে সুবিধেলোভী, অসৎ চরিত্রের দালাল ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায়। সমকালীন অস্থির পরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে তারা ক্রমশ হয়ে উঠেছে পুঁজিপতি।

এই সময় আরতি একটি দোকানে চাকরি পেয়েছে। বাসু বেকারত্বের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে সকলের প্রতিই অবদমিত আক্রোশ প্রকাশ করেছে। ভেবেছে ও যদি মেয়ে হত তাহলেও বোধহয় কাজের অভাব হত না। একদিকে বাড়ির মেয়েদের বিভিন্ন অফিস বা প্রতিষ্ঠানে চাকরির সুযোগ এবং তার মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে আকর্ষণ করার ব্যবসায়িক মনোবৃত্তি অপর দিকে বাসুর মত ছেলেদের বেকারত্ব তৎকালীন মানুষের প্রতিযোগিতার মানসিকতা ও ক্ষয়িষ্ণুতাকে প্রকাশ করেছে।

আরতির সাথে একদিন একটি ছেলেকে দেখে বাসু বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখালে আরতির মন বিষিয়ে ওঠে। আরতির মনে হয় তার সমস্ত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য যেন অপরের কাছে বাঁধা আছে। আরতির সাথে কথা কাটাকাটির জেরে বাসুর মনেও অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে। উমার আত্মহত্যার প্রচেষ্টা তার মনে জাগিয়েছে সমবেদনা। সে ক্রমশ সংবেদনশীল মানুষে রূপান্তরিত হয়েছে। তার যুদ্ধে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা এই হৃদয় বেদনারই চিত্র।

রত্নময়ী সুধা-সুচারুর বিবাহে মত দিলেও সুচারু এখানে একজন বিশ্বস্ত মানুষ রূপে হাজির হয়েছে। যুদ্ধ তার সকল মঙ্গলাকাঙ্ক্ষাকে হত্যা করে তাকে অসহায় নেতিবাদী মানুষে পরিণত করেছে। সুধা সুচারুর এই হতাশাকে প্রশ্রয় দিতে চায়নি। যুদ্ধে একটি হাত খোয়া যাওয়া সুচারুকে নিয়েই সে জীবন যুদ্ধে এগিয়ে যেতে চেয়েছে।

এই পর্বে কমিউনিস্টদের কার্যকলাপ লেখক বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। নিখিল এই সংগঠনের সাথে যুক্ত হয়ে এর মধ্যকার মানুষদের অবিশ্বাস ও সন্দেহপ্রবণ মানসিকতাকে উপলব্ধি করেছে। এদের চোখে গান্ধী হলেন টাটা বিড়লার এজেন্ট, ব্রিটিশ সরকারের নিলামদার, সুভাষচন্দ্র কুইসলিঙ, এন. এন. রায় ট্রেটার। কমিউনিস্টরা কংগ্রেসের সমালোচনা করলেও সাধারণ মানুষদের কাছ থেকে খুব বেশি ভরসা পায়নি। তাদের ব্যর্থতাও দেখানো হয়েছে। উপন্যাসের পরিসমাপ্তিতে সুধাকে কেন্দ্র করে সুচারুর মনে ক্ষীণ আশার সঞ্চার হয়েছে। সুধার মাধ্যমে এই সময়ের দার্শনিক প্রত্যয় লেখক বাস্তব সম্মত ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। বিকলাঙ্গ, ক্ষয়িষ্ণু এই জীবনে সর্বাপেক্ষা সুন্দর ও সুস্থ কোন কিছু পাওয়া সম্ভব নয়। অপূর্ণাঙ্গ বিষয়ের মধ্যেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে এই জীবনে। নস্টালজিয়ায় আবদ্ধ থেকে পুরোনো দিন, হারানো প্রত্যাশা খুঁজতে না গিয়ে সময়োপযোগী ভাবনায় আকৃষ্ট হয়ে অন্তঃসারশূন্যতার মধ্যেও ফুটিয়ে তুলতে হবে পূর্ণতার কামনা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিশ্বংসী রূপ দেশ ও মানুষের উপর কেমন প্রভাব ফেলেছিল, তার পরিচয় রয়েছে ‘দেওয়াল’ উপন্যাসে। মূল্যবোধের অবক্ষয়, নৈতিকতার পরাজয়, ব্যক্তিসত্তার খণ্ডিত রূপ, মানুষের লোভ, হিংসা, বর্বরতা, রিরংসার রূপ লেখক ফুটিয়ে তুলেছেন। বিশ্বযুদ্ধের সময়কার ব্ল্যাক আউট, জাপানী বোমার আত্মফালন, স্বাধীনতা আন্দোলনের জোয়ার, অস্থির রাজনৈতিক পরিস্থিতির পাশাপাশি প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ৪২-এর সাইক্লোন ও সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসে সৃষ্ট বন্যা, ৪৩-এর ভয়ংকর দুর্ভিক্ষের চিত্র ও মানুষের প্রকৃত অবস্থার পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনায় সমৃদ্ধ এই উপন্যাস। সুচারুর মত ভাববাদী মানুষদের পরম সত্যকে লাভ করার বাসনা এবং ব্যর্থতা,

গিরিজাপতির মত মানুষদের পাপস্থলনের প্রয়াস এবং শুভবোধের প্রতি আকাঙ্ক্ষা, বাসুর মত মানুষদের চারিত্রিক অবক্ষয় ও পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা, সুধার মত মেয়েদের জীবন যুদ্ধ --সব কিছু নিয়ে সামগ্রিক মানবচিত্র অঙ্কন করেছেন লেখক। রাজনৈতিক নেতৃত্বের ভুল সিদ্ধান্ত, কর্মসূচির অসারত্ব, মানুষের মনে আস্থা জাগানোর ক্ষেত্রে বিফলতা এই উপন্যাসে লেখক দেখিয়েছেন। লেখক বিমল কর নিজেও একসময় রাডিক্যাল পার্টির সাথে যুক্ত হয়েছিলেন, কিছু সভা সমিতিতেও অংশগ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু উৎসাহ লাভ করেননি। তবুও মানবেন্দ্রনাথ রায় ও তাঁর পার্টির প্রতি তাঁর দুর্বলতার কথা তিনি প্রকাশ করেছিলেন।^৭ এই উপন্যাসে বর্ণিত কমিউনিস্ট আন্দোলন সেই ভাবনার পরিচয় বহন করে। গিরিজাপতির চরিত্র অঙ্কনের ক্ষেত্রে লেখকের সামনে ছিল তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতালব্ধ একজন মানুষ, তিনি আনন্দবাজার পত্রিকা অফিসে কর্মরত ‘পিয়ারীদা’,^৮ যিনি একসময় অনুশীলন দলের সাথে ও পরে কমিউনিস্ট দলে যুক্ত ছিলেন। মধ্যবয়সে এই মানুষটি প্রায় কুড়ি বছর কারাদণ্ড ভোগ করেন। এই মানুষটির জীবনবোধ, মানসিকতা বিমল করের সামনে গিরিজাপতি চরিত্র আঁকতে সাহায্য করেছিল। লেখকের ব্যক্তিজীবনের নানা অভিজ্ঞতা ও জীবনদর্শন এই উপন্যাসে কাহিনী, চরিত্র ও রসপরিণতির মাধ্যমে সার্থক ভাবে ফুটে উঠেছে।

‘খড়কুটো’ (১৯৬৩) উপন্যাসে ভালবাসার শক্তিকে নির্ভর করে শারীরিক অসুস্থতার মধ্যেও সুস্থতা ও সুখের অন্বেষণ পরিলক্ষিত হয়েছে। এর পাশাপাশি ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসবোধ দুটি চরিত্রের মধ্যে তাদের মানসিক শক্তিকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে। অসুস্থতা ও মৃত্যুত্যাগিত জীবনেও আশাবাদী মানসিকতায় উদ্বুদ্ধ হওয়া যায় এবং এর সূত্র ধরে ভালবাসা ও বৃহত্তর জীবনের প্রতি অনুরাগী হওয়া যায় তার উদাহরণ এই উপন্যাসে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

ভ্রমর মাতৃহীন হওয়ার পর বাবা আনন্দমোহন হিমালী মা আর কৃষ্ণাকে বাড়িতে নিয়ে আসে। ভ্রমর শারীরিকভাবে অসুস্থ হলেও আনন্দমোহন, হিমালী, কৃষ্ণা কারোর কাছেই সমবেদনা লাভ করে না। আনন্দমোহন কিছুটা উদাসীন, হিমালী নিয়ম কানূনের বাড়াবাড়ি দেখালেও সমবেদনা প্রকাশ করেন না। আন্তরিকভাবে, এই অবস্থায় ভ্রমর উপেক্ষা সহ্য করতে করতে তার শারীরিক অসুস্থতাকেও গোপন করতে চেয়েছে। বড়দিনের ছুটিতে অমল তাদের বাড়িতে বেড়াতে এসে ভ্রমরের প্রতি সকলের উপেক্ষা, উপলব্ধি করেছে। কিন্তু এখানে এসে ফুলের মত পবিত্র, সুন্দর ভ্রমরকে তার ভাল লেগেছে। ভ্রমরের অসুস্থতা গোপন করার ইচ্ছাকে সে মেনে নেয়নি। ভ্রমরের প্রায়ই জ্বর হয় তবুও বাঁ পায়ের সামান্য ত্রুটির জন্য ভ্রমর তা অগ্রাহ্য করে ঘুরে বেড়ায়।

অমলের ভালবাসা, সমবেদনা ভ্রমরের উপর বর্ষিত হয়েছে। মেসোমশাই আনন্দমোহনকে এব্যাপারে সচেতন করলেও তেমন আগ্রহ সে আনন্দমোহনের কাছ থেকে লাভ করে না। তার মনে হয় এমনি চললে অকালে হারিয়ে যাবে প্রতিমার মতো সুন্দর, নিষ্কলুষ-- ভ্রমর। কিন্তু ভ্রমর বাঁচতে চায়। তার মা সুখতারার মত মৃত্যুভয়ে সে কাতর হয়ে মৃত্যুকেই সে অভ্যর্থনা জানাবে না, সে মঙ্গলময় ভগবান যিশুর বাণীর মধ্য থেকে ইতিবাচক মানসিকতায় নিজের হৃদয়কে পূর্ণ করতে চায়। এর সাথে যুক্ত হয়েছে অমলের ভালবাসা, সমবেদনা, মমতা বোধের উৎফুল্ল জোয়ার যা তার কাছে একান্ত প্রয়োজনীয় প্রাণপেরণা হয়ে দেখা দিয়েছে। তার মনে হয়েছে ভালবাসার শক্তি অনেক। ভালবাসাই আরোগ্য লাভের একমাত্র উপায়, যিশু অঙ্ক কিংবা কুষ্ঠরোগাক্রান্তকেও উদ্ধার করেন ভালবাসার জোরে। তেমনিভাবে ভালবাসার মহান ব্রত আজ সে উপলব্ধি করতে পেরেছে অমলের মধ্যেও। “ভ্রমর আজ শুয়ে শুয়ে অমলের এই মায়া-মমতা ও করুণার কথা ভাবছিল। মনে হচ্ছিল, এতদিন সে যেন বাইবেলের সেই ডুমুর গাছ হয়ে ছিল। অফলা ডুমুর গাছ। একটি ফল ফলত না কোনদিন। তাকে হিমালী মা’রা হয়ত কেটে ফেলত। কিন্তু অমল এসে তার চারধার খুঁড়ে যেন সার দিয়ে দিয়েছে।”^৭

ভ্রমর এই সংসারে সকলকেই ভালবাসতে চেয়েছিল, আনন্দমোহন, হিমালী মা, কৃষ্ণ সবাইকে, কিন্তু তার প্রতিদানে সে পেয়েছে দুঃখ, উপেক্ষা। ভ্রমরের মনের অসহায়তা অমলকে কেন্দ্র করে কমে এসেছে। সে আজ ভবিষ্যতে অমলকে নিয়ে অনেক পরিকল্পনা করার মানসিক জোর পায়। অমলের নৈকট্য আজ তার কাছে সকল বাধাকে অতিক্রম করার সাহস যোগায়। এই সময়ে ভ্রমর সাংঘাতিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ে। ডাক্তার চিকিৎসার জন্য নাগপুরে নিয়ে যাওয়ার কথা বলেন। অনেক ইন্জেকশান, অষুধেও ভ্রমরের উন্নতির লক্ষণ দেখা যায় না, ক্রমশ সে ফ্যাকাশে, বিবর্ণ হয়ে যাতে থাকে। লিউকোমিয়া আক্রান্ত ভ্রমর অমলের সান্নিধ্য লাভ করতে চাইলেও তা সম্ভব হয় না অমলের চোখেও বিচ্ছেদ বেদনা অশুভ্রল নিয়ে আসে, কিন্তু ভ্রমর এখনও আশাবাদী মানসিকতায় আচ্ছন্ন থেকে বাইবেলের লাজারের মৃত্যু ও পুনর্জীবিত হওয়ার গল্প শুনিয়েছে। বিদায় বেলায় অমলের কাছে সে ফিরে আসার প্রতিশ্রুতি জানায়। জীবনের অনেক দুঃখের মধ্যেও আনন্দের প্রতি নিবিষ্ট হওয়ার প্রেরণা জানায়। বাইবেলের বাণী সে ক্রন্দনরত অমলকে শোনায় -- “তোমার দুঃখ হবে, কিন্তু দুঃখই একদিন আনন্দ হয়ে দেখা দেবে। যীশু

বলেছিলেন, এখন দুঃখ সও, কিন্তু আমি আবার এসে তোমাদের সঙ্গে দেখা করব, তখন সুখী হবে।”^৮ —ভ্রমরের এই আশ্বাসবাণীকে মনে রেখে তার জন্য অপেক্ষায় প্রবৃত্ত হয় অমল।

‘খড়কুটো’ উপন্যাসে কয়েকটি প্রতীক ও চিত্রকল্পের ব্যবহার লেখকের জীবনদর্শনকে প্রগাঢ় মাত্রা দিয়েছে। খড়কুটো নিয়ে পাখিদের নীড় বাঁধার মধ্য দিয়ে ভ্রমর ও অমলের মত দুটি পাখিরও মনে নীড় বাঁধার স্বপ্ন জাগ্রত হয়। কিন্তু খড়কুটো তো তুচ্ছ জিনিস। বায়ু প্রবাহে হঠাৎই এসে পড়ে, আবার হঠাৎই চলে যায়; তবু এই খড়কুটোই কখনও কখনও মনে আশাবোধের ব্যঞ্জনা দেয়। অমল কিংবা ভ্রমর এই পৃথিবীতে এসেছে, আবার একদিন এখান থেকে চলে যেতে হবে। তাদের এই জীবনেরও কোন স্থিরতা নেই। আয়ুবদ্ধ জীবনে যে কোন সময়ই মৃত্যু তার আগ্রাসী থাবা বসাতে পারে। ক্ষণিক সুখই এখানে তাই হয়ে ওঠে পরম আশ্বাদ্য বিষয়। ভ্রমর অমলের মুখের দ্বাণ নিতে চায়, কিন্তু অমলের খোলা মুখ তার মুখের সামনে এলে তার হৃদয়ে জেগে ওঠে অনাস্বাদিত অনুভূতি। লেখক তবুও তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়ে মধ্যবিত্ত মানসিকতার দ্বিধা-দ্বন্দ্বকে উপস্থাপিত করেন, কিন্তু হৃদয়ের মধ্যে প্রবাহিত হয় অনন্ত প্রেমের অনুভব।

উপন্যাসের শুরুতে বাজি পোড়ানোর প্রসঙ্গ এসেছে। বাজির ক্ষণস্থায়িত্ব, হঠাৎ আলোর ঝলকানি দিয়ে নিভে যাওয়ার চিত্রের মাধ্যমে লেখক জীবনের সংক্ষিপ্ততা হঠাৎ উদ্ভাসিত হয়ে হারিয়ে যাওয়ার স্বাভাবিক প্রবণতাকে উল্লেখ করেছেন। ভ্রমর ও অমলের সম্পর্ক, ভালবাসা, নীড় বাঁধার কামনা এই বাজির আলোর সাথে তুলনীয়। কিন্তু বাজির আলোর সংকেত ও সেই সূত্রে প্রাপ্ত আনন্দধ্বনি যেমন মনে দাগ কেটে যায়, তেমনি ক্ষণিক ভালবাসা, মমতায় ঘেরা আবিষ্ট-মুহূর্ত মনে রেখে যায় চিরকালীন স্মৃতি— লেখক এই ভাবনাও এখানে ভ্রমর ও অমলের মানসিকতার মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছেন।

উপন্যাসে মিউজিয়ামের প্রসঙ্গ এসেছে, যে মিউজিয়ামের মধ্য দিয়ে মৃত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন পাওয়া যায়, স্মৃতিকে ধরে রাখার প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। ভ্রমরের অতীতচরিতা, বাল্যস্মৃতির মাধুর্য এক্ষেত্রে উল্লেখ্য। এছাড়াও এর মাধ্যমে অতীতের প্রতি যে দীর্ঘশ্বাস ধ্বনিত হয় তা ভ্রমর ও অমলের বিচ্ছেদ ও স্মৃতিকাতরতায় প্রকাশ পেয়েছে। আনন্দমোহনের নস্টালজিয়ার মধ্য দিয়েও বেদনাবোধ তার হৃদয়কে পূর্ণ করে তোলে।

লেখক বাইবেলের বাণীর মধ্য দিয়ে কিংবা যিশুর মানবিকতার চিত্র দিয়ে এই উপন্যাসে আশাবাদ ধ্বনিত করে তুলেছেন। খ্রীষ্টধর্মের প্রতি লেখকের এই আগ্রহ তাঁর বহু গল্পেও

পরিলক্ষিত হয়। ‘মানবপুত্র’, ‘বুদবুদ’, ‘বরফসাহেবের মেয়ে’ প্রভৃতি বহু গল্পে খ্রীষ্টধর্মের উদার বাণীর প্রসঙ্গ লেখক প্রকাশ করেছিলেন। অত্যাচার, অনাচার, অসুস্থতা, দুর্বলতার সময় এই ধর্মের বাণী চরিত্রগুলির কাছে পরম নির্ভরতার ক্ষেত্র হয়ে উঠেছিল। বিমল কর তাঁর জীবনেও বেশ কয়েকজন পাদ্রীর সংস্পর্শে এসে এই ধর্মের উদারতার বাণী উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। উদার মানসিকতার সাথে ছোটবেলা থেকে মানুষ হয়ে ধর্মের আচারসর্বস্বতা অপেক্ষা উদার মানবিকতার বাণী তাঁর কাছে গৃহীত মনে হয়েছিল, তাই বার বার তাঁর সাহিত্যে খ্রীষ্টধর্মের কথা ধ্বনিত হয়। ভ্রমর বড়দিনের দিন গেয়েছে, ‘হাত ধরে মোরে নিয়ে চলো সখা, আমি যে পথ চিনি না।’ -- এই গানে যিশু এবং অমল একই সাথে তার কাছে উদ্দিষ্ট ব্যক্তি। অমলও নিয়ে এসেছে তার কাছে ভালবাসার মন্ত্র যা তাকে বেঁচে থাকার প্রেবণা জোগায়। মৃত্যুভাবনা এই উপন্যাসে থাকলেও ভ্রমর চরিত্রটি আশাবাদে মুখর। ভালবাসাই তাকে কিরিয়ে আনবে মৃত্যুর তীর থেকে, এই বিশ্বাস ভ্রমরের মাধ্যমে উপন্যাসে ধ্বনিত হয়েছে।

‘পূর্ণ অপূর্ণ’ (১৯৬৭) উপন্যাস সম্পর্কে অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় বলেছেন, “মানুষের জীবন অপূর্ণ, স্বাভাবিকই তার যাত্রা পূর্ণতার পথে। পরিণত মানুষ কিভাবে সে পথে যাবে? তার জীবনে এত জটিলতা ও মালিন্য এসে গেছে যে তার ফলে জীবনে অবিশ্বাস আর ঘৃণারই প্রাধান্য। ফলে চোখের সামনে ভালবাসাকে ক্ষয় হয়ে যেতে দেখেও মানুষ অসহায়ভাবে তাকিয়ে থাকে। পূর্ণের সন্ধান একালের মানুষকে কে দেবে? বিমল কর তা দিতে চেয়েছেন ‘পূর্ণ অপূর্ণ’ উপন্যাসে (১৯৬৭)”^{১০}

‘পূর্ণ অপূর্ণ’ উপন্যাসে মানুষের পূর্ণতার অন্বেষণ এবং তার প্রাপ্তিতে আনন্দ এবং অপ্রাপ্তিতে বেদনা অনুভূত হয়েছে। আবার পূর্ণের সংজ্ঞা বা ধারণা মানুষভেদে ভিন্ন হয়ে উঠেছে। আপেক্ষিক এই ধারণার বশবর্তী হয়ে কেউ বা তার সন্ধান পেয়েছে, কেউ বা অসহায়তায় যন্ত্রণার বোঝা সারা জীবন ধরে বয়ে চলেছে। আধুনিক জীবনের নানা অসম্পূর্ণতার মধ্যেই খুঁজে নিতে হয় পূর্ণতাকে। প্রবহমান এই জীবন ধারায় জীবনকে ভালবেসে, কর্মের অঙ্গীকারে নিজেকে আবদ্ধ করে, মনের শুদ্ধ চেতনাকে ধরে রেখে, মানসিক প্রশান্তির মাধ্যমেই এই পূর্ণতার আরাধনা করা সম্ভব। জীবনের তুচ্ছতার মধ্য দিয়েও তাই ফুটে উঠতে পারে পরমপ্রাপ্তির হর্ষ, জীবনের আনন্দ গান। বিমল করের মধ্যেও এই পূর্ণতার প্রতি অন্বেষণ দেখা দিয়েছিল। লেখক বলেছেন, তাঁর অভিজ্ঞতালব্ধ মৃত্যুর ঘটনা, যুদ্ধের সময়কার অসহায়তা বোধ, মানসিক নিঃসঙ্গতা, অসুস্থতার প্রতি

ভয়পীড়িত অবস্থায় তিনি বেঁচে থাকার কারণ ও প্রয়োজনীয়তা বিচার করার চেষ্টা করতেন। এর সাথে যুক্ত হয়েছিল প্রেম ও ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসবোধ, জীবনে ঝড় ঝঞ্ঝার মধ্য দিয়েও ইতিবাচক পরিণতির দিকে এগিয়ে যাওয়ার প্রত্যাশা। এই প্রশ্নমূলকতা ও মানসিক উপলব্ধি থেকেই তিনি ‘খড়কুটো’ উপন্যাস রচনা করেছেন। “‘খড়কুটো’ উপন্যাসের মধ্যে যা ছিল আঁটো সাঁটো গড়নে ‘পূর্ণ অপূর্ণ’ উপন্যাসে তা আরও বৃহৎ করে প্রকাশ করার চেষ্টাই আমি করেছি। ‘পূর্ণ অপূর্ণ’ উপন্যাসে আমার একটি অনুসন্ধান আছে। আমি মনে করি, কোন মানুষই জীবনের পূর্ণতা সম্পর্কে ধারণা করতে পারে না। তার অর্থ এই নয় যে, তার সে চেষ্টা বা প্রয়াস থাকবে না।”^{১০}

এই প্রয়াস লক্ষ্য করা গেছে উপন্যাসের কয়েকটি চরিত্রের মাধ্যমে। উপন্যাসের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র সুরেশ্বর যে দার্শনিকতায়, জীবনবোধের পরিপূর্ণতায় উদ্বেল, তার সাথে অন্যান্য চরিত্রগুলির যোগাযোগ ঘটেছে, তার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে, অনেক সময় তার মানসিকতাকে তারা বিরোধিতা করেছে। অবনীও একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র, তার জীবনবোধও স্বতন্ত্র, এবং চরিত্রটির মধ্য দিয়ে অসহায় বেদনাদীর্ণ একটি মানুষের ছবি ক্রমশ প্রকাশিত হয়েছে। সুরেশ্বর লোকালয়-বিচ্ছিন্ন নিঃসঙ্গ নির্জন জঙ্গলের মধ্যে গুরুডিয়ায় একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছিল অন্ধ মানুষদের জন্য। সে সেবার মধ্য দিয়ে জীবনে প্রসন্নতা লাভ করতে চেয়েছিল। অবনীরা সুরেশ্বরের এই মানসিকতা পছন্দ হয়নি। তার মনে হয়েছে সেবার নামে সুরেশ্বর আত্মপ্রবঞ্চনার পথ গ্রহণ করেছে। কাহিনীর প্রথমাংশে অবনীরা ভারাক্রান্ত হৃদয়ে হাসপাতাল থেকে আসার ছবি বর্ণিত, যেখানে হীরালালের মত সুন্দর যুবকের মৃত্যু তার কাছে অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক। এই আকস্মিক মৃত্যু জীবনের অনিশ্চয়তার প্রমাণ বলে তার মনে হয়েছে। তার বিচলিত মনের সাথে সুরেশ্বরের অনুভূতির মিল হয়নি। সুরেশ্বর দার্শনিকতা সমৃদ্ধভাবে প্রকাশ করেছে জন্ম ও মৃত্যু প্রকৃতির অলঙ্ঘ্য নিয়ম, এটা স্বাভাবিক। সুরেশ্বরের বক্তব্য অবনীরা কাছে গৃহীত না হলেও সুরেশ্বর জানিয়েছে— “আকাশ ও পৃথিবী মানুষের শবাধার। সূর্য চন্দ্র তার শব সয্যার সাজ, নক্ষত্রগুলি আমার গায়ে ছড়িয়ে দেওয়া ফুল। সমস্ত জীব আমার শবযাত্রার সঙ্গী। মৃত্যুর কাছে সকলেই আমাকে বহন করে নিয়ে যাচ্ছে।”^{১১} সুরেশ্বর মৃত্যু তাড়িত এই জীবনে জীবন ও মৃত্যু সম্পর্কিত যথার্থ দর্শন প্রকাশ করেছে। জন্মের পর থেকেই মানুষ তার আয়ু খরচ করতে করতে মৃত্যুর সীমায় উপনীত হয়। এই ধারণা তাকে নির্লোভ, নির্বিকার ও অবিচলিত করেছে। তার মনের মধ্যে আবেগের মাত্রা কম। হৈমন্তী, যাকে একদিন দীর্ঘ শুশ্রূষার মধ্য দিয়ে ভাল করে তুলেছিল; চোখের ডাক্তার হয়ে ওঠার

জন্য প্রেরণা যুগিয়েছিল, সেই সুরেশ্বরই হৈমন্তী ডাক্তার হওয়ার পর উচ্ছ্বসিত হয়নি। আশ্রমের কাজে তাকে বহাল করেছে। হৈমন্তী সুরেশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও প্রেমে আপ্লুত হলেও সুরেশ্বর আবেগহীন, নির্বিকার। এই কারণে হৈমন্তীর মনে এসেছে হতাশা ও অবসাদ, প্রেমাস্পদের মধ্যে কোন রূপ ইঙ্গিত না দেখে তার মন নির্জন এই আশ্রমে টিকে থাকতে চায়নি। হৈমন্তীর মনে হয়েছে তার অসুস্থতার সময় সুরেশ্বরের যে সান্নিধ্য ও শুশ্রূষা পেয়েছিল, এবং তার ফলে যে আবেগতপ্ত ভালবাসার জন্ম হয়েছিল তা সুরেশ্বরের আশ্রমে এসে বার বার ব্যাহত হয়েছে।

উপন্যাসের অপর উল্লেখযোগ্য চরিত্র অবনী। সে একদিন তার স্ত্রী ললিতার প্রথম ভালবাসায় আবদ্ধ হলেও তা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি, এবং সম্পর্কের জটিলতার কারণে উভয়ের মনে তীব্র ঘৃণা সঞ্চারিত হয়েছিল। তাদের বিচ্ছেদ ঘটানোর পর ললিতা তার মেয়ে কুমকুমকে নিজের কাছে রেখে দিলেও তার ভরণ-পোষণের জন্য অবনীর উপর চাপিয়ে দিল আর্থিক দায়। কুমকুমের প্রতি ভালবাসা কোন অংশেই কম ছিল না অবনীর। মেয়ের জন্য তার হৃদয়ের অব্যক্ত ব্যাকুলতা তাকে ক্রমশ যন্ত্রণাবদ্ধ করেছে। এছাড়াও অবনীর হৃদয়ের ক্ষত তার পারিবারিক সম্পর্কের দিক থেকেও তীব্র হয়ে উঠেছে। তার সঠিক পিতৃ-পরিচয় সে জানতে পারেনি। যে মানুষটাকে সে বাবা বলে জেনে এসেছিল তার সাথে জন্মসূত্রে বন্ধন ছিলনা। অবনী বুঝতে পারেনি সেই মানুষটাকে তার মা কেন দুঃসহ যন্ত্রণার মধ্যেও প্রশ্রয় দিয়ে এসেছিল।

সুরেশ্বরের পারিবারিক সুখ কখনই ছিল না। তার মা ছিল অসুস্থ এবং কিছুটা উন্মাদগ্রস্ত। বাবা অত্যন্ত মন্দ চরিত্রের মানুষ ছিলেন। সুরেশ্বরের মা বেঁচে থাকার সময়ই তিনি অপর একটি বিয়ে করেছিলেন এবং তাকে কলকাতায় রাখতেন। এই মহিলার একটি ছেলে হয় এবং তার বাবার মৃত্যুর পর তারা সম্পত্তির দাবিতে মামলা করতে চায়। সুরেশ্বর সেই বন্ধনও ত্যাগ করে। হৈমন্তীর সাথে পরিচয় হওয়ার পর সুরেশ্বরের সাথে অপর একটি নারীর যোগাযোগ ও সম্পর্ক স্থাপিত হয় — সে নির্মালা। নির্মালা সুরেশ্বরের জীবনকে নানাভাবে প্রভাবিত করেছে। সুরেশ্বর উপলব্ধি করেছে হৈমন্তীর সাথে তার মমতা ও স্নেহের সম্পর্ক থাকলেও যে আনন্দের অনুেষণ সে করতে চেয়েছিল তা নির্মালার মাধ্যমেই সে উপলব্ধি করতে পেরেছে। নির্মালার অন্তঃকরণের মধ্যেই সুরেশ্বর অনুভব করেছিল তার ঈপ্সিত সৌন্দর্য ও পূর্ণতার দিকচিহ্ন। নির্মালা ধীরে ধীরে অন্ধত্বের শিকার হতে থাকে, সুরেশ্বরের কোন প্রচেষ্টাই তাকে রক্ষা করতে পারে না। কিন্তু নির্মালার দৃষ্টিহীনতা সুরেশ্বরের মধ্যে জ্বালিয়ে দেয় জ্ঞানের আলো। জগৎ সংসারের মানব জীবনের নানা

প্রকার অন্ধত্ব , দৃষ্টিহীনতা সম্পর্কে তার বোধগম্যতা জন্মে। আগুনে পুড়ে নির্মলার মৃত্যু ঘটায় পর সুরেশ্বরের মনে এই জীবন সম্পর্কে শূন্যতার উপলব্ধি জাগ্রত হয়। অন্ধ নির্মলার স্মৃতিকে বুকে নিয়ে নির্জন গুরুডিয়ায় আশ্রম নির্মাণ করে সুরেশ্বর। হৈমন্তী ডাক্তার হয়ে এই গুরুডিয়াতে এসে আবিষ্কার করে ক্ষত বিক্ষত, উদাসীন সুরেশ্বরকে, যে সেবার ব্রতকেই জীবনের শ্রেষ্ঠ কর্তব্য বলে মনে করেছে। সুরেশ্বরের কাছ থেকে অবহেলা পেলেও সুরেশ্বরের প্রতি তার মনে সঞ্চিত ভালবাসাকে সে ক্ষয় করতে চায় না। সুরেশ্বরের অসুস্থতায় সেও সেবা ও শুশ্রূষার মাধ্যমে তার ভালবাসাকে বাঁচিয়ে রাখতে চায়। কিন্তু সুরেশ্বরের বন্ধনহীনতা তাকে গুরুডিয়ার আশ্রমে আর আবদ্ধ রাখেনি। এর পর গুরুডিয়ার আশ্রমের শান্ত্যাব আর বজায় থাকে নি। মনোহর, তিলুয়া মারা যাওয়ার পর চোখের হাসপাতালও বন্ধ হয়ে যায়। তার বদলে শুরু হয় শহরের ডাক্তার, নার্স, কম্পাউন্ডার, জমাদার, ওষুধ পত্র, রিচিং, ফিনাইল নিয়ে ব্যস্ত হাসপাতাল, যেখানে শান্ত, নিরিবিলা জীবন নেই, আছে দুর্ভাবনা, ভীতি, উদ্বেগ।

গুরুডিয়া ছেড়ে কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা হওয়ার আগে হৈমন্তী তার হৃদয় যন্ত্রণা অবনীর কাছে প্রকাশ করে, অবনী ও ললিতা, কুমকুমকে নিয়ে গড়ে ওঠা জীবনের অসহায়তা তার কাছে ব্যক্ত করে। হৈমন্তী সুমধুর আমন্ত্রণ রেখে যায় অবনীকে উদ্দেশ্য করে। এই পর্বে সুরেশ্বরের মধ্যেও হতাশা ও যন্ত্রণা প্রকট হয়ে উঠেছে, হৈমন্তীর প্রতিও তার সহানুভূতি ব্যক্ত করেছে। সুরেশ্বরের মনে হয়েছে এই জগৎ সংসারে জীবন দুঃখময়-- মানুষ সত্যত দুঃখী। নিয়তি মানুষের ব্যর্থতার সাথে সংযুক্ত, মানুষের দুঃখ যন্ত্রণার পিছনে নিয়তির প্রভাব সে উপলব্ধি করে। তার জীবনে সে পূর্ণতার সাক্ষাৎ না পেলেও বুঝতে পারে ঈশ্বরই পূর্ণ স্বরূপ। “মানুষ তার দয়া মায়া, মমতা, প্রেম, শৌর্য, সৌন্দর্য-- সমস্ত কিছুর চরম কল্পনা ঈশ্বরের ওপর আরোপ করেছে, তাই ঈশ্বরের চেয়ে মমতাময় প্রেমময় আর কিছুকে বলি না। অপূর্ণ মানুষের ধারণায় ঈশ্বর তাই পূর্ণ।”^{২২}

‘সুধাময়’ গল্পে সুধাময়ও তার প্রেমের ক্ষেত্রে পূর্ণতার অভিলাষী ছিল। কিন্তু রাজেশ্বরী, হৈমন্তী কারোর কাছ থেকেই সে সামগ্রিক পূর্ণতাকে লাভ করতে পারেনি। সুরেশ্বর ও হৈমন্তীও নির্মলার মাধ্যমে তার পূর্ণতাকে খুঁজতে গিয়েছিল। হৈমন্তীর চেয়েও পূর্ণ মনে হয়েছিল নির্মালা। তবুও সে তার পাশে থাকল না, হারিয়ে গেল। আজ তার হৃদয়ের মধ্যে যন্ত্রণার আবেশঘন অনুভূতি থেকে গেছে। অবনী প্রাথমিক ভাবে সুরেশ্বরকে চিনতে না পারলেও উপন্যাসের শেষাংশে এসে তার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করেছে।

সুরেশ্বরের মাধ্যমে লেখক বুঝিয়েছেন পৃথিবীতে কোন মানুষই পূর্ণ নয়, এর পিছনে তার জীবনে পেয়ে হারানোর দুঃখও কম নয়। সুরেশ্বর মানব জীবনের উপর নিয়তির দুর্লভ নিয়মকে উপলব্ধি করেছে, তবুও তারই মধ্য দিয়ে কর্মে আত্মনিয়োগ করে জীবনের সারাৎসার লাভ করতে চেয়েছে। বিমল কর লিখেছেন, “মানুষের জীবনে কেউ কেউ তার মনোমতন একটি পূর্ণতার সন্ধান করে বেড়াতে পারে, আবার কেউ কেউ মনে করতেও পারে, এ ধরনের অন্ত্রেষণ অর্থহীন, কেননা যথার্থ পূর্ণতা বলে যদি কিছু থাকেও সংসারে--তা অলভ্য। অথচ, এটা আমরা দেখি, পূর্ণতা সম্পর্কে আমরা অবিশ্বাসী হলেও যারা তার সন্ধানে ঘুরে বেড়ায়--তাদের প্রতি আমাদের কোথায় যেন একটা চাপা সহানুভূতি থেকে যায়।”^{১০} --সুরেশ্বর তার হৃদয়যজ্ঞগার তীব্রতার মধ্য দিয়ে অবনীর সহানুভূতি লাভ করেছে এই উপন্যাসের শেষাংশে।

অবনীর হৃদয়যজ্ঞগা এখানে অত্যন্ত বাস্তবিক। পৈত্রিক সম্পর্ক ও দাম্পত্য জীবন, এই দ্বিমুখী যজ্ঞগার নিরিখে সে ক্ষতবিক্ষত হয়েছে। হৈমন্তী চরিত্রটি প্রথমে সুরেশ্বর ও পরে অবনীর মাধ্যমে জীবনে বাঁচার আনন্দকে উপভোগ করতে চেয়েছে। সুরেশ্বরের মতো মানসিক ভার বহন করে সেবারতের মহিমায় নিজেকে বন্দী করেনি; বৃহত্তর জীবনের প্রতি আস্থা রেখে ভালবাসার মধ্য দিয়ে পুনর্জীবিত হতে চেয়েছে। ললিতা চরিত্রটি আত্মসুখের বাসনায় আবদ্ধ থেকে অবনীর জীবনে ক্ষত সৃষ্টি করেছে। তার শারীরিক উদ্ভামতা ভালবাসা সঞ্চারে আগ্রহী নয়, ভোগসুখের চরিতার্থতায় আগ্রহ প্রকাশ করেছে। দাম্পত্য জীবনের মাধ্যমে সুখের ঠিকানা লাভ করেও সে তাকে অবহেলা করেছে। নির্মলার চরিত্রটি তার অন্ধত্ব সম্পর্কে জানলেও জীবনানুরাগ থেকে পিছিয়ে যায়নি। অন্তরদর্শনের মাধ্যমে সুরেশ্বরের ভালবাসা, উদারতাকে অনুভব করে সে বাঁচতে চেয়েছে ঠিকই কিন্তু মৃত্যুবিভ্রান্ত জীবনে সে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে।

দার্শনিকতা সমৃদ্ধ এই উপন্যাসে লেখক মানুষের ও জগতের পূর্ণতার বিষয়ে অনুসন্ধান করেছেন। নিরন্তর ঘটে চলা ব্যর্থতা, অসহায়তা, বিচ্ছেদ, মৃত্যুর কাহিনী এই উপন্যাসে রূপায়িত হলেও লেখক শেষ পর্যন্ত তাঁর জীবনবাদী মানসিকতাকে প্রকাশ করেছেন। অপূর্ণাঙ্গতার মধ্য দিয়েও পূর্ণতার জীবনের উদ্দেশ্য ও অনুসন্ধানই এখানে প্রাধান্য পেয়েছে।

‘যদুবংশ’ (শারদীয় ‘আনন্দবাজার পত্রিকা’, ১৯৬৭) উপন্যাসে ষাটের দশকের অসুস্থ সামাজিক, রাজনৈতিক ও ব্যক্তিক প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে। চার যুবকের আত্মঘাতী ঔদ্ধত্য ও আচরণ সমাজ ও তাদের জীবনকে ক্রমে কলুষিত করে দিচ্ছিল এই চিত্র যেমন লেখক অঙ্কন

করেছেন, তেমনি এর পাশাপাশি যুগের দায়ও অস্বীকার করা যায় না। কারণ এই যুবকদের সৃষ্টি করেছে সেই সমাজ, যে সমাজ অসুস্থ। রচনাটির মাধ্যমে লেখক তাঁর সমাজ সচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন এবং সমকালীন পরিস্থিতিকেও ফুটিয়ে তোলার প্রয়াস তাঁর মধ্যে দেখা গেছে। ‘পূর্ণ অপূর্ণ’ উপন্যাস রচনার বছরই এই রকম একটি উপন্যাস রচনা করে সমকালীন লেখককুল ও পাঠকের কাছে তাঁর বৈচিত্র্যময় স্বাদের সাহিত্য রচনার ক্ষমতাকে তিনি প্রকাশ করেন। কে. সি. দাসের দোকান, কার্জন পার্কে কিংবা ধর্মতলার ট্রামডিপোর ডিফেকটিভ ট্রামে আড্ডা দিতে বসে সমকালীন লেখক শিল্পী বন্ধুদের কাছে তিনি একপ্রকার চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেন এই রকম একটি উপন্যাস রচনা করবেন বলে।

বিমল কর স্বীকার করেছেন এই উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে তিনি একটি স্প্যানিশ উপন্যাস, গোয়াটেসোলো’র ‘দি ইয়াং অ্যাসাসিনস’ ও একটি ইটালিয়ান লেখকের উপন্যাস প্রাটোলিনির ‘এ হিরো অফ আওয়ার টাইম’ --এর প্রভাব অনুভব করেছেন। দীর্ঘদিন আগে পড়া উপন্যাস দুটিতে স্পেন ও ইটালির যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে যে মূল্যবোধের অবক্ষয় ও পীড়িত সমাজসমস্যার রূপ প্রত্যক্ষ করেছিলেন, তার সাথে ষাটের দশকের বাংলার ও ভারতের যুব সম্প্রদায়ের সামঞ্জস্য লেখক খুঁজে পেয়েছেন। বন্ধুদের সাথে আড্ডায় সাহিত্য শিল্পের পাশাপাশি তৎকালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির বিষয়ও বাদ পড়ত না। লেখক তাঁর জীবনে রাজনৈতিক মতাদর্শকে উগ্রভাবে প্রকাশ না করলেও মনের নিভৃত কোণে সচেতন শিল্পী-সাহিত্যিক হিসেবে এই সব বিষয়কে উপেক্ষা করে থাকতে পারেনি।

রাজনৈতিক পরিস্থিতির ফলশ্রুতিতে যে পরিবর্তন ঘনীভূত হয়ে ওঠে তা তাঁর দৃষ্টি এড়ায় নি। এই সারিতে আছে ১৯৬৫-তে ট্রামের ভাড়া বৃদ্ধিতে সাধারণ মানুষের আন্দোলন, ট্রাম পুড়িয়ে দেওয়ার কর্মসূচীতে পুলিশ-জনতার সংঘর্ষ, ডাক-তার-রেল ধর্মঘট, ১৯৬৬ সালের ফেব্রুয়ারী-মার্চ মাস জুড়ে খাদ্য আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী এলাকার জনজীবনের প্রভাব, ছাত্রবিক্ষোভ, ১৯৬৭ সালের ২-রা মার্চ পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস জমানার অবসান, ৮-ই মে থেকে নকশালবাড়ি আন্দোলন সারা পশ্চিমবঙ্গ তথা পার্শ্ববর্তী এলাকার উত্তাল হয়ে ওঠার মতো সমকালীন নানা পরিস্থিতি। ছাত্র-যুবকেরা মহন্তর মানবিকতার স্বার্থে বিপ্লবের আড়িনায় এসে ক্রমে ক্রমে হারিয়ে ফেলেছে সুকোমল মানসিকতা, ত্রুর রাজনৈতিক পরিস্থিতি তাদের জীবনে অভিশাপ

নিয়ে এসেছে। পরিবার সমাজ থেকে উপেক্ষিত যুবসমাজেরা গুডামি, শয়তানির পথ বেছে নিয়েছে। স্বপ্ন হারানো এই যুবকদের প্রকৃত স্বরূপ আঁকার চেষ্টা করেছেন লেখক এই উপন্যাসের মধ্য দিয়ে।

রুচিহীন, নীতি ও বিবেক বর্জিত যুবকদের প্রতিনিধি সূর্য, বুললি, অভয়, কৃপাময়ের মত যুবকেরা, যাদের পারিবারিক দিক দিয়েও শান্তি-স্বস্তি আসেনি, সামাজিক দিক দিয়েও তারা অস্থির সময়ের প্রতিনিধি। সূর্যের সাথে তার দিদি বিজয়ার সম্পর্ক ভাল নয়। বিজয়ার কর্তৃত্ব করার মানসিকতাকে মেনে নিতে পারে না সূর্য। তার বাবা কামাখ্যাবাবু মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান, যার ভদ্রলোক বলে সুখ্যাতি নেই। আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য থাকলেও সূর্যের উপর স্নেহ ও ভালবাসার পারিবারিক স্পর্শ আসে নি। শুধুমাত্র রুগ্ন, অসুস্থ ভাগ্নে ছোকনুর প্রতি সে স্নেহশীল, এবং তার দুর্বলতা তার প্রতিই কিছুটা প্রদর্শিত হয়েছে।

বুললির বাবা থানার দারোগা। চাকুরি জীবনের শেষাংশে এসে পড়লেও তিনি বৈধ এবং অবৈধ অর্থপ্রাপ্তির মাধ্যমে পারিবারিক স্বাচ্ছন্দ্যকে সুনিশ্চিত করে ফেলেছেন। “বুললির বাবা থানার বড় দারোগা, লোকে বলে, যে চেয়ারে বসে — ওঠবার সময় সেই চেয়ার থেকে পেরেক পর্যন্ত তুলে নেয়, অ্যায়সা চীজ।”^{১৪} বুললির সাথে তার বৌদি মৃদুলার সম্পর্কও ভাল নয়। অত্যন্ত কদর্য ভাষায় তাদের ঝগড়া হতেও দেখা যায়।

কৃপাময় পারিবারিক দিক দিয়ে শান্তি পায়নি। কৃপাময়ের বাবা তার ভাইদের মানুষ করলেও তারা উপযুক্ত হয়ে কৃপাময়ের বাবার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা, প্রতারণা করে তাকে সরিয়ে ফেলেছে। আঘাতে যন্ত্রণায় কৃপাময়ের মা পাগল হয়ে গেছে। বনেদি বাড়ির ছেলে হয়েও পরিস্থিতির পরিবর্তনে অসুস্থতা, দারিদ্র্য কৃপাময়দের জীবনে নেমে এসেছে। কৃপাময়ের ছোটকাকিমা খানিকটা সহানুভূতিশীল হলেও এই বড়-ঝগড়ায় সেই অবলম্বনও সুখের, শান্তির বাতাবরণ সৃষ্টি করতে পারে না। কৃপাময়ের বাবা কিংবা মা এই অবস্থায় প্রতিবাদ করেনি। তার মা ঈশ্বরের চিন্তায়, আগ্রয়ে শান্তি পেতে চাইলেও সন্তানের প্রতি কোন কর্তব্য করেননি।

অপর তিন বন্ধুর মত অভয়ের স্বচ্ছন্দতা ছিল না। তার বাবার উদয়ান্ত পরিশ্রম, দুজন বিবাহযোগ্য্য বোন, মা নিয়ে তাদের অস্বচ্ছন্দ সংসার, তার দাদা বিয়ের পর সংসার থেকে আলাদা হয়ে চাকরি নিয়ে মোগলসরাই চলে গেছে। অভয়ের উপর তাই অনেক দায় বর্তালেও আর্থিক উপার্জনের কোন পথ তার কাছে উন্মুক্ত হয় না। চাকরির জন্য চারুবাবুর দারস্থ হলে চারুবাবু সামান্য সহযোগিতা না করে শুকনো উপদেশ দেওয়ার চেষ্টা করে দায় এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে।

তদ্বৎকথায় যে পেট ভরে না তা বুঝতে পেরে সূর্য, অভয়ের মত যুবকেরা ক্রমে মানসিক অসুস্থতার শিকার হয়ে পড়ে।

রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, প্রশাসন, সমাজের উপর তলার মানুষদের নীতিহীনতা, প্রতারণা, বিশ্বাসঘাতকতার ছবি অঙ্কন করে লেখক সমকালীন পরিস্থিতিকে স্বচ্ছভাবে প্রকাশ করতে চেয়েছেন। এর সাথে যুক্ত হয়েছে তুলসীকে কেন্দ্র করে শিল্প-সাহিত্যের অন্তঃসারশূন্যতার দিকটি। তুলসী সূর্যদের বন্ধু হলেও সে কিছুটা শাস্ত, উদাস ও রুগ্ন প্রকৃতির যুবক। সে কবিতা লিখত এবং তার দু-একজন কবিবন্ধু ছিল কলকাতায়। তাদের কোন একজন দরিদ্র বন্ধু তুলসীর কাছ থেকে টাকা ধার নিয়েছিল মায়ের অপারেশনের নাম করে তারপর আর সে ধরাছোঁয়া দেয়নি। তুলসীর সরলতার সুযোগ নিয়ে তাকে নিঃশ্ব করে তোলে এই যুবকেরা। তুলসী ধার-দেনা করে তার একটা কবিতার বই প্রকাশ করেছিল। এই যুবকেরা খ্যাতিমান কবিরূপে তুলসীকে স্বীকৃতি এনে দেওয়ার জন্য মদের দোকানে তুলসীর বই-প্রকাশকে কেন্দ্র করে উৎসব পালন করেছিল, কিন্তু তুলসীর অবর্তমানে তারাই তুলসীর নামে উপহাস করে ও কদর্য ইঙ্গিত করে। তুলসী এদের প্রকৃত স্বরূপ বুঝতে পেরে এই জগতের অন্তঃসারশূন্যতা ও কদর্য পক্ষিতাকে উপলব্ধি করেছে।

গণনাথ চরিত্রটি আদর্শবাদী চরিত্র, যার বিরুদ্ধে সূর্যরা আক্রমণ শানালেও তিনি তাদের শুভবুদ্ধি জাগ্রত করার উদ্দেশ্যে জীবনপাত করেছেন। তিনি বয়সের দিক দিয়েও সূর্যদের থেকে বড়। কিন্তু তাঁর উন্নত মানসিকতা সূর্যদের সাথে মিশতে বাধাসৃষ্টি করেনি। সূর্য নিজের খরচ চালানোর জন্য ঘর থেকে ‘জন্মসুখী প্রদীপ’ চুরি করে আনলে গণনাথ তা বিক্রি হতে দেয়নি, নিজের বন্ধকে রেখে টাকা যুগিয়ে গেছেন ইন্দ্রকে। ভেবেছিলেন পরবর্তীকালে ইন্দ্রের হাত দিয়ে তা তার বাড়িতে পাঠিয়ে দেবেন। উপন্যাসের শুরুতে তাকে কেন্দ্র করে সূর্যদের গালিগালাজ শোনা গেছে। গণনাথ নয়না-যমুনা-রত্নার বাড়িতে ছিলেন। নয়না অশেষ দারিদ্র্য স্বীকার করে ছোট দুই বোনকে মানুষ করার চেষ্টা করেছে। একই শাড়ি ভাগ করে পরা, কিংবা একই চপ্পল দুজনে দু বছর ধরে ভাগাভাগি করে পরার মধ্য দিয়ে তাদের সংসারিক অস্বচ্ছলতার রূপটি প্রকাশিত হয়। গণনাথ নয়নাদের নিরাপত্তার ক্ষেত্রেও ভরসা দানকারী মানুষ হয়ে উঠেছেন। আমরা অবশেষে লক্ষ্য করি ইন্দ্রের জন্মসুখী প্রদীপ নয়নাদের ঘর থেকে হারিয়ে গেছে। নয়নার সন্দেহ তার বোন যমুনা সেটা নিয়ে তার মানুষের সাথে ঘর ছেড়ে সুখের সন্ধানে চলে গেছে। কিন্তু সূর্যরা এর জন্য দায়ী করেছে গণনাথকে। তারা তাকে চোর বলেও আখ্যায়িত করেছে। যন্ত্রণায়, দুঃখে হতাশায়

আত্মহত্যা করেছে গণনাথ। কিন্তু এই আত্মহত্যার ঘটনা তাদের অন্তরাআকে প্রশ্নমূলকতার সামনে দাঁড় করিয়েছে, বিবেকবোধকে জাগিয়ে তুলেছে। সূর্যের কথা থেকে তা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান- “কী লাভ হল তোমার? যে মারবার সে মেরে বেড়ে দিয়েছে। তুমি শালা মাঝখান থেকে কলা চুষলে। গণাদা, মাইরি গণাদা, আমরা তোমায় মারিনি। মেরেছি? আমাদের জন্য তুমি মরলে? কেন মরলে? মানে লেগেছিল? সম্মানে লেগেছিল? তুমি মাইরি আজব মাল।”^{১৫}

উপন্যাসটিতে প্রেম ও যৌনতার অস্থির, অসুস্থ চিত্রও প্রকাশিত হয়েছে। সূর্যের সাথে মালার একটা সম্পর্ক তৈরী হলেও সূর্যের দিক থেকে তেমন আগ্রহ দেখা যায়নি। মালা তার শরীর প্রদর্শন করে সূর্যের কাছে কৌতূহল সঞ্চার করতে চেয়েছে। এছাড়াও জয়ন্তী ও মালার মধ্যে গড়ে ওঠা সমকামিতার চিত্র যেমন রয়েছে, তেমনি সূর্য তার দিদির ঘরে অশ্লীল ছবির বই দেখেছে যা মানসিক অসুস্থতার চিত্র। সূর্যের মনে সন্দেহ উপস্থিত হয়েছে ছোকনুর জন্মরহস্য নিয়েও। অর্থাৎ উপন্যাসটির মাধ্যমে লেখক সামাজিক অসুস্থতার পরিবেশকে চিত্রিত করতে চেয়েছেন। সূর্য, বুললি, কৃপাময়, অভয়, তুলসী, যমুনা, মালা এরা সকলেই সামাজিক ও পারিবারিক কারণে নৈতিকতাহীন বা মূল্যবোধহীন মানুষে পরিণত হয়েছে। “সূর্য-অভয়-বুললি-কৃপাময় প্রায় সমতুল জীবন পরিধিতে বিচরণ করেছে। এরা সহানুভূতিহীন নয় কিন্তু সংসারের প্রচলিত ছকে আত্মহীন। ছোটকাকিমার প্রতি কৃপাময়ের শ্রদ্ধা ছিল, ছোকনু সম্পর্কে সূর্যর করুণা ছিল, বৌদির সম্পর্কে বুললির স্বাধীন প্রীতি ছিল। তবু সংসারের চার দেওয়াল যেন তাদের আপন ছিল না। আসলে এরা Sick society -তে বাস করে একধরনের দুরারোগ্য Insanity তে ভুগেছে। সংসার এদের দু-মুঠো অন্ন দিলেও সেই অধিকার দেয়নি যাতে এদের বিপন্নতাবোধ এবং ‘রাগী তরুণ’ হিসেবে অসুস্থ চিন্তা চেতনার মোড় ফিরতে পারে।”^{১৬} এদের মধ্যেও স্বপ্ন ছিল, আশা ছিল, কিন্তু সমাজ তাদের সেই প্রত্যাশাকে কোরক অবস্থাতেই নষ্ট করে দিয়েছে। সূর্য বা বুললির বাবা, চারুবাবু, অধ্যাপক, কবি নামধারী শোষণ পোকার মতো লোভী মানুষেরা সমাজটাকে নষ্ট করে দিয়েছে, সেই সমাজে কর্মহীন, স্নেহ-মমতাহীন যুবক-যুবতীরা কী পাবে এই সমাজ থেকে। তাদের বীভৎস রূপই সমাজের আসল চেহারা। গণনাথের মতো মানুষেরা একাই গ্রহণ লাগা সমাজকে গ্রহণ-মুক্ত করতে পারেনা। কলঙ্কিত সমাজ থেকে তাদের পিছু হটতে হয়। তাই বলা যায় উপন্যাসটি সমকালীন সমাজের প্রতিফলন। লেখক উপন্যাসটির কাহিনী একটি শহরকে কেন্দ্র করে গড়ে তুললেও, সেখানকার নাম প্রকাশ করেননি। তৎকালীন সম্ভ্রাস ও যুব সম্প্রদায়ের বেপরোয়া মানসিকতা কোন নির্দিষ্ট স্থানে সীমাবদ্ধ

ছিলনা। কলকাতায় যেমন তা প্রকাশ পেয়েছিল, তেমনিভাবে মফস্বল শহরেও লক্ষ্য করা যায়। এই উপন্যাসের মাধ্যমে তৎকালীন যুগের, প্রতিচ্ছবি প্রকাশিত হয়েছে।

‘অসময়’ (১৯৭২) উপন্যাসে আত্মকথন রীতির মাধ্যমে লেখক চরিত্রগুলির চারিত্রিক প্রবণতা ও মনস্তাত্ত্বিকতাকে প্রকাশ করেছেন। অশান্ত, ক্ষয়িষ্ণু সময়ে মানুষের আকাঙ্ক্ষা ও মূল্যবোধের সংঘাত, ইচ্ছা শক্তির উদ্দামতায় ক্ষতবিক্ষত হওয়ার বিষয়টিকে বিমল কর এই উপন্যাসে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন। উপন্যাসটির ছয়টি চরিত্র মোহিনী, অবিন, আয়না, সুহাস, জ্যাঠামশাই ও শচিপতির মাধ্যমে কথন রীতিকে আশ্রয় করে কাহিনী গড়ে তুলেছেন লেখক। এই উপন্যাসে প্রধান চরিত্র মোহিনী এবং তাকে কেন্দ্র করেই অন্যান্য চরিত্রগুলি আবর্তিত হয়েছে। ছয়টি চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিকতাকে লেখক ফুটিয়ে তুললেও প্রধানত তিনি প্রাধান্য দিয়েছেন মোহিনী ও অবিন চরিত্রের মনোবিশ্লেষণকে।

মোহিনী চরিত্রটির মাধ্যমে লেখক পুরুষতান্ত্রিক সমাজে পুরুষের স্বৈচ্ছাচারিতা, নারীকে পণ্য করে তোলার মানসিকতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হেনেছেন। মোহিনী প্রথমে শচিপতিকে ভালবেসেছিল। কিন্তু তার বিয়ে হয় রাজেশ্বরের সাথে। বনেদি বাড়ির মেয়ে বনেদি বাড়ির বউ হয়ে গিয়েছিল অনেক আশা নিয়ে, কিন্তু কয়েকদিনের পরই সিঁথি মুছে চলে এসেছিল তার লম্পট স্বামীর সাথে না থাকার প্রতিবাদ জানিয়ে। পিতৃগৃহে ফিরে এসে সংসারের মানুষ হয়ে সব দায়িত্ব নিজের হাতে তুলে নিয়েছিল। তার নারীত্বের মাধ্যমে সে সুখী হতে চেয়েছিল। শশুরবাড়ির আবহাওয়া তার কাছে মনে হয়েছিল বিষাক্ত। রূপবান স্বামী দেখে সুখী হলেও সে জানতে পেরেছে তার স্বামী তার সেজ বউদির সাথে অবৈধ সংসর্গে লিপ্ত। মোহিনীকে সে স্ত্রীর মর্যাদা দিলেও সম্পূর্ণ ভালবাসা দিতে পারে না। মোহিনী তার শশুরবাড়ির আর দশটা আসবাবের মত নিজের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখতে চায়নি।

মোহিনী তার পিতৃগৃহের চেনা পরিমণ্ডলে ফিরে এসেছে, নিজের সকল স্বার্থকে বলি দিয়েছে, নতুনভাবে সম্পর্ক রচনা করে অন্য কারোর সাথে সংসার গড়তে চায়নি। এ তো তার স্বৈচ্ছা-নির্বাসন। এইভাবে নিজেকে আত্মপ্রবঞ্চনার করার অর্থ খুঁজে পায়নি অবিন। অবিন তার উচ্ছ্বাস, প্রাণশক্তির জোয়ারে মোহিনীকেও নাড়া দিয়েছে, মোহিনীর স্বৈচ্ছা নির্বাসনকে ভেঙে দিতে চেয়েছে। সে সংস্কার বিরোধী, উদ্দাম, পরিবর্তনশীল জগতের সাথে একাত্ম-হৃদয় ও ঝকঝকে পুরুষকারের প্রতিমূর্তি। তার মনে নেই শচিপতির মত মৃত্যুবোধ। জীবনের যৌবনের জয়গান যেন তার একমাত্র

ব্রত। এই অবিদ্যা মোহিনীর কাছে ঈপ্সিত, কিন্তু যথেষ্ট রহস্যময়ও। তার এতদিনের দেখা পুরুষদের থেকে অবিদ্যা আলাদা-- “শচিদা অক্ষম পুরুষ, তার না আছে সাহস, না তেজ, না উদ্যম। সে সংসারে এসেছে দুর্বলের মতন। ...তাকে দেখে মেয়েদের মায়া হতে পারে, মন ভরে না। আর যে মানুষটার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছিল তার মতন পুরুষকে আমি কোন দাম দিই না। আর এখন দেখছি এই অবিদ্যা ...ওর যেন সবটাই বিচিত্র। তার বেগ আছে নিষ্ঠুরতা নেই। সে দক্ষযজ্ঞ বাঁধানোর মানুষ না। তার মধ্যে যেটা খেয়ালিপনা সেটা ভর করলে তাকে কোথায় উড়িয়ে নিয়ে যাবে বলা মুশকিল, কিন্তু অবিদ্যা যখন তার মতি ফিরে পায় তখন সে বড় সুন্দর হয়ে ধরা দেয়।”^{১৭} কিন্তু মোহিনী অবিদ্যার কাছেও ধরা দেয় না। সে মনে করে তার জীবনের ছত্রিশটা বছর কেটে গেছে, অনেক দেরি হয়ে গেছে। আর সম্পর্ক বাঁধা যায় না। মোহিনী তার দ্বিধা দ্বন্দ্ব কাটিয়ে জীবনের প্রয়োজনে নতুন ঘর বাঁধতে না চাইলেও তার মনের অন্তঃপুরে থেকে গেছে হতাশা, যন্ত্রণা, নিসংগতা। সে জানে জ্যাঠামশাই কিছুদিন পর এ সংসারের মায়া কাটিয়ে ফেলবেন, আয়নার বিয়ে হয়ে যাবে, সুহাস দূরত্ব বজায় রেখেই চলেছে, “কেউ যদি না থাকে তবে আমি কেন যক্ষের মতন বসে থাকব এখানে। ছত্রিশটা বছর এখানে ঘর বাড়ি বারান্দা করে আমার কতটুকু বুক ভরেছে? কী পেয়েছি আমি? কোন সান্ত্বনায় আঁকড়ে আছি এই মাটি? কী হবে আমার? শুধু বেঁচে থেকে থেকে বুড়ি হয়ে মারা যাব?”^{১৮}

মোহিনীর অন্তরের এই প্রশ্ন তাকে তার বর্তমান অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার প্রেরণা দিয়েছে, তবুও সে পারেনি নিজের সংস্কার, রুচিবোধ, মূল্যবোধকে নতুন ভাবনার আলোয় উজ্জ্বল করে তুলতে। ভিতরে ভিতরে সে শুধু ভেঙে গেছে। অবিদ্যার আসার পর সেই ভাঙন আরও তীব্র হয়ে উঠেছে। তবুও সে উৎসাহ লাভ করতে পারে নি, নিজের মনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার জন্য। সমালোচক বলেছেন-- “চলমান জীবনের স্রোত নয়, স্রোত থেকে কিছু মানুষকে আলাদাভাবে সনাক্ত করতে গিয়ে বিমল কর প্রথমেই দেখেছেন মানুষ ভেতরে ভেতরে ভেঙে গেছে এবং সেই ভাঙনের সূত্রেই বার বার প্রবল হয়ে উঠেছে Struggle of the individual; মানুষ যত ভাঙছে, ততই বেড়ে যাচ্ছে তার নিজের সঙ্গে নিজেরই কথা বলার গুঢ় প্রবণতা। ফলে তাঁর উপন্যাসের অনেক খানি the dialogue of the mind itself;”^{১৯}

এই মানসিক ভাঙন অন্যান্য চরিত্রগুলির মধ্য দিয়েও লক্ষ্য করা গেছে। শচিপতির বক্তব্যে তার মনের মৃত্যুভয় প্রকাশিত। তাদের পরিবারে একাধারে ঘটে চলা মৃত্যু মিছিল তার মনে

নিয়তির ভয়ঙ্কর খেলার উপলব্ধি জাগ্রত করেছিল, সে তার বাড়ির একমাত্র জীবিত প্রতিনিধি। একসময় সে ভেবেছিল তার জীবনের সাথে মোহিনীকে যুক্ত করে জীবনবোধে উদ্দীপ্ত হতে, কিন্তু তা না ঘটায় তার জীবনের প্রতি অনীহা ক্রমশ কমে হয়ে এসেছে। ধীরে ধীরে সে শারীরিক ও মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে।

জ্যাঠামশাই তাঁর জীবনে বহু মৃত্যুশোক পেয়েছেন, মোহিনীর পরিণতি তাঁকে ভাবিয়ে তুলেছে। আয়নার বিয়ে ভেঙে যাওয়া, সুহাসের দূরত্ব বজায় রাখার প্রবণতা, শচিপতির অসুস্থতা, সকল দিক দিয়েই তিনি যন্ত্রণাদগ্ধ হয়েছেন। গ্রহণের পর যে আলোর প্রকাশ ঘটে, সুখ ও আনন্দে ভরে ওঠে এটা মনে করে তিনি শান্তি পাওয়ার চেষ্টা করেছেন।

আয়নার হৃদয়যন্ত্রণাও এখানে প্রকাশিত হয়েছে। তার বিয়ে ভেঙে যাওয়া, সুহাসের বিয়ে না করতে চাওয়া, দিদির নিঃসঙ্গ জীবন তাকে কাতর করে তুলেছে। তপুর সাথে তার অন্তরঙ্গতার ব্যাঘাত ঘটলেও পরবর্তীকালে তা কেটে গেছে, বুলাকে দূরে সরিয়ে রাখার জন্য সুহাসের মানসিকতাকে সে সমর্থন করতে পারেনি।

সুহাস তার দিদির বিবাহিত জীবনের দুঃখজনক পরিণতির জন্য হতাশাবোধ করেছে। এর সাথে যুক্ত হয়েছে আয়নার বিয়ে ভেঙে যাওয়ার যন্ত্রণা। দিদির পরিণতি যে আয়নার ভাবি শৃঙ্গুরবাড়ি ভাল চোখে দেখেনি তা সে বুঝতে পেরেছে, সে প্রতিবাদী হয়ে উঠেছে সমাজের এই সব যুক্তি, বিবেকহীন মানুষদের বিরুদ্ধে, দুঃখে, হতাশায় বুলার সাথে তার যে সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল তা ভেঙে দিয়েছে সে। এছাড়া লীলার আত্মহত্যা তার মনে গভীর বিষাদের ছায়া ফেলেছে। পারিবারিক ভাঙন, সম্পর্কের ফাটল, মানসিক অসুস্থতা যে লীলার মৃত্যুর কারণ সে উপলব্ধি করেছে। সুহাসের দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুও তার মনে বিষাদের ছায়া ফেলেছে।

অবিন চরিত্রটি এই উপন্যাসের প্রাণচঞ্চল, প্রত্যয় দীপ্ত চরিত্র। সুহাসদের বাড়ি দেখে তার মনে হয়েছে-- একটা জাদুঘর, যেখানে সর্বত্র প্রাণহীনতার, নিস্তরঙ্গতার ছবি বিদ্যমান। তার মনে হয়েছে সংস্কারের প্রশ্ন দেওয়ার অর্থ হল মানবিক উল্লাসকে অমর্যাদা করা। সে কারণেই সে মোহিনীদের বাড়ির সংস্কারের অচলায়তনকে ভাঙতে চেয়েছে। মোহিনীর উদাসীনতা তার কাছে আত্মবঞ্চণারই নামান্তর। অদৃষ্টের কাছে সে কোনভাবেই সঁপে দিতে পারে না নিজেকে, এমনকি সে মোহিনীকেও এই পথ থেকে সরিয়ে আনতে চেয়েছে। পারিবারিক বন্ধন যে মোহিনীর বন্দী দশার একমাত্র কারণ তা সে উপলব্ধি করে শ্রদ্ধা, সম্মান, ভালবাসা, বিদ্রূপের মাধ্যমে মোহিনীর সংস্কারের

বন্ধনকে নষ্ট করতে চেয়েছে। জীবনের প্রবাহকে, আনন্দ, উৎসবকে জোর করে ঠেকিয়ে রেখেছে মোহিনী। জীবন পিপাসা ও সত্যের রূপায়ণের মাধ্যমে মোহিনীর মনে আনতে চেয়েছে প্রাণের জোয়ার। একটা সময় অবিন তার প্রাণের উদ্দামতায় মোহিনীর কাছে অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে, কিন্তু মোহিনী তার নিজের অবস্থান থেকে বেরিয়ে আসতে পারে না। কিন্তু অবিনের প্রতি তার ভালবাসাকে সঞ্চারিত করে দেয়।

‘অসময়’ উপন্যাসে মোহিনীর মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা প্রকট হলেও লেখক অপর চরিত্রগুলির সমস্যাকেও গুরুত্ব দিয়েছেন। মোহিনীর নারীসত্তা স্বেচ্ছাচারী পুরুষদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ঘোষণা করেছে। স্ত্রী হয়ে পরিবারের যূপকাঠে সে নিজের জীবনকে সঁপে না দিয়ে ব্যক্তিস্বাভাত্ম্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। পারিবারিক বন্ধনের দিক থেকে জ্যাঠামশাই ও অন্যান্য সদস্যদের বন্ধনটিও সুন্দরভাবে লেখক ফুটিয়ে তুলেছেন। শচিপতির মৃত্যুবোধ মানুষের জীবনে নিয়তির প্রভাবকে প্রকাশ করেছে। অবিন এর বিপরীত চরিত্র রূপে বন্ধ, অসুস্থ পরিবার ও সমাজে উন্মুক্ত বাতাস নিয়ে এসেছে। তার কথোপকথনের মাধ্যমেও নানা রূপকার্থ প্রকাশিত হয়। মোহিনী যে ঘরটিতে থাকত, তার জানালা ঘিরে ছিল জামগাছের একটি বিরাট ডাল। এই প্রতিবন্ধকতা পেরিয়ে মোহিনীর দৃষ্টি বাইরের জগতে মুক্তি পেত না। ঝড়ে সেই ডাল ভেঙে পড়ার পর অবিন মোহিনীকে জিজ্ঞাসা করেছে এই আড়াল নিয়ে সে ঘরে থাকত কি করে। এই ডালের আড়ালের রূপকার্থে যেন মোহিনী এই সমাজ থেকে নিজেকে স্বেচ্ছানির্বাসিত করে ঘরের বন্ধনে আবদ্ধ করে রেখেছিল। নিজস্ব মূল্যবোধের বেড়া ভেঙে জীবনের প্রয়োজনকে প্রকাশিত হতে দেয়নি। মনে মনে ক্ষয়িষ্ণু হয়ে উঠেছে। গাছের ডাল ভেঙে যাওয়ার পর মুক্তির আবহ এলেও মোহিনী তার বৃত্ত থেকে বেরোতে পারেনি, কিন্তু অবিনের এই প্রসঙ্গ রূপকার্থকে প্রকাশ করেছে সন্দেহ নেই। পরিশেষে বলা যায় ‘অসময়’ উপন্যাসটি মোহিনীর প্রতিবাদে মুখর হলেও পরিস্থিতির জটিলতায় অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বকে প্রকাশ করার একটি প্রয়াস বলে মনে হয়েছে।

‘খোয়াই’ (১৯৬০) উপন্যাসটিতে অন্ত্যজ শ্রেণীর একজন মানুষের জীবনের ট্রাজেডি বর্ণিত হয়েছে। বিমল কর ছোটগল্পে সমাজে পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর কিছু চরিত্র অঙ্কন করেছেন; যেমন ‘মানবপুত্র’ ‘আঙুরলতা’ ‘বুদবুদ’ প্রভৃতি। কিন্তু উপন্যাসে তার প্রাচুর্য নেই। ‘খোয়াই’ উপন্যাসে ফটিক চরিত্রের ঘটনাবহুল জীবনের মর্মাস্তিক বেদনাগাথাকে ফুটিয়ে তুলেছেন। চরিত্রের আত্মকথন রীতির মাধ্যমে উপন্যাসের কাহিনী প্রবল গতিতে এগিয়ে গেছে এবং চরিত্রটির ভ্রাম্যমান জীবনের

নানা ঘটনার মাধ্যমে তার চরিত্রের ও মনের বহু বৈচিত্র্য প্রকাশিত হয়েছে। উপন্যাসের সাতটি অধ্যায়ের প্রতিটি অনুচ্ছেদ সংখ্যার দ্বারা চিহ্নিত হয়েছে। এবং সেইভাবে কাহিনীতে প্রবল গতি আরোপ করতে পেরেছেন লেখক। এই ধরনের পদ্ধতির মাধ্যমে তাঁর প্রথাসিদ্ধ উপন্যাসের গঠন থেকে বেরিয়ে আসার প্রচেষ্টা ছিল বলে লেখক বর্ণনা করেছেন-- “প্রথাসিদ্ধ উপন্যাস লেখার বাইরে অন্য কিভাবে একটি উপন্যাস লিখতে পারি-- তার চেষ্টা চরিত্র করছিলাম। এ ব্যাপারে সফল হওয়া যাবে কি যাবে না-- তা নিয়ে তেমন ভাবতে বসিনি।”^{২০} তবে এই উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে লেখক এরস্কিন কলডওয়েলের ‘স্যাকরিলেজ অফ অ্যালান কেন্ট’ উপন্যাসটির প্রভাব মেনে নিয়েছেন। এই উপন্যাসে অস্তুজ শ্রেণীর মানুষের জীবনযাত্রা বর্ণিত হয়েছিল, যার সাথে ‘খোয়াই’ উপন্যাসের মিল লক্ষিত হয়।

‘খোয়াই’ উপন্যাসের নায়ক ফটিকের বিচিত্র জীবনযাত্রার ছবি প্রকাশিত হয়েছে। সে তার বাব-মা কে জানত না। শ্যামলাল বাবুকে বাবা এবং বেশ্যা চাঁপারানিকে মা বলত। তারাই তাকে ছোটবেলায় লেখাপড়া শেখানো শুরু করেছিল, ইজের কিনে দিয়েছিল। এখানে সেখানে ফাইফরমাস খেটে, স্টেশনে কুলি ও কুকুরদের সাথে রাত্রিবাস করতে করতে সেও আর পাঁচটা স্বাভাবিক ছেলের মত মনের নিভূতে কামনা-বাসনার চাপ অনুভব করতে পারত। তার বন্ধু পার্বতীর সাথে যুক্তি করেছিল অপরের দোকানে ফাইফরমাস না খেটে তারাও একদিন দোকান করবে। পার্বতীর সাথে সে বেশ্যাবাড়িতেও গিয়েছিল, আবার এই পার্বতী একদিন তার সমস্ত জমানো টাকা নিয়ে পালিয়ে গিয়ে ফটিকের জীবনটাকে ঘোর অনিশ্চিয়তার মধ্যে ফেলে দিল। ফটিকও দোকান থেকে টাকা চুরি করে পালাল। এর পর আলুর গুদামে, কাঁচের কারখানায়, মেসের কাজে কিংবা ট্যাক্সি মোহর কাজে নিযুক্ত থেকেছে সে। জীবনযুদ্ধে ব্রতী হয়ে এরপরও তাকে কখনও কাপড়ের ব্যবসা, গেন্জিকলে কাজ, অপেরাতে নিলাম হাঁকার কাজ, গিল্টির গয়নার দোকান দেওয়া, আলুর আড়তদারী করা প্রভৃতি কাজের মধ্য দিয়ে তাকে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে হয়েছে। জীবনের অভিজ্ঞতাও ফটিকের কম নয়। সে তার অনিশ্চিত জীবনের মধ্য দিয়েও বুঝতে পেরেছিল কীভাবে বাঁচতে হয়। অস্তিত্বের সংকট যেখানে প্রকট সেখানে অপরকে বঞ্চিত করেই তাকে বাঁচতে হবে। তাই কখনও তাকে আশার মতো বেশ্যাকে খুন করে গয়না নিয়ে পালাতে হয়েছে, কখনও গাড়ি চালাতে গিয়ে মানুষকে চাপা দিয়ে চম্পট দিতে হয়েছে। এই পালালোর ধারা অব্যাহত থেকেছে ভোজবাজি খেলার ওস্তাদ বানোয়ারীলালের সঙ্গে পরিত্যাগ করে গা ঢাকা দেওয়ার মধ্যেও।

ফটিক বুঝেছিল এই পৃথিবীতে একাধিক মানুষ অপর মানুষকে ঠকিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। তার জীবনেও পার্বতী, ময়না কিংবা স্বর্ণ অতিরিক্ত লাভের প্রত্যাশায় তাকে ত্যাগ করে চলে গেছে। সুতরাং জীবন মানেই হলো শুধু চলা-- এগিয়ে যাওয়া। কারোর জন্য অপেক্ষার কোন দাম নেই এই সংসারে। রামেশ্বর ড্রাইভার তাকে বলেছিল, “দুনিয়া বুঝলি বে উললু-- বিলকুল বি এন আর -এর আপ রোড, গিয়ার চড়িয়ে যাবি, ইঞ্জিন থামাবি কি শালা চম্পট লাট হয়ে যাবো।”^{২১}

জীবনধারণের জন্য ফটিক শুধু ছুটে বেড়িয়েছে। সভ্য সমাজের মানুষের কাছে কোন সাহায্য সহানুভূতি পায়নি, বেঁচে থাকার মতো অনুকূল পরিবেশ পায়নি। অথচ সেও সাধারণ মানুষের মতো স্বপ্ন দেখেছে, প্রবৃত্তির তাড়না অনুভব করেছে। যৌনতার আকাঙ্ক্ষা যেমন তার মধ্যে দেখা গেছে, তেমনি বিবাহিত জীবনের সুখ-ঐশ্বর্য-শান্তিও পেতে চেয়েছে। কিন্তু তার ভাবনার সাথে মেলেনি তার জীবনের গতিপথ। কুমুকে নিয়ে সংসার করার বাসনায় সে কাশীতে যাওয়ার জন্য ট্রেনে চেপেছে, কিন্তু ভুল করে পৌঁছেছে তার ছোটবেলার শহরে। কুমুর সন্তানের মধ্যেও সে সুখ খুঁজে পায়নি। কারণ সে চায়নি তার ও কুমুর সন্তান বিকলাঙ্গ হয়ে জন্মাক। আলুর আড়ত ছেড়ে তাই একদিন সে আবার পালাতে চেয়েছে। কিন্তু অসুস্থতার জন্য স্টেশনের মুশাফিরখানায় তাকে পড়ে থাকতে হয়েছে। অশেষ দুঃখের মধ্যে সে প্রশ্নাতুর হয়েছে তার সন্তানের বিকলাঙ্গতার জন্য কি তার উচ্ছ্বল জীবনই শুধু দায়ী। অবশেষে নিজেকে দোষারোপ করে সে ফিরে এসেছে তার স্ত্রী ও পরবর্তী প্রজন্মের কাছে। সংসারের অপূর্ণতা ও অপ্রাপ্তির মধ্যেও সে সুখী থাকতে চেয়েছে, জীবনযুদ্ধে মানবিকতার মাধ্যমে জয়ী হতে চেয়েছে।

ফটিকের জীবনের এই ভাঙাগড়া, শুধু ছুটে চলা, অপরাধ করে পালিয়ে বেড়ানোর মধ্য দিয়েও প্রকাশিত হয়েছে তার হতাশাদীর্ঘ দীর্ঘশ্বাস, বেদনার রুদ্ধ অশ্রু। বাঁচার তাগিদে নানা পাপে সে আক্রান্ত হয়েছে, কিন্তু তার জন্য কোন আত্মদংশন অনুভব করেনি।

গল্পটিতে বাস্তব ও পরাবাস্তবের একত্রে সহাবস্থান লক্ষিত হয়েছে। কামিনী হোটেলে খেতে বসে ফটিক দেখেছে কামিনীর মাথার চুল সব পড়ে গেছে, সারা মাথা সাদা। আবার রাতে বিছানায় ঘুমের মধ্যে তার মনে হয়েছে তার শরীর থেকে সমস্ত হাড় মাংস খুলে পড়ে গেছে। এছাড়া স্বপ্নেও দেখেছে ময়নার মাথার চুল সব পড়ে গেছে। জীবনের ক্ষয়িষ্ণুতা, অন্তঃসারশূন্যতা সে উপলব্ধি করতে পেরেছিল। পূর্বাপর সংহতিবিহীন এই পৃথিবী ও মানুষের জীবনেও কোন সামঞ্জস্য সে খুঁজে পায়নি। তার চোখে দেখা জগত ও অনুভববেদ্য জগতের সামঞ্জস্যের মধ্য দিয়েই বাস্তব ও

পরাবাস্তবের সহাবস্থান সূচিত হয়েছে। পাপবোধ, যন্ত্রণা, গ্লানি ফটিকের মনকে ছেয়েছিল ঠিকই তবু সে আত্মহত্যা ব্রতী হয়নি। জীবনের প্রতি অনুরাগে সে জীবনের দাবিকে-ই মেনে নিয়েছে।

একটি ব্যর্থ মানুষের যন্ত্রণাময় জীবনের ছবি বিমল কর তাঁর ‘খোয়াই’ উপন্যাসের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছেন। এই ছবি ষাটের দশকের সমাজ ও মানুষের ক্ষয়িষ্ণুতার প্রতিলিপি। যাযাবর জীবনে শিকড়হীন ভাবে ঘুরে বেড়ানো, স্বপ্ন দেখার মানসিকতা, জীবনের ব্যর্থতা ও হতাশায় ভেঙে পড়া, যৌনতা ও হত্যার পিছনে নির্বিকার, আত্মদংশনহীন মানসিকতা প্রদর্শন করার মধ্য দিয়ে তৎকালীন যুগ-জীবনের সম্পর্কে তাঁর ভাবনা লেখক প্রতীকী উপন্যাসের আদলে রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছেন।

‘ভুবনেশ্বরী’ (শারদীয় ‘দেশ’, ১৯৭০) উপন্যাসটি বিমল করের লেখা একটি মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বমূলক উপন্যাস। এই উপন্যাসে চরিত্রের মানসিক যন্ত্রণা ও আত্মিক সংকটকে বিশেষভাবে রূপ দিয়েছেন লেখক। মানুষকে কেন্দ্র করে যদি মিথ্যার মিথ তৈরি হয়, সেই মিথকে সত্যের কুঠারাঘাতেও ভাঙা সম্ভব হয়না --এই ভাবনা ‘ভুবনেশ্বরী’ উপন্যাসে ব্যাখ্যাত হয়েছে।

‘ভুবনেশ্বরী’ উপন্যাসে তিন প্রজন্মের চিন্তা ভাবনা ও তাদের সম্পর্কের টানাপোড়েন প্রকাশ করেছেন লেখক। উপন্যাসের শুরুতে দেখানো হয়েছে একটি নির্জন স্থানে এক প্রজন্মের সদস্যরা খুব বড় বাড়ি তৈরি করেছে, এবং সেই বাড়ি- ‘ভুবন স্মৃতি’র উদ্বোধনকে কেন্দ্র করে তিন প্রজন্মের সদস্যরা জড়ো হয়েছে। সোমকান্তি বয়স্ক মানুষ, তিনি একাকী দেবাদুনে থাকেন। তাঁর এককালে কেনা জায়গার উপর তাঁর ছেলেরা বাড়ি তৈরি করে তার গৃহপ্রবেশ অনুষ্ঠানে তাঁকে ডেকেছে। তাঁর নাতি অমৃত তার মানসলোকের কল্পনার দ্বারা তার দাদুর মা ভুবনেশ্বরীর একটি বড় ছবি ঝুঁকিয়েছে। গৃহপ্রবেশ অনুষ্ঠানের সাথে এটাও যথেষ্ট তাৎপর্যবাহী হয়ে উঠেছে।

‘ভুবন স্মৃতি’ বাড়িটি বিঘে চারেক জমির কিছুটা অংশে গড়ে উঠেছে। বাকি জমিতে নানা ফল ও ফুলের বাগান। একপাশে ভুবনেশ্বরীর স্মৃতিবেদী নির্মিত হয়েছে। এই বিরাট বাড়ি সোমকান্তির ছেলে-মেয়েরা তৈরি করলেও তা তাদের স্থায়ী বসবাসের উদ্দেশ্যে নয়, অবসর যাপনের লক্ষ্যে নির্মিত। তবে তারা আশা করে ছিল সোমকান্তি দেবাদুন ছেড়ে তাঁর মায়ের নামাঙ্কিত এই বাড়িতে থাকতে পারেন। কিন্তু সোমকান্তি অপ্রসন্ন গলায় বলেছেন, “তোমাদের ভুবন-মা আমারই মা, প্রিয়া মা’র নামে গড়া বাড়িতে থাকলেই কি আমার মা কাছে ফিরে আসবে।”^{২২} সোমকান্তির অন্তর্নিহিত হাহাকার এই কথার মাধ্যমে সূক্ষ্মভাবে পরিবেশিত হয়েছে।

সোমকান্তি ভুবনেশ্বরী অপেক্ষা তাঁর মৃত্যু স্ত্রী হেমমালার স্মৃতিকে সকলের মধ্যে জাগ্রত করতে চেয়েছেন। কিন্তু সোমকান্তির সকল ছেলে-বউমা, মেয়ে-জামাই, নাতি-নাতনি ভুবনমায়ের স্মৃতিমণ্ডপ ঘিরে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধার্থ্য অর্পণ করতে চেয়েছে, স্মরণ করতে চেয়েছে তাঁর অপূর্ব কিংবদন্তিকে। তাদের দ্বারা সোমকান্তি অনুরুদ্ধ হয়েছেন তাঁর ভুবন মা সম্পর্কে স্মৃতি তর্পণের জন্য। সোমকান্তি তাঁর ঘরে সকলকে ডেকে নিয়ে ভুবনেশ্বরী সম্পর্কে তাঁর সত্যভাষণ দিতে চেয়েছেন, এবং প্রায়শ্চিত্ত করতে চেয়েছেন মিথ্যা প্রচারের বিরুদ্ধাচরণের মধ্য দিয়ে। তাঁর মনে হয়েছে উত্তরপুরুষদের কাছে আসল সত্য উদ্ঘাটিত হওয়া উচিত, কারণ ভুবন-মাকে নিয়ে প্রচলিত গল্পকথা অসহ্য ও মিথ্যা এই মনস্তাত্ত্বিক স্বপ্নের মধ্য দিয়ে সোমকান্তির আত্মিক সংকট ধরা পড়েছে। তাঁর বক্তব্যের মাধ্যমে ধরা পড়েছে যন্ত্রণা ও হতাশার পরিচয়। “তোমরা এমন করে একটা ভুবন-মা গড়ে নিয়েছ। দোষ তোমাদের নয় বাবা, দোষ আমার, আমার পাপ আমায় তোমরা স্বীকার করে যেতে দাও”^{২৩}

সোমকান্তির সত্যবচনে প্রকাশিত হয়েছে, তাঁর মা সুন্দরী ছিলেন না কিন্তু তাঁর শরীরে একটা টান ছিল। তিনি দয়ালু ছিলেন না। পাখি কিনতে গিয়ে তিনি বুড়ো পাখিগুলোকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়েছিলেন। বাবার মৃত্যু সম্পর্কে সোমকান্তি রহস্য অনুভব করেন। তাঁর বাবার চোখে তিনি জল দেখতে পেতেন। তিনি আগুনে পুড়ে মারা গিয়েছিলেন। সোমকান্তির মনে হয়, “সংসারে শুধু একই রকম আগুনে মানুষ পুড়ে মরে না, নানা রকম আগুন আছে। কে বলবে কোন আগুনে আমার বাবা পুড়ে মরেছিলেন।”^{২৪} বাবার মৃত্যুর পর ভুবন-মা রানিপুরে একটি বাড়িতে অসুস্থ রোগীর সেবায় নিযুক্ত থাকার সময় গয়না চুরির দায়ে বহিষ্কৃত হন। কিন্তু অসুস্থ রোগীর স্বামী মেজোবাবুর সাথে তাঁর মায়ের অবৈধ সম্পর্ক ছিল বলে সোমকান্তির মনে হয়েছে। “মেজোবাবুর হাত ছিল চুরিতে। মেজোবাবু স্ত্রীর চোখের আড়ালে আরও অনেক কিছু চুরি করত মা’র কাছ থেকে।”^{২৫} এর পর কাশীতে আসার পর তাঁর মা কয়েকদিনের মধ্যে তাঁর নিজের ব্যবস্থা পাকা করে ফেলে ছিলেন। হোটেল ম্যানেজার চক্রবর্তী মশাইয়ের সাথে তাঁর সম্পর্ক হয়েছিল। একদিন তেরো চৌদ্দ বছরের ছেলে সোমকান্তিকে অনাথ করে তাঁর মা পালিয়ে গিয়েছিলেন। রাস্তা-ঘাট-স্টেশনে থাকতে থাকতে একদিন একজন সরল ভদ্র মানুষের মমতার ছায়ায় আতিথ্য পেয়েছিলেন সোমকান্তি। তাঁর কাছে নিজের বংশগৌরব ও পারিবারিক মানুষদের উচ্চ মানসিকতার গল্প বলে তাঁর করুণা আদায় করেন। এমন কি একদিন তাঁর মেয়ে হেমমালাকে স্ত্রী রূপে লাভ করেন।

হেমমালাও মৃত্যুর আগে পর্যন্ত তাঁর মৃত্যু শাশুড়ি-ঠাকরুনের দেবী সুলভ মহনীয়তার কথা জেনে গিয়েছিলেন।

সোমকান্তি তাঁর এই বক্তব্যের মধ্য দিয়ে নিজের হৃদয় উৎসারিত বেদনাকে প্রকাশ করেছেন, নিরুপায় নিরাশ্রয় একটি কিশোরের আত্মযজ্ঞগার রূপরেখা অঙ্কন করেছেন। তাঁর স্বীকারোক্তির মাধ্যমে নিজের মিথ্যাচারের বিষয়ে যেমন গ্লানি অনুভূত হয়েছে, তেমনি ফেলে আসা জীবনে উপেক্ষা, বঞ্চনার জন্য আপশোস এসেছে। “যখন নিজেকে বাঁচবার দরকার হয়, মানুষ কী না করে!”^{২৬}

সোমকান্তির এই স্বীকারোক্তি কারোর কাছেই গ্রহণীয় হয়নি। মেয়ে তপতী কেঁদেছে, অন্যান্যরা তীব্রভাবে প্রতিবাদী হয়েছে। নাতি অমৃত সকাল বেলা ছুরি এনে তার নিজের হাতে আঁকা ভুবনেশ্বরীর ছবিটিকে ছিড়ে ফেলতে চেয়েও পারেনি। তার মনে হয়েছে তার দাদু সোমকান্তি ভুল বলেছে, এই ছবিটিই সত্য। সোমকান্তি অব্যক্ত যজ্ঞগাকে ব্যক্ত করে সত্য প্রকাশের মাধ্যমে যে স্বপ্তির সন্ধান করেছিলেন, তা তিনি পাননি। “সোমকান্তির এখন মনে হচ্ছিল, তিনি নিশ্চয়ই উন্মাদ হয়ে গিয়েছিলেন, নয়ত কেন তিনি এমন করে সব ভাঙতে গেলেন! কী পেলেন তিনি? কোন লাভ হল তাঁর? কিছুই তো হল না। তিনি শান্তি পেলেন না, স্বপ্তি পেলেন না, তাঁর স্বীকারোক্তি তো কই তাঁর হৃদয়কে ধুয়ে মুছে নির্মল করে দিল না। তিনি কি বিন্দুমাত্র সান্ত্বনা পাচ্ছেন কোথাও? তবে?”^{২৭}

একদিনের সকাল থেকে পরের দিনের সকাল এই স্বপ্ন সময়ের ঘটনা নিয়ে উপন্যাসটি গড়ে উঠেছে। ঘটনার থেকেও প্রাধান্য পেয়েছে মনস্তাত্ত্বিকতা, প্রাধান্য পেয়েছে আত্মিক বিশ্লেষণ। অন্তর্জগতের রহস্য উদ্ঘাটনকারী লেখক বিমল কর চরিত্রের মানসিক দ্বন্দ্ব ও মনের গভীর সমস্যাকেই তাঁর সাহিত্যে রূপায়িত করতে চেয়েছেন। এখানে তিন প্রজন্মের মিলনমেলায় যে চরিত্রভিত্তিক টানাপোড়েনের ছবি অঙ্কন করেছেন তা আধুনিক সাহিত্যের বিশেষ দিক। এই উপন্যাসে মানুষের মনে জাগ্রত হওয়া মানুষ সম্পর্কে যে মিথের প্রসঙ্গ রয়েছে তা বাইরের বাধা দিয়ে ভাঙা সম্ভব হয়নি। দীর্ঘ দিন লালিত সংস্কারকে যেমন ভাঙা যায় না, তেমনি মনের মণি কোঠায় প্রতিষ্ঠিত মানব সম্পর্কে কিংবদন্তিও চিরস্থায়ী — লেখক এই ভাবনা উপন্যাসে সংঘারিত করেছেন। বিমল করের ‘জননী’ গল্পের সাথে এই উপন্যাসের ভাবনাগত সামান্য মিল লক্ষিত হয়েছে একটি যায়গায়, সেটি হল, মৃত্যুর প্রতি সম্মান জানানোর প্রচেষ্টা রয়েছে দুটি ক্ষেত্রেই।

তবুও বলতে হয় বিষয়বস্তুগত ভাবনা দুটি ক্ষেত্রে এক নয়। ‘জননী’তে সন্তানেরা মায়ের মূল্যায়ন করে তার প্রতি নিজেদের সম্মান জ্ঞাপন করেছে এবং মায়ের পূর্ণতা কামনা করেছে, আর ‘ভুবনেশ্বরী’তে তৈরি হওয়া মিথের প্রতি সম্মান জানানোর ব্যাকুলতা প্রকাশ পেয়েছে। এখানে সব সত্য নয়, তবু মানসিক বিশ্বাসের ফলে তা ধ্রুব ও চিরন্তনতার মর্যাদা পেয়েছে। তবে পূর্বপুরুষের প্রতি শ্রদ্ধা অর্পণের মাধ্যমে দুটি রচনাই বিশেষত্ব পেয়েছে।

‘নিমফুলের গন্ধ’ (১৯৮৫) উপন্যাসটি সহজ সরল ভাষায় স্বল্প দৈর্ঘ্যের কাহিনীকে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে। নামকরা সুগন্ধি ফুল ছেড়ে নিমফুলের গন্ধের প্রসঙ্গ এসেছে উপন্যাসে, যে গন্ধ পছন্দ করে আনন্দ, মণিমালা, হয়ত পছন্দ করত মণিমালার দাদা। জীবনের অনেক তিক্ততার মধ্যেও সুখের সন্ধানের ইঙ্গিত এর মাধ্যমে প্রকাশিত। কঠিন বাস্তবের পরাক্রমের পরেও জেগে থাকে সামান্য স্বপ্ন, যা নষ্ট হওয়ার নয়, তাকে ইঙ্গিত করেই নিমফুলের গন্ধ তাৎপর্যবাহী হয়ে ওঠে।

উপন্যাসটি শুরুতে, শেষে এবং মাঝে মাঝেও মৃত্যুর খবর ও স্মৃতি একটা ‘Morbid’ আবহাওয়া সঞ্চারিত করেছে। পাড়ার নির্বাঞ্চাট, শান্ত মানুষ শান্তিময় ভাদুড়ির আত্মহত্যার ঘটনার প্রসঙ্গ দিয়ে উপন্যাসের সূচনা। সেই সূত্র ধরে এসেছে মণিমালার গৃহশিক্ষক তনুদা’র আত্মহত্যার স্মৃতি। বৌদি বিজয়ার স্মৃতিতে এসেছে তার স্বামীর মৃত্যুর প্রসঙ্গ। মণিমালার অতীতচরিতায় জেগে উঠেছে তার মা ও বাবার মৃত্যু। এত গুলো মৃত্যুর পরে উপন্যাসের শেষাংশে মণিমালা আত্মহত্যা করতে চেয়েছে। মৃত্যুর এত প্রসঙ্গের পাশেও জীবনানুরাগের কথা ধ্বনিত হয়েছে। মনের অগোচরে বয়ে চলেছে নীরব প্রেমের বার্তা।

আনন্দ এবং মণিমালার জীবন কঠিন বাস্তবের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে। আনন্দের বাবা খুব বড় উকিল ছিলেন, কিন্তু হঠাৎই ভাগ্যের ফেরে তাদের জীবনে নেমে আসে অনিশ্চয়তার মেঘ। অশেষ দারিদ্র্য সহ্য করে আনন্দ এখন একটা ছাপাখানা চালায়-- ‘লোটারাস প্রেস’। মূলধনের অভাবে তাও বন্ধ হওয়ার মুখে। কিন্তু আনন্দ নামটির সাথে তার ব্যবহারের বেশ মিল রয়েছে। নিজের বাড়ি নেই, দিনু ও তার বউ পারুলের সাথে আখা-আধি ভাগ করে মাথা গোঁজার ঠাই করে নিয়েছে সে ভাড়া বাড়িতে। তবুও খুশি ও আনন্দ প্রকাশে তার কোন কমতি নেই। দায়ে দরকারে মণিমালার কাছে হাত পাততে তার কোন সংকোচ হয় না, সর্বদা সকলের সাথে মজা করে কথা বলে সে। জীবনটাকে যেন সে লঘু করে নিয়েছে। মণিমালার যন্ত্রণাময় জীবনে সে যেন কিছুটা প্রাণবায়ু

সঞ্চারিত করে দেয়। রোগ, ক্লান্তি, দারিদ্র্য সব কিছুকেই উপেক্ষা করে সে প্রাণোচ্ছলতায় পরিপূর্ণ চল্লিশ ছুঁই ছুঁই বিগত-যৌবন প্রেমিক যুবক। তার প্রেমের স্বীকারোক্তি ধ্বনিময় হয়ে ওঠে। তবু তা প্রকাশিত হয়েছে সাহায্য, সহানুভূতি, অনুকম্পা ও যন্ত্রণাময় কিন্তু হাস্য প্রদর্শনকারী মুখের মধ্য দিয়ে। “রোগা ফরসা, গালভাঙা ওই মানুষটার দিকে তাকালে বোঝাই যায় না, প্রায় অকেজো একটা ফুসফুস নিয়েও বেঁচে আছে। অকেজো ফুসফুস, ভাঙা হাত। বাঁ হাতের কনুয়ের কাছটায় ধনুকের মতো বাঁকা আনন্দের। পায়ে বন্দুকের গুলি ও খেয়েছিল একবার। ওকে দেখে এসব ধরা যায় না। অদ্ভুত ছেলে। ওর চেহারার মধ্যে বুদ্ধির কোন ছাপ নেই, চোখের জ্বলজ্বলে ভাবটা সারল্যের, অফুরন্ত জীবনীশক্তির।”^{২৮}

মণিমালার বয়সও প্রায় আনন্দের কাছাকাছি। বাবা, মা মারা যাওয়ার পর প্রায় দশ বছরের বড় দাদার কাছে মানুষ হচ্ছিল সে। হঠাৎ দেওয়ালির রাতে আগুন লেগে দাদা মারা যাওয়ায় চরম অনিশ্চয়তা নেমে আসে তাদের পরিবারে। দু বছরের মেয়ে বৌদিকে রেখে দাদার মৃত্যু তার কাছে ভয়াবহ রূপ নিয়ে এসেছিল। বৌদির পাশে দাঁড়িয়ে জীবনযুদ্ধে ব্রতী হয়ে অবশেষে যখন খানিকটা থিতু হল ততদিনে যৌবন অন্ত্যমিত। আনন্দকে তার ভাল লাগলেও জীবনে বিবাহের সম্ভাবনা আজ আর তাকে আকুল করে তোলে না। একটা চাকরি নিয়ে জীবনটাকে সে মানিয়ে নেবার চেষ্টা করেছে। তবুও তার মনে নেমে আসে অনিশ্চয়তার যন্ত্রণা। বৌদি বিজয়ার সাথে তার ঝগড়া হয়েছে ঘর সারানোর অজুহাতে। এই সূত্রে মণিমালা উপলব্ধি করে এই বাড়িতে তার কোন অধিকার নেই। দাদার মৃত্যুর পর তার রয়েছে বৌদির উপর, এরপর ভাইঝি টুনুর বিয়ের পর টুনা এবং জামাইর। এই সংসারে সে বাড়তি মানুষ। তার কোন প্রয়োজন নেই এখানে থাকার। এই বাড়ির ইট, কাঠ, বাগানের পেয়ারা, বাতাবি লেবুর গাছ সব কিছুর সাথে তার চেতনা ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল, কিন্তু সেই বন্ধন আজ তার কাছে বোধ হয় নষ্ট হয়ে গেছে বৌদির কর্তৃত্বের কাছে। বিছানায় শুয়ে শুয়ে অতীতচরিতার মাধ্যমে সে তার জীবনের সুখস্মৃতির কথা, বাবা, মা, দাদার কথা ভাবতে থাকে, হয়ত শান্তি পাওয়ার চেষ্টা করে, কেননা বাস্তব জগতে তার শান্তি কোথায় কবে যেন সে হারিয়ে ফেলেছে। আনন্দও তার কাছে আসে, কিন্তু দরকার পড়লে। তবুও তার আসার পর যেন খানিকটা জীবনীশক্তি তার মনের মধ্যে প্রবেশ করে।

বৌদি বিজয়ার সাথে মনোমালিন্য হওয়ার পর মনটা তার ভারাক্রান্ত হয়ে থাকে। বৌদি তার কাছে একদিন অভিভাবিকার মতই ছিল। কিন্তু আজ সে আবিষ্কার করে টুনা বড় হওয়ার পর

থেকে বৌদির সমস্ত জগৎ টুনুকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। মণিমালার সাথে সংসারের বিষয়ে আলোচনা করে ঠিকই, কিন্তু মণিমালার মনে হয় বৌদি যেন তার সিদ্ধান্তটা শুধু শুনিয়ে দেয়। বাড়ি মেরামতের জন্য নিজের সিদ্ধান্তকেই গুরুত্ব দেয়। মণিমালার ইচ্ছের পরোয়া করে না, আর্থিক সাহায্যও চায় না। টাকার প্রয়োজনে গমকলওলা কৈলাসের কাছে হাত পাতে। মণিমালার মনের মধ্যে এই উপেক্ষা যন্ত্রণার সৃষ্টি করে। আনন্দকে সে জানায়, “না টুনু আমার নয়। তার মায়ের। ...আমার নিজের কিছু নেই, বাড়ি নয়, ঘর নয়, টুনু নয়। ওরা ধীরে ধীরে আমার সব কেড়ে নিয়েছে। আমি একলা। আমার নিজের কিছু নেই।”^{২২} --এই একাকিত্ববোধ, সকলের থেকে বিচ্ছিন্নতার ভাবনা তাকে কাতর করেছে। সংসারের স্বার্থপরতার ছবি আজ যেন সে প্রত্যক্ষ করতে পেরেছে। এই সমস্যা যেন মণিমালাকে ছাপিয়ে আধুনিক বিশ্বের ব্যক্তিসত্তার সমস্যা হয়ে উঠেছে। আনন্দের সামনে সে নিজের হৃদয়ের যন্ত্রণার কথা প্রকাশ করে ঠিকই, কিন্তু তার মনে হয় আনন্দ আজ তার প্রতি ছদ্ম-সহানুভূতি দেখাতে এসেছে, আসলে তার উদ্দেশ্য বৌদির হয়ে ওকালতি করা। মণিমালার অন্তরসত্তা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। তার অস্তিত্বের সংকট তার মনে সঞ্চারিত করেছে দুর্ভাবনা। বয়স্ক, বিগত-যৌবনা, আইবুড়ো একটি মেয়ের কাছে ভবিষ্যৎটা অত্যন্ত অনিশ্চয়তার ভাব নিয়ে উদ্ভিত হয়েছে। মণিমালা নিজের অস্তিত্বের তাগিদে লড়াই করতে চেয়েছে, আবার দুঃখে যন্ত্রণায় আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছে।

বিজয়ার মনের ক্ষতও কম নয়। খুব অল্প বয়সেই স্বামীর আকস্মিক মৃত্যু তার মনে দুঃখ হতাশার জন্ম দিয়েছে। নিজের মেয়েকে ঘিরে আজ যা কিছু স্বপ্ন অবশিষ্ট আছে তা নিয়েই সে বেঁচে থাকতে চেয়েছে। মণিমালার সাথে তার একটা ইগো-সমস্যা দেখা দিয়েছে। স্বামীর মৃত্যুর পর বয়সে ছোট ঠাকুরঝি মণিমালাকে নিয়ে কোন রকমে উঠে দাঁড়িয়েছে তারা। তার নিজস্ব চিন্তা ভাবনার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে মণিমালাকে হয়ত উপেক্ষাই করতে চেয়েছে সে। কেননা এই সংসার তার। সামাজিক প্রথা অনুযায়ী স্বামীর পর তারই কর্তৃত্ব এখানে বলবৎ হওয়া উচিত। তার মেয়ের ভাল-মন্দ তাকেই দেখতে হবে। কিন্তু মণিমালা যখন তার নিজের পয়সায় বাড়ির একটা অংশ সারাতে চেয়েছে, তখন বিজয়ার আত্মসম্মানে তা আঘাত করেছে। এই বাড়ির মেয়ে হিসেবে মণিমালার যে অধিকার আছে তা বিজয়ার কাছে স্বীকৃত হয়নি।

উপন্যাসটিতে প্রেমের কথা উচ্চকণ্ঠে ঘোষিত হয়নি। তার অনুভব যেন ছড়িয়ে আছে নিমফুলের মৃদু গন্ধের মতো। মণিমালা ও আনন্দ একে অপরকে তুই-তুই করে কথা বলে,

আনন্দ মণিমালাকে ইয়ারকি করে পিসি বলে ডাকে, এর মধ্য দিয়ে তাদের বাল্য জীবন থেকে সৃষ্ট হওয়া অনুরাগ ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের নিবিড়তা সূচিত হয়। একের প্রতি অন্যের অনুকম্পাও আমাদের দৃষ্টি এড়ায় না। উপন্যাসের শেষে অস্থির মানসিকতার আতিশয্যে মণিমালা আত্মহত্যার প্রসঙ্গ তার মুখে উত্থাপন করলে আনন্দ শিহরিত হয়েছে। তার বন্ধু রজনী একদিন আনন্দের কাছে একটা পিস্তল, কিছুটাকা এবং ছোট শিশিতে বিষ রেখেছিল রাজপুত ও হরিজন সংঘর্ষের সময়। আনন্দ তা গচ্ছিত রেখেছিল মণিমালার কাছে। সেই বিষ আজ মণিমালার কাছে প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে। আনন্দ মণিমালার হাত শক্ত করে ধরে তা ফেরত দেওয়ার জন্য অনুনয় করে। কিন্তু মণিমালার জেদের কাছে পরাভব মেনে নিবিড় ভালবাসার আনুকূল্যে বেঁধে তাকে বাঁচানোর চেষ্টা করে। মানব মানবীর চরিত্রের অসুগঠনিত প্রেমের ছবিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে এই উপন্যাস।

‘নিমফুলের গন্ধ’ উপন্যাসটিতে জীবন-মৃত্যুর নানা সমস্যা ফুটে উঠেছে। জীবন এখানে যেমন হতাশাব্যাঞ্জক, অনিশ্চিত, তেমনি মৃত্যুও রহস্যময়। মানুষের মৃত্যুর কারণ, আত্মঘাতী মানুষও সঠিকভাবে ব্যক্ত করতে পারবে না। তবুও জীবন-ছুট এই মানুষেরা রহস্যময়তাকেই মানুষের সামনে প্রকাশ করে। বাইরে থেকে একটি মানুষকে অপর মানুষেরা বিচার করে, কিন্তু তার মনের গভীরে ঘটে চলা ভাঙনের খবর কেউ রাখে না-- সম্ভব নয় বলেই। “বাইরে থেকে দেখলে জীবনের অনেক কিছুই মনে হয় শান্তি। যে মানুষটা চলে গেল তার কাছ থেকে তো শোনা যাবে না--সে যাবার সময় শান্তি নিয়ে গিয়েছিল, না অপমান গ্লানি আর শুধু কষ্ট নিয়েই।”^{৩০} তেমনি ভাবে মৃত্যুর কারণ জানা যায় না তনুদা’র আত্মহত্যা ক্ষেত্রেও। মৃত্যুর এই বীভৎসতার পাশাপাশি আনন্দের জীবনবোধ, বেঁচে থাকার তৃষ্ণা আশ্চর্য নিপুণতায় বর্ণিত হয়েছে। ফুসফুসের রোগ, শারীরিক ভ্রুটি বিচ্যুতি নিয়েও সে বেঁচে থাকতে চেয়েছে। পরিহাসের মধ্য দিয়ে বর্ণনা করলেও তার বক্তব্য অনেক বেশি ইতিবাচক-- “চল্লিশের আগেই ফক্কা হয়ে গেলে ব্যাপারটা খুব খারাপ হবে। ...পরমায়ুর ব্যাপারে তাদের পারিবারিক দৌড় মোটামুটি পঞ্চাশ ছাড়িয়েই খানিকটা, তার আগে যাবার ব্যাপার নেই। তবে আনন্দের বেলায় আগেভাগে হলে সে বংশের নাম ডোবাবে।”^{৩১} জীবনতৃষ্ণায় উদ্বুদ্ধ আনন্দ শুধু নিজের ক্ষেত্রে নয় মণিমালাকেও বাঁচাতে চেয়েছে। প্রেমের নিঃশব্দ অঙ্গীকারে বাঁধতে চেয়েছে তার হৃদয়।

প্রতিদিনের তুচ্ছ ঘটনা , তিক্ততা, হৃদয়ভার এই সমস্ত ছবির পাশাপাশি লেখক ফুটিয়ে তুলেছেন ভালবাসার অমোঘ সত্যকে। প্রতিদিনের ঘটে চলা দুর্ঘটনা, বিশ্বাসের অপমৃত্যু,

অনিশ্চয়তার বোধ মানুষকে যে ভাঙনের দিকে এগিয়ে দিয়েছে, পঙ্খিলতার আবর্তে আটকে দিচ্ছে তার সন্তা, সেখান থেকে জীবনবোধে উদ্দীপ্ত মানসিকতা ঝড়ঝাঝাকে অতিক্রম করে এগিয়ে যায় ভবিষ্যতের দিকে। ভঙ্গুর এই পৃথিবীতে ভগ্ন আশা, স্বপ্নের হাত ধরেও সাধ্যানুগ ভাল জীবনের সন্ধান করে পোড় খাওয়া, হতাশা দন্ধ মানুষেরা, আপোষ করে বাঁচতে চায় জীবন প্রবাহে --এরই ছবি 'নিমফুলের গন্ধ' উপন্যাসটিতে ব্যক্ত হয়েছে।

‘বেদনা পর্ব’ (১৯৮৭) উপন্যাসেও চরিত্রগুলির মধ্যে একাকিত্ব, বিষণ্ণতা, বেদনাবোধ প্রকাশিত হয়েছে। বসুদা, রাণু, বিবি কিংবা শচীনবাবুর মত চরিত্রে মানসিক যন্ত্রণার স্বরূপ এই উপন্যাসের মাধ্যমে লেখক দেখিয়েছেন। শচীনবাবুর যন্ত্রণার স্বরূপ অন্যান্য চরিত্রের কথোপকথনে প্রকাশিত, কারণ এই উপন্যাসে শচীনবাবুর আকস্মিক মৃত্যুর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। শচীনবাবুর এই মৃত্যু অন্যান্য চরিত্রগুলিকে প্রভাবিত করেছে; চরিত্রগুলি আত্মসমীক্ষার মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে।

বসুধার জন্মদিনে তার বাল্যজীবনের সঙ্গিনী, তার বাবার বন্ধুর মেয়ে রাণুর পাঠানো একটি প্যাকেট ও চিঠি নিয়ে আসছিলেন রাণুর মামা শচীনবাবু। বসুধার জন্মদিনেই তাঁর মৃত্যু ঘটল -- এই বিষয়টি বসুধাকে আলোড়িত করেছে। এই ঘটনা সূত্রে বেনারস থেকে রাণু কলকাতায় চলে এসেছে। এই মৃত্যু তাকে গভীর ভাবে নাড়া দিয়েছে। টি. বি. রোগে একসময় আক্রান্ত হয়েছে রাণু পারিবারিক জীবনের গভীর শোক, অসুস্থতা, মানসিক হাহাকার সব কিছু নিয়ে সে ভাল নেই। যেমনভাবে ভাল ছিল না শচীন মামা। রাণু বর্ণনা করেছে। শচীন মামা উদার, সরল প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। তিনি বিয়ে করেছিলেন অত্যন্ত ধনী পরিবারের সুন্দরী এক মেয়েকে, তার পায়ের একটু খুঁত ছিল ঠিকই, কিন্তু শচীনমামা অষ্টমঙ্গলায় তার শ্বশুর বাড়িতে গিয়ে একাকীই ফিরে এসেছিলেন, তার পিছনে ছিল অন্য খুঁত। বসুধা শচীনবাবুর বন্ধু কিরণবাবুর মুখ থেকে শুনতে পেয়েছে, শচীনবাবুর বিবাহিতা স্ত্রীর একটি দশ বারো মাসের সন্তান ছিল। তারা তাঁকে সত্য গোপন করে বিয়ে দিয়েছিল। মানুষের প্রতি মানুষের এই ধান্নাবাজি, জুয়াচুরি সহ্য করতে না পেরে শচীনবাবুর মা পাগল হয়ে গিয়েছিলেন। আর নিরুপদ্রব, সরল, সাদাসিধে মানুষটি নিজেকে শুধু সরিয়ে এনেছিলেন নিঃসঙ্গতার মধ্যে।

বিবি চরিত্রটির বেদনাবোধও কম নয়। সে বসুধাকে জন্মদিনে শুভেচ্ছা জানালেও নিজের মনের সংগোপনে যন্ত্রণার বীজ পুষে রেখেছে। সুখী দাম্পত্যের স্বপ্ন নিয়ে সে শ্বশুর বাড়িতে সংসার

করতে গিয়েছিল, কিন্তু অচিরেই ফিরে এসেছে। দু-আড়াই বছরের সংসারে সে বুঝেছে শ্বশুরবাড়ির সকলের নোংরা কদর্য মানসিকতা। তাদের অনেক পাপের কথা ও জানত বলে তারা তাকে গাড়ি চাপা দিয়ে মারতেও চেয়েছিল। বিবি তার লোভী, কামুক, নোংরা চরিত্রের স্বামীর সাথে থাকতে পারেনি, চলে এসেছে। তার সমস্ত ক্ষোভ সঞ্চারিত হয়েছে পুরুষদের উপর। “বারো আনা পুরুষ মানুষের কাছে মেয়েরা নেসেসিটি, তাদের পার্ট অফ লাইফ নয়। মুখে যে যাই বলুক আমরা তোমাদের গোলাম!”^{৩২} --তাই সে আর অন্য পুরুষের সাথে সম্পর্ক রাখতে চায়না। নিজের সম্ভ্রম, নারীত্ব, স্বাধীনতার প্রতি বিশ্বাস, নিজের ব্যক্তিত্বের উপরে বিশ্বাস রেখে অন্তরের বেদনাবোধকে সঙ্গী করেও জীবনসংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে।

রাণুর মনের বেদনাবোধ ও অসহায়তা উপন্যাস প্রবাহিত হয়েছে। রাণুর ছোটভাই জিতু, ছাদে ঘুড়ি ওড়াতে গিয়ে নীচে পড়ে মারা যায়, এর শোকে তার মা পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে মারা যান। এই সকল কারণে ক্রমে নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ছিল রাণু। এর পর একাকী চাকরি ঘরবাড়ি, কাজ-কর্ম নিয়ে সে বেঁচে রয়েছে এই যন্ত্রণাময় বর্তমানে। রাণুর মনে হয়, “এ সব নিয়ে থাকতে থাকতে একসময় কখন যেন বুঝতে পারি আমি এর কোনটার মধ্যে নেই। কোনওটাই আমার নয়। আমি যেভাবে আছি এটা মিথ্যে। আমার থাকা না থাকার কোনও মানে হয় না। তখন আমার মরে যেতে ইচ্ছে হয়।”^{৩৩} সকল কিছুর মধ্যে থেকেও এই উদাসীনতা, বিচ্যুতি, বিষণ্ণতাবোধ, স্বপ্ন হারানোর বেদনা রানুর মনে বেদনাবোধকে তীব্র করে তুলেছে।

বসুধা প্রায় নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করে। তার বাবা মায়ের মৃত্যুর পর তার জীবনের সুর, আনন্দের অবসান ঘটেছে। বাবা মায়ের অপূর্ণ ইচ্ছের কথা তাকে বেদনা দেয়, চাকরি করে জীবনটাকে কোন রকমে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার অভ্যাসগত গতানুগতিকতায় আজ সে আচ্ছন্ন। বিবির জীবনের ব্যর্থতা তাকে পীড়া দেয়, রাণুর অন্তরের হাহাকার তাকে বিষণ্ণ করে তোলে। শচীনবাবুর মৃত্যু তাকে জীবন ও মৃত্যুর রহস্যময়তার আচ্ছন্ন করে। তবু তার মুখে শোনা যায় বেঁচে থাকার বাণী। যে বাঁচা নিতান্তই অভ্যাসগত, যেখানে ইচ্ছা অনিচ্ছার অনুরাগ ও অভিমান নেই। জীবনের উল্লাস নেই, প্রার্থনা নেই, অসাধ্য সাধনের ব্রত নেই। সে রাণুকে জানায়, “মরে যাবার ইচ্ছেটা ভাল নয় রাণু। তোমার যেমন মনে হয় তুমি যে-ভাবে আছ-- এটা মিথ্যে আমারও মাঝে মাঝে সে রকম মনে হয়। হয়তো সব মানুষেরই হয়। আমাদের বেঁচে থাকাটা আর নিজেকে

বাঁচিয়ে রাখাটা বোধ হয় এক নয়। বেঁচে থাকাটা একটা প্রসেস; নিজে নিজেই গড়িয়ে যায় যতদিন পারে। কিন্তু নিজেকে বাঁচিয়ে রাখাটা অন্য জিনিস। আমরা ঠিক পারলাম না।”^{৩৪}

বসুধা, রাণু বিবি— এদের মনের যে অসুস্থতা তা আধুনিক জীবনেরই প্রভাব। দেশ, সমাজ, পরিবারের ভাঙন, রাজনৈতিক, সামাজিক, নৈতিক অবক্ষয় মানুষের মনে শুধুই বেদনা সঞ্চারিত করে। অভ্যাসবশত মানুষ সুখের সন্ধানে ব্রতী হয়, কিন্তু সেই পথে সংঘাতের তীব্রতা তাকে হতাশ করে তোলে, নিঃসঙ্গতা, একাকিত্ব, মনের জগতে একাকী বিচরণ করার প্রবণতা মানুষকে ক্রমশ বিচ্ছিন্ন করে তুলেছে সমাজ ও পরিবারের গতি থেকে। অসুখ আজ মানুষের দেহ-মন সর্বত্রই থাবা বসিয়েছে। বাইরে থেকে আজ মানুষকে বিচার করা সম্ভব নয়। “কে সুখী, কে সুখী নয়, কার কোথায় সুখ, কোথায় অ-সুখ বাইরে থেকে বোঝা যায় না।”^{৩৫} মনের ভিতর ঘটে চলা সেই ভাঙনের আভাস বিমল কর আমাদের দিয়েছেন তাঁর সাহিত্যের মাধ্যমে। মানুষের প্রবাহিত জীবনধারায় প্রতিনিয়ত ঘটে চলা বেদনাপর্ব মানুষের জীবনে স্বপ্নের ও ইচ্ছার কোরক গুলোকে মেরে ফেলে। মরীচিকার পিছনে ছুটতে ছুটতে ক্লান্ত, বিধ্বস্ত মানুষ অবশেষে নিজেকে সঁপে দেয় অনিবার্য পরিণতির হাতে, সেটাই তার নিয়তি, তার সাথে যুদ্ধ করা যেতে পারে, কিন্তু জেতার সম্ভাবনা থাকে না বললেই চলে। তারপর শুরু হয় হতাশা, বিষণ্ণতা, বেদনাবোধ, যার প্রবাহ নিরন্তর।

‘ইমলিগড়ের রূপকথা’ (২০০৩) বিমল করের লেখা শেষ উপন্যাস। বিরাশি বছর বয়স্ক লেখক অত্যন্ত শারীরিক অসুস্থতার মধ্যেও পূজা সংখ্যায় লেখার জন্য এই উপন্যাসের পরিকল্পনা করেন। উপন্যাসটির অনুলেখন করেন লেখকের পারিবারিক সূত্রে পরিচিত স্বপন সাহা। অসুস্থ লেখক বিছানায় শুয়ে শুয়ে গভীর নিবিষ্টতার মধ্য দিয়ে বলে যান, আর স্বপন বাবু উপন্যাসটির অনুলেখনের চেষ্টা করেন। বিমল করের সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে প্রায়শই দেখা যেত তিনি বার বার নিজের লেখাকে কেটে কুটে তাঁর মনোমত করে একটি কাঠামো দাঁড় করাতেন। রচনার ক্ষেত্রে তাঁর মধ্যে কোন আপোষ ছিল না, বা অত্যন্ত সাধারণ ভাবে বিষয়টিকে দেখতেন না, তাই গভীর নিবিষ্টতায় নিজের ভাবনার কথাগুলো নিজের মনোমত করে প্রকাশের প্রতি তাঁর দুর্বলতা লক্ষ্য করা গেছে। কিন্তু ‘ইমলিগড়ের রূপকথা’ উপন্যাসটিতে লেখক খুব বেশি পরিবর্তন করেননি। দীর্ঘদিন ধরে লালিত একটি স্বপ্নের যেন প্রকাশ ঘটল তাঁর এই উপন্যাসের মাধ্যমে। চিত্ররূপময় এই ছোট উপন্যাসটি যে লেখকের মনোরাজ্যে অত্যন্ত স্বচ্ছভাবে জাগ্রত ছিল তা কাহিনী ও প্রকাশ

ভঙ্গির মধ্য দিয়ে উপলব্ধ হয়। টুকরো টুকরো ছবির একটি অ্যালবামের মতো হয়ে উঠেছে উপন্যাসটি।

ইমলিগড় একটি পাহাড়ি জঙ্গলাকীর্ণ অঞ্চল, যেখানে প্রতি শীতের সময় কিছু মানুষ হাওয়া বদল করতে আসে। অঞ্চলটির একসময় গুরুত্ব ছিল, মিলিটারিদের তাঁবু ছিল বিশ্বযুদ্ধের সময়, তখন থেকেই ছোট্ট এক চিলতে স্টেশনে ট্রেন এসে থামত। মিলিটারিরা চলে যাওয়ার পর প্রায় নির্জন এই স্থানে চাকুরিসূত্রে কিছু মানুষ থেকে গিয়েছিল, আর অল্পই স্থানীয় মানুষ। পাহাড়ি গঞ্জের মত এই স্থানে রয়েছে ডলবি সাহেবের একটি ভ্যারাইটি স্টোর, আর তার থেকে কিছু দূরে স্টেশনের কাছাকাছি নিলি মেমসাহেবের বাড়ি, এবং বাড়ি সংলগ্ন রেস্টুরেন্ট, যেখানে হাওয়া বদল করতে আসা মানুষেরা সকালের ব্রেকফাস্ট করতে পারে।

ছোট ইমলিগড়ে বেড়াতে আসা কয়েকটি পরিবারের বা দলের মধ্যে লেখক দেখালেন মানুষের ভাবনা-জগতের বৈচিত্র্য। এখানে জয়দীপ এবং দেবযানীর মত নববিবাহিত দম্পতি যেমন আছে, তেমনি রয়েছে কৈদার সিনহা-যমুনা, কল্যাণ-শান্তিলতা, শীতলবাবু ও তাঁর স্ত্রী, জলধরবাবুর পরিবার, স্টেশন মাস্টার ও তাঁর স্ত্রী রমা, ইন্দ্রজিৎ ত্রিপাঠীর মত দার্শনিক অধ্যাপক, মোহিনী চাঁদের মত কাঠের বাবসায়ী, আবার এদের পাশাপাশি অনিমা, তার বোন ও তার মাসি সর্বানী, এবং জগন্নাথ-ফটিক-হীরেণের মতো ছেলে ছোকরার দল। অত্যন্ত স্বাভাবিক হাসি মশকরার পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিক আলোচনাও বিভিন্ন চরিত্রের স্বাতন্ত্র্য প্রকাশ করেছে। হীরেণের বাঁশির সুরে যেমন মাদকতাময় পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে, তেমনি কিছু চরিত্রের সাংসারিক জীবনের অচরিতার্থতার যন্ত্রণাও ব্যাপ্ত হয়ে গেছে। কৈদারবাবু ও তাঁর স্ত্রী, কিংবা কল্যাণবাবুদের আলোচনায় পারিবারিক জীবনের নানা যন্ত্রণার অনুভূতি ব্যক্ত হয়েছে। আবার হীরেণ-অনিমাদের আলোচনায় কমবয়সীদের অনুরাগ-বিরাগের স্বাভাবিক প্রকাশ লক্ষিত হয়। ডলবি সাহেব কিংবা মোহিনী চাঁদ নিজের ছেলেদের থেকে দূরে অবস্থান করে নিঃসঙ্গতা যেমন সহ্য করে নিয়েছেন তেমনি নিলি মেমসাহেব একাকী জীবনে অভ্যস্ত হয়ে জীবনের সময়গুলোকে কেবল খরচ করে চলেছেন।

উপন্যাসের কোণে কোণে পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছে জীবনের অচরিতার্থতার কথা ব্যক্তি জীবন ও সাংসারিক জীবনের নানা দুঃখ-ভোগের কথা। এর পাশাপাশি দেখা যায় ইন্দ্রজিৎ ত্রিপাঠীর বর্ণনায় তাঁর পরাবাস্তববাদী ভাবনার কথা। তাঁর ‘আনসিন ওয়ান্ড’ সম্পর্কিত লেখা গ্রন্থে তিনি প্রকাশ

করেছিলেন, মানুষের জীবনের নানা অভিজ্ঞতার কথা, যা ব্যক্তি-মানুষের নিজস্ব, তার বিশ্লেষণ চলে না। প্রতিটি মানুষই স্বতন্ত্র জগতের অধিবাসী। তার মনোজগতে সে সম্পূর্ণ একা। তার সম্ভার পরিবর্তনের পিছনে যে জাগতিক নিয়ম ও অনিয়ম কার্যকরী তাও সাধারণ মানুষের বোধগম্যতার বাইরে। “আমি কেউ নই, আমার কোন আইডেনটিফিকেশন নেই। হঠাৎ উপনিষদের একটা কথা মনে পড়ল। তার অর্থ, তোমার কোন নিজস্ব সত্তা নেই। সত্তাই তোমাকে এক এক সময় এক এক রূপ দান করে। ...এটা বোঝা বড় কঠিন কিন্তু দুর্বোধ্য নয়। যেমন ধরো তুমি আজ যেমন আছ, আগামীকাল তোমার সত্তা তোমাকে অন্য মানুষও করে দিতে পারে। গাছপালা, প্রকৃতি, নদী এদের আজ আর কালকের কোন পার্থক্য ঘটে না, কিন্তু মানুষের ঘটে। তার চৈতন্য তাকে কোথায় কবে কোন রূপান্তরে একেবারে ভিন্ন করে তুলবে তুমি বলতে পারো না।”^{৩৬}—ইন্দ্রজিতের এই কথার মধ্য দিয়ে মানব জীবন, তার সম্ভার রহস্যময়তা ও গভীর জীবনদর্শন প্রকাশ পেয়েছে।

দুই দিন-রাতের ঘটনা নিয়ে লেখা উপন্যাসটিতে দ্বিতীয় দিন দেখা যায় আকস্মিকভাবে নিলি মেমসাহেব তার ঘরে মারা যান। খ্রীষ্টান হিসেবে তাঁকে খ্রীষ্ট ধর্মের নিয়ম অনুযায়ী সৎকারের ব্যবস্থা করার প্রয়োজন। বেশ দূরের গ্রাম থেকে পাদরি সেদিন আসতে পারবেন না। জয়দীপ ডলবি সাহেবের মধ্যেও উদাসীনতা লক্ষ্য করে মর্মান্বিত হয়ে উঠল। কিন্তু সন্ধ্যা-রাতের গহন অন্ধকারের মধ্যে জয়দীপ ডলবিকে খুঁজে পেল নিলির মৃতদেহের সামনে।

ডলবির অতীতচরিতায় তখন ছিল নিলির সাথে তার ভালবাসা ও সন্তানের স্মৃতি, যে সন্তানের এক বছর বয়সে মৃত্যুর পর থেকে নিলি সম্পূর্ণ একা। ডলবি বিয়ে করলেও স্ত্রীর মৃত্যুর পর এবং ছেলের দূরে থাকার সুবাদে তিনিও নিঃসঙ্গভাবে জীবন কাটিয়েছেন। জয়দীপ নিলির ঘরে এক অন্য ডলবিকে খুঁজে পেল, যে স্মৃতিভারাতুর, বিনম্র চিন্তা এবং কিছুটা অসহায়। ডলবির আত্মকথনের মধ্য দিয়ে মানব জীবনের বিশেষ অনুভূতি ব্যক্ত হয়েছে, “মানুষের দুঃখগুলো এইভাবে কোথাও না কোথাও লুকিয়ে থাকে। এগুলো বলা যায় না, প্রকাশ করা যায় না।”^{৩৭} মানবের অন্তর্গূঢ় গোপনচারি অনুভব একান্তভাবে সেই মানুষটিরই, তা সে পৃথিবীর যেখানেই অবস্থান করুক না কেন, তার পরিবর্তন হয় না—এই ভাবনা উপন্যাসে প্রকাশ পেয়েছে।

খ্রীষ্ট ধর্মের কথা এই উপন্যাসেও ব্যক্ত হয়েছে। নিলি মেমসাহেবের পাশাপাশি ডলবিও খ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বী মানুষ। ডলবির বিহারী হলেও এক সময় নিম্নবর্ণের মানুষদের খ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বী হওয়ার প্রবণতার সাথে সাথে ডলবির বাবাও ধর্মান্তরিত হয়েছিলেন। খ্রীষ্টধর্ম তাঁদেরকে সমাজে স্বীকৃতি

দিতে পেরেছিল, যা নিম্নবর্ণের মানুষ হিসেবে হিন্দুধর্মের কাছ থেকে তাঁরা পাননি। খ্রীষ্টধর্মের উদারতার প্রসঙ্গ নিলি কিংবা ডলবির জীবনাচরণে প্রকাশ পেয়েছে।

সাংসারিক জীবনের দুঃখ যন্ত্রণা, পরিবারতন্ত্রের ভাঙন, মানসিক অসুস্থতার প্রসঙ্গের পাশাপাশি এই উপন্যাসেও মৃত্যুর কথা ব্যক্ত হয়েছে। তবুও সেই মৃত্যু কিছুটা সহজ, স্বাভাবিকভাবে এসেছে। ভয়াবহতার পরিবেশ এখানে নেই, স্মৃতিচরিতা ও সম্মান জানানোর উদারতায় তা করুণ-মধুর। ছোট ছোট চিত্রের মধ্য দিয়ে লেখক ব্যক্তি-মানবের, মানসিকতার যে প্রতিফলন এই উপন্যাসে প্রকাশ করে তুলেছেন তা সত্যিই অসাধারণ। এই রচনায় তিনি দ্যোতিত করে তুলেছেন, আকাশে চাঁদের আলোর অনুপস্থিতিতে উজ্জ্বল তারার দীপ্তির মত মানুষের দুঃখময় অনুভূতিগুলোও মনের গভীর প্রকোষ্ঠে উজ্জ্বল হয়ে থাকে, —এই ভাবনা। লেখকের মৃত্যু-পূর্ব (মৃত্যু: ২৬শে আগষ্ট, ২০০৩) রচনা হিসেবে উপন্যাসটির বিশেষ মাত্রা পেতে পারে।

উৎস পরিচয়

১. 'কিছু খড় আর কুটো : বিমল করের সঙ্গে কিছুক্ষণ'— সাক্ষাৎকার-স্বরূপ ঘোষ, 'বিমল করের উপন্যাস প্রসঙ্গ অসুখের উপমা' বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০০৬, পৃষ্ঠা-২০২
২. 'উড়োখই' (দ্বিতীয় পর্ব)—বিমল কর, আনন্দ পাব. প্রাঃ লিঃ, জুলাই-১৯৯৭, পৃষ্ঠা-৫৬
৩. 'ছোটমন'- 'দেওয়াল'—বিমল কর, আনন্দ পাব. প্রাঃ লিঃ, জানুয়ারী-২০০৩, পৃষ্ঠা-২১৬-২১৭
৪. তদেব, পৃষ্ঠা-২৭৯
৫. 'উড়োখই' (প্রথম পর্ব)—বিমল কর, আনন্দ পাব. প্রাঃ লিঃ, সেপ্টেম্বর-২০০১, পৃষ্ঠা-২১৩
৬. 'উড়োখই' (দ্বিতীয় পর্ব)—বিমল কর, আনন্দ পাব. প্রাঃ লিঃ, জুলাই-১৯৯৭, পৃষ্ঠা-২০
৭. 'খড়কুটো'—বিমল কর, আনন্দ পাব. প্রাঃ লিঃ, সেপ্টেম্বর-১৯৯৮, পৃষ্ঠা-৪৩-৪৪
৮. তদেব, পৃষ্ঠা-১০২
৯. 'কালের প্রতিমা'— অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, দে'জ পাব, ২০০১, পৃষ্ঠা-২২৩

১০. ‘আমার লেখা’-‘গল্প সংগ্রহ’-বিমল কর, প্রকাশক-ব্রজকিশোর মন্ডল,

প্রথম প্রকাশ-১৩৮৭, পৃষ্ঠা-২৭

১১. ‘পূর্ণ অপূর্ণ’-‘উপন্যাস সমগ্র’(২)-বিমল কর, আনন্দ পাব. প্রাঃ লিঃ, সেপ্টেম্বর-১৯৯৯, পৃষ্ঠা-২১৯

১২. তদেব, পৃষ্ঠা-৪১৩

১৩. ‘উড়োখই’(দ্বিতীয় পর্ব)-বিমল কর, আনন্দ পাব. প্রাঃ লিঃ, জুলাই-১৯৯৭, পৃষ্ঠা-১৪০

১৪. ‘যদুবংশ’-‘উপন্যাস সমগ্র’(৩)-বিমল কর, আনন্দ পাব. প্রাঃ লিঃ, সেপ্টেম্বর-২০০০, পৃষ্ঠা-১৮৭

১৫. তদেব, পৃষ্ঠা-২৮৪

১৬. ‘বিমল করের যদুবংশ’-বিমল কুমার মুখোপাধ্যায়-তীর কুঠার, বইমেলা-১৪১০, পৃষ্ঠা-৯৬

১৭. ‘অসময়’-‘উপন্যাস সমগ্র’(৫)-বিমল কর, আনন্দ পাব. প্রাঃ লিঃ, সেপ্টেম্বর-২০০২, পৃষ্ঠা-১২৩

১৮. তদেব, পৃষ্ঠা-২৭

১৯. ‘বিমল করের অসময় : ক্রমশ নারীবাদ’-জহর সেন মজুমদার-তীর কুঠার, বইমেলা-১৪১০, পৃষ্ঠা-১৬০

২০. ‘উড়োখই’(দ্বিতীয় পর্ব)-বিমল কর, আনন্দ পাব. প্রাঃ লিঃ, জুলাই-১৯৯৭, পৃষ্ঠা-৯২

২১. ‘ঝোয়াই’-‘উপন্যাস সমগ্র’(২)-বিমল কর, আনন্দ পাব. প্রাঃ লিঃ, সেপ্টেম্বর-১৯৯৯, পৃষ্ঠা-১০১

২২. ‘ভুবনেশ্বরী’-‘উপন্যাস সমগ্র’(৩)-বিমল কর, আনন্দ পাব. প্রাঃ লিঃ, সেপ্টেম্বর-২০০০, পৃষ্ঠা-৩৬২

২৩. তদেব, পৃষ্ঠা-৩৭৯

২৪. তদেব, পৃষ্ঠা-৩৮০

২৫. তদেব, পৃষ্ঠা-৩৭৮

২৬. তদেব, পৃষ্ঠা-৩৮২

২৭. তদেব, পৃষ্ঠা-৩৮৪

২৮. ‘নিমফুলের গন্ধ’-‘উপন্যাস সমগ্র’(৫)-বিমল কর, আনন্দ পাব. প্রাঃ লিঃ, সেপ্টেম্বর-২০০২, পৃষ্ঠা-৪৪৮

২৯. তদেব, পৃষ্ঠা-৪৮৯

৩০. তদেব, পৃষ্ঠা-৪৩৬

৩১. তদেব, পৃষ্ঠা-৪৭৮

৩২. ‘বেদনা পর্ব’-‘উপন্যাস সমগ্র’(৭)-বিমল কর, আনন্দ পাব. প্রাঃ লিঃ, সেপ্টেম্বর-২০০৪, পৃষ্ঠা-৩৭৭

৩৩. তদেব, পৃষ্ঠা-৩৫৫

৩৪. তদেব, পৃষ্ঠা-৩৫৫

৩৫. তদেব, পৃষ্ঠা-২৮০

৩৬. ‘ইমলিগড়ের রূপকথা’-বিমল কর, আনন্দ পাব. প্রাঃ লিঃ, জানুয়ারি ২০০৪, পৃষ্ঠা-৬৮-৬৯

৩৭. তদেব পৃষ্ঠা-৮৯

-----o-----

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কালে সাহিত্যের আঙিনায় বিমল কর প্রবেশ করেন ছোটগল্পের হাত ধরে। একদিকে বিশ্বযুদ্ধের রণদামামা, অপর দিকে স্বাধীনতা আন্দোলনের উচ্ছ্বাস, একদিকে রাজনৈতিক অস্থিরতা অপরদিকে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের প্রতি সমর্থন, অন্যপক্ষে বিরোধিতা, একদিকে অর্থাভাব, বেকারত্ব, দারিদ্র্য অপরদিকে প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও মনস্তত্ত্ব -- কোন কিছুই তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে যায় নি। এই সময়কালকে ও ব্যক্তি মানুষের প্রকৃত স্বরূপকে যারা সাহিত্যের মাধ্যমে প্রকাশ করার প্রয়াস নিয়েছিলেন তাঁর মধ্যে বিমল কর অগ্রগণ্য সাহিত্যিক হিসেবে পরিগণিত। বিমল কর ছাড়াও সেই সময়ে বেশ কয়েকজন সাহিত্যিক উল্লেখযোগ্য গল্পকার হিসেবে বর্তমান ছিলেন। ছোট গল্পের দিক থেকে আমরা তাঁদের যে পরিচয় পেয়েছি তাই এই পরিচ্ছেদে আলোচিত হবে। যুগ ও জীবনের ছায়া তাঁদের গল্পেও প্রকাশিত হয়েছে। প্রত্যেক মানুষ ও শিল্পীর দৃষ্টিভঙ্গির বৈচিত্র্যের কারণে একই বিষয়বস্তু বিচিত্রভাবে উপস্থাপিত হয়, এবং আত্মোপলব্ধির স্বাতন্ত্র্যে ভিন্ন মাত্রার স্বাক্ষর রাখে শিল্প কর্মের মধ্য দিয়ে। এ কারণে গল্পে প্রতিষ্ঠিত কাহিনী, চরিত্রের বিকাশ, রসপরিণতি, মননধর্মিতা, আত্মানুসন্ধানের প্রয়াস, প্রেমভাবনা, মৃত্যুচেতনা ইত্যাদি যে কোন দিক দিয়ে সমকালীন গল্পকারদের মধ্যে মিল লক্ষ্য করা গেলেও জীবনদৃষ্টির তারতম্যে বৈচিত্র্যও লক্ষিত হয়।

বিমল করের সমকালীন গল্পকারদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন জগদীশ গুপ্ত, তারশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়, মানিক বন্দোপাধ্যায়, সুবোধ ঘোষ, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সন্তোষকুমার ঘোষ, কমল কুমার মজুমদার, মনোজ বসু, সমরেশ বসু, আশাপূর্ণা দেবী, নবেন্দু ঘোষ, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, মতি নন্দী, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, আশুতোষ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ আরও অনেক বিশিষ্ট গল্পকার। সকল গল্পকার বয়সের মাপকাঠিতে বিমল করের সমবয়স্ক না হলেও সাহিত্য রচনার দিক থেকে ঐরা ছিলেন সমসাময়িক এবং জনপ্রিয়তার অধিকারী। বিমল করের গল্পে উপস্থাপিত তৎকালীন সমাজচিত্র, ব্যক্তিজীবন মানব সম্পর্কের রসায়নের ক্ষেত্রে এই গল্পকারদের সঙ্গে তাঁর মিল ও অমিল পরিলক্ষিত হয়।

জগদীশ গুপ্ত (১৮৮৬-১৯৫৭) বিমল করের পূর্ববর্তী লেখক। তিনি কল্লোল-কালিকলম পত্রিকার সমকালে সাহিত্য রচনা করেন। তাঁর রচনায় দেহজ প্রেম, মনস্তত্ত্ব, সমকালীন পরিপ্রেক্ষিত

বিশেষ ভাবে প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর জীবনদৃষ্টির মধ্যে নিরাসক্ত, নির্মোহ ভাব লক্ষিত হয়। প্রকাশভঙ্গির স্বচ্ছতা, রূঢ় বাস্তবতা, প্রেমের ক্ষেত্রে দেহবাদিতার প্রতিষ্ঠা তাঁর গল্পে প্রকাশ পেয়েছে। মানুষের জীবনে নিয়তির প্রবল পরাক্রম এবং তার মাধ্যমে মানুষের জীবনে হাহাকারের প্রতিধ্বনি তাঁর রচনায় উল্লিখিত। ‘হাড়’, ‘দিবসের শেষে’, ‘অপহৃত আকাশ কুসুম’, ‘পল্লীশ্মশান’, ‘রতি ও বিরতি’ প্রভৃতি গল্পে সেই চিত্র প্রকাশিত।

‘হাড়’ গল্পে নিয়তির প্রভাব সক্রিয়। সনাতন একজন পরিশ্রমী মানুষ, সে মৎস শিকার করে জীবনধারণ করে। তার স্ত্রী মারা যাওয়ার সময় সন্তানকে রসি বুড়ির কাছে রাখতে চেয়েছিল। কিন্তু সনাতন রসি বুড়িকে পছন্দ করেনি। গ্রামের মানুষ জনও তাকে ডাইনি বলে সন্দেহ করে। রসিবুড়ির সাথে সনাতনের ঝগড়া হলেও শিশুর মুখ চেয়ে রসিবুড়ি সব কিছু মেনে নেয়। একদিন রাগ করে সে সনাতনকে বলে ফেলে-- ‘তুই মাছ মারতে চলেছিস -- ওই মাছই যেন আজই তোকে মারবে।’^১ এরপর মাছ খেতে গিয়ে গলায় কাঁটা আটকে গিয়ে সনাতন মারা গেছে। গ্রামের লোক রসি বুড়িকে ডাইনি সন্দেহ করলেও এর পিছনে যে নিয়তির প্রভাব অত্যন্ত কার্যকরী, তা উপেক্ষা করা যায় না। এর প্রভাবে মানুষের জীবনে নেমে আসে চরম দুঃখভোগ ও মৃত্যু।

‘দিবসের শেষে’ গল্পে অমোঘ নিয়তির কাছে নিরুপায় মানবজীবনের পরিণতির ভয়াবহ চিত্র অঙ্কন করেছেন লেখক। রতি নাপিতের একমাত্র ছেলে পাঁচু। রতির স্ত্রী নারানীর তিনটি ছেলে প্রসবগৃহেই মৃত হওয়ায় পাশের কামদা নদীতে ফেলে দিতে হয়েছিল। এর পর পাঁচু গোপালের মাদুলি ধারণ করে সে পাঁচুকে পেয়েছে। এই কারণে মায়ের শঙ্কিত মন সর্বদা একমাত্র প্রদীপ, পাঁচুকে ঘিরে থাকে। মনের আশঙ্কায় জন্ম নেয় পাঁচুকে ঘিরে অমঙ্গল চিন্তা “দেবতার নির্মাল্য ও প্রসাদ একসময় কমজোর হইয়া পড়িতেও পারে -- তাই পাঁচু চোখের আড়াল হইলেই নারানীর মনে হয় পাঁচু বুঝি নাই -- এমনি সশঙ্ক তার উৎকর্ষা।”^২ সেই পাঁচু একদিন সকালে বলেছিল, ‘মা আজ আমায় কুমিরে নেবো।’ নারানীর বুক সহসা কেঁপে উঠলেও পরবর্তী সময়ে মনে হয়েছে এটা অসম্ভব। কামদা নদীর কাছে তারা অত্যন্ত পরিচিত এবং এষাবৎকাল সেখানে কুমিরের আবির্ভাব ঘটেনি। এই নদী তাদের কাছে মমতাময়ী, পালয়িত্রী। দিন গড়ানোর সাথে সাথে পাঁচুর ভয় বেড়ে গেছে। তার ইচ্ছার বিরুদ্ধেও সে তার বাবার সাথে দুপুরে নদীতে গিয়ে নিরুপদ্রবে স্নান করে এসেছে। দুপুরবেলা সঙ্গীদের সাথে লুকিয়ে কাঁঠাল খেয়ে তার রসে গা ভিজিয়ে ফেলায় নারানীর কথায় রতি নাপিত শেষ-বিকলে পাঁচুকে নিয়ে নদীতে গেছে গা পরিষ্কার করে আনতে।

ফিরে আসার সময় পাঁচুর নজর পড়েছে নদীর পাড়ে সে ঘট্টা ফেলে এসেছে। সেই ঘট ফিরিয়ে আনতে গিয়ে কুমিরের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে সে। “যখন ওপারের কাছাকাছি পাঁচুকে পুনর্বীর দেখা গেল তখন সে কুস্তীরের মুখে, নিশ্চল।”^৩

জগদীশ গুপ্তের গল্পে মানুষ নিয়তির কাছে অসহায়। এই নিয়তির অনিবার্যতা মানুষের জীবনের সুখ-স্বস্তিকে নিঃশেষিত করে দেয়। গল্পের সূচনায় পাঁচুর মনে যে সম্ভাবনার সৃষ্টি হয়েছিল তা ঘটল। সে যদিও নদীর সংস্পর্শ থেকে নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা করছিল, কিন্তু আমোঘ শক্তির বলে নিয়তি তাকে পরাভূত করল। নিয়তির এই প্রভাব এবং তার কার্যকারিতা মানুষের জ্ঞানের বাইরে। তাই দুপুরের স্নান কিংবা বাবার সাথে বিকেলে নদীতে যাওয়া, কোন ক্ষেত্রেই তার কাছে নদী কিংবা কুমির সম্পর্কিত ভয়ের ভাব বিশ্বাসযোগ্য হয়নি। কিন্তু পাড়ে ঘট বসে থাকা, এবং তার প্রতি পাঁচুর এগিয়ে যাওয়া যেন মানুষের জীবনের নিয়তিতড়িত রূপটিকে প্রতিষ্ঠিত করে।

এখানে গল্পের শুরুতে যেমন পাঁচুর মৃত্যু-সম্ভাবনা দ্যোতিত হয়েছে, তেমনি বিমল করের ‘নিষাদ’ গল্পেও লক্ষ্য করা যায় গল্পের সূচনাতেই তিনি নিয়তির অনিবার্যতার দ্যোতনা করেছেন -- “ছেলেটা মরবে; লাইনে কাটা পড়েই মরবে একদিন। হয়ত আজ... কিংবা কাল...”^৪ ‘জলকু’ --বহুর বারের ছেলেটি মনের আক্রোশ মেটানোর প্রচেষ্টায় অবিরাম রেল লাইন লক্ষ্য করে পাথর ছুঁড়ে চলেছে। সে ভেবেছে তার ছাগলছানা মানিককে হত্যা করেছে এই রেল। কিন্তু সে জানে না তাদেরই প্রতিবেশী, এই গল্পের কথক সাধের ফুলচারা খেয়ে যাওয়ার অপরাধে মানিককে শাস্তি দিতে গিয়ে অসাবধানে হত্যা করে ফেলেছে। অথচ গল্প কথক নিজের এই অপরাধ স্বীকার করেনি জলকুর কাছে। কিন্তু তার জন্য মূল্য দিতে হয়েছে তাকে একটি কিশোরের প্রাণ। নিয়তি এখানেও অনিবার্য, জলকুর মৃত্যুর ক্ষেত্রে তাকে ঠেকানো যায়নি। গল্প কথক যেন এখানে নিয়তির সাথে একাত্ম হয়ে কাজ করেছে। জলকুর মৃত্যুর জন্য কিছুটা দায় তারও, একারণেই সে অন্তর্দ্বন্দ্বের ক্ষতবিক্ষত হয়েছে। রাতের অন্ধকারে অনুশোচনায় আক্রান্ত হয়ে জলকুর প্রতি ক্ষমা প্রার্থনা করেছে, নিজের অন্তরসন্তায় তার ভাঙন ধরেছে। “মানুষ যখন তার নাগালের কাছে শূন্যতা ছাড়া আর কিছু হাতড়ে পায় না, অথচ তার কথা থাকে, তখন বোধ হয় এইভাবে নিজেকে ভাঙে।”^৫ নিয়তির অনিবার্যতা এই গল্পে প্রকাশিত হলেও তার পাশাপাশি অন্তর্দ্বন্দ্বময় মানুষের হৃদয়ের ছবিকেও লেখক ফুটিয়ে তুলেছেন। ‘অশুখ’ কিংবা ‘আয়োজন’ গল্পে নিয়তির কার্যকারিতা উপলব্ধি করা যায়। ‘অশুখ’ গল্পে রেণুর সন্তান মারা যাওয়ার পিছনে তার মনোগহনে অশুখের

প্রভাব কল্পিত হয়েছে। তার মনে হতো, ‘ওই শত্রু একদিন আমার সব নেবে!’^৬ --এই সম্ভাবনা একদিন অনিবার্য যজ্ঞণা নিয়ে এসেছিল রেণুর বুক খালি করে দিয়ে। ‘আয়োজন’ গল্পে মনোবীণা’র সন্তান-সম্ভাবনা গভেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। সন্তান-হীনতার যজ্ঞণা নিয়ে সে তাকিয়ে থাকত সেই সিঁড়ি গুলোর দিকে, যেখানে বেশ কয়েক বছর আগে পড়ে গিয়ে তার মাতৃ-সম্ভাবনা সমূলে বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

জগদীশ গুপ্ত নিয়তির এই আগ্রাসী মনোভাবের কাছে মানুষের কোন ভূমিকা দেখেননি। মৃত্যুভাবনা মনের মধ্যে জাগ্রত থাকায় বিমল করও নিয়তির লীলার বিরুদ্ধাচরণ করতে পারেন নি, এবং তিনিও মেনে নিয়েছিলেন, এই নিয়তি অনিবার্য, এর বিরোধিতা চলে না। ‘বুদবুদ’ গল্পে তাই বেলা শ্রাপদের দ্বারা আক্রান্ত নিজের শিশুর মৃত্যুতে প্রতিকারের পথ খুঁজে পায়নি। জগদীশ গুপ্তের গল্পে প্রেমের স্নিগ্ধ রূপ প্রায় অনুপস্থিত। প্রেম এখানে দেহজ এবং তীর যৌনচেতনার মাধ্যমে তার প্রকাশ। স্বার্থ, ভোগসর্বস্বতা, কুঠাহীন যৌনক্ষুধা তাঁর গল্পগুলিকে রূঢ় বাস্তবের প্রতিচিত্র করে তুলেছে। মানুষের মনের গোপন আকাঙ্ক্ষার নগ্নরূপ তিনি নিরাসক্তভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। অশ্লীলতা প্রকাশের বাসনা এর মধ্যে নেই, মানুষের মনের স্বরূপ প্রকাশেই তিনি নিঃশঙ্ক, অকৃত্রিম মানসিকতার অধিকারী। ‘অরূপের রাস’ গল্পটিতে প্রেম থাকলেও যৌনক্ষুধার কদর্য রূপ স্বচ্ছভাবে প্রকাশিত হয়। অবদমিত সেই ভালবাসার প্রকাশ ঘটেছে কিছুটা মৃদুভাবে।

গল্পের কথক কানুর সাথে রাণুর বন্ধুত্ব ছিল। শৈশব কৈশোরের ছেলেমানুষীর দিনগুলি অতিক্রম করে বয়ঃসন্ধির লগ্নে এসে পৌঁছল তারা। ছেলেদের থেকে মেয়েদের মানসিক পরিবর্তন, মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণী ক্ষমতা যে অনেক বেশি এই গল্পে তার প্রকাশ ঘটেছে। তাই উভয়ে উভয়ের দেহ স্পর্শ করার পর রাণুর মনে পুলক সঞ্চারিত হলেও, কানুর মনে কোন প্রতিক্রিয়া দেখা যেত না। রাণুর বিয়ের কথা শোনার পর ভালবাসাকে টিকিয়ে রাখার দুর্বার মানসিকতায় কানুর মনে বিদ্রোহের সৃষ্টি হয় না। এমনকি রানুর রান্না করা খাবার খেয়েও ভালবাসার রসায়ন বোঝার ক্ষমতা তার নেই। রাণু আশা করেছিল কানুর মনেও তার মত ব্যগ্রতা, উৎকণ্ঠা প্রকাশ পাবে, সে জায়গায় কানু নিস্পৃহ, নির্মোহ। রাণুর বিয়ের সম্বন্ধে সে ‘বিবাহ’ কবিতা লিখেছে বসেছে, কিন্তু বিবাহের পিছনে রোমহর্ষ অনুভব করতে পারেনি। বিয়ের পরও রাণু চিঠি লিখেছে, কিন্তু কানুর মধ্যে কোন উৎসাহ দেখা যায় নি। সময়ের প্রবাহের সাথে সাথে কানুর বিয়ে হয়েছে এবং স্ত্রী ইন্দিরার সঙ্গে পরিচয় হয়েছে রাণুর। রাণুরও সন্তান হয়েছে, সেই ছেলের নাম রেখেছে ‘বেণু’। এই নামের পিছনে

তার নামের মিল আছে কিনা তা নিয়ে কানু সন্দেহ প্রকাশ করেছে। এরপর রাণু ইন্দিরার সাথে নিবিড় ভাবে মেলামেশা করেছে। কানুর প্রতি তার অবদমিত প্রেমাকাঙ্ক্ষার স্বাক্ষর যেন রেখে দিতে চেয়েছে ইন্দিরার মাধ্যমে। রাণুর সমকামিতার প্রকাশ এখানে ইন্দিরার মনেও লজ্জার সৃষ্টি করেছে। আর কানু মনে করেছে রাণু যেন, “ইন্দিরার অঙ্গ হইতে আমার স্পর্শ মুছিয়া লইয়া সে ত্বক রক্ত পূর্ণ করিয়া লইয়া গেছে। ...আমি তৃপ্ত।”^{৭৭} --এই গল্পে রাণুর মধ্যে প্রেমবোধের নানা প্রকাশ ঘটলেও কানু নিজীবের মতো আচরণ করেছে। সময়ানুগ ভাবে তার মনে প্রেমবোধের প্রকাশ ঘটেনি। আবার রাণু স্পষ্টভাবে তার ভালবাসার কথাকে ব্যক্ত করতে পারেনি। মনের গোপনে সেই অবদমিত আকাঙ্ক্ষাকে লুকিয়ে রেখেছে। ইন্দিরার সাথে মেলামেশা, রাতে শোওয়ার আকাঙ্ক্ষার মাধ্যমে সমকামিতার অস্বাভাবিক আচরণে তৃপ্ত হতে চেয়েছে।

বিমল করের ‘উদ্ভিদ’ গল্পে অবদমিত প্রেমের স্বরূপ কিছুটা ভিন্নভাবে প্রকাশ পেয়েছে। বটানির অধ্যাপক পূর্ণেন্দুবিকাশের গোপন, অস্বাভাবিক ভালবাসা, বিকৃত কামনাকে প্রকাশ করেছে। পাথরের মূর্তির উপর অলংকরণ তারই যথার্থ প্রকাশ। ছাত্রী চন্দ্রার কাছে সে নিজের এই অব্যক্ত ভালবাসাকে প্রকাশ করতে পারেনি। চন্দ্রার বিয়ের রাতে বাগানের স্ট্যাচুকে আঁকড়ে ধরে অবদমিত, বিকারগ্রস্ত মানসিকতাকে প্রকাশ করেছে। তার এই বিকৃত মানসিকতা মানুষের স্বভাবধর্মের সাথে মেলেনা। রানী সুবর্ণমঞ্জরী একারণেই তাকে উদ্ভিদ বলেছেন। যে পুরুষ নিজের প্রেমের উপলব্ধিকে সুস্থ সংস্কৃতির মাধ্যমে ব্যক্ত না করে অসহায়ভাবে গোপনে মানসিক অসুস্থতার দ্বারা পরিচালিত হয়, এবং লতানো উদ্ভিদের মতো জড়বস্তুকে আশ্রয় করে টিকে থাকতে চায়, সে তো উদ্ভিদের মতোই। পূর্ণেন্দুবিকাশ নিশ্চাণ নগ্ন স্ট্যাচুটিকে আলিঙ্গন করে সুখ পেতে চেয়েছে-- “যে সুখে এমন স্তব্ধরাতেও একটি লতা চুপি চুপি তার সবুজ ডগা তিল তিল করে বাড়িয়ে একটি অদ্ভুত কামনাকে প্রকাশ করেছে।”^{৭৮}

পূর্ণেন্দুবিকাশের মনে এই উদ্ভিদসত্তা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। অবদমিত এই প্রেমাকাঙ্ক্ষা তার বিকৃত রুচির পরিচায়ক। ‘অরুণের রাস’ গল্পের সাথে এর সার্থক মিল লক্ষিত হয় না। তবু রাণুর অবদমিত প্রেমাকাঙ্ক্ষা ইন্দিরাকে নিয়ে সুখ পাবার প্রচেষ্টা কিছুটা বিকৃত মানসিকতার সাক্ষ্যবাহী। কানুর নির্মোহ মানসিকতা, বয়ঃসন্ধিকালে সেই ভালবাসাকে বুঝতে না পারার মানসিক প্রতিবন্ধকতা কিছুটা পূর্ণেন্দুবিকাশের চরিত্রের সমধর্মী।

মানব মনে মূল্যবোধের সঙ্কট জগদীশ গুপ্তের গল্পে নানা ভাবে প্রকাশ পেয়েছে। ‘আদি কথার একটি’ গল্পে বিশ্ববার শিশু-কন্যাকে বিয়ে করার পিছনে কন্যা এবং তার মা দুজনকেই ভোগ করার আকাঙ্ক্ষা দেখা দিয়েছে। বন্ধুর স্ত্রীর প্রতি তীব্র আসক্তি এবং তার অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার খবরে নিজেকে বঞ্চিত করার পিছনে অবদমিত কামনার প্রকাশ ঘটেছে ‘শশাঙ্ক কবিরাজের স্ত্রী’ গল্পে। নিজের স্ত্রী সুন্দরী নয় বলে পুত্রবধূকেও অসুন্দরী মনোনীত করার পিছনে কামনার গ্লানি প্রকাশিত হয়েছে ‘লোকনাথের তামসিকতা’ গল্পে। ‘পৃষ্ঠে শরলেখা’ গল্পে আবার দেখা যায় পুত্রবধূ নির্বাচন করতে গিয়ে পৌড় নিজেই বিয়ে করে বসে এবং পুত্রকে ভৎসনা করে তাকে মাতৃ সম্মান না দেওয়ার কারণে।

‘যযাতি’ গল্পে বিমল কর মানুষের অন্তর্জগতের বাসনার বিষয়কে মূর্ত করে তুলেছেন। যযাতির মিথের সাথে এই গল্পের নীলকণ্ঠের মানসিকতাকে তিনি মিলিয়ে ফেলেছেন। সে তার স্ত্রীর মৃত্যুর পর পালা লিখতে বসে কোনভাবেই সফল হয় না। মনের মধ্যে শূন্যতাকে সে দূর করতে পারে না। ফাঁকা বাড়িতে স্ত্রীর কিছু কিছু দায়িত্ব পালন করে আঠার বছরের কুসুমা রান্না কিংবা সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালানোর কাজের মধ্যে নিরত থাকা কুসুমকে দেখে নীলকণ্ঠ ভুলে যায় ছেলে ললিতের সাথে কুসুমের বিয়ে দেওয়া যেতে পারে, সে নিজের মনে সঙ্গোপনে প্রত্যাশার জগৎ তৈরি করে ফেলে। রাত্রে ললিত ঘরে ঢুকে বাবার স্বপ্নকে সার্থক করার উদ্দেশ্যে বলে-- ‘একটা বিয়া করুন আপনি। কুসুমকেই করুন। ভাল মেয়ে।’^৪ ব্যক্তির মূল্যচেষ্টনার সংকট নীলকণ্ঠ চরিত্রের মাধ্যমে এখানে প্রকাশ পেয়েছে। মনের গভীরে অবচেতনে লালন করা প্রবৃত্তিকে এখানে রূপ দিয়েছেন লেখক।

জগদীশ গুপ্তের ‘শঙ্কিতা অভয়া’ গল্পেও মূল্যবোধের অবক্ষয় লক্ষ্য করা যায়। সন্দেহ প্রবণতা, কদর্য চিন্তা মানুষের মনকেও কেমন ভাবে বিষিয়ে দেয়, তার প্রকাশ এই গল্পে। অভয়া তার মেয়ের সাথে স্বামী অতুলের সম্পর্কে সুস্থভাবে দেখতে পারে না। মেয়ে শান্তিময়ী বাবার সাথে সমস্ত বিষয়েই আলোচনা করে, যেখানে, খেলাধুলা, নাটক এমনকি প্রেমের বিষয়ও বাদ পড়ে না। এই আলোচনার মাধ্যমে তাদের আত্মিক সহাবস্থান দৃঢ় হলেও তার মধ্যে কামনা নেই, আছে সহযোগিতা, সাবলীলতা। কিন্তু অভয়া মেয়ে ও বাবার এই মেলামেশা পছন্দ করে না। আবার বাধা দিয়েও সফল হয় না। কারণ দুজনের উচ্ছ্বাসের তোড়ে তার তৈরি করা সমস্ত প্রতিবন্ধকতা ভেঙে যায়। অভয়া শঙ্কিত হয়ে অতুলকে জিজ্ঞাসা করে, ‘মেয়েটাকে তুমি নষ্ট করতে চাও কেন বলো

তো?’ --এই প্রতিবাদ মুখরতা পরবর্তী সময়ে আরও রূঢ় রূপ ধারণ করে। “তার মনে হইতে লাগিল, পাপের পায়শ্চিত্ত শুরু হইয়াছে, তার অজ্ঞানতা, তার অন্ধকার, তার উত্তেজনা, ভ্রম, দুর্বুদ্ধি সবই তার পাপ; কিন্তু যথার্থ যে পাপী, যে তাহাকে প্রলুব্ধ করিয়া নানা ছলে তাহার সংবিৎকে উত্তাপ দিয়া দিয়া বক্র বিকৃত বীভৎস করিয়া তুলিয়াছিল, সে আজও পরম আনন্দে আছে ...।”^{১০} তাই সে শান্তির কাছে নিজেদের সম্পর্কে প্রকাশ করে শান্তিকে তার বাবার কাছ থেকে দূরে সরাতে চেয়েছে। অভয়া একদিন অতুলের সাথে কুলত্যাগ করে পালিয়ে এসেছিল। শান্তি অতুলের সন্তান নয়। যে মানুষ অভয়াকে নিয়ে পালিয়ে এসেছে, সেই পুরুষ মানুষকে বিশ্বাস করা যায় না। তার লোভের থাবা হয়তো শান্তির দিকেও প্রসারিত হতে চেয়েছে।

অভয়ার অন্তর্দ্বন্দ্ব, মূল্যবোধের অবক্ষয় এই গল্পে প্রকাশিত হয়েছে। বিমল করের ‘আত্মজা’ একটি ভিন্নধর্মী গল্প হলেও বাবা ও মেয়ের সম্পর্ক নিয়ে মায়ের অকারণ সন্দেহপ্রবণতা সেই গল্পেরও বিষয়বস্তু। ‘আত্মজা’তে হিমাংশু ও পুতুল আত্মজা সম্পর্কিত। ‘শক্তি অভয়া’য় তা নয়। ‘আত্মজা’ গল্পে বাইরের লোকের দ্বারা যুথিকা প্রভাবিত হয়েছে এবং হিমাংশুকে আক্রমণ করেছে। যার ফলশ্রুতিতে হিমাংশুর মর্মান্তিক আত্মহত্যা পরিণতি টেনেছে গল্পের। হিমাংশুর অন্তর্দ্বন্দ্ব, নিজের শুভবোধকে লালন করার প্রত্যাশা, পুতুলকে ঘিরে তার মমত্ববোধ ও হাহাকার ‘আত্মজা’ গল্পকে অসাধারণ উচ্চতায় তুলে নিয়ে গেছে।

জগদীশ গুপ্তের কিছু গল্পে দাম্পত্য জীবনের একঘেয়েমিজাত ক্লান্তি ও তার মাধ্যমে হতাশা প্রকাশিত হয়েছে। ‘মনোভূঙ্গ গুঞ্জরিল’ কিংবা ‘আঠারো কলার একটি’ প্রভৃতি গল্পে তার পরিচয় পাওয়া যায়। ‘আঠারো কলার একটি’ গল্পে বেণুকের দাম্পত্য জীবনের ক্লান্তিতে আচ্ছন্ন। চারবছরের বিবাহিত জীবনের দাম্পত্য সম্পর্ক তার কাছে অভ্যাসগত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বর্ণহীন হয়ে উঠেছে। স্ত্রীর কাছে সে আরও কিছু ছলা কলার প্রত্যাশা করে, যা তার দাম্পত্য জীবনে নতুনত্বের ছোঁয়া লাগাতে পারে। স্ত্রী জানকী জানতে পেরে বলে, ‘তা আশ্চর্য কী এমন! দেখাইনে তাই দেখ না।’^{১১} এরপর আকস্মিকভাবে শুকনো মাঠে লাঙল করতে গিয়ে বেণুকের একটি জ্যাস্ত মাগুর মাছ পায় এবং বাড়িতে নিয়ে এসে তা ঝোল করতে বলে আবার মাঠে ফিরে যায়। দুপুরে খতে বসে মাছের ঝোলের কথা জিজ্ঞাসা করলে জানকী যেন আকাশ থেকে পড়ে। তাদের চাঁচামেচিতে প্রতিবেশীরা এলে বেণুকের কথা শুনে তারা বুঝতে পারে তার ‘মাথা বিগড়েছে’। কারণ এই শুকনো মাঠে মাগুর মাছ পাওয়া অসম্ভব। প্রতিবেশীরা চলে গেলে জানকী বলেছে,

“আঠারো কলা দেখতে চেয়েছিলে না! এ তারই একটি। ...রাগ করো না, তোমার পায়ে ধরি।’
ব’লে জানকী স্বামীর পা ধরে বলল, ‘মাগুর মাছের ঝোল রৈষেছি। এসো খেতে দিগে।’”^{২২}

রুক্ষ, তিক্ত জীবনবোধের মধ্যেও এই গল্পটিতে সরসতা দেখিয়েছেন জগদীশ গুপ্ত। জীবনের একঘেয়েমির কারণে ক্লান্তিবোধ, হতাশা, তার থেকে বেরোনোর চেষ্টা, কিন্তু তার মধ্যেই আটকে পড়ার মতো আধুনিক বিষয় এই ‘আঠারো কলার একটি’ গল্পতে রয়েছে। বিমল করের ‘পালকের পা’ গল্পে মৃণালের কাছে তার স্ত্রী কমলা একঘেয়ে হয়ে উঠেছিল তার সাজপোষাক, চটকদারিত্বের অভাবের কারণে। সে পাশাপাশি লক্ষ্য করেছিল তার বান্ধবী তুষারকণার আধুনিকত্ব ও মনমোহিনী ভাবমূর্তিকে, যার কাছে তার স্ত্রী নিতান্তই সাধারণ। কিন্তু একদিন সে তুষারকণার রক্তাক্ত হৃদয়ের স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারল, যেখানে শুধুই কৃত্রিমতা রয়েছে। বাড়িতে ফিরে এসে দেখতে পেল কমলার ইচ্ছাকৃত অভিনয়ের স্বরূপ, যেখানে জীবনের সেই স্বাভাবিকত্ব, সহজবোধ্যতা, সরলতা ও অকৃত্রিম ভাব ছিল না। কমলা মৃণালের মনোরঞ্জননের জন্য বলেছে, “এতেও যদি না হয়, আরও পারি।” কমলা আঁচলটা খুলে ফেলল গা থেকে। হাত ধরে ফেলল মৃণাল খপ করে। আশ্চর্য এক ভয়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছে তার গা। গলার স্বর ফুটছিল না। তবু বলল, ‘না না। লক্ষ্মীটি না।’”^{২৩}—
মৃণাল নিজের স্ত্রীর মধ্যে অনুভব করেছে ঘরোয়া সুশৃঙ্খল মানসিকতা, যা তার কাছে অবসরের একমাত্র সুখ ও স্বস্তি এনে দিতে পারে। তাই বৈচিত্র্যের খোঁজ না করে অপরের প্রতি ঈর্ষাকাতর না হয়ে নিজ পরিধির মধ্যে ফিরে এসেছে। বিমল কর দাম্পত্য জীবনের মধ্যে সুখের বাতাবরণ খোঁজার চেষ্টা করেছেন। ঐতিহ্য, সুস্থ মানসিকতা, চিরন্তন প্রেমের প্রতি তাঁর দুর্বলতা ও আকাঙ্ক্ষা লক্ষ্য করা যায়। জগদীশ গুপ্ত মানুষের অন্তর-মনের ক্লেদাক্ত স্বরূপকে খোঁজার চেষ্টা করেছেন। প্রেমের মধ্যে লক্ষ্য করেছেন প্রবৃত্তির টানাপোড়েন। নৈরাশ্যবোধ, গ্লানি, বিকারগ্রস্ত মানসিকতার প্রকাশ রয়েছে তাঁর গল্পের মধ্যে। বিমল কর সমকালীন মানুষের চারিত্রিক দুর্বলতা প্রকাশ করলেও সুখের সন্ধান দেওয়ারও চেষ্টা করেছেন।

তারশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭২) বিমল করের অগ্রজ কথাশিল্পী, কল্লোল যুগ থেকে একাদিক্রমে সাহিত্য রচনা করে গেছেন। বিমল করের সাথে তাঁর মধুর সম্পর্কও ছিল। তারশঙ্করের গল্পে আঞ্চলিকতার প্রভাব থাকলেও তা আঞ্চলিকতায় সীমাবদ্ধ নয়। রাত অঞ্চলের জীবনযাত্রা ও মানুষের ছবি সমগ্র জীবনের বৈশিষ্ট্যের সাথে একাত্ম হয়ে যায়। মানব চরিত্র ও মানব জীবনের সাথে তাঁর ওতপ্রোত যোগাযোগ তাঁকে যেমন রাজনৈতিক জীবনের দীক্ষা দিয়েছিল,

তেমনি সাহিত্যকেও করে তুলেছিল বাস্তবসম্মত। কল্লোলীয় ধারণার বশবর্তী হয়ে তিনি তাঁর সাহিত্য-ভাবনাকে গড়ে তোলেননি। লেখক নিজেই জানিয়েছেন, “আমি বিদ্রোহের ছিলাম না। বর্তমানকে ভেঙেচুরে তাকে অগ্রাহ্য করে শূন্যবাদের মধ্যে জীবনকে শেষ করার কল্পনায় আমার মনের পরিতৃপ্তি কোনদিন হয় নি। ...আমার মনে ভেঙে গড়ার স্বপ্ন ছিল।”(‘আমার সাহিত্য জীবন’-- তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়) কৃষক, শ্রমিক, সাধারণ মানুষের অবহেলিত জীবনচিত্র, নিম্ন অধুষিত মানুষের ধর্মীয় সংস্কার, জমিদারি প্রথার অবক্ষয় ও বিলোপ, নবীন-প্রবীণের দ্বন্দ্ব, নিয়তির অমোঘ নিয়মে আক্রান্ত জীবনচিত্র তাঁর সাহিত্যের বিষয় হয়ে উঠেছে। “আর্টিস্টের অনাসক্ত দৃষ্টিতে তারাশঙ্কর দেখেছেন--মানুষের আদিম অপরাধ- প্রবণতা, দেহমন্দের কুৎসিত ব্যাধি, পতনোন্মুক্ত জমিদার কুলের অন্তর্মিত গরিমা, অশিক্ষা ও কুসংস্কারে নিমজ্জিত তথাকথিত উচ্চবর্ণের মানুষ এবং তার পাশাপাশি অন্ত্যজ মানুষ, বেদে-বাউরী-সাঁওতাল-রাজবংশীর দল।”^{১৪}

বিমল করের গল্পে গ্রামীণ জীবনের চিত্র ফুটে ওঠেনি। লেখক গ্রামে থাকেননি, তাই কল্পনার আশ্রয়ে গ্রামের চিত্র অঙ্কন করেননি। কিন্তু তাঁর গল্পে পরিবেশ পটভূমিকায় বিহার ও বিহার সংলগ্ন পশ্চিমবঙ্গের ছবি লক্ষ্য করা যায়, যে ছবিতে মালভূম অঞ্চলের বঙ্গুর প্রকৃতি, নদী, জঙ্গল লক্ষ্য করা যায়। ‘মানবপুত্র’, ‘বুদবুদ’, ‘আঙুরলতা’, ‘সাদা কালো’ প্রভৃতি গল্পে অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষের চরিত্র থাকলেও অধিকাংশ গল্পের চরিত্র মধ্যবিত্ত বা নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষ। তারাশঙ্করের গল্পে কাহিনীমূলকতা লক্ষিত হয়। তাঁর প্রায় সমস্ত গল্পে সুপরিচালিত, সাজানো একটি কাহিনী থাকে, এর মাধ্যমেই নিয়তির অনিবার্যতা, প্রবৃত্তির দ্বন্দ্ব, পুরুষকারের লড়াই, মানুষের বিত্ত ও অবস্থানগত আধিপত্য প্রকাশিত হয়েছে। বিমল করের প্রথম দিকের গল্পে কাহিনীর প্রাধান্য লক্ষ্য করা গেলেও পরবর্তীকালে কাহিনী বা ঘটনার চেয়ে প্রাধান্য পেয়েছে চরিত্রের মনোবিশ্লেষণ।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘তারিণী মাঝি’ গল্পে জীবধর্মের জয় ঘোষিত হয়েছে। তারিণী মাঝি উত্তাল ঢেউয়ের সাথে লড়াই করতে করতে নিজেকে বাঁচানোর তাগিদে তার ভালবাসার মানুষ, স্ত্রী সুখীকে জলের তলায় গলা টিপে মেরে ফেলেছে। এখানে চরম মুহূর্তে স্ত্রীর প্রতি ভালবাসার চেয়েও অনেক বেশি মূল্য পেয়েছে নিজের জীবনোপভোগের বাসনা। ‘অগ্রদানী’ গল্পে প্রবৃত্তিরূপিনী নিয়তির জয় ঘোষিত হয়েছে। পূর্ণ চক্রবর্তী দারিদ্র্যের হাত থেকে বাঁচার জন্য শ্যামদাস বাবুর সদ্যজাত সন্তানের সাথে নিজের সন্তানের বদল ঘটিয়েছে। শ্যামদাসবাবুর স্ত্রীর সন্তান

প্রসব গৃহেই মারা যায়, অপর পক্ষে দারিদ্র্য থাকলেও পূর্ণ চক্রবর্তীর সংসারে সন্তানে অভাব নেই। শ্যামদাসবাবু পূর্ণ চক্রবর্তীকে প্রসব গৃহের দ্বারে ব্রাহ্মণ হিসেবে রাখেন এবং ঘোষণা করেন যদি এই সন্তান বেঁচে যায় তাহলে দশবিঘা জমি ও প্রতিদিন একখালা করে সিংহবাহিনীর প্রসাদ পাবে পূর্ণ চক্রবর্তী। যথারীতি মৃত সন্তান প্রসব করেন শ্যামদাসবাবুর স্ত্রী এবং পূর্ণ চক্রবর্তী নিজের সন্তানের সাথে সেই সন্তানের বদল ঘটিয়ে দেন। কিন্তু চৌদ্দ বছর পর সেই সন্তানের মৃত্যু ঘটলে তার পিণ্ড গ্রহণের জন্য ডাক পড়ে পূর্ণ চক্রবর্তীর। তার মন হাহাকার করে ওঠে, প্রথমে অরাজি হলেও শেষ পর্যন্ত জমির লোভে ও দারিদ্র্য মোচনের অভিলাসে অসহায়ভাবে সম্মতি দেন। এই গল্পে নিয়তির নির্মম পরিহাস পূর্ণ চক্রবর্তীর উপর আঘাত হেনেছে।

‘ভাইনি’ গল্পে কুসংস্কারের বলি হয়েছে নিরপরাধ বৃদ্ধা। আবার ‘সন্তান’ গল্পে কদাকার সন্তানকে হত্যা করেছে তার পিতা। ‘তিনশূন্য’ গল্পে দরিদ্র, ভিক্ষুক ল্যালা কিশোরীর উপর বন্য যৌনতা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। এইসব গল্পে তারাশঙ্কর মানবের প্রবৃত্তি, সন্দেহপ্রবণতা, কুসংস্কারের প্রতি দুর্বলতা দেখিয়েছেন। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে তাঁর গল্পেও মৃত্যুভাবনা, জীবনের প্রতি বিরাগ লক্ষ্য করা যায়। তবে এই প্রবণতা চারের দশক থেকেই তাঁর গল্পে কিছুটা প্রভাব ফেলেছিল। ‘বোবাকান্না’, ‘পৌষলক্ষ্মী’, ‘না’, ‘দেবতার ব্যাধি’ প্রভৃতি গল্পে আধুনিক জীবনের নৈরাশ্য, আশাভঙ্গের বেদনা, সমকালীন পরিস্থিতির প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। এর থেকে উত্তরণের পথও তিনি খোঁজার চেষ্টা করেছেন মনের মধ্যে জন্ম নেওয়া ক্ষমাশীলতা, আশাবাদী মানসিকতা, অধ্যাত্মবাদী ভাবনার মাধ্যমে। ‘না’ গল্পে ব্রজরানি তার স্বামীহন্তাকে ক্ষমা করে মানবিকবোধের চূড়ান্ত নিদর্শন দেখিয়েছে। ‘পৌষলক্ষ্মী’ গল্পে অতীত মহিমার প্রতি দুর্বলতা দেখিয়েও মুকুন্দ পালের মৃত্যুর মাধ্যমে কালের পরিবর্তনকে সমর্থন করেছেন লেখক এবং এর পাশাপাশি দেখা গেছে জ্বরাক্রমী নিয়তির কাছে জীবনের পরাজয় ঘটেছে। এই গল্পে মনুষ্যের প্রভাবও রয়েছে। ‘বোবাকান্না’, ‘ইস্কাপন’, ‘মরামাটি’ প্রভৃতি গল্পেও মনুষ্যের ছবি লক্ষ্য করা যায়। আবার ‘বিস্ফোরণ’ গল্পে ছেচল্লিশের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পটভূমি লেখক ফুটিয়ে তুলেছেন। ‘শেষ কথা’ গল্পে মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলন, অনশন, কস্তুরবা গান্ধীর মৃত্যু এই সমস্ত সমকালীন ঘটনা প্রস্ফুটিত হয়েছে। ‘জলসামর’, ‘রায়বাড়ি’ প্রভৃতি গল্পে সামন্ততান্ত্রিকতার বিলোপের মতো বাস্তবঘনিষ্ঠ বিষয় লক্ষ্য করা গেছে। সমাজ ও সাহিত্যের প্রতি দায়বদ্ধ থেকে তারাশঙ্কর সাহিত্য রচনা করেছেন। সমকালের বিভিন্ন পরিস্থিতি মানুষের জীবন তাঁর গল্পে তাই

এত জীবন্তভাবে রূপ পেয়েছে। “তারাশঙ্করের অভিজ্ঞতা, তাঁর জীবন চিন্তা, তাঁর নিজস্ব পরিবেশ --সবই এই ব্যবধানের হেতুমূল। তিনি তো উচ্চশিক্ষিত মধ্যবিত্তের বুদ্ধির মাধ্যমেই তাঁর বক্তব্যে এসে পৌঁছাননি : নৈরাশ্য তাঁর ছিল -- কিন্তু গ্রাম সমাজের সংস্কারে বিশ্বাসে পালিত তারাশঙ্কর নৈরাজ্যকে তখনও মেনে নিতে পারেন না। তাঁর দুঃখচেতনা প্রত্যক্ষ রূঢ় অভিজ্ঞতার ফল। অর্থনৈতিক দুর্গতি ও অশিক্ষায় তমসচ্ছন্ন আধিব্যাধিতে বিড়বিত পল্লীবাংলার ব্যাপক অবক্ষয়, আদিমতা আর হৃদয়বেগে ক্ষত-বিক্ষত মানুষের হৃদয়, জ্ঞান-অজ্ঞানকৃত নিরুপায় পাপ এবং তার উপর বিধাতার নির্মম দণ্ডাঘাত, আর পরিশেষে এই সিদ্ধান্ত-- “মানুষ নিজের কাছে কী অসহায়, সংসারে কী নিদারুণ বঞ্চনা, হৃদয় কি কঠোর ভাবে অপমানিত, দারিদ্র্য কী ভয়ঙ্কর, মৃত্যু কী ক্ষমাহীন, পাপের জন্য কী করাল বজ্র সমুদ্রত্যাগ।’ এক কথায় তারাশঙ্করের দুঃখবোধ ক্লাসিক লক্ষণাক্রান্ত -- তার ব্যাপ্তি যেমন বিরাট, তার উপলব্ধি তেমনি সুদৃঃসহ।”^{১৫}

বিমল করের বেশ কয়েকটি গল্পে সমকালে ঘটে যাওয়া ঘটনার ছবি প্রত্যক্ষ করা যায়। ‘মানবপুত্র’ গল্পে ১৩৫০-এর মন্বন্তরের ছবি ফুটে উঠেছে। মানুষের দুর্বিসহ জীবনাকাঙ্ক্ষা, নারীর জীবনের অসহায়তা, লোভের বশবর্তী হয়ে ভুল পথে পরিচালিত হওয়া --সব কিছুই গঙ্গামণি চরিত্রের মাধ্যমে রূপ পেয়েছে। ‘ইদুর’, ‘বরফ সাহেবের মেয়ে’ গল্পেও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, বেকারত্ব প্রভৃতি সামাজিক সমস্যার প্রতি আলোকপাত করেছেন লেখক, এবং এর মাধ্যমে মানুষের অসহায় জীবনচিত্র প্রকাশ পেয়েছে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-১৯৫৬) বিমল করের অগ্রজ সাহিত্যিক, যার রচনায় সমকালের ঘটনা যেমন প্রকাশ পেয়েছে, তেমনি প্রকাশিত হয়েছে মানবের অন্তর-জগতের রহস্যময়তা। কল্লোলের সমকালে তিনি সাহিত্য রচনা করলেও তিনি তাঁর যুক্তিবাদের সাথে কল্লোল গোষ্ঠীর সাহিত্যিকদের জীবনদর্শনকে মেলাতে পারেন নি। ছেলেবেলা থেকেই ‘কেন’ শব্দটির পেছনে ঘুরে ঘুরে সাহিত্যের মধ্যেও খুঁজে পেতে চেয়েছেন সেই বিচারবোধ ও বাস্তব পরম্পরা। তিনি চেয়েছেন সেখানে ভাবুকতা যেমন থাকবে তেমনি থাকবে বাস্তবতা, প্রেম যেমন থাকবে, তেমনি থাকবে তার সংহত দর্শন। তাই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর কথাসাহিত্যে ফুটিয়ে তুললেন বাস্তব মানুষের প্রকৃত ছবি, যার মধ্যে অহেতুক কল্পনাপ্রবণতা নেই। “আমি নিজে ভাবপ্রবণ, অথচ ভাবপ্রবণতার নানা অভিব্যক্তিকে ন্যাকামি বলে চিনে ঘৃণা করতে আরম্ভ করেছি।”^{১৬} -- লেখক দাবি করেছেন, একারণেই নর-নারীর প্রেমের জটিল রূপ যা একান্ত ভাবেই বাস্তব তা

প্রাঞ্জলভাবে তুলে ধরেছেন তাঁর সাহিত্যে। ‘প্রাগৈতিহাসিক’ গল্পে তাই ভিখু ও পাঁচি ভিখারী হয়েও মানুষ, তাদেরও ক্ষুধা নিবৃত্তির পাশাপাশি অন্যান্য জৈব ক্ষুধার আলোড়ন তাদেরকে ভিতর থেকে নাড়া দেয়। হৃদয়গ্নিত প্রেমের পাশাপাশি দেহগ্নিত প্রেম যে বাস্তব তার উল্লেখ কোন দ্বিধা নেই এই সব ছোটগল্প ও উপন্যাসে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে ধনী মানুষদের পাশাপাশি হঠাৎ অর্থলাভ করে কিছু মধ্যবিত্তের মনেও যে ভডামি, হিংসা, যৌনবিকৃতি, স্বৈচ্ছাচারিতা, স্বার্থপরতা দেখা গিয়েছিল তার প্রমাণ তাঁর গল্পগুলি। মানুষের মনোবাজ্যে হানা দিয়ে তিনি যেন প্রকৃত আকাঙ্ক্ষা ও বাস্তবের ছবিকে তাঁর ফটোগ্রাফিক নিপুণতায় খুঁজে পেয়েছেন। সর্পিল, মহাকালের জটর জট, কুষ্ঠরোগীর বউ, চুরি, সরীসৃপ প্রভৃতি গল্পে নর-নারীর মগ্নচেতন্য থেকে উদ্ভূত মানসিক বিকৃতির আভাস তার গল্পগুলিকে নতুনত্ব দিয়েছে।

‘আত্মহত্যার অধিকার’ গল্পে স্ত্রী নিভার অনুরোধ উপেক্ষা করেও নীলমণি প্রবল বৃষ্টিতে সংসারের সদস্যদের নিয়ে নিরাপত্তার জন্য সরকারদের বাড়িতে আশ্রয় ভিক্ষা করতে যায়নি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আত্মসম্মান বলি দিয়ে সাহায্য কামনা করেছে সরকারদের কাছে। এই অসহায় জীবনে তার মনে হয়েছে, “জীবনে লজ্জা, দুঃখ, রোগ, মৃত্যু, শোকের তো অভাব নাই। মন খারাপ হইবার কারণ জাগিয়া থাকার প্রত্যেকটি মুহূর্তে এবং ঘুমের সময় দুঃস্বপ্নে।”^{১৭} নীলমণি এই পরাজিত জীবনে আত্মহত্যার পিছনে কোন অযৌক্তিকতা খুঁজে পায়নি। দারিদ্র্য-জরা-ব্যাধির মধ্য দিয়ে নৈরাশ্যবোধের শেষ সীমায় সে পৌঁছে গেছে। যেখানে মনে হয় না-- ‘জীবন অমূল্য’। ‘সমুদ্রের স্বাদ’ গল্পে নারীর অপ্রাপ্তির বেদনা তার অশ্রুজলে সমুদ্রের নোনতা স্বাদ এনে দেয়। ‘আপিম’ গল্পে দুঃখ, যন্ত্রণা ভোলার জন্য নেশার প্রবৃত্তি মানুষের কাছে নতুনত্বের স্বাদ বহন করে আনে। আবার ‘ফাঁসি’ গল্পে লক্ষ্য করা যায় লোকনিন্দা ও জীবনের প্রতি অশ্রদ্ধায় আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে চরিত্রটি। এই গল্পে গণপতি অভিযুক্ত আসামী। তার বিরুদ্ধে নরহত্যার মতো অভিযোগ রয়েছে। দীর্ঘদিন পর বিচারে সে মুক্তি পেয়ে জেল থেকে ঘরে ফিরে এলে তার স্ত্রী রমার মনে সংশয় থেকে যায়। সে স্বামীকে প্রস্তাব দেয় চেনা-জগৎ থেকে অন্য কোথাও গিয়ে ঘর বাঁধার জন্য। কিন্তু গণপতি এই প্রস্তাবের পিছনে ভীকৃতার প্রকাশ লক্ষ্য করে এবং তা মেনে নিতে অস্বীকৃত হয়। বাইরের লোকের বিদ্রূপাত্মক আলোচনার প্রতি লজ্জাবোধ এবং স্বামীকে ক্ষমা না করতে পারার দুর্বলতা তার মনে জাগিয়ে তুলেছে আত্মহত্যার ইচ্ছা। সে আত্মহত্যার মধ্য দিয়ে

তার স্বামীর প্রতি বিরূপ মানসিকতা প্রকাশ করেছে। খুনের আসামী স্বামীর সাথে পরিচিত জগতে একই ছাঁদের তলায় থাকতে না চাওয়ার প্রতিবাদে তার এই আত্মহত্যার প্রবৃত্তি দেখা গিয়েছে।

বিমল করের ‘হেমঙ্গের ঘরবাড়ি’ গল্পে হেমঙ্গ তার পূর্বতন স্ত্রীর ফিরে আসার পর আত্মহত্যার মাধ্যমে জীবনের পরিণতি ঘটিয়েছে। পায়রা পৌড়ত্বের দ্বারপাশে তার মেয়েকে নিয়ে ফিরে এসেছে হেমঙ্গের কাছে। তার সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক আবার গড়ে তোলার চেষ্টা করেছে, কিন্তু হেমঙ্গ নিভূতে কাঁচের শিশির ভাঙা অংশ দিয়ে নিজের গলার নলি কেটে এই জীবনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হেনেছে। রমা এবং হেমঙ্গের পরিস্থিতি ও ভাবনার বৈচিত্র্য থাকলেও অন্তর্দ্বন্দ্বের ক্ষতবিক্ষত দুটি মানুষকে আবিষ্কার করা যায় এই দুটি গল্পে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘নমুনা’, ‘নেড়ী’, ‘আজ কাল পরশুর গল্প’ প্রভৃতি গল্পে মনুষ্য-বিশ্বস্ত, যুদ্ধ পরবর্তী সমাজ জীবনের দুঃসহ কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। আর্থসামাজিক জীবনের ঘোর অনিশ্চয়তা মানুষের নীতিচ্যুতনা, মূল্যবোধকে বিশ্বস্ত করে তুলেছে। নারীর প্রতি ষড়যন্ত্র, নারী ব্যবসার কদর্য রূপ এই গল্পগুলির বিষয়। ‘নমুনা’ গল্পে কালাচাঁদ শৈলকে দেহব্যবসার কাজে লাগানোর উদ্দেশ্য নিয়ে তাকে বিয়ে করে। শৈলর বাবা কেদার চক্রবর্তী মেয়েকে পাত্রস্থ করার দায়ে এবং দারিদ্র্যের কারণে জেনে শুনেই এমন পাত্রের হাতে মেয়েকে তুলে দিয়েছে। বিয়ের পর সুস্থ ভালবাসার কারণে প্রাথমিক পর্যায়ে কালাচাঁদ শৈলকে দেহব্যবসায় নামাতে রাজি হয় না, তার মনে অন্তর্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। কিন্তু এই ব্যবসায় তার সহযোগিনী মন্দোদরী যখন চাল ব্যবসায়ী গজেনের কাছ থেকে পাওয়া নোটের একটা বাড়িল কালাচাঁদের হাতে বাড়িয়ে দেয়, কালাচাঁদ তখন সমস্ত মূল্যবোধ হারিয়ে ফেলো। খরিদারের পছন্দ অনুযায়ী গ্রামের কুমারী মেয়ে তুলে দিতে পেরেছে বলে স্বস্তি অনুভব করে। ‘আজ কাল পরশুর গল্প’তে দেখা যায় ঘনশ্যাম, গোকুলের মত সমাজপতিরা নারী-ব্যবসার জন্য গ্রামের মেয়েদের বেশ্যাবাড়িতে চালান করে। গিরিবালা তাদের শিকার। আবার স্বামী রামপদর নিরুদ্দেশ হওয়ার কারণে ও সন্তানের মৃত্যুতে অসহায় দারিদ্র্য ক্লিষ্ট, অবস্থায় মুক্তা নিজের শরীর বেচে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে বাধ্য হয়। এর পর রামপদ ফিরে আসে এবং সমাজসেবিকার হাত ধরে মুক্তা কিংবা গিরিবালারা সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে ফিরতে চাইলে ঘনশ্যামের মত সমাজপতিরাই বিরুদ্ধাচরণ করে, অবশেষে সুস্থ জীবনে ফিরে আসতে পারে নির্যাতিত এই মেয়েরা। ‘নেড়ী’ গল্পেও হৃদয়পন্ডিত নারীপাচার কাজে নিযুক্ত

হয়েছে। তার অর্থ দিয়ে নিজেদের সুখ শান্তিকে সুদৃঢ় করার প্রক্রিয়ায় মনের মধ্যে মূল্যবোধের শূন্যতাকে দ্যোতিত করে।

বিমল করের ‘আঙুরলতা’ গল্পে নন্দ এমনিভাবে আঙুরলতাকে পৌঁছে দিয়েছিল বেশ্যালয়ে। আঙুরের জীবনের সমস্ত স্বাদ-আহ্লাদ এই নন্দের হৃদয়হীনতার মাধ্যমে শেষ হয়ে গিয়েছিল। আঙুরলতা আর স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে না পারলেও, নন্দের মৃত্যুর পর তার পারলৌকিক কাজের মধ্য দিয়ে যে সংগ্রামে সে ব্রতী হয়েছিল, সেখানে মানবিকতার অতুলনীয় দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করতে পেরেছে।

অকারণ যৌনতা বা মানস বিকৃতি নয় মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্তের চূড়ান্ত মানসিক অস্থিরতা ও জটিলতা যাকে কল্পনার মুখোশে লুকিয়ে রাখা যায় না, যার প্রকাশের মাধ্যমে মানুষের প্রকৃত আদিম স্বরূপটিকে চিনে নেওয়া যায় লেখক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাই দ্বিধাহীনভাবে প্রকাশ করেছেন। কিন্তু শুধু মানুষের নৈরাশ্যের চিত্র দিয়েই তিনি স্ফাঙ্গ থাকেন নি, তার মূলানুসন্ধানেও তৎপর হয়েছেন। অর্থনৈতিক অসাম্যে ও অর্থনৈতিক ও সামাজিক দিক দিয়ে সাংঘাতিকভাবে বিপর্যস্ত মানুষ -- যখন গভীর নাস্তিকতায় নিমজ্জিত হয়ে যায় তখনই তার মধ্যে অবচেতনের ক্রিয়া শুরু হয়। এই স্থান থেকে সমাজকে বাঁচানোর লক্ষ্যে সাম্যবাদী ভাবনার প্রতিও তিনি আকৃষ্ট হন। তবু তার প্রভাব সাহিত্যে তেমন ভাবে প্রতিফলিত না হলেও জীবনজিজ্ঞাসার আলোকে মানুষের জীবনকে ও চরিত্রকে তিনি যেমনভাবে ব্যবচ্ছেদ ও বিশ্লেষণ করেছেন তা পরবর্তীকালেও বহুক্ষেত্রে অনুসৃত হয়েছে।

বিমল করের গল্পে মানুষের মগ্নচেতনের যে স্বরূপ প্রকাশিত হয় তা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছ থেকে প্রাপ্ত যুগের বৈশিষ্ট্যের অনুসারী। আত্মমগ্নতা, নারী-পুরুষের সম্পর্কের টানাপোড়েন, বিশ্বাসবোধের অবক্ষয়, আবার তাকে ফিরে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা, মানসিক জটিলতা, যৌন সমস্যা, সমকাল চেতনা -- এই সমস্ত বৈশিষ্ট্য বিমল করের গল্পেও প্রকাশিত হয়েছে তৎকালীন সাহিত্যের গতি প্রকৃতির নিরিখে।

সুবোধ ঘোষ (১৯১০-১৯৮০) বিমল করের সমকালীন গল্প লেখক। কল্লোল পরবর্তী কালের সাহিত্য-বৈশিষ্ট্য ও সমাজ চিত্র তাঁর গল্পে প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর গল্পে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমকালীন চিত্র, মানুষের জীবনের নানা বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। শ্রমজীবী মানুষ, নিপীড়িত নারীসমাজ তাঁর গল্পের প্রধান অবলম্বন। তাঁর কয়েকটি রচনায় গান্ধীবাদের প্রতি দুর্বলতা ও

কমিউনিস্টদের প্রতি অবহেলা প্রদর্শিত হলেও, পরবর্তী কালে সেই বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয়নি। ভারতীয় ধর্ম ও দর্শনের প্রতি যেমন তাঁর বিশ্বাস ছিল, তেমনি সমকালীন পরিস্থিতিতে বিশেষত পরিবার জীবনের ভাঙন, দাম্পত্য জীবনের মধ্যে কলুষতা তিনি উপলব্ধি করে ছিলেন। সমকালীন পরিপ্রেক্ষিতে ঘটে চলা সমাজ ও মানুষের নানা বৈচিত্র্য তিনি ছোটগল্পে ফুটিয়ে তুলেছেন। মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর গল্পে সার্বিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা, স্বাধীনতা আন্দোলন, স্বাধীনতা প্রাপ্তি, স্বাধীনতা পরবর্তী মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, নিরাশার অন্ধকারে ডুবে যাওয়ার চিত্র যেমন তিনি দেখেছেন, তেমনি শেষ জীবনে শূন্যতার দ্বারা আক্রান্ত হয়ে আত্ম গবেষণার মধ্যে আশ্রয় নিয়েছেন; সন্ধান করেছেন প্রকৃতি ও পশু জগতের সারল্যের সঙ্গে মানব জীবনের সম্বন্ধসূত্র। “ব্যক্তি জীবনই তাঁর গল্পের মুখ্য বিষয় তাই ব্যক্তি-জীবনের নেপথ্যে তার চেতনাজগৎ এবং সেই জগতে নানা ঘটনার প্রক্ষেপ ও তার মূল্যায়ন এবং ব্যক্তি মানুষের চেতনালোকে মূল্যবোধের উদ্ভাসন, মূল্যবোধের রূপান্তর, মূল্যবোধের সংকট, মূল্যবোধের উত্তরণ প্রভৃতি পর্যায় প্রতিভাত হয়।”^{১৮}

সুবোধ ঘোষের ‘পরশুরামের কুঠার’ গল্পে অন্ত্যজ শ্রেণীর মেয়ে ধনিয়া দারিদ্র্যের কারণে নিজের বুকের দুধ খাইয়ে অভিজাত ঘরের সন্তানদের বাঁচিয়েছে, এবং নিজের দেহব্যবসার ফলে লভ্য সন্তানকে ফেলে এসেছে মিশন জেনানা হাসপাতালে। কিন্তু তার এই স্বার্থত্যাগের দান সভ্য সমাজ মনে রাখেনি। তার বয়স বাড়ার সাথে সাথে তার গ্রহণযোগ্যতা কমে যায়। সমাজের চেহারাও ধীরে ধীরে পাল্টাতে থাকে। “বছরের পর বছর ঘুরে গেছে... পাঁচ সাত দশ বারো ষোল আঠারো -- বছরের পর বছর ভেসে গেছে ধনিয়া প্রায় চল্লিশ বছরে পা দিলা।”^{১৯} নয়াবাদ মিউনিসিপ্যালিটি নতুন টাউনকে বাড়াতে চেয়েছে, যেখানে ধনিয়ার স্থান হয়েছে পতিতালয়ে। সুস্থভাবে জীবনের আশ্রয় লাভ করতে পারেনি ধনিয়া, সমাজই তাকে পতিতাবৃত্তি অবলম্বন করতে বাধ্য করেছে।

বিমল করের ‘বুদবুদ’ গল্পে স্কুলের শেষ ক্লাস পর্যন্ত পড়া বেলা মনডিয়াল জীবনে প্রত্যাশা করেছিল সভ্য মানুষের মতো বেঁচে থাকার, কিন্তু সে ব্যর্থ হয়েছিল। বিদেশী সৈন্যরা তার জীবনে ধর্ষণের মাধ্যমে যে অদৃশ্য কলঙ্ক-চিহ্ন ঐকে দিয়েছিল, তার জেরেই সে ঠাই পেলনা ভদ্রমানুষের সংসারে। পতিতাবৃত্তির মাঝে কয়েকটি মাস পঞ্চজ বোসের মতো ভদ্র লোকের আনুকূল্য লাভ করেছিল বটে, কিন্তু যখনই পঞ্চজ বোস বেলার অনালোকিত জীবন কাহিনী শুনলেন তারপর তার

প্রতি আর উদারতা প্রশয় পেল না। বেলা জীবনের শেষে উন্মাদের মত দিন কাটিয়েছিল। ভদ্র সমাজ স্বপ্নদর্শী এই মানুষদের জীবনকে গভীর অন্ধকারে নিষ্কেপ করেছে। নারী-জীবনের অসহায়তা সুবোধ ঘোষের গল্পের মত বিমল করের গল্পেও প্রকাশ পেয়েছে।

বিমল কর তাঁর সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে অগ্রজ সুবোধ ঘোষের প্রভাব মেনে নিয়েছিলেন। তিনি বলেছেন, “সুবোধদা প্রবাসী বাঙালি, গুর কৈশোর-যৌবনকাল অনেকটা বিহারেই কেটেছে, আর আমিও তো মোটামুটি ভাবে বিহারে মানুষ, আমাদের পরিবেশটা একই রকমের ছিল। শুধু পরিবেশ নয়, বাঙলার বাইরে বাঙালিদের যে ধরনের সামাজিক কাঠামো, আচার আচরণ, বাঙালি-অবাঙালি সমাজের মিশ্র পরিবেশ ইত্যাদি থাকে, তারও একটা মিল আমাদের দুজনের লেখায়। আর তা ছাড়া, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে ও পরবর্তীকালে যদি গল্পকার সুবোধ ঘোষের কথা ভাবা যায়,... তিনি এমন একজন শক্তিমান ও প্রভাববিস্তারী লেখক যে, নতুন গল্পকারদের মধ্যে তাঁর প্রভাব কাটিয়ে ওঠা খুব মুশকিল ছিল। কাজেই, আমি মনে করি না, এই প্রভাবে আমার কোনও লজ্জা আছে।”^{২০}

সুবোধ ঘোষের ‘ফসিল’ গল্প দেখানো হয়েছে নেটিভ স্টেট অঞ্জনগড়ের শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন ঘটলেও কুর্মি সম্প্রদায়ের মানুষদের নির্যাতিত জীবনের কোন পরিবর্তন হয় না। অঞ্জনগড়ের রাজার কাছে কুর্মিরা ন্যায় পাওনা দাবি করে, বিনা পারিশ্রমিকে বেগার পরিশ্রম করতে রাজি হয় না। তাদের কাছে আর্থিক সুযোগ নিয়ে আসে বণিকতন্ত্র। রাজার লাঠির হাত থেকে নিজেদের বাঁচাতে পেরে কুর্মিরা কৃষক থেকে শ্রমিকে রূপান্তরিত হয়ে যায়। আদর্শবাদী তরুণ দরবারের ল-এজেন্ট মিঃ মুখার্জী মাটির নীচে অভ্র ও অ্যাসবেস্টসের খনি আবিষ্কার করার পর বণিকতন্ত্রের উন্মাদনা শুরু হয়। কুর্মিরা টাকার বিনিময়ে কাজের সুযোগ পায়। তারা ধীরে ধীরে বণিকতন্ত্রের শোষণের দ্বারা তাদের হাতের পুতুলে রূপান্তরিত হয়ে যায়। মরিশাস থেকে ফিরে আসা দুলাল মাহাতো এই শ্রমিকদের নেতা হয়ে ওঠে। রাজতন্ত্র ও বণিকতন্ত্রের মধ্যে ক্ষমতা দখলের দ্বন্দ্ব এই সময় হঠাৎ থেমে যায়। কারণ চৌদ্দ নম্বর পিট ধসে গিয়ে নব্বই জন কুলি-কামিন চাপা পড়ে। এতে যেমন সিডিকেট কোণঠাসা হয়ে পড়েছে, তেমনি ফৌজের গুলিতে বাইশ জন শ্রমিক গাছ কাটার অপরাধে মারা যাওয়ায় মহারাজাও কোণঠাসা হয়ে পড়েছে। অবশেষে মিঃ মুখার্জীর তত্ত্বাবধানে সিডিকেট ও রাজার মধ্যে আঁতাত তৈরি হয়েছে এবং শ্রমিক নেতা দুলাল মাহাতো খুন হয়েছে। দুলাল মাহাতো ও কুর্মিরা শাসনতন্ত্রের শিকার, আর সিডিকেট বা রাজা

শোষণকারী হয়ে উঠেছে এখানে। মিঃ মুখার্জী অবশেষে মূল্যবোধ হারিয়ে বিদ্রোহের পথ ছেড়ে শাসকতন্ত্রের সদস্য হয়ে উঠেছে। মধ্যবিত্তের মূল্যবোধের অবক্ষয়, শ্রমিক শ্রেণীর অত্যাচারী শাসক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হতে না পারা এবং তার ফলে তাদের জীবনে মৃত্যুর করাল গ্রাস নেমে আসার ছবি এখানে বর্ণিত।

বিমল করের ‘যক্ষ’ গল্পেও শ্রমিকদের জীবনের অসহায়তা বর্ণিত হয়েছে। চৌবেরডি সেকশনের রেলপথ নির্মাণের জন্য ডিনামাইট দিয়ে পাথর ফাটানোর কাজ চলেছে। মিঃ গিবসনের অফিসে কর্মরত ভরত চৌধুরী এই কাজে নিযুক্ত হলেও বিদেশী শাসনযন্ত্রের হাত থেকে আর্যাবর্তের মহিমাকে সে খুন হতে দিতে চায় না। তবুও মনের দুঃখে সেই কাজেই তাকে ব্রতী হতে হয়। এই অঞ্চলের প্রায় সকল আদিবাসী সম্প্রদায়ের শ্রমিকদের কাজের সুযোগ দেওয়ায় মাধো রায়ের গাছ কাটার জন্য পুরুষ শ্রমিকদের টান পড়ে। মাধো রায় তার স্বজাত্যবোধকে প্রকাশ করায় ভরত চৌধুরীর যন্ত্রণাদগ্ধ উক্তি প্রকাশিত হয়, “মাধোজি, এ দেশ তোমার নয় শুধু আমারও! কিন্তু এখন না তোমার না আমার।”^{২১} মাধো রায় কুসংস্কারের ভয় দেখিয়ে শ্রমিকদের নিজের দিকে টানলেও একটা সময় বন্যাবিশ্রুত মানুষেরা নিরাপত্তার স্বার্থে কোম্পানীর হয়েই কাজ করতে শুরু করে, মাধো রায় হয়ে ওঠে তাদের নেতা। ভরত চৌধুরী ফ্যাভরে কোম্পানীর কাজ শ্রমিকের অভাবে থেমে যাওয়ায় যে মানসিক আনন্দ পেয়েছিল, আবার শ্রমিকেরা ফিরে আসায় তার মধ্যে যন্ত্রণার বহিঃপ্রকাশ লক্ষ্য করা গেল। ক্রমাগত ঘটে চলা দুর্ঘটনাগ্রস্ত শ্রমিকদের জীবনের পরিসমাপ্তি তার মনে হতাশার সৃষ্টি করেছিল। এই পথে ধ্বংসের উন্মাদনায় সে একদিন নিজেকেই শেষ করে ফেলল। --এই গল্পে ভরত চৌধুরী আর্যাবর্তের কালচারকে বাঁচাতে চেয়েছে। সে ভেবেছে, “একটা মৃত সভ্যতাকে আর বাঁচানো যায় না; তবে চেষ্টা করলে শেষ পর্যন্ত এখনও ক্ষীণ ধারায় যেটুকু টিকে আছে, তাকে হয়তো বাঁচিয়ে রাখা যায়।”^{২২} অন্তর্দ্বন্দ্বের দ্ব্যর্থবোধক, আর্যাবর্তের মহিমায় আচ্ছন্ন অথচ হতাশাগ্রস্ত ভরত চৌধুরী তার জীবনের মাধ্যমে যেন যান্ত্রিক সভ্যতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হেনে গেছে।

ব্যক্তির অর্থনৈতিক অবস্থানও শ্রেণীগত অবস্থানই আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে তাকে শ্রদ্ধা কিংবা অশ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত করে --এই বিষয়ের উপর গড়ে উঠেছে সুবোধ ঘোষের ‘তিন অধ্যায়’ গল্পটি। ভবানী, বারীণ, সতু, শশীর মত শিক্ষিত কমহীন যুবকেরা কিংবা ভবানীর কাকা, মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যানের মত প্রৌঢ় মানুষেরা অহি, বন্দনা, কিংবা পুলিন বাবুর শ্রমভিত্তিক

জীবনের উপর তাদের সামাজিক মর্যাদা দেওয়ার চেষ্টা করে। এ্যাসিস্টেন্ট কনজারভেন্সী সুপারভাইজার পদ থেকে সর্দার স্ক্যাভেন্জার পদের পরিবর্তনে অহি সুখী হয় না যেমন, তেমনি সমাজও তাকে গুরুত্ব দিতে চায় না। বন্দনা হাসপাতালের নার্স হওয়ায় তার সামাজিক প্রতিপত্তি কমে। আর পুলিন বাঁড়ুজ্যে জুতোর দোকান করায় ‘পুলিন চামার’এ পরিণত হয়। পুলিন বাবু প্রথমে দোকান ও মুচিদের বসার জায়গায় মাঝখানে একটা পর্দা ঝোলালেও পরে খুলে ফেলেছেন। ভদ্র সমাজের মানুষদের কাছে এঁদের বৃত্তি নিন্দনীয় হয়ে উঠেছে। তারা মনে করেছে “সব ভদ্রমানার সংস্কার অমান্য করে সমাজের স্বীকৃতি-অস্বীকৃতির তোয়াক্কা না করে, রুচি-অরুচির বালাই না রেখে, শুধু কাজ আর পয়সাকে শ্রেষ্ঠ করে তোলা মানুষের লক্ষণ নয়! এঁকে জীবিকা অর্জন বলে না, এটা হলো জীবনকে বিকিয়ে দেওয়া।”^{২০} এই কারণেই ফোর্থক্লাস পর্যন্ত একসাথে পড়া অহিকে বন্ধুত্বের মর্যাদায় বাঁধতে চায় না ভবানীরা। বন্দনার মত মেয়েদের কুৎসা গায় পঞ্চমুখো। শুধু তাই নয়, তাদের একাধিক বিয়ের সম্বন্ধ নিজেরা ব্যক্তিগত উদ্যোগে ভেঙে দিয়ে মনে করে সমাজ শোধনের কাজে তারা ব্রতী হতে পেরেছে। কিন্তু অহি ও বন্দনার বিয়ে যখন কোন ভাবেই তারা ভাঙতে পারেনি, তখন সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে তাকেই সাফল্য মণ্ডিত করে তুলেছে। মধ্যবিত্ত যুবকদের হৃদয়ের এই অন্তঃসারশূন্যতা, কদর্য মানসিকতা এই গল্পের প্রধান অবলম্বন।

বিমল করের ‘বরফ সাহেবের মেয়ে’ গল্পে তিনু বীরু, পাঁচু-রা তাদের বাল্যসঙ্গিনী জিনির কাছে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে না পারলেও তাদের সন্দেহপ্রবণতা, লোভী মানসিকতার দ্বারা জিনির জীবনকে ক্ষতবিক্ষত করেছে। তার বিরুদ্ধে সরব হয়ে সিনেমা হলের চাকরি থেকে জিনিকে বরখাস্ত করেছে। জিনির প্রেমিক মনে করে সুখেনকে আক্রমণ করেছে এমন কি পরবর্তীকালে বাল্যবন্ধু আলুওয়ালা নন্দকে মেরে জিনির হাতে সেবা-শুশ্রূষার জন্য দিয়ে এসেছে। আলুওয়ালা বলে নন্দকে যেমন তারা বন্ধুত্বের মর্যাদা দেয় নি, তেমনি জিনিকেও সামাজিক স্বীকৃতি থেকে বঞ্চিত করেছে। অবশেষে তাদের বিয়েতে সাক্ষী হতে গিয়ে প্রতিবাদী ভূমিকা নিয়ে পালিয়ে এসেও সকলকে লুকিয়ে জিনি এবং নন্দর পরিণতি দেখার জন্য চুপিসারে হাজির হয়েছে। ‘তিন অধ্যায়’ ও ‘বরফ সাহেবের মেয়ে’ দুটি গল্পেও আর্থিক ও বৃত্তিগত প্রভেদের কারণে নির্যাতিত হতে হয়েছে নিম্নশ্রেণীদের। ‘বরফ সাহেবের মেয়ে’তে যুক্ত হয়েছে ধর্ম বা জাতিগত প্রভেদ।

‘চোখ গেল’, ‘ঐশ্বরিক’, ‘মানস্কলা’ প্রভৃতি গল্পে মানবিক মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশিত হয়েছে। ‘চোখ গেল’ গল্পে অপরাজিতা আত্মকেন্দ্রিকতা, সুখভোগের আকাঙ্ক্ষায় আবদ্ধ থেকে হিরণ্যয়ের অন্ধত্বকে বড় করে দেখে তার প্রেমিক সত্তাকে বিশ্বাস করতে পারেনি। কিংশুকের কাছে ফিরে যাবার বাসনা পোষণ করেছে, কিন্তু অবশেষে হিরণ্যয়ের অনুভব শক্তির তীব্রতা, ভালবাসার মত সহানুভূতিশীল মনের পরিচয় পেয়ে মানবিক মূল্যবোধে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছে। ‘ঐশ্বরিক’ গল্পে খুনি আসামীও সাধারণ মানুষের দ্বারা তার প্রতি প্রদত্ত সম্মানের প্রতি অন্যায় বিচার করেনি। অসুস্থ শিশুর জন্য মঙ্গল কামনায় তার চোখেও এসে গেছে মানবিকতায় আর্দ্র অশ্রু। সুবোধ ঘোষের ‘তিলাজলি’ উপন্যাসেও যে আদর্শবাদী ভাবনা, মূল্যবোধের প্রতি দুর্বলতা প্রকাশিত হয়েছিল সেই আদর্শ বিমল করের রচনায় যথেষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়। মানুষের অন্তর্জগতের দ্বন্দ্বমূলকতা বিমল কর যে উত্তরাধিকার সূত্রে কিছুটা তাঁর কাছ থেকেও লাভ করেছিলেন, তাও উল্লেখ করা যায়।

বিমল করের সমকালীন গল্পকার হিসেবে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী’র (১৯১২-১৯৮৩) নাম উল্লেখ করা যায়। তিনি তাঁর সময়কালে, বিশেষত চল্লিশের দশক থেকে গল্প রচনার মাধ্যমে তাঁর জীবনদৃষ্টি ও সমাজের প্রতি ভাবনাকে প্রকাশ করেছিলেন। নিম্নমধ্যবিত্ত, মধ্যবিত্ত মানুষদের জীবনচিত্র অঙ্কনে তিনি ছিলেন সিক্কহস্ত। খেটে খাওয়া অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষও তাঁর গল্পে দুর্লক্ষ্য নয়। প্রকৃতি তাঁর গল্পে বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে ফুটে উঠেছে। “প্রকৃতি-নির্ভর গল্প রচনায় জ্যোতিরিন্দ্র যে বাংলা সাহিত্যে একটি বিশেষ মর্যাদার আসন দাবি করতে পারেন, তার প্রধান কারণ লেখকের ইন্দ্রিয় সচেতনতা। তিনি আজীবন প্রকৃতির রূপ রস শব্দ ও গন্ধের মধ্যে আদ্যন্ত নিমজ্জিত ছিলেন।”^{২৪} বিমল কর শহর কিংবা মফঃস্বল জীবনের চিত্রকর হলেও তাঁর গল্পে প্রকৃতিবর্ণনা বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে ফুটে উঠেছে। প্রকৃতি মানব জীবনের বিশেষ পরিস্থিতিতে প্রতীকের মর্যাদা নিয়ে উপস্থিত হয়েছে, ব্যঙ্গনার মাধ্যমে তৎকালীন পরিবেশকে গভীর ইঙ্গিতময়তায় আচ্ছন্ন করেছে। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী গ্রামের পাশাপাশি শহরের ছবিও ঐঁকেছেন। এবং অধিকাংশ গল্পেই তাঁর নাগরিক জীবনের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে। “তিনি নাগরিক জীবনের কথাবার। নগর-জীবনে ধনী, উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত এবং দরিদ্র শ্রেণীর পার্থক্যটা বড় করেই চোখে পড়ে। আর এই শ্রেণী বৈষম্য একটা বড় সামাজিক-রাষ্ট্রনৈতিক-অর্থনৈতিক আঘাতের ফলে বড় হয়ে দেখা দেয়। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী তাঁর লেখক জীবনের প্রথম থেকেই সেই শ্রেণীর বিষম

অবস্থার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেছিলেন।”^{২৫} --তঁার ছোটগল্পে এই বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে। এছাড়াও তঁার গল্পে মানব মনের অন্তর্জগতের ছবি আঁকার প্রয়াস লক্ষিত হয়, যে বৈশিষ্ট্য তাঁকে স্বাধীনতা পরবর্তী ছোটগল্পকারদের কাছে অনুকরণীয় করে তুলেছিল। “জ্যোতিরিন্দ্র তথাকথিত বাস্তববাদী লেখক নন। তার চেয়ে কিছু বেশি। আসলে তিনি অন্তর্লোক উন্মোচনকারী শিল্পী, সৌন্দর্যবাদী। সৌন্দর্যের সামগ্রিকতা ও ব্যক্তি নিরপেক্ষতায় তঁার আগ্রহ আছে।”^{২৬}

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর ‘শালিক কি চড়ুই’, ‘মঙ্গল গ্রহ’ প্রভৃতি গল্পে প্রকৃতি প্রতীকধর্মিতায় উদ্ভাসিত। এর সাথে রয়েছে মনস্তত্ত্বের গূঢ় জটিলতা। ‘শালিক কি চড়ুই’ গল্পে সাধারণ কেরানি তারাপদর সঙ্গে অবস্থাপন্ন বাড়ির মেয়ে শানুর বিয়ে হয়েছিল। বিত্তগত পার্থক্যের কারণে তারাপদ শানুকে হাবেভাবে তার কৃতজ্ঞতা জানিয়ে দেয়। তারা দাম্পত্য জীবনে সুখী হলেও অফিসের বন্ধুরা তারাপদর মনে নানাভাবে সন্দেহের বীজ বুনে দিতে চায়। একদিন শানুর দ্বিপ্রাহরিক নিঃসঙ্গতা ঘোচানোর জন্য তারাপদ অফিস থেকে ফিরে আসে। মনে মনে কল্পনা করে শানু হয়তো তার বাবার বাড়ির মতো এখানেও চড়ুইদের নিয়ে দুপুর বেলাটা কাটাচ্ছে। কিন্তু বাড়িতে ঢোকার সময় দেখতে পায় শানুর বিবাহপূর্ব জীবনের প্রেমিক বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। চড়ুই নেই, একটা শালিক দূরে পাঁচিলের উপর দাঁড়িয়ে আছে। তারাপদ শানুকে যখন শালিক সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল, তখন শানু উত্তর দিয়েছে, ‘সবাই ফিরে যায় রোজ’^{২৭} --এই সবাই’র মধ্যে রয়েছে শানুর প্রণয়প্রার্থীও। কিন্তু বাইরের মানুষের আসা এবং ফিরে যাওয়া শানুর মনে কোন প্রভাব ফেলে না। সে স্বামীর সংসারে তার হৃদয়ের প্রদীপটিকে অস্বাভাবিকভাবে জ্বালিয়ে রাখে। পৈত্রিক সম্পত্তি বা বিশ্বের প্রতি দুর্বলতা দেখিয়ে স্বামীর প্রতি তার কর্তব্যের হানি ঘটায় না। কিন্তু তারাপদর বন্ধু মহলে যে সন্দেহের বীজ রয়েছে তা সম্পূর্ণ মুছে যায় না। তবুও এই গল্পে দাম্পত্যজীবনের সুন্দর শোভন ছবি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

‘কাঠ পিপড়ে’, ‘চন্দ্রমল্লিকা’, ‘পতঙ্গ’, ‘গিরগিটি’ প্রভৃতি গল্পে প্রতীকের ব্যবহার যেমন রয়েছে, তেমনি গল্পগুলির মধ্যে মানুষের অন্তর্লোকের উন্মোচন ঘটানোর প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়।

‘পতঙ্গ’ গল্পে লেখক নাগরিক জীবনে নারীর অধৈর্য প্রেমাকাঙ্ক্ষা ও যৌনচেতনাকে প্রকাশ করেছেন। অধ্যাপক অঞ্জন চক্রবর্তীর স্ত্রী রূপা দাম্পত্য জীবনের শূন্যতাকে পরিপূর্ণ করার প্রত্যাশায় মনে ঠাই দেয় বিকৃত যৌনতার সম্পর্কে। একাধিক পুরুষের সঙ্গে তার সম্পর্ক ঘটানোর প্রবৃত্তি পরিলক্ষিত হয়। এইভাবে পলাশ যখন জানতে পেরেছে রূপা শুধু তার ভোগ্যা

নয়, সে বহুভোগ্য, তখন সে তাকে হত্যা করে। এই হত্যার পিছনে তার সুকুমার প্রেমবোধে কলঙ্কচিহ্ন নিশ্চিহ্ন করার বাসনা প্রতিষ্ঠিত হয়। দাম্পত্য জীবনের এই বিকারগ্রস্ত যৌন-মানসিকতা লেখক সমর্থন করতে পারেননি বলেই পলাশের হাতে তাকে খুন করিয়েছেন। নাগরিক জীবনের অন্তঃসার শূন্যতার ছবির পাশাপাশি এই গল্পে পলাশের চোখে নারীর সৌন্দর্যময় রূপের বর্ণনাও প্রকাশ পেয়েছে।

‘গিরিগিটি’ গল্পেও নারীদেহের সৌন্দর্যের পাশাপাশি জাগতিক সৌন্দর্যবোধের ছবি লক্ষিত হয়। বৃদ্ধ ভুবন মায়ার মানরত অবস্থায় তার দেহ সৌন্দর্যকে লুকিয়ে লুকিয়ে উপভোগ করে। ডালিম গাছের সাথে সে মিলিয়ে ফেলে মায়ার দেহবল্লরীর শোভা। আবার মায়াও কুয়োতলায় প্রজাপতি, গাছ, স্যাওলার মধ্যে প্রকৃতির অনাবিল সৌন্দর্যকে উপভোগ করে। প্রণব এবং মায়ার দাম্পত্য জীবনের মধ্যে ফাটল রয়েছে। মায়া প্রণবের দেখার চোখও আলাদা, তাই মায়া প্রণবকে জাগতিক সৌন্দর্য দেখার আমন্ত্রণ জানায়নি। আবার নিজের দেহের সৌন্দর্য সম্পর্কে সে নিশ্চিত হলেও প্রণবের চোখে তা ধরা পড়েনি বলে হতাশা প্রকাশ করে। ভুবনের দৃষ্টিতে এই গল্পে লেখক কামনা বা যৌনতার সম্পর্ক যুক্ত করেননি। আবার মায়ার মধ্যে যে মূল্যবোধের স্বাক্ষর করেছেন তাও ব্যতিচারে আক্রান্ত নয়। নারীর রূপ প্রকৃতির রূপের সমধর্মী। নিরাসক্ত আর্টিস্টের চোখে তা দেখায় কোন অন্যায় বা পাপ নেই --এই বক্তব্য এখানে প্রতিষ্ঠিত।

বিমল করের ‘পার্ক রোডের সেই বাড়ি’, ‘পলাশ’, ‘সুধাময়’ প্রভৃতি গল্পে প্রকৃতিচেতনা বিশেষ মাত্রা পেয়েছে। ‘শীতের মাঠ’ গল্পের প্রকৃতি নবেন্দুর মনের নিঃসঙ্গতা, ক্লান্তিময়তার সাথে একাত্ম। ‘গগনের অশুখ’ গল্পেও প্রকৃতি চরিত্রের মানসদর্পণ হয়ে উঠেছে। ‘অশুখ’ গল্পে রেণুর মনের দৃষ্টিভঙ্গি ও মানস প্রবণতার সাথে অশুখ গাছ শিশু সন্তানের বৈশিষ্ট্য উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। গাছের মধ্য দিয়ে মানবের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য উপলব্ধির প্রচেষ্টা ‘অশুখ’ গল্পটিকে বিশেষ মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছে।

সমাজের কাছে সত্যভাষণের দায়বদ্ধতা নিয়ে সন্তোষকুমার ঘোষ (১৯২০-১৯৮৫) সাহিত্য রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। বিমল করের সমকালীন এই গল্পকারের রচনায়ও ফুটে উঠেছে নাগরিক জীবনে সমাজ ও ব্যক্তিমনের অবক্ষয়, মূল্যবোধের ক্ষয়িষ্ণুতা, জীবনের প্রতি ক্লান্তি, অবসাদ, বিষণ্ণতা, এবং মৃত্যুচিন্তা। যদিও তিনি বলেছিলেন, “আমি লিখিয়ে হয়েছে স্রেফ এই কারণে যে, আর কিছু হওয়া (ভালো পড়ুয়া, সাব-ডেপুটি বা সাব জজ) আমার পক্ষে অসম্ভব ছিল বলে।

লেখা মানে গল্প লেখা, আসলে একটা আনন্দিদ লেবার (সেই লেবার যা লাভ-এর নয় বলেই বুঝি নেভার লস্ট) যার খুশি সেই বুঝি এই রসুন চৌকিতে এসে পৌঁ ধরতে পারে।’’^{২৮} --তবুও তাঁর গল্পে যে বাস্তব ঘনিষ্ঠতা আছে, মনস্তত্ত্বের জটিল বিশ্লেষণ রয়েছে তা তাঁকে গল্পকার হিসেবে স্বকীয়তা দিয়েছে। “তীক্ষ্মমুখ লেখনীকে সন্তোষ কুমার ব্যবহার করেছেন সমাজের ও ব্যক্তির ব্যবচ্ছেদে ও নির্মম উদ্ঘাটনে। মানব জীবনের প্রতি তাঁর মমতা আছে, ঈষৎ বেদনা ও চাপা বিদূপ-মেশানো সে মমতা। তাঁর গল্পে জীবনাসক্তি মৃত্যুচেতনায় বিধূত। সে মৃত্যু কখনো মোহের অবসান, কখনো প্রতীক্ষার সমাপ্তি, কখনো বা আত্মাবলুপ্তির আশঙ্কা।’’^{২৯}

সন্তোষ কুমার ঘোষের বেশ কিছু গল্পে মানব সম্পর্ক ও দাম্পত্য সম্পর্কের অসারত্ব লক্ষ্য করা যায়। ‘যাদুঘর’, ‘গিল্টি’, ‘পারাবত’, ‘অমিত্রাক্ষর’, ‘সমান্তর’ প্রভৃতি গল্পে এই বৈশিষ্ট্য রয়েছে। ‘যাদুঘর’ গল্পের নায়িকা সুরমা জগদিন্দুর হাত ধরে পালিয়ে গিয়ে ‘অন্নপূর্ণা আশ্রম’ নামে বাঙালি হোটেলে কাজের মেয়ে হিসেবে আত্মনিযুক্ত হয়। পালিয়ে আসার কয়েকদিনের মধ্যেই জগদিন্দুর প্রতি তার মোহ কেটে যায় এবং সে বিষ খাইয়ে জগদিন্দুকে মেরে ফেলতে চায়। বিষের মাত্রা কম থাকায় জগদিন্দু বেঁচে যাওয়ার পর দীর্ঘ কুড়ি বছর ধরে খাদ্যের বিবিক্রিয়া পরীক্ষার জন্য আগে পোষা বিড়ালকে খেতে দিয়ে পরে সে খাবার গ্রহণ করে। শুধু তাই নয় হোটেলের খরিদদারদের কাছে সুরমাকে দেহ বিক্রি করতে বাধ্য করে। একই ছাদের তলায় থাকলেও দুটি নারী-পুরুষের মানসিকতায় তীব্র দূরত্ব বজায় থাকে। মূল্যবোধহীনতার প্রকাশ ঘটেছে এই গল্পে প্রেমজ সম্পর্কের মানুষকে অর্থপার্জনের জন্য দেহ বিক্রয়ে বাধ্য করার মধ্য দিয়ে। সুরমারও মনে হয়েছে, ‘পুরুষ মানুষ, অত্যন্ত স্কল, দৈহিক অর্থে। নইলে জগদিন্দুর আছে কী। না শিক্ষা, না রুচি, না চরিত্র।’’^{৩০}

‘অমিত্রাক্ষর’ দাম্পত্য সম্পর্কের মনস্তাত্ত্বিক জটিলতার গল্প। সীতার মায়ের কূটনৈতিক চালো সীতা ও শিশিরেন্দুর বিয়ে হয়েছিল। ওদের মধ্যে বন্ধুত্ব থাকলেও তারা কেউ বিয়ের জন্য প্রস্তুত ছিল না। একদিন শিশিরেন্দুকে সীতার ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে লোকলজ্জা ও কলঙ্কের মিথ্যা জালে জড়িয়ে দিয়ে তাদের বিয়ে করতে বাধ্য করেছিল সীতার মা। বিয়ে হয়ে গেলেও হীনম্মন্যতার কারণে সীতা নিজেকে শিশিরেন্দুর সাথে মেলাতে পেরেছিল না। ওদের দাম্পত্য সম্পর্কে হিম শীতলতা ও সন্দেহপ্রবণতা বাসা বাঁধতে থাকে।

বিমল করের ‘জানোয়ার’ গল্পে দাম্পত্য প্রেমের ভাঙন তীব্রভাবে লক্ষিত হয়েছে। সুধীবন্ধু সোম ও তার স্ত্রী অতসীর মধ্যে ভালবাসার সম্পর্ক নষ্ট হয়ে গেছে। সুধীবন্ধু চাকরিতে উন্নতির নেশায় সহকর্মীদের সঙ্গেও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখেনি। অপর দিকে ঘরের বন্দী দশা থেকে মুক্তি পেতে চায় অতসী। কিন্তু পার্শ্ববর্তী যে কোন বাড়িতে গেলেই তারা সকলে অতসীকেও এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। সকলে তাকে সুধীবন্ধুর স্পাই বলে ভাবে। স্বামীর অসামাজিক মনোবৃত্তি, সকলকে উপেক্ষা করার মানসিকতা সহ্য করতে পারেনা অতসী। স্বামীর কথা মতো বাহাদুরের কাছে বন্দুক ছোঁড়া শিখতে গিয়ে ক্রমশ দেহ মন সব দিক থেকেই নিজেকে সুধীবন্ধুর কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। দাম্পত্য সম্পর্কের ভাঙন, তীব্র অসন্তোষ, মনের অসহায়তা বোধ এই সকল গল্পের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে।

সন্তোষ কুমার ঘোষের কিছু রূপক গল্প পাওয়া যায়, যার মাধ্যমে লেখক জীবন জিজ্ঞাসার নানা দিক ফুটিয়ে তুলেছেন। ‘অলীক পৌত্তলিক’ গল্পে অলীকাসুর অসুখের হাত থেকে বাঁচার জন্য অমৃতের সন্ধান করেছে। একসময় মায়াময়ী এক নারীকে দেখে তার মনে শিল্পীসত্তা জেগে ওঠে। সেই নারী--দেবীকার মূর্তি বানায় সে, কিন্তু তার সেই নারী সম্পর্কে মোহভঙ্গ ঘটলে তার বানানো মূর্তিও ভেঙে যায়। সে সেই ভাঙা মূর্তিটিই তুলে দেয় দেবীকার হাতে। অলীকাসুরের মাধ্যমে লেখক অতৃপ্ত, অসুখী মানুষের মনের গভীরে জন্য নেওয়া প্রশ্ন ও বাইরের বাস্তবের অমিল দেখিয়ে মানুষেরই ভেঙে পড়া ছবি রূপকের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছেন। ‘শবানুগমন’ গল্পেও মনের নিভূতে মৃত মানুষকে বয়ে নিয়ে যাওয়ার ভাবনাটিকে বাহ্যিক শব্দবহনের নিরন্তর প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে দ্যোতিত করেছেন লেখক।

বিমল কর ‘উপাখ্যান মালা’র পাঁচটি গল্পের মধ্য দিয়ে মানব জীবনের নানা প্রবৃত্তির অন্ধকারকে রূপকের আশ্রয়ে প্রকাশ করেছেন। সন্তোষ কুমার ঘোষের বেশ কিছু গল্পে মৃত্যুবোধে আক্রান্ত মানুষের চিত্র পাওয়া যায়। ‘মুখোশ’, ‘মানুষ’, ‘ভুল স্টেশন’, ‘শূন্যযান’, ‘নিহতের নাম’ প্রভৃতি গল্পে আত্মিক মৃত্যুকে অতিক্রম করেও শুভবোধে আচ্ছন্ন হওয়ার প্রবৃত্তি, সুস্থ স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার প্রত্যাশা ধ্বনিত হয়েছে। ‘শূন্যযান’ গল্পে দুটি চরিত্র, লোকনাথ ও অনিতা শূন্যযানের মাধ্যমে অন্যলোকে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিয়েছে। এই লোকে যাওয়ার জন্য পার্থিব জগতের ভালবাসা, কামনা-বাসনা, মোহ সব কিছু পরিত্যাগ করে তাদের যেতে হবে। লোকনাথ বুঝতে পারে ‘যেখানে আমি আছি, তুমি আছ, নদীতে স্রোত আছে, সমুদ্রে লবণ’^{৩১} সেখানেই

ফিরে যাওয়া উচিত। অন্যলোকে সেই জীবনের স্বাদ নেই। স্বাদহীনতা নিয়ে জীবনে বাঁচা সম্ভব নয়। পার্থিব জগতের দুঃখ দুর্দশা সব কিছুর ভিতর দিয়েই মহত্তর সুখের অনুভূতি লাভ করা যায়।

বিমল করের ‘শূন্য’ গল্পে নিশীথ, মৈত্র সাহেবের কাছে জীবনের কয়েক বছরের দুঃখময় স্মৃতিকে ভুলিয়ে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেছিল। একটি দিনের সংজ্ঞাহীন ঘুমের পর তার মনে হয়েছিল মৃত্যুপ্রতিম এই ঘুম আর দুঃখময় স্মৃতি সমার্থক নয়। দুঃখ নিয়েই সে অবশেষে সুন্দর জীবনে বেঁচে থাকতে চেয়েছে। আধুনিক জীবনের শূন্যতা, হতাশা, বিষণ্ণতা, মৃত্যুবোধ, একাকিত্ব সম্পর্কের ক্রমভঙ্গুরতা সন্তোষকুমার ঘোষের মত বিমল করেরও গল্পের বৈশিষ্ট্য। বিমল করও তাঁর মত শুভবোধকে খোঁজার চেষ্টা করেছেন। জীবনের অন্ত্রেষণের মাধ্যমে জীবনকেই মূল্যবান করে তুলেছেন।

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের (১৯১৬-১৯৭৫) সাথে বিমল করের গল্পের বিশেষ মিল হল, ঐরা সমাজের ক্লেদাক্ত বাস্তবতা, পাপ, অন্যায়, ভোগসর্বস্বতা, স্বার্থপরতার রূপ দেখেছেন, এবং তার ছবি গল্পে প্রকাশও করেছেন। কিন্তু এটাই শেষ কথা নয়, সমাজ ও জীবনের নেতিবাদিতার মধ্যেও শুভবোধ, মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা, হৃদয়গত প্রেম, মূল্যবোধ এর প্রতি দুর্বলতা প্রকাশ করেছেন। নরেন্দ্রনাথ মিত্র চারের দশকের লেখক হলেও যুদ্ধবিধ্বস্ত মানুষদের জীবনচিত্র অঙ্কনে নির্মম হয়ে ওঠেননি। স্বপ্ন-কামনা-বাসনার প্রতি মানুষদের ফিরিয়ে আনার প্রয়াস নিয়েছেন। “নরেন্দ্রনাথ মিত্র মধ্যবিত্ত বিবেকের ব্যবচ্ছেদ করতে উৎসাহী, কিন্তু বিবেককে বর্জন করতে এতটুকুও আগ্রহী নন। তিনি বাস্তবিক অর্থেই ‘রোমান্টিক সৌন্দর্যপ্রিয়’, এবং ‘শান্ত মধুর ভাব-এ বেশি তৃপ্তি পান। তাই মধ্যবিত্ত মানুষদের পাপ ও পদস্খলনের চিত্র আঁকার সময় নির্মম হন নি, বেদনাহত হয়েই বরং তার সহমর্মী হয়েছেন।”^{৩২}

মনস্তাত্ত্বিক গল্পকারদের মধ্যে নরেন্দ্রনাথ মিত্র উল্লেখযোগ্যতা অর্জন করেছেন। তাঁর ‘চোর’, ‘একপো দুখ’ প্রভৃতি গল্পে নিম্নমধ্যবিত্ত মানুষের আর্থিক অনটনের মধ্যেও তীব্র মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব উপলব্ধ হয়। ‘চোর’ গল্পে অমূল্য ও রেণুর সংসার জীবন বর্ণিত হয়েছে। অমূল্য একটি দোকানে কাজ করলেও নববিবাহিত জীবনে স্ত্রীকে খুশি করার জন্য ও আর্থিক অনটন মোচনের জন্য সে হাত সাফাইয়ের কাজ করে। এই চৌর্যবৃত্তির জন্য তার কোন পাপবোধ নেই, রেণুর বারণ সে শোনেনা, বরং রেণুকে সে প্ররোচনা দেয় দোতলার ভাড়াটে বিনোদবাবুর ঘর থেকে কাঁসার বাটি

চুরি করে আনার জন্য। রেণু রাজি হয় না। ইতিমধ্যে অমূল্যর চাকরি যায়, সংসারে আরও অনটন বেড়ে চলে। একদিন রাত্রে বিছানায় শোওয়ার পর রেণু বিনোদবাবুর ঘর থেকে চুরি করে আনা দামি ঘড়িটা অমূল্যর হাতে পরিয়ে দিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে। কিন্তু তখন অমূল্য খুশি হয় না। তার মনে অন্তর্দ্বন্দ্বের সূচনা হয়। নিজের জীবন চৌর্যবৃত্তি তার কাছে অত্যন্ত কুরুটিকর মনে হয়। এই অধ্যঃপতনের জন্য সে অসহায়তা বোধ করে। “আজ তার উল্লসিত হওয়ার দিন। কিন্তু জীবন কোমল বাহুবল্লভের মধ্যে অমূল্য যেন কাঠ হয়ে রইল। পৃথিবীর সমস্ত সৌন্দর্য, সমস্ত মাধুর্য যেন বিলুপ্ত হয়ে গেছে। আর যে চির পরিচিত দুখানি হাত তার কণ্ঠ জড়িয়ে রয়েছে তা কোন সুন্দরী তরুণীর কঙ্কণ কবিত মৃণালভূজ নয়--তাও আজ শীহীন, কলঙ্কিত।”^{৩৩}

‘মহাশ্বেতা’ গল্পটিতে মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব তীব্রভাবে প্রকাশ পেয়েছে। বিধবা নারীর সংস্কার ও অভ্যস্ত রূপ থেকে মহাশ্বেতা এবং তার নব বিবাহিত সংসারে চিন্মোহন বেরোতে পারেনি। হেডমিস্ট্রেস মহাশ্বেতা পাঁচ বছর আগে স্বামীকে হারানোর পর শ্বেত-শুভ্র বস্ত্রে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল। চিন্মোহনও যুবতী এই নারীর শ্বেতবস্ত্র ভূষিত রূপ দেখে মুগ্ধ হয়েছিল। তাদের প্রেম অবশেষে বিবাহে রূপ নেয়। মহাশ্বেতাও বৈধব্যের গ্লানিময় জীবন থেকে বেরিয়ে আসতে চেয়েছে কিন্তু সধবার খাদ্যাভ্যাসে সে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারে না যেমন, তেমনি চিন্মোহনের কাছেও মহাশ্বেতার নববধূ-সাজ অস্বস্তিকর মনে হয়। পরে নিজেকে সামলে নিয়ে ‘সর্বাপ্ত হেসে উঠল চিন্মোহন, না না না, অতি চমৎকার, অতি চমৎকার! দশ বছর বয়স কমে গেছে তোমার। একেবারে চতুর্দশী বালিকা বধূ।’^{৩৪} --এই বক্তব্যের মধ্যে প্রচ্ছন্ন বিদ্রুপের আঁচ লক্ষ্য করার পাশাপাশি মহাশ্বেতা দেওয়ালে টাঙানো তার বৈধব্য চেহারার ছবি দেখতে পেয়েছে। জীবনের পরিবর্তন বাইরের খোলসে দেখানো গেলেও অন্তরাআ তাতে সব সময় সায় দেয় না। বিগত জীবনের স্মৃতি, আচ্ছন্নতা থেকে যায়, যা থেকে মানুষের মন মুক্ত নয়, ‘মহাশ্বেতা’ গল্পে তারই প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়।

বিমল করের মনস্তাত্ত্বিক গল্পও মানুষের মনের গোপন ভাবনা ও স্বরূপকে প্রকাশ করে দেয়। তাঁর এই শ্রেণীর বহু গল্পের মধ্যে ‘বকুলগন্ধ’ গল্পটির উল্লেখ করা চলে। অঞ্জনা তার বিগত দিনের স্মৃতিকাতরতায় আচ্ছন্ন। এখান থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টায় ক্ষতবিক্ষত হতে হতে মানসিক অসুস্থতার শিকার হয় সে। বকুল ফুলের মাধ্যমে তার অচরিতার্থ প্রেমের স্মৃতি তাকে গ্রাস করে। মেয়ে কিংবা স্বামীর বকুল ফুলের প্রতি দুর্বলতায় সে তীব্র বিরোধিতা করলেও

অবচেতনের দ্বারা চালিত হয়ে সেই বকুল ফুলের কাছে সে আশ্রয় নিতে চেয়েছে। মনস্তাত্ত্বিকতা এই সকল গল্পের মূল অবলম্বন। জীবনের প্রতি শুভবোধ থাকলেও অন্তর-জগতের দ্বারা চালিত মানুষ তার প্রবৃত্তি থেকে মুক্ত হতে পারেনা, নরেন্দ্রনাথ মিত্র কিংবা বিমল করের গল্প সেই ভাবনাকেই প্রকাশ করে।

বিমল করের সমকালীন গল্পকার হিসেবে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় (১৯১৮-১৯৭০), সমরেশ বসু (১৯২৪-১৯৮৮)-কে চিহ্নিত করা যায়। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্পে মধ্যবিত্তের মূল্যবোধের অবক্ষয় ও তৎকালীন দেশ ও মানুষের সংকটময় অবস্থার চিত্র পাওয়া যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও তার পরবর্তী রাজনৈতিক যুদ্ধ, মনস্তর সকল দিক দিয়েই বিপর্যয়কে স্বচ্ছভাবে প্রকাশ করেছেন লেখক। এর পাশাপাশি রয়েছে উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্তের মানসিকতার স্বরূপ, তাদের ক্রৈদান্ত জীবনের পরিচয়। দাম্পত্য জীবনে সম্পর্কের অবক্ষয় তাঁর গল্পের বিষয় হলেও সুস্থ মানবিক চেতনায় ফিরে আসার প্রত্যাশাও ফুটিয়ে তোলে গল্পগুলি। ‘দুঃশাসনীয়’ গল্পে কাপড়ের আড়তদার দেবী দাস মনস্তর-অভাবপীড়িত মানুষের কাছে সরকার-নির্ধারিত দামে কাপড় বিক্রি করেনি। বরং সরকারের সমালোচনা করে কাপড়ের অপতুলতা সম্পর্কে তার মত জানিয়েছে। যাত্রার আসরে সেই দেবী দাস দুঃশাসনের মৃত্যু উপভোগ করে আনন্দ লাভ করে। আবার মুচি পাড়ায় এসে নগ্ন ষোড়শী মেয়েকে দেখে নিজের স্বার্থপর মানসিকতার প্রতি এতটুকু গ্লানি অনুভব না করে বলেছে, “মেয়েটি সম্পূর্ণ নগ্ন। কোনোখানে একফালি কাপড় নেই -- কাপড় পাবার উপায়ও নেই। যুগের দুঃশাসন নির্লজ্জ পাশব হাতে বস্ত্রহরণ করেছে তার, তার সমস্ত লজ্জা, সমস্ত মর্যাদাকে নিষ্ঠুর উপহাসে মেলে দিয়েছে লোলুপ পৃথিবীর সামনে।”^{৩৫} --কিন্তু সমাজের এই দুঃশাসনদের শাস্তি দেওয়ার জন্য ভীম-স্বরূপে কোন সহৃদয়, সংবেদনশীল মানুষ এগিয়ে আসেনা। দুর্ভিক্ষ পীড়িত জীবনের বাস্তব যন্ত্রণাময় চিত্র ‘দুঃশাসন’ গল্পটি। এই পর্যায়ে ‘হাড়’ গল্পটিরও উল্লেখ করা যায়। গল্পকথক চাকরির উমেদারি করতে এসে উচ্চবিত্ত রায়বাহাদুরের বাড়ির বিলাসিতার মধ্যেও বাইরের দুর্ভিক্ষ-পীড়িত মানুষের চিৎকার শুনতে পেয়েছে। কিন্তু চাকরির কথাতে রায়বাহাদুর উৎসাহী না হয়ে তাঁর সংগৃহীত হাড়ের গল্প বলে নিজের পৌরুষ প্রকাশ করতে চেয়েছেন। ঘরের ভিতরকার স্বপ্নময় অতীতের মুগ্ধতা বারবার বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছিল মনস্তর-পীড়িত বাইরের মানুষের বাস্তবের যন্ত্রণায় ও চিৎকারে। রায়বাহাদুরও বিরক্তিবোধ করেছেন মানুষের আতর্নাদে। “বড় বেশি প্রত্যক্ষ, বড় বেশি বাস্তব। মানুষের ক্ষুধাটা বড় বেশি নগ্ন। এক মুহূর্তে ভুলে যাওয়ার জো নেই,

তলিয়ে যাওয়ার উপায় নেই কোথাও। কোথায় তাহিতি-ম্যানিলা-হনোলুলুর যাদু রাজ্য, আর কোথায়--’’^{৩৬} স্বপ্নরাজ্যের হাড় থেকে বেরিয়ে এসে কথক দেখতে পেয়েছে ডাস্টবিনের পাশে কুকুরের সাথে লড়াই করে একটি শিশুর হাড় চোষার প্রয়াস। ১৩৫০ এর দুর্ভিক্ষে সমাজের এই বিপরীত চিত্র তৎকালীন পরিস্থিতিকে বাস্তব ভাবে ফুটিয়ে তুলেছে।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের দাম্পত্য সম্পর্কের কিছু গল্পে ভালবাসার নিবিড়তা লক্ষ্য করা যায়। ‘ধস’ গল্পটিতে কিরণলেখা স্বামী ভবতোষকে নিয়ে চেষ্টা যায় দার্জিলিং-এ। চাকরি হারানো, শারীরিক ভাবে অসুস্থ ভবতোষকে মানসিক ও আর্থিক সাহায্য করতে চায় কিরণলেখা। দার্জিলিং-এ এসে তার সহপাঠী রণজিতের সাথে দেখা হয়। রণজিতের প্রাণোত্তাপ, স্ফূর্তি দেখে মনের দুর্বল মুহূর্তে তার সাথে কিরণলেখা টাইগার হিল যেতে চায়। কিন্তু ঝড়ো পরিবেশে যেতে পারেনা। হঠাৎই ধস নামার পর রণজিতকে অবাক করে ভবতোষ। তার অসুস্থ শরীরেও কিরণলেখাকে সে উদ্ধার করতে চায়। রণজিত ভবতোষের প্রেমিকসত্তাকে উপলব্ধি করে নিজের মনের দীনতায় লজ্জাবোধ করে।

মানুষকে জানবার জন্য কলম ধরেছিলেন সমরেশ বসু (১৯২৪-১৯৮৮) চল্লিশের দশকে প্রাক-স্বাধীনতা লাভের উত্তাল সময়ে বাংলা সাহিত্যে তিনি আবির্ভূত হন। একদিকে স্বাধীনতা আন্দোলনের আবেগ, অপরদিকে অভিশপ্ত বঙ্গবিভাগ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার যন্ত্রণা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। তাঁর গল্পে সমকাল চেতনার বিশেষ স্বাক্ষর লক্ষ্য করা যায়। কমিউনিজমের প্রতি বিশ্বাসবোধ, আবার সেই বিশ্বাসের পতন তার মনের স্বরূপে ধরা পড়েছে। রাজনৈতিক মতাদর্শ যেমন তাঁকে প্রভাবিত করেছে, তেমনি সমকালীন মানুষদের প্রতিও তিনি সহানুভূতিশীল হয়ে উঠেছেন। তাঁর গল্পে জীবনের বৈচিত্র্যের পাশাপাশি জীবনসংগ্রামও বিশেষ মূল্যে স্বীকৃত হয়েছে। “বিপুল জীবন ঘনিষ্ঠ অভিজ্ঞতা কল্পনাযোগে বিশ্বাস্য ও সজীব হয়ে উঠেছে। প্রগাঢ় মানবিক আবেগ ও দুর্মদ সহানুভূতিতে লেখক তাঁর সৃষ্ট বিচিত্র চরিত্রগুলির সঙ্গে সহজেই একাত্ম হয়ে যান, তাদের জীবনের বিচিত্র সুখ-দুঃখের অংশীদার হয়ে যান। আর সেই সব সুখ দুঃখের প্রকাশে সমরেশ বিচিত্র প্রকরণ আশ্রয় করেছেন -- বিশাল ক্যানভাস, পরিবর্তমান পটভূমি, বিশেষ পরিধিবেষ্টিত মঞ্চ।’’^{৩৭}

সমরেশ বসুর ‘আদাব’ গল্পটিতে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার প্রেক্ষাপটে দুটি সাধারণ মানুষের অসহায়তার চিত্র রূপ পেয়েছে। এরা একজন হিন্দু অপরজন মুসলমান, ভয়াবহ রাত্রে একটি

ডাস্টবিনের আড়ালে তাদের পরিচয় হয়। এরা কেউ দাঙ্গা চায় না, তাই দাঙ্গার ভয়ে নিজেদের পালিয়ে নিয়ে বেড়ায়। দুটি মানুষ পরিচয়ের পর ক্রমশ কাছাকাছি এসেছে। অন্যদিকে রাত্রির নিস্তর্রাতাকে কাঁপিয়ে টহল দিয়ে চলেছে মিলিটারি সৈন্য। গল্পের শেষাংশে দেখা যায় নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে যাওয়ার পথে মুসলমান মাঝিটি তার সদ্য পরিচয় হওয়া হিন্দু বন্ধুর সামনে পুলিশের গুলিতে প্রাণ হারায়। ঈদের পরবে সে আর পরিবারের মানুষদের সঙ্গে মিলতে পারেনি। “সুতা মজুরের বিহ্বল চোখে ভেসে উঠল মাঝির বুকের রক্তে তার পোলা মাইয়ার, তার বিবি জামা শাড়ি রাঙা হয়ে উঠেছে। মাঝি বলছে-- পারলাম না ভাই। আমার ছাওয়ালরা আর বিবি চোখের পানিতে ভাসব পরবের দিনে। দুশমনরা আমাকে যাইতে দিল না তাগো কাছে।”^{৩৬} দাঙ্গার কাছে বলি হওয়া মানুষের আত্ননাদে বিষাদমগ্নতার সৃষ্টি হয়েছে এই গল্পে।

বিমল করের ‘অন্তরে’ গল্পটিও এই দাঙ্গার পটভূমিতে রচিত। ‘আদাব’ গল্পে হিন্দু মুসলমান দুটি মানুষের মিলন দেখানোর পরও মুসলমান মাঝির মৃত্যু যে বিষাদমগ্নতা সৃষ্টি করেছিল, ‘অন্তরে’ গল্প লেখক তা পেরিয়ে গিয়ে শান্তির, সহানুভূতির ছবি আঁকেছেন। কবীর এবং মাধবী দুজনেই আশ্রয় নিয়েছিল একটি নির্ণয়মান বাড়িতে। পরিচয়ের পর তাদের মধ্যে বিশ্বাসবোধ ফিরে আসে। খাদ্য সংগ্রহ করে তা ভাগ করে খেয়ে তারা পাশাপাশি ঘুমিয়ে গেছে, এবং স্বপ্নমদিরতায় খুঁজে পেয়েছে সুন্দর ভবিষ্যৎ-কে। মানুষের প্রতিশ্রুতি, সহানুভূতি, দাঙ্গার দিনেও কেমন ভাবে অপর মানুষকে আশ্রয় দিতে পারে তার ছবি এই গল্পটি।

‘হেঁড়া তমসুক’ গল্পগ্রন্থের ‘শহীদের মা’ গল্পটি সত্তর দশকের নকশাল আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে লেখা। বাদলের মৃত্যুতে তার মায়ের অন্তর্ভেদী যন্ত্রণা প্রকাশিত হলেও বাদলের ভাইয়েরা কৃপাল, দয়াল কিংবা তার বাবা হরপ্রসাদকে দুঃখিত হতে দেখা যায় না। একই বাড়ির তিন ভাই এবং বাবা চারটি রাজনৈতিক দলের সদস্য। অপর সদস্যরা বাদলকে পার্টি ছাড়তে বললেও নিজেরা পার্টিকে আঁকড়ে ধরে রাখে। তাদের চোখে বাদলের পার্টি ক্ষমতাবাজ, উদ্ভ্রান্ত মানুষদের সমষ্টি। নকশাল আন্দোলনের সময় সাধারণ মানুষদের চোখে নকশালরা এই ভাবে বিচার্য হতো। বাদলের মৃত্যুতে তার বাবা হরপ্রসাদকে শোকে মুহমান না হতে দেখে মা বিমলার মনে প্রশ্ন জাগে। “হরপ্রসাদ কি ছেলেদের বাবা নয়? পিতৃত্বের থেকেও পার্টি কি বড়ো? ওদের ভাতৃত্ব বলতে কিছুই নেই? পার্টি কি তার উপরে? এই সংসারের মাঝখানে বসে, কথাটা কোনদিন তিনি বুঝতে পারেননি। কেবল ভেবেছেন, তার ঘরে কেন এত অশান্তি। বাপছেলেরা মিলে, একটা সুখের

সংসার কি ওরা গড়তে পারত না। তার বদলে ওরা এক একজন, এক একজনের বিরুদ্ধে কেবল মরণ ধরাটাই দেখতে পেয়েছে।”^{৩৩} --বাদল সকলের কাছে ‘পার্টির একটি ছেলে’ বলে মূল্য পেয়েছে। কিন্তু মাতৃত্ববোধ এই পরিচয়কে বড় করে দেখেনা। তাই বিমলা গল্পের শুরু থেকেই তাঁর মনের অবচেতনে (Sub Conscious) বাদলকে প্রত্যক্ষ করেছে। স্মৃতির মাধ্যমে খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করেছে সন্তানকে। তাই বাদলের নামে শ্লোগান কিংবা শহীদ বেদী নির্মাণে তাঁর হতাশাবোধ বা যন্ত্রণার নিবৃত্তি হয়নি। কেননা তাঁর মনে হয়েছে, শহীদ বেদী ভেঙে যাওয়ার পর বাদল বিস্মৃত অধ্যায়ে চলে যাবে, কিন্তু মাতৃহৃদয়ে বাদল চিরদিন অবস্থান করবে। একটি মায়ের সন্তান হারানোর ঘটনার মাধ্যমে নকশাল আন্দোলনের প্রকৃতিকে লেখক ধরার চেষ্টা করেছেন।

বিমল কর রাজনৈতিক ভাবনায় আচ্ছন্ন না হলেও সন্তরের উত্তপ্ত দিনগুলির কথা তিনিও কয়েকটি গল্পে ব্যক্ত করেছেন। তৎকালীন সময়ের পুলিশি নির্যাতন, আন্দোলনকারী যুবকদের প্রবৃত্তি তিনি দেখানোর চেষ্টা করেছেন ‘সে’, ‘ওরা’, ‘নিগ্রহ’ প্রভৃতি গল্পের মাধ্যমে। পুলিশ কিংবা বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে সাধারণ আন্দোলনকারী যুবকদের বিদ্রোহ এই সমস্ত গল্পের প্রধান অবলম্বন।

বিমল কর তাঁর ‘এই দশকের গল্প’ সংকলনের ভূমিকায় তরুণ গল্পলেখকদের সম্পর্কে বলেছিলেন, “দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অভিজ্ঞতা এবং প্রভাব অধিকতর গভীরভাবে আমাদের সমাজ এবং জীবনে স্থায়ী হয়েছিল। ফলে সমাজ জীবন ও মানুষ সম্পর্কে যে মৌল ধারণাগুলি একালের লেখকদের সংশোধন করতে হয়েছে তাতে বাংলা ছোটগল্পে জীবনচিত্র অনেক বেশি আন্তরিক, জীবনসমস্যা অনেক বেশি প্রকট এবং মানুষের আত্মিক প্রসঙ্গ অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছে। নৈরাশ্য বেদনা জটিলতা আত্মবিদ্রূপ এযুগের লেখকদের হাতে যত অকৃত্রিমভাবে ফুটে উঠেছে সম্ভবত তেমন আর পূর্বে হয়নি।”^{৪০} এই সময়ের গল্পে ব্যক্তির মূল্যবোধের সংকট এবং মূল্যবোধের বিপর্যয় বিশেষ মাত্রা পেয়েছে। ষাটের দশকের একাধিক রাজনৈতিক ও সামাজিক অস্থিরতা মানুষের মতে বিষণ্ণতাবোধের জন্ম দিয়েছিল। জীবনের অসারত্ব মানুষ উপলব্ধি করেছিল এই আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে এসে। মনের মধ্যে জন্ম নিয়েছিল শূন্যতা ও মৃত্যুবোধ, মানুষের এই সময়কার মানস-দর্পণ হয়ে উঠেছে ছোটগল্পগুলি। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, দেবেশ রায়, দিব্যেন্দু পালিত, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের মত বহু লেখক মানুষের মানসিক সংকটকে ফুটিয়ে তুলেছেন গল্পের মধ্যে।

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় জীবন জিজ্ঞাসার তীব্রতাকে গল্পে ফুটিয়ে তুলেছেন। শূন্যতা, হতাশা বোধের পাশাপাশি জীবনের আন্তিক্যবোধের প্রতিও তাঁর আকাঙ্ক্ষাকে দ্যোতিত করেছেন। বিমল করের সমকালীন এই গল্পকারের রচনার সাথে বিমল করের ভাবনার যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া যায়।

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের গল্পে জগৎ, জীবন, মৃত্যু সম্পর্কে যে জিজ্ঞাসা প্রকাশ পায় তার পিছনে রয়েছে লেখকের জগৎ ও জীবন সম্পর্কে অনন্ত জিজ্ঞাসা ও বিস্ময়বোধ। “বারংবার নিজেকে প্রশ্ন করি— এই মহাজগৎ কেন অসীম? কেন মৃত্যু? কেন জীবন? কেন সব কিছু? এই প্রশ্নগুলি ছোবলে ছোবলে বিষ ঢেলে দিতে লাগল মনে আমার নিস্তর্র আত্মস্বর তার ‘রক্ষা কর, রক্ষা কর’ ধ্বনি পাঠাতে লাগল চারপাশে, চেতনার তরঙ্গে তরঙ্গে সে খুঁজে বেড়াতে থাকে আশ্রয়।”^{৪১} -- এই আশ্রয়ের জন্য তিনি যেমন ঈশ্বর বিশ্বাসকে আমল দিয়েছেন, তেমনি খুঁজে ফিরেছেন তাঁর শৈশবের স্মৃতি।

‘আত্মপ্রতিকৃতি’ গল্পে শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় একজন বিকারগ্রস্ত মানুষের ছবি ঐকেছেন। যিনি একা নিজেই টেলিফোনের শব্দ শোনেন এবং টেলিফোনের অপর পাশে কারোর সাথে কথা বলেন যাকে বাড়ির লোকেরা চেনে না। সব চেষ্টা আশ্চর্যের বিষয় হল বাড়িতে বা আসে পাশে কোথাও ফোন নেই। উনি তাঁর পেনটাকে ফোনের মত ধরে কথা বলেন, তার ছেলে বুঝতে পেরেছে যার সাথে বাবা কথা বলেন সেই মানুষটি তাঁকে তাঁর ছোটবেলার ডাকনাম রণ্টু বলে সম্বোধন করে। এই পাগলামির জন্য তাঁর চাকরি গেছে, তবু এই ফোনে কথা বলার ক্ষেত্রে তিনি স্থান-কাল-পাত্রের কোন অপেক্ষা রাখেন না। মানুষটির Sub conscious mind দ্বারা প্রভাবিত এই আচরণ তাঁকে ক্রমশ বিচ্ছিন্ন, বিষন্ন এক জগতের অধিবাসী করে তোলে।

‘স্বপ্নের ভিতরে মৃত্যু’ গল্পে মাখনলাল তার বোধের গভীরে তীব্রভাবে এই জীবনের অসারত্ব উপলব্ধি করে। অফিস থেকে বেরিয়ে ইতস্তত ঘুরে বেড়ায়, পথে ঘুরতে ঘুরতে পথ হারায়, আবার খুঁজে পায়। এই ভাবে একসময় সে এক অপরিচিত মানুষের চোখ দেখে চমকে ওঠে। তার সারা শরীরে শিহরণ লাগে। বাড়িতে ফিরে এসেও সে স্ত্রী পুত্রের জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন জগতে বাস করে। তার স্বপ্নের মধ্যে সে দেখতে পায় সে মারা যাচ্ছে, মনুষ্যত্বের জীবের মত তুচ্ছভাবে। এই নিঃসঙ্গ জীবন তার কাছে ভয়াবহ হয়ে উঠে, সে মুক্তি পাওয়ার পথ খুঁজতে থাকে।

বিমল করের ‘অপেক্ষা’, ‘উদ্বেগ’ প্রভৃতি গল্পেও এই মৃত্যুবোধ প্রকাশিত। ‘অপেক্ষা’ গল্পে শিবতোষ কোন একজন মানুষের জন্য অপেক্ষা করে, কিন্তু মনে করতে পারে না সে কো। মনের

মধ্যে আবছাভাবে স্মরণ করে সেই মানুষটি তাকে একটি চিঠি দিয়েছিল, এবং তাতে তার আসার কথা লিখেছিল। যদিও দিন কালের সঠিক সময় সেই রহস্যময় মানুষটি জানায়নি, তবুও শিবতোষ বুঝতে পারে সে আসবেই, কোন না কোন দিন সেই মানুষটি অনিবার্য মৃত্যুর সাথে একাত্ম। মানুষের অন্তরে এই মৃত্যুবোধ তার নিঃসঙ্গ জীবনে বারবার হানা দেয়। মানুষকে বিচ্ছিন্ন জগতের বাসিন্দা করে তোলে এই সব গল্পে তারই প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়।

বিমল কর চারের দশক থেকে নয়ের দশকের শেষ পর্যন্ত একাদিক্রমে ছোটগল্প রচনা করেছেন দীর্ঘ এই সময়ে বহু গল্পকারের সাথে তাঁর যেমন যোগাযোগ ঘটেছিল, তেমনি তাঁর রচনায় এই দীর্ঘ সময়ের নানা বৈশিষ্ট্য প্রযুক্ত হয়েছে। বিমল কর ছিলেন মনোজগতের লেখক। বহির্জগতের চেয়ে অন্তর্জগতের দিকেই ছিল তাঁর সতর্ক, সচেতন দৃষ্টি। মানুষের মনের এই গোপন স্বতন্ত্র ভাবনাকে তিনি প্রকাশ করেছেন। এর সাথে যুক্ত হয়েছে তাঁর নানা দার্শনিক ভাবনা, আত্মানুসন্ধানের প্রয়াস, যা তাকে সমকালীন সমস্ত গল্পকারদের থেকে স্বাতন্ত্র্য দিয়েছে।

বিমল করের গল্পকার জীবনের সূচনা লগ্নে, চারের দশকের ছোটগল্পে সমকালীন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে একদিকে কমিউনিজম্‌ অপর দিকে কংগ্রেসের প্রতি আস্থা ও বিরাগ প্রকাশিত হয়েছিল। এর সাথে যুক্ত হয়েছিল মন্বন্তরের চিত্র, তেভাগা আন্দোলন, হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা, স্বাধীনতা লাভের মত নানা ঘটনার চিত্র। মানুষের মনে হাহাকার বিপন্নতা যেমন গ্রাস করেছিল তেমনি দেখা যাচ্ছিল ক্ষমতালোভী মানুষদের অত্যাচারের বিবরণ। তখন থেকেই জীবনের মূল্যবোধের অবক্ষয় নানাভাবে সাহিত্যের বিষয় হয়ে উঠেছিল। এই পরিস্থিতিতে গল্প রচনার পাশাপাশি বিমল কর যেমনভাবে সমকালীন গল্পকারদের রচনার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে উঠেছিলেন, তেমনি নিজেও সৃষ্টি করেছিলেন পৃথক একটি ঘরানা, যা তার স্বকীয় ভাবনায় উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে।

উৎস পরিচয়

১. 'হাড়'-জগদীশ গুপ্তর গল্প, দে'জ পাব. সেপ্টেম্বর-১৯৯৯, পৃষ্ঠা-১৪৪
২. 'দিবসের শেষে'-জগদীশ গুপ্তর গল্প, দে'জ পাব. সেপ্টেম্বর-১৯৯৯, পৃষ্ঠা-৫৮
৩. তদেব, পৃষ্ঠা-৬২
৪. 'নিষাদ'--'বিমল করের পঞ্চাশটি গল্প'--বিমল কর, আনন্দ পাব. প্রাঃ লিঃ, ২০০১, পৃষ্ঠা-২৮০
৫. তদেব, পৃষ্ঠা-২৯০
৬. 'অশুখ'--'বিমল করের পঞ্চাশটি গল্প'--বিমল কর, আনন্দ পাব. প্রাঃ লিঃ, ২০০১, পৃষ্ঠা-২০৯
৭. 'অরুণের রাস'--জগদীশ গুপ্তর গল্প, দে'জ পাব. সেপ্টেম্বর-১৯৯৯, পৃষ্ঠা-১২৬
৮. 'উদ্ভিদ'--'বিমল করের পঞ্চাশটি গল্প'--বিমল কর, আনন্দ পাব. প্রাঃ লিঃ, ২০০১, পৃষ্ঠা-১২০
৯. 'যযাতি'--'বিমল করের পঞ্চাশটি গল্প'--বিমল কর, আনন্দ পাব. প্রাঃ লিঃ, ২০০১, পৃষ্ঠা-২৩৯
১০. 'শঙ্কিতা অভয়া'-জগদীশ গুপ্তর গল্প, দে'জ পাব. সেপ্টেম্বর-১৯৯৯, পৃষ্ঠা-১৩৬
১১. 'আঠারো কলার একটি'--জগদীশ গুপ্তর গল্প, দে'জ পাব. সেপ্টেম্বর-১৯৯৯, পৃষ্ঠা-২০৬
১২. তদেব, পৃষ্ঠা-২১২
১৩. 'পালকের পা'--'বিমল করের পঞ্চাশটি গল্প'--বিমল কর, আনন্দ পাব. প্রাঃ লিঃ, ২০০১, পৃষ্ঠা-১০০
১৪. 'গল্পকার তারাশঙ্কর'-'তারাশঙ্কর অন্ত্রা'--রথীন্দ্রনাথ রায়, রমা প্রকাশনী, ১৯৮৭, পৃষ্ঠা-১৮০
১৫. 'আত্মদীপ তারাশঙ্কর'--নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকা, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় সংখ্যা, ১৪০৪, পৃষ্ঠা-২৮
১৬. 'লেখকের কথা'--মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, নিউ এজ পাব. সেপ্টেম্বর-১৯৫৭, পৃষ্ঠা-২৩
১৭. 'আত্মহত্যার অধিকার', 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প', বেঙ্গল পাব. প্রাঃ লিঃ, ১৪০৬, পৃষ্ঠা-৩০
১৮. 'দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পূর্বকালে প্রতিষ্ঠিত ছোটগল্পকারবৃন্দ'-'আধুনিক বাংলা ছোটগল্প : মূল্যবোধের সংকট', পুস্তক বিপণি, ২০০৪, পৃষ্ঠা-৭৪
১৯. 'পরশুরামের কুঠার'-'সুবোধ ঘোষ বাছাই গল্প' মণ্ডল বুক হাউস, ১৪০৫, পৃষ্ঠা-২৬৪
২০. প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়ের নেওয়া বিমল করের সাক্ষাৎকার, 'বিভাব' পত্রিকা, বইমেলা সংখ্যা-১৪১০, পৃষ্ঠা-৫১
২১. 'যক্ষ'-'গল্পসংগ্রহ'--বিমল কর, প্রকাশক ব্রজকিশোর মণ্ডল, মহালয়া-১৩৮৭, পৃষ্ঠা-১৬২
২২. তদেব, পৃষ্ঠা-১৬৭
২৩. 'তিন অধ্যায়'-'সুবোধ ঘোষের শ্রেষ্ঠ গল্প', প্রকাশ ভবন, ফাল্গুন-১৪০১, পৃষ্ঠা-২২০
২৪. 'ভূমিকা'-'জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর নির্বাচিত গল্প', সম্পাদনা- নিতাই বসু দে'জ পাব. ১৯৯৯, পৃষ্ঠা-১৯

২৫. বাংলা ছোটগল্প : প্রসঙ্গ ও প্রকরণ-বীরেন্দ্র দত্ত, পুস্তক বিপণি, ১৯৯৫, পৃষ্ঠা-৬৩৬
২৬. কালের পুস্তলিকা- অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, ডি.এম.লাইব্রেরী, সেপ্টেম্বর-১৯৮২, পৃষ্ঠা-৪৭৪
২৭. 'শালিক কি চড়ুই'-জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, ইন্ডিয়ান এসোসিয়েটেড পাব, ১৯৬৪, পৃষ্ঠা-১৯
২৮. 'গল্প লেখার গল্প'-'গল্প সমগ্র(১)'--সন্তোষ কুমার ঘোষ, দে'জ পাব. ১৯৯৪
২৯. কালের পুস্তলিকা- অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, ডি.এম.লাইব্রেরী, সেপ্টেম্বর-১৯৮২, পৃষ্ঠা-৮৯১
৩০. 'যাদুঘর', 'গল্প সমগ্র(১)'--সন্তোষ কুমার ঘোষ, স্বরলিপি, ১৩৮৪, পৃষ্ঠা-৯০
৩১. 'গল্প সমগ্র'(৩) --সন্তোষ কুমার ঘোষ, দে'জ পাব. ১৯৯৪ পৃষ্ঠা-৯৬৬
৩২. বাংলা ছোটগল্প : প্রসঙ্গ ও প্রকরণ-বীরেন্দ্র দত্ত, পুস্তক বিপণি, ১৯৯৫, পৃষ্ঠা-৫৩৭
৩৩. 'চোর'-'গল্পমালা'(১) নরেন্দ্রনাথ মিত্র, আনন্দ পাব. প্রাঃ লিঃ, জুলাই ১৯৯৯, পৃষ্ঠা-৩৪
৩৪. 'মহাশ্বেতা'-'গল্পমালা'(১) নরেন্দ্রনাথ মিত্র, আনন্দ পাব. প্রাঃ লিঃ, জুলাই ১৯৯৯, পৃষ্ঠা-২৩
৩৫. 'দুঃশাসন'-গল্প সমগ্র(৩)--নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, চৈত্র-১৪০৬, পৃষ্ঠা-২৩২
৩৬. 'হাড়'-গল্প সমগ্র(৩)--নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, চৈত্র-১৪০৬, পৃষ্ঠা-২৯৬
৩৭. কালের পুস্তলিকা- অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, ডি.এম.লাইব্রেরী, সেপ্টেম্বর-১৯৮২, পৃষ্ঠা-৪৯৪-৪৯৫
৩৮. 'আদাব'-সমরেশ বসুর গল্প সমগ্র(২), মৌসুমী প্রকাশনী, ১৪০১, পৃষ্ঠা-৮৫
৩৯. 'শহীদেব মা'-সমরেশ বসুর গল্প সমগ্র(১), মৌসুমী প্রকাশনী, ডিসেম্বর-১৯৯৫ পৃষ্ঠা ৩৪৯
৪০. 'ভূমিকা' এই দশকের গল্প-বিমল কর, পলাশী প্রকাশন, ১৯৬০ পৃষ্ঠা-১২
৪১. 'একটু খানি বেঁচে থাকা', গল্প সংগ্রহ-শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, বিশ্বাবানী প্রকাশনী, ১৯৮১, পৃষ্ঠা-১৩-১৪

-----o-----

পঞ্চম অধ্যায় উপসংহার

বিমল কর চারের দশক থেকে নয়ের দশক পর্যন্ত যে সাহিত্য রচনা করে গিয়েছেন, তার মধ্যে তাঁর জীবনদৃষ্টির বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয়েছে। জীবনের পথ চলার সাথে সাথে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন তাঁর ছোটগল্প ও উপন্যাসে তা তিনি প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। তাঁর এই রচনায় যেমনভাবে চোখে দেখা জগতের কথা ব্যক্ত হয়েছে, তেমনি সেই অভিজ্ঞতা তাঁর জীবনদর্শনের রসে জারিত হয়ে সৃষ্টি করেছে এক অনুভূতিময় জগৎ। এই জগতে সাধারণ মধ্যবিত্ত নিম্নবিত্ত শ্রেণীর মানুষ বাস্তব জগতের ওম্ মেখে সাধারণ মানুষের কাছেই বিশ্বাসযোগ্য চরিত্রে রূপান্তরিত হয়ে উঠেছে। তাই কাহিনীর পাশাপাশি চরিত্রগুলিও যথাযোগ্য সময়ের প্রতিনিধি হয়ে উঠেছে।

বিমল করের গল্প ও উপন্যাসে তাঁর যে দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ পেয়েছে তা বহুবিধ। জীবনকে নানা দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার প্রচেষ্টা তাঁর মধ্যে পরিলক্ষিত হয়েছিল। সময়ের পরিবর্তনের কথা মাথায় রেখে সচেতন সাহিত্যিক হিসেবে তিনি তাঁর গল্প ও উপন্যাসে ভাবগত ও গঠনগত কিছু পরিবর্তনও এনেছিলেন। এই দিক থেকে তাঁর গল্পগুলি অনেক বেশি বৈচিত্র্যমন্ডিত। তবে এটাও বলে রাখা জরুরি, তিনি গল্পে যেভাবে মানবমনের অন্তর-রহস্যের সন্ধানী শিল্পী হয়ে উঠেছিলেন, এই বৈশিষ্ট্যগুণই তাঁকে স্বাতন্ত্র্য দিয়েছে।

বিমল কর তাঁর জীবনে পারিবারিক সূত্রে লেখক হয়ে ওঠার তেমন অনুকূল পরিবেশ পাননি। সেজোকাকা ও কাকিমার মধ্যে সাহিত্যের প্রতি খানিকটা অনুরাগ থাকলেও তা সাহিত্য পাঠের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। বিমল কর সেই সুযোগে সাহিত্য পাঠের মধ্য দিয়ে মনের সংগোপনে সাহিত্যবোধ গড়ে তুলে ছিলেন। তাই সৃষ্টিশীলতার ক্ষেত্রে তাঁকে থমকে যেতে হয়নি। চারের দশকে ছোটগল্প রচনার সূত্রপাত হলেও সংখ্যার দিক থেকে খুব বেশি গল্প এই দশকে পাওয়া যায়নি; তবে পাঁচের দশক থেকে তাঁর রচনা সঠিক স্রোতের সন্ধান পায়। বহির্বঙ্গে কৈশোর ও প্রথম যৌবনের দিনগুলি কাটলেও সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ তাঁর মধ্যে বজায় ছিল। কলকাতায় কলেজে শিক্ষা লাভের জন্য আসা, বহুবাজারের বাড়ির দাদামনি— দেবীপ্রসাদ করের সাহচর্য সেই

সাহিত্যবোধকে আরও উদ্দীপ্ত করে তুলেছিল। তাই বেনারস, আসানসোল প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানে কর্মসূত্রে থাকতে হলেও সাহিত্য রচনার প্রতি অনুরাগ তাঁর কমেনি। সাহিত্যের তগিদেই তিনি কলকাতায় অনিশ্চিত আর্থিক-জীবনকে বেছে নিয়েছিলেন। দারিদ্র্য, আর্থিক স্থিতিবস্তুর অভাব তাঁর মনে খুব বেশি আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারেনি। বোহেমিয়ান জীবন, বহু মানুষের সাথে মেলামেশার সুযোগ, তাদের জীবনধারা, বয়ে চলা সময়ের নানা ঘটনাপ্রবাহ বিমল করের সাহিত্যের ইমপ্রেশ্যন হয়ে উঠেছে। জগৎ ও জীবনের প্রতি গভীর অনুসন্ধিৎসার ফলে বিমল করের সামনে উপস্থিত হয়েছিল নানান দার্শনিক জিজ্ঞাসা। তাঁর শিল্পকীর্তির মূলে রয়েছে এই দার্শনিক জিজ্ঞাসার নানা স্তর।

বিমল কর চারের দশকে যে সময় তাঁর সাহিত্য রচনা শুরু করেছিলেন তখন সমকালীন পরিস্থিতি ছিল অস্থির। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম, মন্বন্তর, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, দেশভাগ, দাঙ্গা, এর পর প্রাপ্ত স্বাধীনতা, সর্বত্রই ফুটে উঠেছিল অসুস্থতার ছবি। দেশ-কাল-মানবিক সম্পর্কের এই অসুস্থতা, বর্ণহীনতা তাঁর গল্পের ‘ইমপ্রেশ্যন’ হয়ে উঠেছিল। কথাসাহিত্যে ‘ইমপ্রেশ্যন’ সম্পর্কে প্রখ্যাত সমালোচক ও সাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় বলেছিলেন—

“খুব সহজ করে সাধারণত বলা হয়-- ছোটগল্প তৈরি হয় ইমপ্রেশ্যন থেকে। যে কোন শিল্পবস্তুই তো ইমপ্রেশ্যন সঞ্জাত। উপন্যাস রচনা করতে গিয়ে যে কোন একটি বিস্তৃত জীবনভূমি আমি রচনা করতে পারি, গড়ে তুলতে পারি সংঘাত সংক্ষুব্ধ সুবিশাল একটি মানব নাট্য; কিন্তু বিচিত্রমুখী এই জৈবনিক চঞ্চলতা -- এই নটলীলা-এরা নিয়ন্ত্রিত হবে কিসের দ্বারা? এই বিবিধ ব্যক্তি সমাবেশ, তাদের বহুমুখী এবং অন্তস্তরী ঘাত-সংঘাত আর গহন-চারণা এগুলো কি সব দেখানো যায় বিশুদ্ধ রিপোর্টাজে-- অদলীয়, অপক্ষপাত সাংবাদিকের মতো? এ রকম ঐশ্বরিক নিরাসক্তি নিয়ে আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে কোন শিল্পকীর্তি গড়ে ওঠেনি -- সহস্র সমালোচকের স্বীকৃতি-পত্র থাকলেও তা মান্য নয়। যে কোন শিল্পকৃতিতে সমুত্তীর্ণ মহৎ উপন্যাসই অদ্যাবধি তার ঘটনাপুঞ্জ, চরিত্র সংঘাতে এবং সিদ্ধান্ত বাক্যে -- সংশ্লিষ্ট স্রষ্টার জীবন সম্পর্কিত কোন উপলব্ধিতে, কোন দার্শনিক চেষ্টনায়, কোন নতুন সমীক্ষায় উদ্ভাসিত এবং চালিত হয়েছে। মহাভারতের ‘মহাপ্রস্থান পর্ব’ যেমন চক্রান্ত কুটিলতা যুদ্ধ রক্তপাতের বিপুল ভৈরব রঙ্গের পর এক বিষণ্ণ মৌনের ধূসরতায় প্রশান্ত হয়ে আসে, তেমনি কোন পরিব্যাপ্ত সার্থক উপন্যাসও এই

রকম যে কোন একটি বোধির মধ্যে উদ্ভীর্ণ হতে চায় -- আর সেও হল জীবন, মানুষ, সমাজ কিংবা বিশ্বনীতি সম্পর্কে লেখকের ইম্প্রেশ্যন।”^১

বিমল করের গল্পে ও উপন্যাসে লেখকের মানবজীবন সম্পর্কে যে দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশিত হয়েছে সেখানে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মানবমনের গভীর গোপনচারী মনের বৈচিত্র্যের নিরিখে তাঁর সাহিত্য গড়ে উঠেছে। তাঁর গল্পের বিষয়-বৈচিত্র্য তাই মানুষের দ্বন্দ্বিক মনের স্বরূপ সন্ধানে, জটিল মনস্তত্ত্বের রহস্যময় অনুভবে, জীবনের জটিলতার সাথে একাত্ম। ছোটগল্পে তাঁর ‘ইম্প্রেশ্যন’ তাঁর অনুভববেদ্য জীবনদর্শনের সাথে তাই সহাবস্থান করেছে প্রতিদিনের চেনা-জানা জগতের গভীবন্ধ জীবন থেকে টুকরো টুকরো যে জীবনানুভূতি তিনি তাঁর সাহিত্যে রূপ দিলেন সেখানে সমকালীনতার আবর্তে অসহায় মধ্যবিত্ত মানুষের জীবনযুদ্ধ ও জীবনানুরাগ বাস্তবসম্মতভাবে প্রকাশ পেল। তাঁর গল্পে যে বিষয়-বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায় তার মূল ভিত্তি ব্যক্তিমানুষের মনস্তাত্ত্বিক ভাবনার নানা বৈচিত্র্য অবলম্বন করে রয়েছে।

বিমল করের সমকালে যারা সাহিত্য রচনা করেছিলেন তাঁদের ক্ষেত্রেও এই মনস্তত্ত্ব নির্ভরতা চোখে পড়ে। যে ছবি তাঁদের প্রকাশ পেয়েছে সেখানে দেখা গেছে অস্থির বাহ্যিক পরিস্থিতি মানুষের মনেও সৃষ্টি করেছে অস্থিরতা, সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে তারা অপারগ। জীবনের পবাহে তারা ভেসে চলেছে খড়কুটোর মত, প্রতিবাদ করার মত মানসিক জোর তারা যেন হারিয়ে ফেলেছে। আর বাহ্যিক জগতে যখনই মানুষ কোণঠাসা হয়ে পড়েছে, ততই অন্তর্জগতে উঠেছে প্রবৃত্তির ঝড়। বেঁচে থাকার মৌল প্রয়োজনের পাশাপাশি মধ্যবিত্ত মানুষ খুঁজেছে অতিরিক্ত সুখের সন্ধান। সব সময় আকাঙ্ক্ষার চরিতার্থতা না ঘটায় অসহায় মানুষ অন্তর্দ্বন্দ্বের ক্ষতবিক্ষত হয়ে উঠেছে। বিমল করের গল্পেও এই মানুষের ছবি প্রকাশ পেয়েছে। আশা-নিরাশা, প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির মানদণ্ডে তারা আবর্তিত হয়েছে। পাপ-পুণ্যের বোধ মানসিক বিভ্রান্তি, আত্ম-আবিষ্কারের আকুলতা, প্রেম-মনস্তত্ত্বের জটিলতার পাশাপাশি বিপন্নতার চিত্র তাদের জীবনকে ক্রমশ বিচ্ছিন্ন করে তুলেছে সমকালীন সমাজ ও মানুষের সান্নিধ্যে থেকে। বিমল করের শিল্পকীর্তি গড়ে উঠেছে এই ভাবনার সাথে সংযুক্ত হয়ে।

বিমল করের গল্পে যে বৈশিষ্ট্যগুলি লেখকের জীবনদৃষ্টিকে প্রকাশ করে তার মধ্যে প্রধান মানবিক সম্পর্কের বিষয়। মানুষের সাথে অপর মানুষের সম্পর্কে দুটি দিক এখানে প্রকাশ পেয়েছে। একটি হল দাম্পত্য সম্পর্কের বাইরে মানবিক বিশ্বাস ও সহযোগিতার মাধ্যমে গড়ে ওঠা মানবিক

সম্পর্ক, অপরটি দাম্পত্য সম্পর্ক। প্রথম শ্রেণীটিতে লেখকের ভাবনা সমকালীন- তার প্রেক্ষাপটে নতুন আদর্শ সৃষ্টি করতে পেরেছে। অস্থির সামাজিক প্রেক্ষাপটে মানুষ যখন নিজের অস্তিত্ব বাঁচানোর তাগিদে ক্রমশ স্বার্থপর হয়ে উঠেছিল, বিমল কর সেই পটভূমিতে দাঁড়িয়ে মানবিক সম্পর্কে গড়ে তুললেন। এই সম্পর্কে মানুষের মনস্তত্ত্ব আবর্তিত হয়েছে ব্যক্তিত্বের দৃঢ়তায়, ভালবাসা ও সৌহার্দের নিবিড়তায়। ‘সম্পর্ক’ গল্পে শৈলেশ ও অনিলার মধ্যে সম্পর্ক আত্মীয়তার। দাম্পত্য সম্পর্ক ব্যতিরেকে দুটি চরিত্র মানবিক মূল্যবোধের দৃঢ়তায় একে অপরের সান্নিধ্য কামনা করেছে। একসাথে সহাবস্থানের মাধ্যমে তাদের মনে শান্তি ও স্বস্তির আবহ সৃষ্টি হয়েছে। ‘নিশীথ সঙ্গী’ গল্পে কিশোরীলাল ও সাধনা একই বাড়িতে অবস্থান করেছে, যেখানে তাদের সম্পর্ক সম্পূর্ণভাবে মানবিক, কোন আত্মীয়তা বা রক্তের সম্পর্ক ছাড়াই। ধর্মিতা মেয়ে সাধনাকে জ্ঞানহীন অবস্থায় উদ্ধার করে কিশোরীলাল হাসপাতালে নিয়ে যায়। পরে ঠাই দেয় নিজের ঘরে। এই গল্পে আরও একটি মেয়েকে অসুস্থ অবস্থায় দেখা যায় রেলস্টেশনে। কিশোরীলাল, রতিকান্ত, অমলজ্যোতিরা আইনের পরোয়া না করে তাকে বাঁচানোর চেষ্টা করেছে। মানুষের প্রতি মানুষের সাহায্য সহানুভূতি, আত্মিক সম্পর্ক বিমল করের গল্পে এইভাবে প্রকাশ পেয়েছে। ‘সহযাত্রী’ গল্পে শতদলের ‘বউমা’(মা)-অনুপমা ও হেমকাকার সম্পর্কও মানবিক সম্পর্কে আবদ্ধ। হেমকাকার বার্ষিকের দিনগুলিতে সাহায্য ও সহানুভূতির তাগিদে অনুপমা নিজের সংসার, পুত্র-কন্যা, সমাজ থেকে সরে এসে মানবিকতার শর্তে হেমকাকার সাথে সহাবস্থান করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। অসুস্থ, দুর্বল, অসহায় মানুষের কাছে এসে দাঁড়ানোর মধ্য দিয়ে বিমল কর মানুষের মানবিকতাকে সর্বোচ্চ মূল্য দিয়েছেন। এই মানুষেরা এই মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির জন্য সামাজিক পুরস্কার বা জয়ধ্বনির কামনা করেনি, আত্মিক স্বাবলম্বন ও বিশুদ্ধতাকেই যেন প্রকাশ করেছে। মানুষকে সাহায্য ও বিশ্বাস করার মধ্য দিয়েই ঈশ্বরতত্ত্বকে অনুভব করেছে তাঁর গল্প ও উপন্যাসের চরিত্রেরা। ‘নিশীথসঙ্গী’ গল্পে কিশোরীলালের মনে এসেছে পাদরিবাবার কণ্ঠ উচ্চারিত বাইবেলের বাণী -- “No man hath seen God at any time. If we love one another, God dwelleth in us, and his love is perfected in us.”^২

বিমল করের গল্পে যে ঈশ্বরভাবনা প্রকাশিত হয়েছে তার মর্মমূলে রয়েছে মানুষের প্রতি গভীর আস্থা ও বিশ্বাস। এর দ্বারাই তাঁর চরিত্রেরা মানুষের পাশে দাঁড়ানোর অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয়েছে। ‘মানব পুত্র’ গল্পে কেঁচু গঙ্গামণির কাছে সাহায্য ও সহানুভূতির মাধ্যমে দেবত্ব উত্তীর্ণ

হয়ে উঠেছে। অস্তুঃসত্ত্বা গঙ্গামণির সামনে তুলে দিয়েছে নিজের ভাগের খাবার। মদনবাবু গঙ্গামণিকে আক্রমণ করে সাধু সাজ্জার প্রত্যাশায় পুলিশের কাছে গেলেও কেউ গঙ্গামণিকে পরিত্যাগ করে চলে যায়নি। যিশুর ছবির দিকে তাকিয়ে মানবপুত্রের আবির্ভাবের প্রত্যাশা করেছে।

‘মানব পুত্র’, ‘বরফ সাহেবের মেয়ে’, ‘নিশীথ সঙ্গী’, ‘বুদবুদ’ এমনি বহু গল্পে খ্রীষ্টধর্মের প্রতি লেখকের অনুরাগ বর্ণিত হয়েছে। ব্যক্তিজীবনে ঈশ্বরবিশ্বাসের আচ্ছন্নতা তাঁর ছিল না। উদার ধর্মীয় মানসিকতায় তিনি মানুষ হয়েছিলেন। তাই ধর্মের আচারসর্বস্বতা তাঁর মধ্যে ছিল না। বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের বেশ কিছু অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষের খ্রীষ্টধর্মের প্রতি অনুরাগ তিনি লক্ষ্য করেছিলেন। এই কারণে কেউ, জিনি, বেলা, কিশোরীলালের মত বহু চরিত্রের খ্রীষ্টধর্মের মানবিক ভাবনার প্রতি আশ্রয় গ্রহণের প্রবণতাকে তিনি বর্ণনা করেছেন। লুক, মথি, যোহনের সমাচার পাঠ করে এবং নানা সময়ে পাদরিদের সান্নিধ্যে এসে তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন খ্রীষ্ট ধর্মের উদার মানবিক তাৎপর্য। আচার-সর্বস্বতার প্রকাশ বিহীন এই ধর্মভাবনা তাঁকে আকর্ষণ করেছিল। তাই ‘খড়কুটো’ উপন্যাসে যেমন খ্রীষ্টধর্মের কথা ব্যাখ্যাত হয়েছে, তেমনি কয়েকটি গল্পের মাধ্যমেও লেখক সেই ভাবনাকে মূর্ত করে তুলেছেন।

দাম্পত্য সম্পর্কের উপর বিমল করের বহু গল্প রচিত হয়েছে। এই গল্পগুলির মধ্যে দুটি দিক দেখা যায়। একটি শ্রেণীতে রয়েছে দাম্পত্য সম্পর্কের ভাঙনের কথা অপর শ্রেণীতে সুস্থ দাম্পত্য সম্পর্ক ও নির্ভরশীলতার কথা। বিশ্বযুদ্ধোত্তর সামাজিক পটভূমিতে যখন বেঁচে থাকার জৈবিক প্রয়োজন মুখ্য হয়ে উঠেছিল, অস্তিত্বের সংকট ক্রমে ঘনীভূত হয়ে উঠেছিল সেই সময়ে মানুষের প্রতি মানুষের অনাস্থাও কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছিল না। দাম্পত্য সম্পর্কেও তাই ফাটল লক্ষিত হচ্ছিল। আধুনিক যন্ত্রণাকাতর বিশ্বে প্রতিটি মানুষ স্বতন্ত্র বৃত্তের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে শুধু নিজস্ব চিন্তা ভাবনার মধ্যেই আবৃত হয়েছে, পার্শ্ববর্তী মানুষের সাথে তার মানসিক দূরত্ব ক্রমে বর্ধিত হয়ে গেছে। ‘জানোয়ার’ গল্পে সুধীবন্ধু সোম ও তার স্ত্রী অতসীর মধ্যে জন্ম নিয়েছে ঘৃণা ও প্রতিশোধম্পৃহা। অতসী স্বামীর অমানবিক ব্যবহারে ক্ষুব্ধ হয়ে আত্মবঞ্চনার মাধ্যমে প্রতিবাদ ধনিত করে তুলেছে। ‘বাঘ’ গল্পেও শচী ও অচিন্ত্য পৃথক জগতের বাসিন্দা হয়ে উঠেছে একই ছাদের তলায় থেকেও। ‘পালকের পা’ গল্পে মিত্রসাহেব ও তুষারকণা, ‘শীতের মাঠ’ গল্পে অতসী ও নবেন্দু, ‘আয়োজন’ গল্পে মনোবীণা ও পশুপতির সম্পর্ক প্রভৃতি বহু উদাহরণ উপস্থাপিত হতে পারে দাম্পত্য সম্পর্কের ক্রমক্ষীয়মান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে। এই চরিত্রগুলি

মানসিক চাহিদার তাগিদে ক্রমশ মানসিক অসুস্থতার শিকার হয়ে উঠেছে। মনস্তত্ত্বের গূঢ় আবর্তনের জালে এরা নিজেরাই বন্দী হয়ে এক যন্ত্রণাময় পৃথিবীর বাসিন্দা হয়ে উঠেছে। পরিবারতন্ত্রের ভাঙন, দাম্পত্য সম্পর্কের জটিলতা, প্রেমাস্পদের প্রতি সন্দেহপ্রবণতা এবং তার নিরিখে আত্মপ্রবঞ্চনার রূঢ়, বিসদৃশ জগতে কেন্দ্রীভূত হওয়ার ঘটনায় সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে এই গল্পগুলি। একান্ত বাস্তবসম্মতভাবে মানুষের মনস্তাত্ত্বিক জটিলতাকে লেখক রূপ দিয়েছেন এই গল্পগুলিতে, যা সমকালীনতার চিত্র হয়ে উঠেছে।

দাম্পত্য সম্পর্কের এই জটিলতার চিত্র অঙ্কনের পাশাপাশি লেখক, দাম্পত্য সম্পর্কের সুস্থ সাবলীল, বিশ্বাসবোধের চিত্রও প্রকাশ করেছেন এবং লেখকের প্রবণতাও আবর্তিত হয়েছে এই বিশ্বাসের চিত্র রচনায়। সনাতন ভাবধারার প্রতি তাঁর ঔৎসুক্য ছিল। দাম্পত্য জীবনে নারী-পুরুষের মধ্যে আস্থা ও বিশ্বাসবোধের শক্ত জমি তিনি প্রোথিত করতে চেয়েছেন। পারস্পরিক নির্ভরশীলতার ছবি পরিলক্ষিত হয় ‘সোপান’ গল্পের সুরেশ্বর মজুমদার এবং তাঁর স্ত্রীর মধ্যে, ‘তুচ্ছ’ গল্পের বরদা ও কাননের মধ্যে, ‘সুখ’ গল্পের বরদাকান্ত এবং সুবর্ণ কিংবা ‘এরা ওরা’ গল্পের হেমদাকান্ত ও সুশীলার মধ্যে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই লক্ষ্য করা যায় দাম্পত্য জীবনের পারস্পরিক নির্ভরশীলতার যে ছবি লেখক প্রয়োগ করেছেন তাঁর গল্পে, তাঁরা প্রৌঢ় কিংবা বৃদ্ধ দম্পতি। বয়স বাড়ার সাথে সাথে মানসিক আশ্রয় লাভের মধ্য দিয়ে তাঁরা বেছে নিয়েছেন তাঁদের জীবনসঙ্গী ও সঙ্গিনীকে। দীর্ঘ দাম্পত্য জীবনের ভালবাসা ও বিশ্বাসের সুর বয়স বাড়ার সাথে সাথে আরও যেন নিবিড় হয়ে উঠেছে। একজনের ব্যতিরেকে অপর জনের উপস্থিতি যেন ভয়াবহ নিয়ে এসেছে। এই পর্যায়ে ‘সংশয়’ গল্পের সুধাকান্ত ও সুনয়নীর কথাও উল্লেখ্য। মৃত্যুর আবহ এখানে তাঁদেরকে পীড়া দিয়েছে। সুধাকান্ত শেষ বিদায়ের সময় সুনয়নীর কাছে কী উপহার পেতে পারেন তা তার মনে জিজ্ঞাস্য হয়ে উঠেছে-- “আমি যদি আগে যাই তুমি আমায় কি দেবে?”^৩ আবার ‘সুখ’ গল্পে শুভেনের কল্পনার মাধ্যমে দেখা যায়-- সুবর্ণর শেষ যাত্রার চিত্র-- “বরদাকান্ত পিছু পিছু চলেছেন। আন্তে আন্তে, একা একা, চোখ দুটি খাটের দিকে।”^৪ ‘তুচ্ছ’ গল্পেও স্বামী-স্ত্রীর অঙ্গাঙ্গি সম্পর্ক তাদের জাগতিক জীবনকে করে তুলেছে মধুর, স্বচ্ছন্দ, অবিনাশী প্রেমের সৌন্দর্যে উজ্জ্বল-- “এ রকম হয় সংসারে, হয়, আপন জনের মধ্যেও একজন কেমন করে যেন আরও আপন হয়ে ওঠে, নিজের হৃদয়ের সবটুকু জায়গা জুড়ে নেয়, মিশে যায় সর্বাস্থে। কখনও কখনও মনে হয়, অন্য মানুষটির নিঃশ্বাস নিজের বকের মধ্যে থেকে উঠে এল।”^৫

আধুনিক জীবনের চাওয়া-পাওয়ার আর্তি যেখানে থবল, স্বার্থপরতার, কৃতঘ্নতার আবিলতা যেখানে দাম্পত্য জীবনের মধ্যেও চিড় ধরিয়ে দিচ্ছে, ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল নর-নারী যেখানে নিজস্বভাবনায় বন্দী থেকে একবিম্বু জমি ছাড়তে রাজি নয়, সংসারে অধিকার বলবৎ করার প্রচেষ্টায় একে অপরকে টেকা দেওয়ার চেষ্টা করেছে, সে জায়গায় বিমল করের গল্পে দাম্পত্য জীবনের পারস্পরিক বন্ধনের ছবি জীবনের আস্থা-বিশ্বাসের সুরকে প্রতিফলিত করতে চেয়েছে। সমকালীন গল্পকার কিংবা কবিরা হতাশার ছবির মধ্যেও জীবনের সনাতন সুরকে খুঁজে নেওয়ার প্রত্যাশা করেছিলেন অতীতচারণার মাধ্যমে, নস্টালজিক চিন্তার বন্ধনে, ইতিহাস চেতনার অলিন্দে। অতীতকে গৌরবান্বিত করে বর্তমানের সাথে তার তুলনা করে বর্তমান জীবনের ক্লীবত্বকে প্রকাশ করেছিলেন। বিমল কর বর্তমানের মধ্যেই দেখালেন জীবনের সেই বিশ্বাস ও প্রত্যয়। জীবনে পথ চলার মাধ্যমেই তাঁর সৃষ্ট চরিত্রেরা খুঁজে পেল স্থির বিশ্বাসের ও প্রত্যয়ের জমি। আত্মশুদ্ধির আকুলতায় তারা নিজেদের পরিবর্তিত করতে চাইল। ধূসর অতীতের থেকেও অনেক বেশি গ্রহণযোগ্যতা পেল চোখে দেখা জগতের বাস্তব উদাহরণ। ‘সুখ’ গল্পে শুভেন ও মীনার মধ্যে সেই আত্মশুদ্ধির প্রবণতা লক্ষিত হল। বরদাকান্ত ও সুবর্ণের দাম্পত্য জীবনের প্রেম ও সহযোগী মানসিকতা তাদের মনে আত্মানুসন্ধানের ভাবনাকে জাগ্রত করে তুলল। ‘সোপান’ গল্পে হেমদা এবং রেণু’র দাম্পত্য সম্পর্কের ভাঙনের পাশাপাশি সুরেশ্বর মজুমদার এবং তাঁর স্ত্রীর দাম্পত্য বন্ধনকে লেখক তুলনামূলক স্তরে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

বিমল করের গল্পে মনস্তাত্ত্বিকতার প্রভাব তাঁর জীবনদৃষ্টির একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। আধুনিক সাহিত্যে মনস্তত্ত্বের প্রাধান্য থাকলেও বিমল কর বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে তাঁর গল্প ও উপন্যাসে মনস্তত্ত্বের গূঢ় ভাবনাকে প্রকাশ করেছেন। তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলি তাদের মনস্তত্ত্বের কারণেই অন্তর্দ্বন্দ্বের ক্ষতবিক্ষত হয়েছে, স্বকীয় ভাবনায় বিশ্লেষিত হয়েছে। কখনও বা মনস্তত্ত্বের কারণে সংবেদনশীল মানুষে পরিণত হয়েছে, আবার কখনও বা জনসমুদ্রের মধ্যেও হয়ে উঠেছে নিঃসঙ্গ। অন্তর্লোকের জগৎ প্রতিটি মানুষের কাছে যেমন চেনা, তেমনি অচেনা। এই অচেনা জগতে সে পদার্পণ করতে না পারলেও, তার দ্বারা চেতন স্তরেই সে প্রভাবিত হয়ে পড়ে নিজের অজ্ঞাতেই ভুলের শিকার হয়। আবার কখনও মনের সুপ্ত বাসনা মানুষের অন্তরকে কুরে কুরে খায়, তাকে ব্যথাদীর্ণ করে তোলে। তাই আধুনিক লেখক হিসেবে বিমল কর অন্তর্লোকের অপতিরোধ্য জগৎকে বিশেষ মূল্য দিয়েছেন তাঁর গল্পের মাধ্যমে। মানুষের টুকরো টুকরো ইচ্ছা-অনিচ্ছা, কামনা-বাসনা যা মনস্তত্ত্বের

জটিলতায় জীবনের অর্থকে বদলে দিতে পারে সেই ছোট অথচ গভীর ভাবনাগুলি তিনি তাঁর গল্পে ফুটিয়ে তুলেছেন। ছোটগল্পের ‘Singleness of aim’ শর্তের অনুসারী করে তাঁর ভাবনাগুলিকে তিনি জীবন্তভাবে উপস্থাপিত করেছেন। এই গল্পগুলিতে যেমন যুক্তির প্রাধান্য প্রকাশিত হয়েছে, তেমনই মানব মনের রহস্যময়তা হাজার জিজ্ঞাসা নিয়ে এসেছে। মানব মনের এই অনালোকিত অধ্যায় তাঁর গল্পগুলিকে দিয়েছে স্বাতন্ত্র্য।

‘মোহনা’ গল্পে মোহনার মুখে শোনা গিয়েছিল অন্তর্চারী সেই মানুষের কথা, যাকে বাইরে থেকে উপলব্ধি করা যায় না। “আমি ভাই মনটাকে একটা মানুষ বলি--ভেতরের মানুষ। তুই কোনদিন তার গোটা চেহারা দেখতে পাবি না, তাকে ভাল বুঝবি না, অথচ সে তোকে আড়াল থেকে কোথায় যে চালিয়ে নিয়ে যাবে তুই জানিস না।”^৬ --এই ‘ভেতরের মানুষের’ দ্বারাই মানুষ পাপ-অন্যায়ের পথে ব্রতী হয়। কখনো তার জন্য মনে অনুশোচনা জাগে, কখনও বা জাগে আত্মশুদ্ধির আকুলতা। বিমল কর লিখেছিলেন, “ফ্রয়েডের তত্ত্ব, পাপ তত্ত্ব, শয়তানের তত্ত্ব -- একথা যদি বলেন এবং প্রশ্ন করেন, এতো পাপ লুকিয়ে নিয়ে আমরা আছি? শারকের একটি প্রিয় কথা ব্যবহার করে ফ্রয়েড যে জবাব দিতেন আমাকেও সেই জবাব দিতে হবে-- ‘That dose not keep it from existing’ যা আছে তা হয়তো দুর্বিসহ কিন্তু যা আছে তার অস্তিত্ব অস্বীকার করবার নয়।”^৭ --বিমল কর মনস্তত্ত্বের এই গূঢ় জটিলতাকে তাঁর গল্পে রূপ দিয়েছেন। জগদীশ গুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনায়ও ফ্রয়েডের মনোবিকলন তত্ত্ব, স্বপ্ন-তত্ত্ব বিশেষ স্থান করে নিয়েছিল। কিন্তু বিমল কর মানুষের মনের অনালোকিত জগতে সন্ধানী আলো ফেলার চেষ্টা করেছেন।

“ইদুর” গল্পে মলিনার সাথে যতীনের দাম্পত্য সম্পর্ক সুখের। তবুও ইদুর-রূপী অবৈধ কামনা কেমন ভাবে তার মনে এসে তার সর্বনাশ ঘটানোর চেষ্টা করেছে তা মলিনার কাছে অজানা। যতীনের অনুপস্থিতি বাসুদেবের প্রতি তাকে উৎসাহী করে তোলার পরিবেশ রচনা করেছিল। অবচেতন মনে বাসুদেবের প্রতি তার যে কামনার প্রশ্ন ছিল তা সুপ্ত, তবুও তারই কারণে সে ইদুরকলে বাধা পড়ে তার অন্তর স্বরূপ কে চিনে নিতে পেরেছে। ‘বকুল গন্ধ’ গল্পে অঞ্জনা বিবাহিত জীবনেও শ্যামলের প্রতি তার অনুরাগকে চাপা দিতে গিয়ে অবচেতনের দ্বারা চালিত হয়ে নিজের কাছেই নিজে রহস্যময়ী হয়ে ওঠে। ‘পলাশ’ গল্পে রতিকান্ত বিনুর প্রতি স্বামীসুলভ ভালবাসা টিকিয়ে রেখেও উমার প্রতি গোপন ভালবাসায় ক্ষতবিক্ষত হয়। ‘সুধাময়’

গল্পে সুধাময় রাজেশ্বরী, হৈমন্তীর মধ্যে খুঁজে ফেরে ভালবাসা ও পূর্ণতার তত্ত্ব। সুধাময়ের মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব তাকে মানসিক দিক দিয়ে স্থিরতা দেয় না, ‘আমরা তিন প্রেমিক ও ভুবন’, ‘সম্পর্ক’, ‘আয়োজন’, ‘গুণেন একা’ এই রকম বহু গল্পে চরিত্রগুলির মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব তাদের চেনা পৃথিবীর মধ্যেও অচেনা করে তুলেছে। প্রাত্যহিক জীবন থেকে তারা ক্রমশ নিঃসঙ্গতায় ডুবে গেছে। কখনও এই সূত্রে তাদের মনে এসেছে বিষণ্ণতা, মৃত্যুভাবনা, মৃত্যুভয়।

মৃত্যুভাবনা বিমল করের সাহিত্যের একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণ। পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে তিনি যে মৃত্যু দেখেছিলেন তার মাধ্যমে মৃত্যুভয় তাঁর মনে বিশেষ স্থান করে নেয়। চল্লিশের দশকে যুদ্ধ-দাঙ্গা-মন্বন্তরে অজস্র মানুষের মৃত্যু যেমন তিনি দেখেছিলেন, তেমনি ব্যক্তি জীবনেও তিনি উপলব্ধি করেছিলেন জীবনের অনিশ্চয়তা। মৃত্যু যে কোন মুহূর্তে মানুষের জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটাতে পারে, শেষ হয়ে যায় সমস্ত আকাঙ্ক্ষার প্রতি দুর্বলতা, মৃত্যু এখানে নিয়তির স্বরূপে দেখা দিয়েছে। মানুষের জীবনের উপর তার ভয়ঙ্কর ক্ষুধার পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করেছেন লেখক। ‘অপেক্ষা’ গল্পে শিবতোষ ঘুমন্ত স্ত্রীর প্রতি তাকিয়ে নিজের মনে মনে ব্যক্ত করতে চেয়েছে, “আমাকে বুকের কাছে এক মুঠো গোঞ্জি ধরে তুমি আমায় আটকে রাখবে কমলা।... আমি ভুবনের মতন এই মুহূর্তে চলে যেতে পারি। তুমি মুঠো খুলবে যখন, তখন দেখবে আমি নেই।”^৮ লেখকের মনে মানুষের জীবন এই রূপ ক্ষণস্থায়ী এবং অনিশ্চিত স্বরূপে ধরা দিয়েছে। মুঠো ভরে ধরে রাখার প্রত্যাশা থাকে মানুষের আবার মুঠো খোলার সাথে সাথে যেন হারিয়ে যায় সহসা সেই আকাঙ্ক্ষিত জীবন। ‘অশ্বখ’ গল্পে রেণুর বুক খালি করে চলে গেছে তার সন্তান — রেণুর জীবনে নেমে এসেছে হাহাকার, যন্ত্রণার ভারী পাথর। ‘নিষাদ’ গল্পে জলকু ক্রমশ এগিয়ে গেছে নিয়তিরূপী মৃত্যুর কাছে। আবার প্রথমদিকে লেখা গল্প ‘অধিকানাত্মের মুক্তি’তে জাগতিক বন্ধন ছেড়ে যে মানুষটি মৃত্যুর কাছে যেতে চায় না, তারও ঘটে অনিবার্য মৃত্যু।

এই মৃত্যুভাবনায় বিমল করের গল্পে কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। পঁচের দশক থেকে তাঁর গল্প অনেক বেশি বিশ্লেষণমুখী হয়ে ওঠে এবং নানা দার্শনিক জিজ্ঞাসা তাঁকে আলোড়িত করে তোলে। প্রথম দিকের গল্পে যে মৃত্যুর চিত্র রয়েছিল, তা জাগতিক মৃত্যু — তা স্বাভাবিক, বিধিবদ্ধ। কিন্তু পরবর্তী কালে মানব চরিত্র, মানবমন ও মানবজীবন নিয়ে নানা জিজ্ঞাসায় আলোড়িত বিমল কর উপলব্ধি করলেন আধুনিক জীবনের যন্ত্রণা, অসহায়তা, ক্লীবতা। এখানে বৈচে থাকা মৃত্যুর মত ভয়াবহ। জীবনের যথার্থ মানে খুঁজে ফেরা মানুষ অসহায় ভাবে নিজেকে

শেষ করে দিচ্ছে প্রবহমান সময়ের কাছে। আত্মানুসন্ধানের প্রয়াস বার বার দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পথ হারাচ্ছে। ‘সুধাময়’ পর্বে এসে বিমল কর কিছুটা পথ খুঁজে পেলেন। ‘সুধাময়ে’র মধ্যে এই অন্তর্বেশন পর্ব শেষ হয়নি বটে তবুও মনের মধ্যে জাগ্রত হয়েছে বিশ্বাস ও প্রত্যয়। “সুধাময়’ গল্পের পর থেকে কয়েক বছর আমি যা লিখেছি তার বার আনাই দ্বিধা, সংশয়, ভয়, এবং উদ্বেগ অসহায়তার কথা। তার গ্লানি এবং পাপের কথা,”^{১০} --তাই পরবর্তী গল্পগুলির মধ্যে মনস্তত্ত্বের গভীরে প্রোথিত মানুষের মনের হতাশা, দ্বিধা, সংশয় চরিত্রগুলির মাধ্যমে রূপ পেয়েছে। ‘সংশয়’, ‘অপেক্ষা’, ‘জননী’, ‘সোপান’ প্রভৃতি বহু গল্পে মনস্তাত্ত্বিকতার পাশাপাশি মৃত্যু সম্পর্কিত ভাবনা রূপ পেয়েছে।

কিছু মৃত্যুর ঘটনাপ্রবাহ চরিত্রের আত্ম-আবিষ্কারের প্রবণতার সাথে একাত্ম হয়ে গেছে। কখনও বা ধ্রুব-সনাতন বিশ্বাসকে আঁকড়ে রেখে নিজেকে স্বচ্ছ, নিশাপ প্রমাণ করার তাগিদ প্রদর্শিত হয়েছে চরিত্রগুলির মধ্যে। ‘আত্মজা’ গল্পে মানসিক ভাবে ক্ষতবিক্ষত হিমাংশু নিজের নিশাপ মনকে প্রকাশ করতে চেয়েছে। মেয়ের প্রতি তার দুর্বলতা যৌন-কেন্দ্রিক নয়। তবুও বাইরের মানুষের দ্বারা আরোপিত ‘কমপ্লেক্স’ -এর দায় থেকে সে নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা করেছে। পুতুলের প্রতি তার ভালবাসাকে সে কালিমা-লিপ্ত করতে চায় না। কারণ যে মুহূর্তে তার মনে সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছে, সেই মুহূর্তে সে সন্দেহাতুর মনকে খুন করতে চেয়েছে নিজে আত্মঘাতী হয়ে। ‘হেমাস্পের ঘরবাড়ি’ গল্পে হেমাস্প আত্মহত্যা করেছে কারণ সে পায়রার কৃত্রিম মানসিকতার মধ্যে বাঁচতে চায় নি। জীবনে বেঁচে থাকার সাধ তার মিটে গেছে যখন জীবনের স্বাভাবিকত্ব নষ্ট হয়েছে বলে তার বিশ্বাস জন্মেছে। তাই এই গল্পগুলিতে আত্মহত্যা দেখানো হলেও তা জীবন থেকে পালিয়ে যাওয়ার প্রবণতার অনুসারী নয়। স্বচ্ছ, ধ্রুব, অকৃত্রিম জীবনবোধের প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ হওয়ার প্রচেষ্টা দেখা দিয়েছে।

বিমল কর অবশ্য হিমাংশু বা হেমাস্পের মধ্যে সমস্যার বিরুদ্ধে জয়ী হয়ে বেঁচে থাকার পথ দেখাননি, তাদের কাছে মৃত্যু আশ্রয় হয়ে গেছে। মৃত্যু তাদের কাছে প্রতিবাদের পথ হিসেবে গৃহীত হয়েছে। কারণ তাদের সমস্যাসঙ্কুল জীবনে বেঁচে থাকাতো শুধুই বাঁচার লক্ষণ হয়ে থাকতো। সচেতন, শুভবাদী মানুষ আত্মিক ভাবেও বেঁচে থাকতে চায় -- সেই বেঁচে থাকতেই সুখ -- সেই বেঁচে থাকাই মানুষের মত বাঁচা। তিনি স্বীকার করেন -- “মৃত্যুর ইচ্ছা বা ডেথ্ উইস এ যুগে একটা মারাত্মক, বিস্তৃত ব্যাধির মতন জগৎকে ছেয়ে ফেলেছে -- ...এর দুটি কারণ সম্ভব। এক

আত্ম সংরক্ষণে অতিসচেতন এ যুগের মানুষ হয় নিরন্তর কোন কোন পাপ বোধের সঙ্গে অন্তর্দ্বন্দ্বিতা বিক্ষত হয়ে শেষ পর্যন্ত শান্তির আশায় মৃত্যুবরণ করতে চাইছে। আর না হয় একালের সমাজ-রাষ্ট্রজীবনে সর্বতোভাবে হতাশ, বীতশ্রদ্ধ হয়ে নিরুপায় সান্ত্বনা হিসেবে অনেকটা আত্মহত্যার সামিল, চোখ কান বুজে ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইছে মৃত্যু গহ্বরে।... বলতে কি এমন একটি ভৌতিক যুগে আমরা বাস করছি-যে যুগে সব কিছু টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়ছে। বিশ্বাস, নীতি, ধর্ম, কল্যাণবোধ, জীবন সৌন্দর্যের ধ্যান-- কী না।’’’’ তবুও এই ছবির পাশাপাশি জীবনের প্রতি অনুরাগও তাঁর কয়েকটি গল্পে প্রদর্শিত। ‘নদীর জলে ধরা ছোঁয়ার খেলা’ গল্পে নন্দকিশোর মৃত্যুকে ফাঁকি দিতে চেয়েছে জীবনেরই তাগিদে।

অর্থাৎ জীবন যতই দুর্ভর হয়ে উঠুক না কেন মানুষ বেঁচে থাকার প্রচেষ্টায় তাকে আরও রঙিন আরও সুন্দর করে গড়ে তোলে এই তথ্য লেখক পরিবেশন করেছেন। অর্থাৎ বিমল করের গল্পে একটি বিশেষ প্রবণতা উপলব্ধ হয়, তা হল, তিনি জীবনের প্রতি অনুরাগ পোষণ করেছেন। কিন্তু সেই জীবন চেয়েছেন সুন্দর, শুভময়, আনন্দস্বরূপে। আধুনিক জীবনের যন্ত্রণার আবহ থেকে তাই তিনি জীবনকে দিতে চান অমৃতের আনন্দ-- বেঁচে থাকার উন্মাদনা। শুধুই ধ্বংস বা ক্ষয়িষ্ণুতা নয় মূল্যবোধের প্রতি চিরন্তন দুর্বলতা, মানুষের প্রতি মানুষের সাহায্য, সহানুভূতি তাঁর বহু গল্পেরই বিষয় হয়ে উঠেছে। তাঁর সৃষ্ট কিছু চরিত্র তাদের কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনা করেছে, পাপবোধে আক্রান্ত হয়ে নিজেকে পরিবর্তিত করার চেষ্টা করেছে-- এখানেই প্রকাশিত হয়েছে মানবিক মূল্যবোধ। ‘নিষাদ’ গল্পের কথক অন্তর্দ্বন্দ্বিতা বিক্ষত হয়ে জলকুর মৃত্যুর জন্য নিজেকে দায়ী করে অনুশোচনায় দগ্ধ হয়েছে। ‘আমরা তিন প্রেমিক ও ভুবন’ গল্পে তিন প্রেমিক শিবানীর মৃত্যুর পর তাদের দায় স্বীকার করে মৃত আত্মার কাছে হয়ে উঠেছে ক্ষমাপ্রার্থী।

মৃত্যুভাবনার পথ ধরেই বিমল করের গল্পে দেখা দিয়েছে পরাবাস্তব জগৎ ও ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য জগতের মধ্যে একাত্মতা। অনেক সময় প্রকৃতি প্রতীকের মর্যাদায় আবির্ভূত হয়ে উঠেছে তাঁর গল্পে ও উপন্যাসে এবং চরিত্রের পরাবাস্তব জগতের সাথে সেতু নির্মাণ করেছে। ‘অপেক্ষা’ গল্পে শিবতোষ প্রকৃতির মধ্যে খুঁজে পায় একাকিত্ব ও নিঃসঙ্গতার আবহ। প্রকৃতির নিম্নত্ব যেন মৃত্যুর রূপকে তার কাছে হাজির হয়, নিয়তির মত প্রবল রূপ ধরে এগিয়ে আসে ‘ঝড়ো হাওয়া’। আবার শিবতোষের মনে হয় নীচের সদর দরজায় কেউ কড়া নাড়ছে, তার মন অজানা আতঙ্কে শিউরে ওঠে। চেতন জগৎ ও পরাবাস্তব জগৎ এই ক্ষেত্রে একাত্ম হয়ে গেছে। ‘নিষাদ’ গল্পে

অবচেতনের দ্বারা আড়িত হয়ে গল্প-কথক টিলার উপর উঠে এসেছে, যেখান থেকে রেললাইন দেখা যায় — জলকু যেখানে মারা গেছে। তাঁদের আলোর স্বচ্ছতার সাথে সাথে তার মনেও স্বীকারোক্তির আকুতি জেগে ওঠে, জলকুর মৃত্যুর কারণ কিছুটা হলেও সে-ই। ‘শীতের মাঠ’ গল্পের নবেন্দুর মনের নিঃসঙ্গতার সাথে মিলে যায় প্রকৃতির আবহ। স্বপ্ন-কামনা-অবচেতনের দ্বারা নবেন্দুর জগৎ আবর্তিত হয়। ‘গুণেন একা’ গল্পে আত্মরক্ষার তাগিদে ছুটে চলা গুণেন অনুভব করে বুনা কুকুর তার দিকে এগিয়ে আসছে, আসলে তা কুকুর নয়, গুণেনের পরাবাস্তব জগতে জাগ্রত মূল্যবোধ। মানসিক অন্ধকারের মধ্যে সেই মূল্যবোধ জেগে থেকে গুণেনকে ফিরিয়ে আনে তার প্রকৃত অবস্থানে। ‘সোপান’ গল্পেও দেখা যায় অন্ধকারের মধ্যে পথ খুঁজে ফেরে বাঁচার অভিনায়ে আক্রান্ত মানুষেরা। এই অন্ধকার প্রবৃত্তির অন্ধকার, যেখানে জীবনের শুভবোধ, সঠিক মূল্যবোধ খুঁজে পাওয়া যায় না। বাস্তব-পরাবাস্তবের পাশাপাশি অবস্থান বিমল করের গল্পকে সমকালীন গল্পকারদের সৃষ্টি থেকে স্বাভাবিক দিয়েছে --একথা বলা যায়।

বিমল করের গল্পে ব্রাত্যজীবনের ছবিও তাঁর জীবনদৃষ্টির বৈচিত্র্যকে প্রকাশ করেছে। অন্ত্যজ শ্রেণীভুক্ত মানুষেরা তাদের জীবনের তাগিদ ও প্রত্যাশা নিয়ে সমাজের অংশ হয়ে বেঁচে থাকতে চেয়েছে। কিন্তু তাদের জীবনের প্রতিষ্ঠা বারবার ব্যাহত হয়েছে সভ্যসমাজের আক্রমণে। ‘মানবপুত্র’ গল্পে কেঁট বা গঙ্গামণি সমাজে শোষিত, বঞ্চিত হয়েছে। ‘আঙুরলতা’ গল্পে আঙুরলতা সমাজের সভ্যমানুষদের কাছে অস্পৃশ্য হয়ে উঠেছে, কিন্তু তার মধ্যে দিয়ে লেখক যে মানবিক মূল্যবোধ প্রকাশ করেছেন, জীবনের প্রকৃত রূপ ও রহস্যকে বিশ্লেষণ করেছেন তাতে আঙুরলতা ব্রাত্য হতে পারেনা -- সভ্য সমাজের সচেতন নাগরিক হয়ে উঠতে পারে। তবুও কেঁট কিংবা আঙুরলতা এই সমাজের যুপকাঠে বলি-প্রদত্ত হয়েছে। ‘বুদবুদ’ গল্পে বেলা মনডিয়াল সভ্য সমাজে গৃহীত হয়নি ধর্মিতা নারী বলে। ‘বরফ সাহেবের মেয়ে’ গল্পে জিনি খ্রীষ্টান হওয়ার কারণে হিন্দু অভিজাত সমাজে স্থান পায়নি। ‘সাদা কালো’ গল্পেও ব্রাত্যজীবনের ছবি লেখক অঙ্কন করেছেন। এই সকল নারী-পুরুষেরা ধর্মগত কারণে ও আর্থিক মানদণ্ডে সাধারণ মানুষের সমাজে স্থান পায়নি। এদের প্রতি লেখকের অনুরাগ বর্ণিত হয়েছে। লেখক তাদের জীবনযুদ্ধের মাধ্যমে স্বচ্ছ মানবিক প্রত্যয়কে রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছেন।

এছাড়াও বিমল করের গল্পে কিছু মানুষকে লক্ষ্য করি যারা সমাজ ও পরিবার থেকে নিজেদের ব্রাত্য মনে করেছে। সামাজিক মানুষদের তাদের প্রতি উপেক্ষা, বঞ্চনা তাদের স্থাপিত

করেছে ভিন্নতর জগতে। ‘এরা ওরা’ গল্পের বৃদ্ধ দম্পতি-- হেমদাকান্ত-সুশীলা, ‘তুচ্ছ’ গল্পের বরদা-কানন, ‘সুখ’ গল্পের বরদাকান্ত-সুবর্ণ পরবতী প্রজন্মের কাছে গ্রহণযোগ্যতা পায়নি, গুরুত্ব পায়নি। এঁদের পুত্র-কন্যা-পুত্রবধূরা দূরত্ব সৃষ্টি করতে চেয়েছে। পারিবারিক জীবনের ভাঙন পরিবারতন্ত্রের ক্ষয়িষ্ণুতা এখানে যেমন কার্যকরী তেমনি পরবতী প্রজন্মের আত্মস্বার্থলোভী মানসিকতার দ্বারা উপেক্ষিত হয়ে নিঃসঙ্গ জগতে পতিত হয়েছে এই চরিত্রগুলি। যুগজীবনের প্রভাব এই ঘটনার ক্ষেত্রে যথেষ্ট দায়ী তা বলা যেতে পারে।

রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি বিমল করের গল্পে প্রভাব না ফেললেও সমকালীনতার নিরিখে নকশাল আন্দোলনের পরিস্থিতির সাপেক্ষে তিনি কয়েকটি গল্প লেখেন, যেখানে মানবিক মূল্যবোধই বেশি মাত্রায় প্রদর্শিত হয়েছে। ‘ওরা’, ‘সে’, ‘নিগ্রহ’ প্রভৃতি গল্পে সেই মানবিক মূল্যবোধের পতন দেখানোর পাশাপাশি আত্মানুসন্ধানের প্রয়াস চরিত্রগুলির মধ্যে লক্ষিত হয়েছে।

বিমল কর যে প্রেম মনস্তত্ত্বের ছবি তাঁর গল্পে ফুটিয়ে তুলেছেন, সেখানে মানবিক সম্পর্কের পতনের চিত্র থাকলেও প্রকাশিত হয়েছে সনাতন আদর্শবাদী প্রেমের প্রতি আকাঙ্ক্ষা। দাম্পত্য সম্পর্ক, মানবিক সম্পর্কের টানাপোড়েনেও লক্ষিত হয়েছে ভালবাসার ইতিবাচক মধুর রূপ। বিশ্বাস, সহযোগিতার মাধ্যমে তা উজ্জ্বলতা পেতে চেয়েছে। অশ্লীলতার আমন্ত্রণে তাঁর গল্প কুলষিত নয়। ‘মোহনা’ গল্পে দেহ ভোগের কথা বর্ণিত হলেও একটি নারীর ব্যক্তিসত্তার তীব্রতা সেখানে উপস্থিত। অন্তঃসারশূন্য পুরুষদের সান্নিধ্য থেকে সে নিজেকে বাঁচিয়ে উদ্দীপ্ত হতে চেয়েছে নারীত্বের অঙ্গীকারে। ‘আমরা তিন প্রেমিক ও ভুবন’ গল্পেও দুইজন প্রেমিকের মুখ থেকে শিবানীকে দেহভোগের স্মৃতি রোমন্থন করতে দেখা যায়। কিন্তু এক্ষেত্রেও লক্ষিত হয় শিবানীর বেঁচে থাকার আকাঙ্ক্ষা। অসহায় জীবনে সে পুরুষের সান্নিধ্য লাভ করতে চেয়েছে বিবাহিত জীবনের প্রতিশ্রুতিতে, কিন্তু সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেনি তার বন্ধুরা। ‘আয়োজন’ গল্পে দীর্ঘ সময় ধরে মনোবীণা শারীরিক উদ্দামতা প্রকাশ করতে চেয়েছে পশুপতির কাছে। প্রৌঢ়ত্বে আসীন দাম্পত্যজীবনে সন্তানের জন্য আকাঙ্ক্ষা মনোবীণার মনে তীব্র হয়েছে। মস্তপুতঃ তাবিজ ধারণ করে সে তার স্বামীর সান্নিধ্য চেয়েছে। সঠিক লগ্নে মিলনের আকাঙ্ক্ষা তার কাছে একমাত্র লক্ষ্য ছিল, তাই তার মিলনের প্রতি এত আয়োজন, যার মর্মমূলে শুধুমাত্র যৌনতার দাবি ছিল না। বিমল কর সুস্থ-স্বাভাবিক প্রেম ভাবনার দ্বারাই আবর্তিত হয়েছেন। তাঁর গল্পে তাঁর সেই রুচিবোধেরই প্রকাশ ঘটেছে।

উপন্যাসের আলোচনায়ও দেখা যায় বিমল কর তাঁর জীবন ও জগৎ সম্পর্কে যে দৃষ্টি তা স্বচ্ছভাবে প্রকাশ করতে চেয়েছেন। ‘দেওয়াল’ উপন্যাসে ১৯৪১ থেকে ১৯৪৫ সালের অশান্ত, বিক্ষুব্ধ, আতঙ্কগ্রস্ত সমাজের প্রতিচ্ছবি ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন। গিরিজাপ্রসাদের রাজনৈতিক ভাবনা সুখা, বাসু, রত্নময়ী প্রমুখের সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি সুচারু নিখিল অবনীর্ জগৎ ও জীবন সম্পর্কে ভাবনা তৎকালীন সময়ের দলিল হয়ে উঠেছে। ‘যদুবংশ’, ‘অসময়’, ‘নিমফুলের গন্ধ’ প্রভৃতি উপন্যাসে তৎকালীন মানুষের ছবি বিশ্বাসযোগ্য ভাবে তাদের জীবনের আকাঙ্ক্ষা ও প্রাপ্তির নিরিখে বর্ণিত হয়েছে। ‘পূর্ণ অপূর্ণ’ উপন্যাসটি বিমল করের জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে তাঁর দার্শনিক ভাবনাকে প্রকাশ করেছে। সুরেশ্বর যে জীবনের পূর্ণতা খুঁজতে চেয়েছিল তার কাছে সেই পূর্ণতা ধরা দেয়নি। অপূর্ণতার মধ্যেই পূর্ণতাকে খুঁজে বেড়াতে গিয়ে মানুষ যখন অসহায় হয়ে ওঠে তখন তার কাছে সান্ত্বনা হয়ে আসে মানবিক সম্পর্কের বন্ধন, কর্মযোগের মহান ব্রত। তুচ্ছ, ক্ষুদ্র এই জীবনে আকাঙ্ক্ষাময় পূর্ণতাকে লাভ করা যায় না। তৃপ্ত হতে হয় সীমাবদ্ধতার মধ্যেই। ‘খড়কুটো’ উপন্যাসে মৃত্যুযন্ত্রণার ক্ষেত্রে উপশম হয়ে এসেছে খ্রীষ্টধর্মের বাণী। যে বাণী মানবিক হৃদয়ের গভীরে আশাবাদ সঞ্চারী। ভালবাসার মাধ্যমে মৃত্যুকে জয় করার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পেয়েছে অমর কিংবা অমলের মাধ্যমে। ‘খোয়াই’ উপন্যাসে লেখক অন্ত্যজ শ্রেণীর একটি মানুষের মধ্যে জীবনানুরাগ দ্যোতিত করে তুলেছেন।

বিমল করের উপন্যাসে বিস্তৃত পরিসরে জীবনের অর্থবহতাকে উপলব্ধি করার প্রয়াস রয়েছে। আমরা জানি ছোটগল্পের থেকেও উপন্যাসে জীবনদৃষ্টির বৈচিত্র্য ও পরিধি সুদূর প্রসারী হয়। তাই অন্তর্দ্বন্দ্বময় চরিত্র উপন্যাসেও পরিলক্ষিত হয়। ‘পূর্ণ অপূর্ণ’র সুরেশ্বর, অবনী, ‘দেওয়াল’ উপন্যাসের গিরিজাপ্রসাদ, সুখা, বাসু, সুচারু, ‘দীপ’ উপন্যাসের বসুখা, ‘হৃদয়তল’ উপন্যাসের রজনীকান্ত, প্রতিভা, ‘অসময়’ উপন্যাসের মোহিনী, ‘ভুবনেশ্বরী’ উপন্যাসের সোমকান্তি অন্তর্দ্বন্দ্বময় চরিত্রে রূপান্তরিত হয়ে উঠেছে। উপন্যাসের মাধ্যমে লেখক একটি কাহিনীকে খাড়া করার চেষ্টা করেছেন এবং সেই কাহিনীর মধ্যেই আবর্তিত হয়েছে তাঁর চরিত্রগুলি। লেখকের জীবনদর্শন, জগৎ সম্পর্কে ভাবনা কাহিনী ও চরিত্রের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু কাহিনী বা ঘটনাবৈচিত্র্য অনেক সময়ই তাঁর ছোটগল্পে অনুপস্থিত। ‘গল্প বিহীন গল্প’ বলার প্রয়াস তাঁর কয়েকটি গল্পের মাধ্যমে রূপ পেয়েছে। এই গল্পগুলিতে চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক ভাবনা প্রাধান্য পেয়েছে, এবং তারই নিরিখে গল্পগুলিতে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে মানসিক জগতের রূপ বৈচিত্র্য। লেখক নিজে বলেছেন--

“একেবারে গোড়ার দিকে গল্প লেখার সময় আমি মনে মনে একটা কাঠামো করে নিতাম। তার পর আর করি না। হালে দশ বারো বছর যা লিখি তার স্পষ্ট কোনো ধারণা আগে থেকে আমার থাকে না। অস্পষ্ট কী যেন একটা মনের মধ্যে গুমরে মরে। একটা তুলনা দিয়ে কথাটা তোমায় বোঝাই। আমার সব সময় মনে হয়েছে, সিস পেনসিলে লেখা অস্পষ্ট খাপছাড়া একটা ঠিকানা যেন কেউ এক টুকরো কাগজে মুড়ে আমার হাতে দিয়ে দিয়েছে। আমি সেই দুর্বোধ্য, বেয়াড়া, অস্পষ্ট লেখা দেখে দেখে ঠিকানা খুঁজে বেড়াচ্ছি। এইভাবে হাতড়ে হাতড়ে আমি লিখি, লেখার সময় মাথার মধ্যে কিছু যেন একটা বলার আপাণ চেষ্টা থাকে, কী যেন বলতে চাইছি তাও একেবারে দিনের আলোর মতন স্পষ্ট হয়ে আমার কাছে ধরা দেয় না। আমার লেখা তাই বড় বেশী দ্বিধা এবং সংশয়পূর্ণ।”^{১১}

লেখকের এই সত্যভাষণের সাথে তাঁর গল্পগুলির যোগ লক্ষ্য করা যায়। ষাটের দশকের পরবর্তীকালে তাঁর গল্পে ঘটনার বৈচিত্র্য থেকেও প্রাধান্য পেয়েছে মানব মন। ‘জননী’, ‘উদ্বেগ’, ‘অপেক্ষা’, ‘সংশয়’, ‘এরা ওরা’ প্রভৃতি গল্পে কাহিনী তেমন নেই, যতটা আছে মনোবিশ্লেষণ এবং আইডিয়ার প্রাধান্য। বিশেষ আইডিয়ার দ্বারা লেখক তাঁর গল্পে চরিত্র ও পরিস্থিতি নির্মাণ করেছেন।

বিমল করের সমসাময়িক গল্পকারদের সাথে তাঁর স্বাতন্ত্র্য প্রকাশিত হয়েছে তাঁর জীবনদৃষ্টির স্বাতন্ত্র্যে। জগদীশ গুপ্তের গল্পে রূঢ় বাস্তবতার নিরিখে জীবনের যে কদর্য রূপ প্রকাশিত হয়েছিল, সেখানে প্রকাশ পেয়েছিল প্রেমের ক্ষেত্রে যৌনতার প্রশ্ন, মানুষের জীবনের উপর নিয়তির পরাক্রম, এছাড়াও মানব মনের ভোগসর্বস্বতা, স্বার্থপরতা, হীন মনোবৃত্তি। বিমল করকে তাঁর সৃষ্টির মাধ্যমে এই নেতিবাদিকতাকে অতিক্রম করে ইতিবাচক ভাবনায় আপুত হতে দেখা যায়। তারাক্ষর বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পে গ্রামীণ জীবন, সামন্ততন্ত্রের অবক্ষয় ও বণিকতন্ত্রের উদ্ভবের যে যুগ পরিবর্তনের ছবি পাওয়া যায়, বিমল করের গল্পে তা অনুপস্থিত। তাঁর গল্পেও যুগের ছবি অঙ্কিত তবে তা স্বাধীনতা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী মানুষের চরিত্রিক, ভাবনাগত, আত্মানুসন্ধানগত পার্থক্যের মাধ্যমে বর্ণিত। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংগ্রামী মানুষের ছবি বিমল করের গল্পে পৃথক ভাবে এসেছে। তাঁর চরিত্রগুলি বাইরের জগতের থেকে অন্তর্জগতের যুদ্ধেই অধিকমাত্রায় ব্রতী হয়েছে। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্পে যে কাহিনী-প্রাধান্য লক্ষিত হয় তার প্রতি সর্বদা বিমল কর উৎসাহী হননি। তাঁদের গল্পের চরিত্রগুলির মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব থাকলেও

বিমল করের গল্পে চরিত্রগুলিতে মনস্তাত্ত্বিকতার মত গূঢ় ও নিবিড় আবেদন অন্য মাত্রা দেয়। বিমল কর গূঢ়ভাষী লেখক এবং তাঁর গল্পে মূলত মানুষের অন্তরঙ্গজগতের আলো-ছায়াময় জগৎ প্রতিভাত হয়েছে। তাঁর গল্পে শ্রেণীগত সমস্যা সর্বদা তীব্র হয়ে আসেনি। প্রথমদিকের ‘মানবপুত্র’, ‘আঙুরলতা’, ‘বরফ সাহেবের মেয়ে’ গল্পে এই প্রবণতা থাকলেও পরবর্তীকালে তিনি মধ্যবিত্ত মানুষের মনস্তাত্ত্বিক টানাপোড়েনকেই প্রকাশ করতে চেয়েছেন। সমকালীন গল্পকারদের মধ্যে আশাপূর্ণা দেবী, কমলকুমার মজুমদার প্রমুখের গল্পে ব্যক্তি মানুষের মূল্যবোধের ক্ষয়িষ্ণুতা যেমন ভাবে গল্পের বিষয় হয়ে উঠেছে, তার সাথে বিমল করের গল্পের মিল লক্ষিত হয় বটে তবে বিমল করের গল্পে আত্মিক উন্নতির বাসনায়, স্বীকারোক্তির প্রবণতায় চরিত্রগুলি বহুক্ষেত্রেই সঠিক পথের দিশা খুঁজে পেয়েছে। বিমল করের ‘উপখ্যান মালা’ গ্রন্থের গল্পগুলিতে এই ভাবনা খুঁজে পাওয়া যায়।

‘ছোটগল্প : নতুন রীতি’ আন্দোলন বিমল কর সংগঠিত করে তোলেন। এই আন্দোলনের সাপেক্ষে যে গল্প সংকলনগুলি প্রকাশিত হয় সেখানে তাঁর গল্প না থাকলেও তিনি এই আন্দোলনের মাধ্যমে লেখকের সচেতন ইচ্ছা ও প্রয়াসকে রূপ দিতে চেয়েছেন। এই আন্দোলনের ইন্তেহারে তিনি লেখেন -- “ছোটগল্প : নতুন রীতি”র সঙ্গে যারা সংশ্লিষ্ট তাঁরা সবিনয়ে শুধু এইটুকু বলবেন : আমরা আমাদের মনোমত করে গল্প লিখতে চাই, যে লেখা সাধারণত চলিত পত্রিকাগুলির পক্ষে ছাপা সর্বদা সম্ভব নয়। বস্তুত এই কারণেই আমাদের এই গ্রন্থমালা, যার পাঠক স্বল্প, সহানুভূতিশীল এবং পরীক্ষামূলক রচনার প্রতি শ্রদ্ধাবান।”^{১২}

বিমল কর তাঁর লেখক জীবনে ছোটগল্পের প্রতি অনুরাগবশত বহু পরীক্ষা নিরীক্ষায় ব্রতী হয়েছেন। বার বার পত্রিকা প্রকাশের দুঃসাহস দেখিয়েছেন। এই প্রয়াস তাঁর অবসর জীবনে ‘গল্পপত্র’ নামক গল্পের পত্রিকা প্রকাশের মাধ্যমেও ব্যাখ্যাত হয়। কিন্তু বিমল কর তাঁর সমকালে আরও কিছু গল্প আন্দোলন, যেমন --হাথরি জেনারেশন, নিম্ন সাহিত্য, শাস্ত্র বিরোধী, গণতন্ত্র ও চাকর সাহিত্য বিরোধী প্রভৃতি গল্প আন্দোলনের দ্বারা প্রভাবিত হন নি। জীবনের শুভবোধের প্রতি আস্থা রেখে তার প্রতিফলনও ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন সাহিত্যের মাধ্যমে।

পরিশেষে বলা যায় বিমল করের গল্পে যে চরিত্রগুলি এসেছে তারা সাধারণ মানুষের প্রতিনিধি। কেঁট, গুণেন, বরদা, সুধাময়, শ্যামল, পূর্ণেন্দু, মৃণাল, নিশীথ বরদা, হেমদাকান্ত, শৈল, কানন, উমা, হৈমন্তী, ফুল্লরা, শিবানী, মোহনা এই সব নামকরণের মধ্যে যেমন সারল্য রয়েছে

তেমনি তাদের জীবনধারণের প্রবণতাও সরল, স্বাভাবিক। তবুও অবচেতন মনের দ্বারা আড়িত হয়ে তারা সৃষ্টি করে ফেলেছে একটা মনস্তাত্ত্বিক জগৎ, যে জগতে সে একা, বন্ধুহীন, পরিজনহীন। আধুনিক জীবনের জটিলতার আবর্তে এই চরিত্রগুলিও এসে পড়েছে। লেখক তাদের জীবনাকাঙ্ক্ষার পথের পথিক করে তুলেছেন তাদের আত্ম আবিষ্কারের সৎ প্রচেষ্টায়। তাদের জীবনের গভীরে জীবনবাদী প্রত্যয়ের সন্ধানই লেখকের জীবনদৃষ্টির বৈচিত্র্যের সাথে একাত্ম হয়ে উঠেছে। লেখকের জীবন ও জগৎ সম্পর্কে এই অনুসন্ধানের কথাই তাঁর ছোটগল্প ও কয়েকটি উপন্যাসের সমালোচনার মাধ্যমে রূপায়িত করতে চেয়েছি।

উৎস পরিচয়

১. ছোটগল্পের সীমারেখা—নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, বাকসাহিত্য, ১৪০৬, পৃষ্ঠা-১৭
২. 'নিশীথ সঙ্গী'- 'শেষ বেলার গল্প'—বিমল কর, প্রকাশক-রংঘীর পাল, ১৯৯০, পৃষ্ঠা-২০৬
৩. 'সংশয়'—'বিমল করের পঞ্চাশটি গল্প'—বিমল কর, আনন্দ পাব. প্রাঃ লিঃ, ২০০১, পৃষ্ঠা-৩৭০
৪. 'সুখ'—'বিমল করের পঞ্চাশটি গল্প'—বিমল কর, আনন্দ পাব. প্রাঃ লিঃ, ২০০১, পৃষ্ঠা-৫৬৬
৫. 'তুচ্ছ'—'বিমল করের পঞ্চাশটি গল্প'—বিমল কর, আনন্দ পাব. প্রাঃ লিঃ, ২০০১, পৃষ্ঠা-৫৮০
৬. 'মোহনা'—'বিমল করের পঞ্চাশটি গল্প'—বিমল কর, আনন্দ পাব. প্রাঃ লিঃ, ২০০১, পৃষ্ঠা-৪৭৫
৭. 'ফ্রয়েড জন্মশতবার্ষিকী'—বিমল কর, সাপ্তাহিক 'দেশ', ১২ই মে, ১৯৫৬, পৃষ্ঠা-১৭২
৮. 'অপেক্ষা'—'বিমল করের পঞ্চাশটি গল্প'—বিমল কর, আনন্দ পাব. প্রাঃ লিঃ, ২০০১, পৃষ্ঠা-৩৩৬
৯. 'লেখকের কৈফিয়ত'—'নির্বাচিত গল্প'—বিমল কর, অনন্য প্রকাশনী, ১৯৭৩, পৃষ্ঠা-৪-৫
১০. 'মৃত্যু ইচ্ছা'—বিমল কর, সাপ্তাহিক 'দেশ', ৪ঠা জুন, ১৯৫৫, পৃষ্ঠা-৪৫০
১১. 'লেখকের কৈফিয়ত'—'নির্বাচিত গল্প'—বিমল কর, অনন্য প্রকাশনী, ১৯৭৩, পৃষ্ঠা-৬
১২. 'ছোটগল্প : নতুন রীতি', বাংলা গল্প কবিতা আন্দোলনের তিন দশক—সন্দীপ দত্ত, র‍্যাডিক্যাল ইমপ্রেশন, ১৪০০, পৃষ্ঠা-২৯

বাংলা সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১. অন্তর্বয়ন: কথা সাহিত্য—পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়, একুশে, ১৯৯০
২. অক্টোবর বিপ্লব ও আধুনিক বাংলা সাহিত্য — মলয় বসু কে. পি. বাগচী
৩. আটদশক— ভবতোষ দত্ত, প্রতিষ্কণ পাব. প্রাঃ লিঃ ১৯৯৫
৪. আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস— অশুকুমার সিকদার—অরুণা প্রকাশনী ১৯৯৩
৫. আলাপ: সংলাপ:সম্ভাষ—সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় দে'জ পাব. ১৯৯৮
৬. আমার কালের কয়েকজন কথাশিল্পী— জগদীশ ভট্টাচার্য, ভারবি, ১৯৯৪
৭. আধুনিক বাংলা ছোটগল্প— সাবিত্রীনন্দ চক্রবর্তী-পুস্তক বিপণি
৮. আকাদেমি বানান অভিধান— সংকলক: পবিত্র সরকার, অমিতাভ মুখোপাধ্যায়,
প্রশান্তকুমার দাশগুপ্ত, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ১৯৯৮
৯. ইতিহাসের দিকে ফিরে ৪৬ এর দাঙ্গা — সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, উৎস মানুষ সংকলন, ১৯৯৩
১০. ইমলিগড়ের রূপকথা— বিমল কর, আনন্দ পাব. প্রাঃ লিঃ, জানুয়ারী-২০০৪
১১. উপাখ্যান মালা — বিমল কর, আনন্দ পাব. প্রাঃ লিঃ, ১৯৯৫
১২. উপন্যাস জিজ্ঞাসা — রবীন্দ্র গুপ্ত, গ্রন্থ নিলয়, ১৯৯৫
১৩. উনিশ শতক — অলোক রায়, পুস্তক বিপণি, ১৯৯৫
১৪. উপন্যাসের প্রতিবেদন — তপোধীর ভট্টাচার্য, র‍্যাডিক্যাল ইমপ্রেশন, জানুয়ারী, ১৯৯৯
১৫. উপন্যাসের বর্ণমালা — সুমিতা চক্রবর্তী, পুস্তক বিপণি, আগষ্ট, ১৯৯৮
১৬. উপন্যাস সমগ্র (১)— বিমল কর, আনন্দ পাব. প্রাঃ লিঃ, নভেম্বর, ২০০২
১৭. উপন্যাস সমগ্র (২)— বিমল কর, আনন্দ পাব. প্রাঃ লিঃ, সেপ্টেম্বর, ১৯৯৯
১৮. উপন্যাস সমগ্র (৩)— বিমল কর, আনন্দ পাব. প্রাঃ লিঃ, সেপ্টেম্বর, ২০০২
১৯. উপন্যাস সমগ্র (৪)— বিমল কর, আনন্দ পাব. প্রাঃ লিঃ, সেপ্টেম্বর, ২০০১
২০. উপন্যাস সমগ্র (৫)— বিমল কর, আনন্দ পাব. প্রাঃ লিঃ, সেপ্টেম্বর, ২০০২
২১. উপন্যাস সমগ্র (৭)— বিমল কর, আনন্দ পাব. প্রাঃ লিঃ, সেপ্টেম্বর, ২০০৪
২২. কথা সাহিত্য জিজ্ঞাসা— অলোক রায়, সাহিত্যলোক, ১৩৯৮
২৩. কথা শিল্পীর এ্যালবাম—ডঃ নিতাই বসু অভিজাত প্রকাশনী, ১৯৯৯
২৪. কথাসূত্র— পবিত্র সরকার— মিত্র ও ঘোষ পাব. প্রাঃ লিঃ, ১৪১০
২৫. কল্লোল গোষ্ঠীর কথা সাহিত্য—ডঃ দেব কুমার বসু— করুণা প্রকাশনী, ২০০৪

২৬. কল্লোল যুগের ছোটগল্প ও রুশ বিপ্লব— ডঃ শিবশঙ্কর পাল, পাণ্ডুলিপি ১৯৯৯
২৭. কল্লোল গল্প পঞ্চাশৎ— সম্পাদনা— বারিবরণ ঘোষ, আনন্দ পাব. প্রাঃ লিঃ ২০০৪
২৮. কল্লোল যুগের পরে—আশু চট্টোপাধ্যায় প্যাপিরাস ১৯৯৩
২৯. কল্লোলের কাল— জীবেন্দ্র সিংহ রায়, দে'জ পাব. ১৯৮৭
৩০. ঋতুকুটো— বিমল কর, আনন্দ পাব. প্রাঃ লিঃ, ১৯৯৪
৩১. গল্প সমগ্র— নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, মিত্র ও ঘোষ পাব. প্রাঃ লিঃ, ১৪০২
৩২. গল্প সমগ্র— নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, মিত্র ও ঘোষ পাব. প্রাঃ লিঃ, ১৪০৬
৩৩. গল্প সংগ্রহ— কমল কুমার মজুমদার, সুবর্ণরেখা, শ্রাবণ, ১৩৮৮
৩৪. গল্প সংগ্রহ— শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, বিশ্ববানী প্রকাশনী, ১৯৮১
৩৫. গল্প সম্ভার— বিমল মিত্র, সম্পাদনা: সুনীল দাস, উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দির, ২০০১
৩৬. গল্প নিয়ে কবিতা নিয়ে— হিমবন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রয়াস, ১৯৯১
৩৭. গল্প পাঠকের ডায়ারি, উজ্জ্বলকুমার মজুমদার, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০০৫
৩৮. গল্পমালা (১)—নরেন্দ্রনাথ মিত্র, আনন্দ পাব. প্রাঃ লিঃ, ১৯৯৯
৩৯. গল্পমালা (৩)—নরেন্দ্রনাথ মিত্র, আনন্দ পাব. প্রাঃ লিঃ, ১৯৯৪
৪০. গল্পমালা (৪)—নরেন্দ্রনাথ মিত্র, আনন্দ পাব. প্রাঃ লিঃ, ১৯৯৭
৪১. ছোটগল্পের বিচিত্র কথা— সরোজ মোহন মিত্র, গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ, ১৩৮৬
৪২. ছোটগল্পের সীমারেখা— নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, বাকসাহিত্য প্রাঃ লিঃ, ১৪০৬
৪৩. ছোটগল্পের বিষয় আশয়— সুমিতা চক্রবর্তী, পুস্তক বিপণি, ২০০৪
৪৪. ছোটগল্পের কথা— ভূদেব চৌধুরী,
৪৫. ছোটগল্পের সুবোধ ঘোষ— সুদীপ কুমার চক্রবর্তী, প্রকাশ ভবন,
৪৬. ছোটগল্পের কথা— রথীন্দ্রনাথ রায়, পুস্তক বিপণি, ১৯৯৬
৪৭. জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর নির্বাচিত গল্প— সম্পাদনা: ড. নিতাই বসু, দে'জ পাব. ১৯৯৯
৪৮. জগদীশ গুপ্তর গল্প— সম্পাদনা: সুধীর রায়চৌধুরী, দে'জ পাব. ১৯৯৯
৪৯. তারশঙ্কর অনুসন্ধান '৯৮— ক্ষেত্র গুপ্ত, পুস্তক বিপণি, ১৯৯৮
৫০. তারশঙ্করের শিল্পী মানস— ড. নিতাই বসু, দে'জ পাব. ১৯৮৮
৫১. তারশঙ্কর অন্তরে— সম্পাদনা: সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, রমা প্রকাশনী, ১৯৮৭
৫২. দুই বিশ্বযুদ্ধ মধ্যকালীন বাংলা কথাসাহিত্য— গোপিকানাথ রায়চৌধুরী, দে'জ পাব. ১৯৮৬

৫৩. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমকালীন বাংলা কথাসাহিত্য-- ড. মীরা ঘোষ,

মডল বুক এজেন্সি প্রাঃ লিঃ, ১৯৮৪

৫৪. দেওয়ান-- বিমল কর, আনন্দ পাব প্রাঃ লিঃ, ২০০৬

৫৫. নরেন্দ্রনাথ মিত্র জীবন ও সাহিত্য, অঞ্জুশ্রী ভট্টাচার্য, পুস্তক বিপণি, ১৯৯৪

৫৬. নকশাল আন্দোলনের গল্প-- সম্পাদনা: বিজিত ঘোষ, পুনশ্চ, ১৯৯৯

৫৭. নকশাল বাদী আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য-- নির্মল ঘোষ, করুণা প্রকাশনী, মাঘ-১৪০১

৫৮. পঞ্চাশের মনস্তর ও বাংলা সাহিত্য-- ড. বিনতা রায়চৌধুরী, সাহিত্যালোক, ১৯৯৭

৫৯. প্রতিবাদের গল্প : নকশাল বাড়ি-- সম্পাদনা: পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়, সাধন চট্টোপাধ্যায়,

র্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, ১৯৯৯

৬০. পঞ্চাশের মহা মনস্তর ও বাংলা ছোটগল্প-- মানস মজুমদার, পুস্তক বিপণি, ১৯৯৪

৬১. ফ্রেড-- সুনীল কুমার সরকার, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৯৫

৬২. বৃহদারণ্যকোপনিষদ, সংস্কৃত বুক ডিপো, ২০০৪

৬৩. বিংশ শতকের বাংলা ছোটগল্পে সমাজ বিদ্রোহ-- ড. চন্দ্র ঘোষ সিনহা, রত্নাবলী, ১৯৯৩

৬৪. বাংলা ছোটগল্প : প্রসঙ্গ ও প্রকরণ-- বীরেন্দ্র দত্ত, পুস্তক বিপণি, ১৯৯৫

৬৫. বিমল করের উপন্যাস : প্রসঙ্গ অসুখের উপমা-- সুব্রত ঘোষ, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০০৬

৬৬. বাংলা গল্প কবিতা আন্দোলনের তিন দশক-- সম্দীপ দত্ত, র্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, ১৯৯৩

৬৭. বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার-- ভূদেব চৌধুরী, মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাঃ লিঃ, ১৯৭৫

৬৮. বাংলা ও বাঙালীর বিবর্তন-- ড. অতুল সুর, সাহিত্যালোক, ২০০১

৬৯. বাংলা সাহিত্যে ব্রাত্য সমাজ-- ড. সুবোধ দেবসেন, পুস্তক বিপণি, ১৯৯৯

৭০. বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা-- শ্রী শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়,

মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাঃ লিঃ ১৯৯৬

৭১. বাংলা উপন্যাসের পালাবদল-- ড. ভাস্করী সমাদার, পুস্তক বিপণি, ১৯৯৪

৭২. বাংলা উপন্যাসের কালান্তর, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, দে'জ পাব. ১৯৮৮

৭৩. বাংলা সাহিত্যে সমাজতাত্ত্বিক চিন্তাধারা-- গীতা মুখোপাধ্যায়, কে পি বাগচী এন্ড কোং

৭৪. বাংলা দেশের ইতিহাস (আধুনিক যুগ) রমেশচন্দ্র মজুমদার, জেনারেল পাব. প্রাঃ লিঃ, ১৩৮১

৭৫. বাংলা ছোটগল্পে প্রতিবাদী চেতনা-- ড. বিজিত ঘোষ, পুনশ্চ

৭৬. বাংলা কথাসাহিত্য প্রকরণ ও প্রবণতা-- গোপিকানাথ রায়চৌধুরী, পুস্তক বিপণি, ১৯৯১

৭৭. বিমল করের বাছাই গল্প, মডল বুক এজেন্সী, ১৪০৭

৭৮. বঙ্কিম মনন— ড. দিলীপ কুমার দত্ত, বিশ্বজ্ঞান, ১৯৯১
৭৯. বাংলা সাহিত্যে ইতিকথা (চতুর্থ পর্যায়)— ভূদেব চৌধুরী, দে'জ পাব. ১৯৯৪
৮০. বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা (নব যুগ)—গোপাল হালদার অরুণা প্রকাশনী ১৪০১
৮১. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রষ্ঠ গল্প— সম্পাদনা: যুগান্তর চক্রবর্তী, বেঙ্গল পাব প্রাঃ লিঃ, ১৪০৬
৮২. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনদৃষ্টি ও শিল্পরীতি— গোপিকানাথ রায়চৌধুরী, দে'জ পাব, ১৯৯৮
৮৩. মানিক জিজ্ঞাসা— সম্পাদনা: তরুণ মুখোপাধ্যায়, রমা প্রকাশনী, ১৯৯৬
৮৪. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমাজ জিজ্ঞাসা— ড. নিতাই বসু দে'জ পাব. ১৯৯৯
৮৫. মনোজ বসুর গল্প সমগ্র(প্রান্তিক পর্ব)— ভূদেব চৌধুরী, বেঙ্গল পাব প্রাঃ লিঃ। ১৩৮৪
৮৬. মনোবিদ্যা— ড. প্রীতিভূষণ চট্টোপাধ্যায়, মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাঃ লিঃ, ১৯৯৭
৮৭. মার্কসবাদ— এমিল বার্নস, ন্যাশন্যাল বুক এজেন্সী প্রাঃ লিঃ, ১৯৯৭
৮৮. রবীন্দ্রনাথ— বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৯১
৮৯. রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা— নীহার রঞ্জন রায়, নিউ এজ পাব প্রাঃ লিঃ, ১৩৬৯
৯০. রবীন্দ্রনাথ বাংলা কথাসাহিত্য নানা দর্পণে— গোপিকানাথ রায়চৌধুরী, দে'জ পাব. ১৯৯৬
৯১. রবীন্দ্রনাথের : ছোটগল্পের প্রকরণ শিল্প— গোপিকানাথ রায়চৌধুরী, সাহিত্যলোক, ১৯৯৭
৯২. লিখনে কী ঘটে— অমিয়ভূষণ মজুমদার, আনন্দ পাব প্রাঃ লিঃ, ১৯৯৭
৯৩. শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা— সম্পাদনা— জয়দেয়াল গোস্বামী, গীতা প্রেস, তৃতীয় সংস্করণ
৯৪. শরৎ চন্দ্র শ্রী সুবোধ চন্দ্র সেনগুপ্ত এ. মুখার্জী এন্ড কোং প্রাঃ লিঃ ১৪০৪
৯৫. সুবোধ ঘোষ বাছাই গল্প— সন্তোষ ঘোষ মণ্ডল বুক হাউস ফাল্গুন ১৪০৫
৯৬. সমরেশ বসুর গল্প সমগ্র (১) সম্পাদনা ড. নিতাই বসু মৌসুমী প্রকাশনী ১৯৯৫
৯৭. সমরেশ বসুর গল্প সমগ্র (২) সম্পাদনা ড. নিতাই বসু মৌসুমী প্রকাশনী ১৪০১
৯৮. সমরেশ বসু : সময়ের চিহ্ন — পার্থপ্রতীম বন্দ্যোপাধ্যায়, র‍্যাডিক্যাল ইমপ্রেশন ১৯৯৭
৯৯. সমরেশ বসু স্মরণ সমীক্ষণ— সম্পাদনা: সত্যজিৎ চৌধুরী, নিখিলেশ্বর সেনগুপ্ত,
বিজলি সরকার, চয়নিকা, ১৯৯৪
১০০. সন্তোষ কুমার ঘোষের সমস্ত গল্প (১) স্বরলিপি বৈশাখ ১৩৮৪
১০১. সাহিত্যে ছোটগল্প— নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, ডি.এম. লাইব্রেরী ১৩৮৪
১০২. সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে বাংলা ছোটগল্প— ড. ভাস্করী চক্রবর্তী লাহিড়ী
দে'জ পাব. ১৯৯১
১০৩. সন্তোষ কুমার ঘোষ কথা সাহিত্যে স্বয়ং নায়ক—অলোক চক্রবর্তী, পুস্তক বিপণি ২০০১

১০৪.সরস গল্প--বিমল কর, আনন্দ পাব প্রাঃ লিঃ ২০০৫

১০৫.সাহিত্য সম্ভূট --সম্পাদনা প্রমথনাথ বিশী, শ্রী বিজিত কুমার দত্ত, বিশ্বভারতী ১৯৬৭

১০৬.সাহিত্য বীক্ষা --নীরেন্দ্রনাথ রায়, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পৰ্যদ, ১৯৮৩

১০৭.সংসদ বানান অভিধান-- আশোক মুখোপাধ্যায়, সাহিত্য সংসদ, ১৯৯৮

বাংলা সহায়ক সাময়িক পত্র-পত্রিকা

অর্থমা-- প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, জুলাই-২০০৪

কোরক-- বিমল কর বিশেষ সংখ্যা, জানুয়ারী-এপ্রিল, ১৯৯৭

বিতর্কিকা-- শীত ১৯৯০

কলেজ স্ট্রীট-- মার্চ, ১৯৮৮

তীর কুঠার-- বইমেলা-২০০৩

বিকল্প-- অক্টোবর ২০০৩

বিভাব-- বইমেলা- ১৪১০

পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকা-- তারাক্ষর বন্দ্যোপাধ্যায় বিশেষ সংখ্যা, ১৪০৪

গোধূলি মন-- ডিসেম্বর ১৯৮৮

গল্পপত্র-- প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা, বৈশাখ- জ্যৈষ্ঠ- ১৯৯৫

প্রমা-- এপ্রিল-জুন, ১৯৮৭

পশ্চিমবঙ্গ-- তেভাগা সংখ্যা, ১৪০৪

পশ্চিমবঙ্গ-- শৈলজানন্দ জন্মশতবর্ষ সংখ্যা, মার্চ, ২০০১

পশ্চিমবঙ্গ-- বঙ্কিমচন্দ্র সংখ্যা, ১৪০২

সাহিত্য সেতু-- ভাদ্র-আশ্বিন, ১৩৯০

এবং জলার্ক-- জানুয়ারী-মার্চ, ১৯৯৯

দেশ-- ৪ঠা জুন, ১৯৫৫

দেশ-- ১২ই মে ১৯৫৬

দেশ সাহিত্য সংখ্যা, ১৩৭৬

দেশ-- ৬ই ডিসেম্বর, ১৯৮৬

দেশ-- ৯ই জানুয়ারী, ১৯৮৮

দেশ-- ২১শে অক্টোবর, ১৯৮৯

দেশ-- ৩রা নভেম্বর, ১৯৯০

দেশ-- ৩০শে নভেম্বর, ১৯৯১

দেশ-- ৫ই নভেম্বর, ১৯৯৪

দেশ-- ৩রা নভেম্বর, ১৯৯৫

দেশ— ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৯৫

দেশ— ৭ই ফেব্রুয়ারী ১৯৯৮

দেশ— ৫ই ফেব্রুয়ারী ২০০০

দেশ— ১৭ই সেপ্টেম্বর, ২০০৩

শারদীয় আনন্দ বাজার পত্রিকা— ১৯৯৬, ১৯৯৮, ১৯৯২, ১৯৮৩

বার্ষিক সংখ্যা— আনন্দবাজার পত্রিকা — ১৯৮৮, ১৯৮০

শারদীয় দেশ— ১৯৮৮, ১৯৯০, ১৯৯৩, ১৯৯৫, ১৯৯৭

ইংরেজি সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

1. The psychological Novel, By Leon Edel, J.B.Lippincott Company, New York
2. 'A glossary of Literary Terms', M. H. Abrams,
Harcourt Brace College Publishers, Seventh Edition
3. A Short Story: A Critical Introduction – Valerie Shaw
Longman, London & New York, 1985
4. A Handbook of critical Approches to Literature – Wilfred L. Guerin,
Earle Labor, Lee Morgan, Jeanne C. Reesman, John R. Willingham,
Forth Edition, Oxford University Press, 1999
5. Aspects of the Novel – E. M. Forster, Edited by Oliver Stallybrass,
Penguin Books, 1990
6. Dictionary of Literary themes and Motifs – Jean Charles Seigneuret Editor,
Greenwood Press, New York, 1988
7. Marks Engels on literature and Art—Progress Publishers, Moscow, 1978
8. Literary Criticism in Ancient India – Dr. Ramaranjan Mukherjee,
Sanskrit Pustak Bhandar, 1990
9. Marx and Modern Social theory – Alan Swingewood,
The Macmilan Press LTD, London & Basingstoke, 1979
10. The Psychological Novel (1900-1950) – Leon Edel,
J. B. Lippencott Company, New York
11. The Art of Fiction – David Lodge, Penguin Books, 1992